অনীশ দেব

সেরা সায়েন্স ফিকশন সমগ্র



সেরা সায়েন্স ফিকশন সমগ্র

অনীশ দেব

পত্র ভারতী

তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে সায়েন্স ফিকশন চর্চায় একনিষ্ঠ লেখকের বাছাই করা ২৬টি গল্প এবং ১টি উপন্যাস এই সংকলনের সম্পদ। এই লেখাগুলির কোনওটি প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায়, কোনওটি 'বর্তমান', 'যুগান্তর' কিংবা 'সানন্দা'য়। গল্পগুলি বলেছে মানুষের বহুমাত্রিক সম্পর্কের কথা, ভালোবাসার কথা, জীবনের কথা। এর মধ্যে যেমন আছে রোবট, মহাকাশ, তেমনই আছে আমাদের আগামী দিনের সমাজ, আগামী দিনের জীবন, আগামী দিনের অচেনা পৃথিবী। ভবিষ্যতের জীবনকে নতুন এক বহুবর্ণ লেন্সের ভেতর দিয়ে দেখেছেন লেখক। আর সেই 'নতুন' দেখার সুযোগ করে দিচ্ছেন আপনাকে...। হ্যাঁ, একমাত্র আপনাকেই।



জন্ম ২২ অক্টোবর ১৯৫১, কলকাতায়। স্কুলের পড়াশোনা : হিন্দু স্কুল। সাম্মানিক পদার্থবিজ্ঞানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং ফলিত পদার্থবিজ্ঞানে বি. টেক., এম.টেক. ও পিএইচ.ডি.। পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি স্বর্ণপদক ও একটি রৌপ্যপদক।

১৯৮৩ সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে লেকচারার। ১৯৯০ থেকে ওই বিভাগেই রিডার, আর ১৯৯৮ থেকে প্রফেসার।

লেখালেখির শুরু ১৯৬৮-তে, অধুনালুপ্ত 'মাসিক রহস্য পত্রিকা'য়। প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস/গল্পগ্রন্থ : **ভয়পাতাল, অন্তরে পাপ ছিল, কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র, বিশ্বের সেরা ভয়ংকর ভূতের গল্প, অশরীরী অলৌকিক, ভৌতিক অলৌকিক, আমি পিশাচ, মার্ডার ডট কম, বারোটি উপন্যাস, সেরা সায়েন্স ফিকশন সমগ্র** ইত্যাদি।

জনপ্রিয়-বিজ্ঞান গ্রন্থ : **বিজ্ঞানের হরেকরকম, সহজ কথায় ইন্টারনেট, কেমন করে কাজ করে যন্ত্র, রোমাঞ্চকর ধূমকেতু ও পাই নিয়ে রূপকথা** ইত্যাদি।

প্রধান নেশা : রহস্য-গোয়েন্দা, অলৌকিক ও কল্পবিজ্ঞান কাহিনি লেখালেখি, জনপ্রিয় বিজ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান গবেষণা এবং কম্পিউটার।

পুরস্কার : প্রাচীন কলাকেন্দ্র সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৮) ও ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ জাতীয় পুরস্কার (১৯৯৯)।

সম্পাদনা করেছেন অল্পকালজীবী কয়েকটি মাসিক পত্রিকা ও বিমল করের 'গল্পপত্র' পত্রিকার বিশেষ কল্পবিজ্ঞান সংখ্যা।

প্রচ্ছদ সৌরীশ মিত্র

অনীশ দেব

সেরা সায়েন্স ফিকশন সমগ্র



পত্র ভারতী

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১

SERA SCIENCE FICTION SAMAGRO
by
Anish Dev

ISBN No. 978-81-8374-079-1

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সৌরীশ মিত্র

মূল্য
২৫০.০০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
e-mail : patrabharati@gmail.com
website : bookspatrabharati.com
Price Rs. 250.00

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে
প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

এক মিনিট, আপনাকে বলছি

যে-বইটা আপনি হাতে নিয়েছেন সেটা আমার সবচেয়ে প্রিয় বই। তার কারণ, আড়াই দশকের লেখালেখি থেকে ছাব্বিশটি কল্পবিজ্ঞানের গল্প এবং একটি উপন্যাস আমি বহু যত্নে বাছাই করে একগুচ্ছ রঙিন ফুলের মতো আপনার ব্যক্তিগত ফুলদানিতে সাজিয়ে দিতে পেরেছি। এই লেখাগুলো প্রকাশিত হয়েছিল নানান পত্রপত্রিকায়। তার মধ্যে 'দেশ' পত্রিকা যেমন আছে, তেমনই আছে 'আজকাল', 'সানন্দা', 'বর্তমান', 'সাপ্তাহিক বর্তমান', 'যুগান্তর' কিংবা 'নবকল্লোল'-এর মতো পত্রিকাও। এই গল্পগুলো বই হয়ে বেরোল এই প্রথম। আর উপন্যাসটি ১৯৯৬ সালে একবার অকিঞ্চিৎকরভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় কল্পবিজ্ঞান কিংবা সায়েন্স ফিকশন এখনও পর্যন্ত কিছুটা ব্রাত্য। কিন্তু আমরা, যারা কিছুতেই কল্পবিজ্ঞান গল্প লেখার 'চুলকুনি' বন্ধ করতে পারি না, মনের অন্দরের অন্দরমহলের আকাঙক্ষা থেকে এই ধরনের গল্প-উপন্যাস ক্রমাগত লিখে চলেছি। আর আপনি—মানে, আপনার মতন আগ্রহী পাঠক—সেসব গল্প পড়েন, অথবা পড়বেন, এই ভরসাতেই আমাদের কলমে ক্লান্তি আসেনি।

হলফ করে বলতে পারি, এই সংকলনের লেখাগুলো আমাকে বরাবরই 'পাঠক' হিসেবে নাড়া দিয়েছে। এগুলোর প্রতি বিশেষ ভালোবাসা বোধহয় তৈরি হয়েছে সেই কারণেই। সেই ভালোবাসার শরিক হওয়ার জন্যে আপনাকে আন্তরিক স্বাগত জানাই। আসুন, আমরা একসঙ্গে হাত ধরে বাংলা কল্পবিজ্ঞানকে আরও একটু জায়গা তৈরি করে দিই।

অনীশ দেব

৮ জানুয়ারি, ২০১১
ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা ৭০০০০৯

সূ চি প ত্র

গল্প

সুন্দরী ১১
পিকনিকে তিনটে বিকেল ৩০
ধূমকেতু যখন আসে ৩৮
চিত্রার অদৃশ্য মৃতদেহ ৪৩
জীবনের সুর ৫৪
বুকের ভেতরে ৫৮
মাদারি যখন খেলা দেখায় ৬৭
সুখ-দুঃখের সরণি ৭৯
বিকল্পকবি সুবল বসু ৯২
চরম অস্ত্র ১০০
অশনি ও আবেগথেরাপি ১০৪
মনে পড়ার খেলা ১১৫
আকাশে কীসের শব্দ ১২১
অকালের ফুল ১৩৬
সুখের সংসার ডট কম ১৪৫
রাত ফুরোল, কথা ফুরোল ১৫৫
অলীক কথামালা ১৬৮
আজ শেষ দিন ১৮২
সময়েরে দিতে ফাঁকি ১৮৬
ভালোবাসা ফুরিয়ে গেলে ২০৩
জীবনের চাবিকাঠি ২১৯
হৃদয়নাথ ২২৭
একটু-একটু দেখা যায় ২৩৮
ইন্টু-পিন্টু থারটিন ২৪৫
দাগের বাইরে যাবেন না ২৫৩
মায়াযৌবন ২৬৫

উপন্যাস

ঘাসের শিষ নেই ২৮৭

লেখকের অন্যান্য বই

সেরা সায়েন্স ফিকশন সমগ্র
বারোটি রহস্য উপন্যাস
ভয়পাতাল
হিমশীতল
আমি পিশাচ
মার্ডার ডট কম
দুঃখী রাজকুমার
রোমাঞ্চকর ধূমকেতু
সহজ কথায় রোবট
সহজ কথায় ইন্টারনেট
সহজ কথায় টেলিভিশন
কেমন করে কাজ করে যন্ত্র
তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট
বিজ্ঞানের হরেকরকম
ভৌতিক অলৌকিক
অন্তরে পাপ ছিল
পাঁচটি রহস্য উপন্যাস
কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র
সেরা কল্পবিজ্ঞান সমগ্র
বিশ্বের সেরা ভয়ঙ্কর ভূতের গল্প
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ১ (সম্পাদিত)
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ২ (সম্পাদিত)
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ৩ (সম্পাদিত)
রহস্য রোমাঞ্চ গোয়েন্দা পত্রিকার সেরা ১০০ গল্প (সম্পাদিত)



সুন্দরী

রিঙ্কু বিছানায় বসে বই পড়ছিল। কমলেশ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে জিগ্যেস করল, 'অ্যাই, খুব সুন্দর একটা কবিতার লাইন শুনবি?'

রিঙ্কু আয়নার মধ্যে দিয়ে বাবার দিকে তাকাল। বলল, 'কী, শুনি?'

কমলেশ মুচকি হেসে বলল, 'পদার্থবিদ্যা পড়ছে একটি অপদার্থ মেয়ে।'

রিঙ্কু গম্ভীরভাবে বইয়ের পাতায় মনোযোগ দিয়ে মন্তব্য করল, 'বুঝেছি, আমাকে অপদার্থ বললে। আমি তো ভৌতবিজ্ঞান পড়ছি, তাই—।'

কমলেশ হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'নাঃ, তোর দেখছি বুদ্ধি আছে। আমি তোর বুদ্ধি পরীক্ষা করছিলাম।'

একটু দূরে দাঁড়িয়ে রোমি ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষছিল। রুক্ষ গলায় বলল, 'তোমার আয়নার কাজ হয়েছে? তা হলে এ পাশে এসে মেয়ের সঙ্গে কবির লড়াই করো। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে—।'

কমলেশ বউয়ের দিকে তাকাল। সেজেগুজে কোথায় যেন বেরোচ্ছে! বিউটি পারলার, কিংবা হ্যান্ডিক্র্যাফট-এর স্কুল, অথবা কুকিং রেসিপি-র স্পেশাল কোর্স অ্যাটেন্ড করতে। নয়তো অন্য কিছু। কমলেশ ঠিক জানে না। জানার তেমন একটা

ইচ্ছেও আর নেই।

কমলেশ কোনও কথা না বলে আয়না ছেড়ে দিল। রোমি চটপট পা ফেলে আয়নার সামনে এসে সাজগোজের শেষ ধাপটুকু মন দিয়ে শেষ করতে লাগল।

কমলেশ আড়চোখে বউকে একবার দেখল।

রোমি দারুণ সুন্দরী। এত সাজগোজের কোনও দরকার নেই ওর। কিন্তু তবুও সাজে। রূপ নিয়ে ঠিক দেমাক না হলেও ওর একধরনের আত্মতুষ্টি আছে। মাঝে-মাঝে কমলেশকে আড়ালে কথা শোনায়, রিঙ্কু তেমন সুন্দর দেখতে হয়নি বলে।

আয়নার মধ্যে দিয়ে রোমিকে দেখতে-দেখতেই হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল। আয়নার ছায়াটা ঢেউয়ের মতো কাঁপতে লাগল, তারপর সেখানে একটা অদ্ভুত বেঢপ চেহারা দেখা গেল। ধাতুর পাতে তৈরি হাত-পা-ওয়ালা একটা মানুষ যেন!

কমলেশ বুঝতে পারল, ও এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল। কারণ এই ঘরে রোমি বা রিঙ্কু থাকতে পারে না। অন্তত এখন।

তো চোখ খুলে ভালো করে তাকাল চারপাশে।

মাথা ঝিমঝিম করছে। ঘরের দেওয়ালগুলো দোল খাচ্ছে। বুকের ভেতর কেমন যেন একটা শব্দ হচ্ছে। আয়নাটা মনে হল দুলছে। এমনকী আয়নার সামনে দাঁড়ানো বেঢপ চেহারার বস্তুটাও সামান্য টলছে।

ওইরকম আচ্ছন্ন অবস্থাতেও কমলেশ মোটামুটি শুনতে পাচ্ছিল। ওর কানে এল, বিচিত্র ধাতব গলায় কে যেন সুর করে গাইছে ঃ

‘ভোর হইল, জগৎ জাগিল
চেতনে চাহিল নারী-নর—।’

আর তার ঠিক পরেই সেই ধাতব কণ্ঠ হাঁফ ছাড়ার ভঙ্গিতে বলল, ‘যাক, তোমার ঘুম ভেঙেছে তা হলে। ওঠো—দ্যাখো, ভোর হয়ে গেছে। আজি এ প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল। প্রাণের পর কেমনে পশিল গুহার আঁধারে। প্রভাত পাখির গান—।’

‘থামো, থামো, থামো!’ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কমলেশ। বিছানায় উঠে বসে ও হাতের পিঠ দিয়ে চোখ ঘষতে লাগল। তারপর মুখের সামনে ডানহাতের তর্জনী ও মধ্যমা ‘ভি’ অক্ষরের মতো করে বারকয়েক নাড়ল। না, দুটো আঙুলই দেখতে পাচ্ছে কমলেশ—চারটে নয়। এমনকী পাশের ছোট টেবিলে রাখা ভ্যাট সিক্সটিনাইনের বোতলের গায়ের লেখাটাও বাংলায় নির্ভুলভাবে ‘ভ্যাট উনসত্তর’ বলে পড়তে পারল। নাঃ, নেশার ঘোর তা হলে আর নেই। শুধু এই হতচ্ছাড়া মস্তক-বেদনাটি ছাড়া।

কিন্তু তবুও আয়নার সামনে দাঁড়ানো বিচিত্র রোবটটাকে কমলেশ কিছুতেই বাস্তব বলে মেনে নিতে পারছিল না। একে তো রোবট, তায় আবার ‘নির্ঝরের

স্বপ্নভঙ্গ' আওড়াচ্ছে!

রোবটটা আহত গলায় বলল, 'জানি, আমার পাংচুয়েশানে একটু-আধটু ডিফেক্ট আছে, তা বলে অমন মুখ করে থামিয়ে দেওয়ার কী ছিল! ভোরের রূপ দেখে আমি একটু ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলাম!'

কমলেশ হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারল না। আয়নার সামনে দাঁড়ানো রোবটটাকে দেখে ওর মনে ঠিক পাঁচটি মৌলিক প্রশ্ন জাগল : কে, কী, কেন, কবে, কোথায়?

এলোমেলো বিছানা থেকে নেমে কোনওরকমে সোজা হয়ে দাঁড়াল কমলেশ। বিরক্ত গলায় পাঁচটি প্রশ্নের প্রথমটা ছুড়ে দিল রোবটটার দিকে।

'কে তুমি?'

'ও মা!' বিস্ময়ে ডানহাত তুলে গালে ঠেকাল রোবটটা। খনখনে গলায় বলল, 'আমার জন্মদাতা হয়ে আমাকেই ভুলে গেলে!'

'জন্মদাতা!'

'হ্যাঁ, কাল রাতে তুমিই তো আমাকে তৈরি করলে! ঠিক রাত বারোটা বেজে তেতাল্লিশ মিনিটে আমাকে কমপ্লিট করে সুইচ অন করে দিয়েছ তুমি।'

কমলেশ এই যন্ত্রপাতিটাকে তৈরি করেছে! হতে পারে, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। গত ছ'মাস ধরে যা কিছু ও আবিষ্কার করেছে তার শতকরা নব্বই ভাগই মাতাল অবস্থায়, নেশার ঘোরে। তা ছাড়া, রোবটটার চেহারার মধ্যেও কমলেশের পেটেন্ট ধাঁচ রয়েছে।

কমলেশ বেশিরভাগ সময়েই বাতিল করে দেওয়া জিনিসপত্র ব্যবহার করে নতুন-নতুন আবিষ্কার করে ফেলে। ফলে অল্প খরচে তৈরি করা অভিনব সব মেশিনপত্তর জনগণের কাছে চটজলদি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যেমন, নিমের ডাল, জামাকাপড় ছড়ানোর প্লাস্টিকের ক্লিপ আর পুঁচকে একটা মোটর দিয়ে ও তৈরি করেছে 'দন্তধাবন যন্ত্র'। এই যন্ত্রের সাহায্যে দাঁত মাজার সময়ে মাথা একটুও নাড়াতে হয় না। শুধু যন্ত্রে দাঁত ঠেকিয়ে দাঁত খিচিয়ে থাকলেই কাজ হয়। যন্ত্র নিমেষে বাকি কাজটুকু সেরে দেয়। তা ছাড়া এতে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিমের দাঁতনের আয়ুর্বেদিক গুণ। আর দাম মাত্র পঁচাত্তর টাকা। শুধু মাঝে-মাঝে নিমের দাঁতনের একটা নতুন টুকরো ক্লিপের মধ্যে ফিট করে দিতে হয়।

তা এই রোবটটাও সেইরকম। ভাঙা টিনের পাত্র—তার মধ্যে মোটর গাড়ির বডি থেকে শুরু করে আমুল স্প্রে-র খালি টিন পর্যন্ত রয়েছে, পুরোনো গিয়ার, সাইকেলের চেন, কয়েকটা টুনি বাল্‌ব, খানিকটা স্বচ্ছ প্লাস্টিক, কয়েকটা মোটর আর আই. সি. চিপ দিয়েই ব্যাপারটা মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। মেশিনটার বুকের কাছটায় একটা নব লাগানো দরজা রয়েছে। বোধহয় ব্যাটারি ভরার জন্য আর কানেকশান রিপেয়ার করার জন্য।

স্বাভাবিকভাবেই রোবটটা দেখতে তেমন একটা আহামরি কিছু হয়নি। চোখের বাল্‌ব দুটো মাঝে-মাঝেই জ্বলে উঠছে, আর তালপাতার সেপাইয়ের মতো ল্যাকপ্যাক করে টিনের হাত-পা নাড়ছে।

কিন্তু এই মালটাকে কমলেশ তৈরি করল কেন?

ওর এখন বেশ মনে পড়ছে, রোবটটা তৈরির জন্য গত কয়েক সপ্তাহ ধরে খুবই পরিশ্রম করেছে। তারপর গতকালই ফিনিশিং টাচ দিয়ে রোবটটাকে চালু করেছে। কিন্তু কেন?

কমলেশ সেই কথাটাই জিগ্যেস করল, 'তোমাকে হঠাৎ তৈরি করতে গেলাম কেন বলো তো?'

রোবটটা ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল কমলেশের দিকে। বলল, 'কী করে জানব! হয়তো তোমার একা-একা লাগছিল, সেইজন্যে—।'

কমলেশ বিরক্তির একটা শব্দ করে ঘরের চারপাশটা দেখল। ছন্নছাড়া বলতে যা বোঝায় ঘরটার অবস্থা এককথায় তাই। একসময় এই ঘরটার নাম 'বেডরুম' ছিল—যখন রোমি-রিঙ্কু ছিল। তারপর, গত আটমাস ধরে এই ঘরটা ধীরে-ধীরে পালটে গেছে। এখন এটা বসার ঘর, শোওয়ার ঘর, ল্যাবরেটরি—সবকিছু।

বিছানার পায়ের দিকটায় ড্রেসিং টেবিল, আয়না লাগানো। আর ওদিকের কোণটায় জামাকাপড়ের দুটো স্টিলের আলমারি। একটায় কমলেশের জামাকাপড় ডাঁই করা। অন্যটায় রোমি আর রিঙ্কুর পোশাক-আশাক। রোমি বলে গেছে, ওর নতুন ফ্ল্যাটে সবকিছু সাজানো-টাজানো হয়ে গেলে তখন এটা নিয়ে যাবে। নিয়ে গেলেই ভালো। নইলে সবসময় পুরোনো কথাগুলো বড় বেশি করে মনে পড়ে। তখন খারাপ লাগে। একা-একা লাগে। কষ্ট হয়।

কমলেশ আয়নার পাশে দেওয়ালে ঝোলানো টুথব্রাশ কিপার থেকে ব্রাশ নিল। নানা রঙের রেক্সিন দিয়ে তৈরি জোকারের হাসি-হাসি মুখ। তার টুপিতে 'গুড মর্নিং' লেখা। রিঙ্কু পছন্দ করে এই টুথব্রাশ কিপারটা কিনেছিল। কমলেশের গোলাপি ব্রাশের পাশেই সবুজ ও নীল রঙের দুটো ব্রাশ। রোমির আর রিঙ্কুর। ওরা কখনও এলে যদি দরকার হয়, তাই ও-দুটো এখনও ফেলে দেয়নি কমলেশ।

মাঝে-মাঝে রোমি আসে, কখনও-কখনও সঙ্গে নিয়ে আসে রিঙ্কুকে। তবে এলেও বেশিক্ষণ থাকতে চায় না। একমাত্র সুতপন এলে তেমন একটা তাড়াহুড়ো করে না।

সুতপন বোধহয় কমলেশকে পছন্দই করে। ও কমলেশের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে গল্প করে। ওর টিভি সিরিয়াল তোলার কোম্পানি আছে। তার ব্যাপারে অনেক সময় কথা বলে। টিভি দর্শকদের তাক লাগিয়ে দেওয়ার জন্য কমলেশ অভিনব কিছু আবিষ্কার করতে পারে কি না, তা জিগ্যেস করে।

রিঙ্কুর পড়াশোনা নিয়ে আলোচনা করে সুতপন। কিন্তু রোমির কথা কখনও

তোলে না। রোমির সঙ্গে ওর সম্পর্ক নিয়ে বোধহয় মনে-মনে একটা অস্বস্তি আছে।

কমলেশ সাধারণত নিজের আবিষ্কার নিজে ব্যবহার করে না। তাই সাবেকি পদ্ধতিতে দাঁত মেজে মুখ-টুখ ধুয়ে ও চলে গেল রান্নাঘরে। ফ্রিজ খুলে দুটো মিষ্টি আর একটা স্যান্ডউইচ বের করে নিল।

ফ্রিজ খুলতেই সুন্দর একটা মিউজিক বেজে উঠল। এটা কমলেশের বৈজ্ঞানিক কীর্তি। আর ফ্রিজের ভেতরটা যে যেমন-তেমন অগোছালো, সেটাও কমলেশের কীর্তি। ফ্রিজের ভেতরে উলটোপালটা খাবার-দাবারের সঙ্গে এখানে ওখানে আই. সি. চিপ. ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টও খুশিমতো রাখা আছে।

গত সাত-আটমাস ধরে এই ফ্রিজটা কমলেশের তত্ত্বাবধানে আছে। আর রান্নাঘরটা রয়েছে ছুটির মায়ের তত্ত্বাবধানে। ছুটির মা এখনও আসেনি। দশটা-সাড়ে দশটায় আসবে।

কোনওরকমে খাওয়া শেষ করে শোওয়ার ঘরে ফিরে এল কমলেশ। গা ম্যাজম্যাজ করছে, মাথা দপদপ করেছে। অবশ্য এ ঝামেলাগুলো আজকাল গা-সওয়া হয়ে গেছে।

শোওয়ার ঘরে ঢুকতেই দেখল, রোবটটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা বেঁকিয়েচুরিয়ে দেখছে আর বারবার বলে উঠছে, 'অপূর্ব! মারভেলাস! বিউটিফুল!'

কমলেশ হাই তুলল। বিছানায় গিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বসল। তারপর আর থাকতে না পেরে মুখ তুলে জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার? কী দেখে অমন বারবার অপূর্ব, মারভেলাস আর বিউটিফুল বলছ?'

রোবটটা ঢং করে বলল, 'আ-হা, বোঝে না যেন! নিজের রূপ দেখেই বলছি! এমন সুন্দর একটা রোবট তৈরি করতে পারবে কখনও ভেবেছিলে? এটা তোমার জীবনের সেরা কীর্তি।'

কমলেশ এবার সত্যি-সত্যি হো-হো করে হেসে উঠল। সেরা কীর্তি! গত ছ'সাত মাস ধরে কমলেশের খুব টানাটানি চলছে। রোমি স্কুলে চাকরি করে। সেই আয় তো গেছেই, উপরন্তু নিজের চাকরিটাও ছেড়ে দিয়েছে কমলেশ।

এখন এটা-ওটা আবিষ্কার করে সেগুলো বিক্রি করে দিন চালাচ্ছে।

'সুপারটয় করপোরেশন'-এর সিনিয়ার ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার ছিল কমলেশ। কিন্তু ওর মাথায় প্রতি ঘণ্টায়-ঘণ্টায় যেসব চমৎকার আবিষ্কারের আইডিয়া আসে তার জন্য কোম্পানি কোনওরকম টাকা ঢালতে রাজি নয়। ঝগড়াঝাঁটি অনেকদিন ধরেই চলছিল। রোমি রিন্টুকে নিয়ে চলে যাওয়ার পর কমলেশ কেমন দিশেহারা আর রগচটা হয়ে পড়েছিল। সেইসময়েই একদিন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে কথাকাটাকাটি হয়। তখন কমলেশ বুকে আঙুল ঠুকে বলেছিল, 'সারাজীবন আপনার কোম্পানিতে চাকরি করার জন্যে আমার জন্ম হয়নি। এ-চাকরি আমি করব না। আমি বাড়িতে বসেই কাজ করব।

একদিন আপনাকে এসে আমার জীবনের সেরা আবিষ্কার দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেব!'

তা এই সেই তাক লাগানোর বস্তু! যেটার কোনদিক সোজা আর কোনদিক উলটো সেটাই ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না!

কমলেশের চিন্তায় বাধা দিয়ে রোবটটা বলে উঠল, 'আস্তে, আস্তে! তুমি যে হাসির চোটে আমার কান ফাটিয়ে দিলে!'

কমলেশ খানিকটা অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'তোমার কান খুব সেনসিটিভ বুঝি?'

'হ্যাঁ। আমি সাবসনিক থেকে সুপারসনিক—সবরকম শব্দ শুনতে পাই। দ্যাখো না, তোমার ফ্ল্যাটের বাইরে সিঁড়ির কাছটায় একটা বেড়াল ঘুরঘুর করছে, আমি তার পায়ের ধুপধুপ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।'

কমলেশের কী যেন হল। ও একছুটে শোওয়ার ঘর পেরিয়ে ঢুকে পড়ল একফালি ড্রইংরুমে। ড্রইংরুমের নানা জায়গায় কমলেশের নানা আবিষ্কারের চেষ্টার ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। এ ছাড়া মোটর, ট্রান্সফর্মার, পিসিবি, লোহার টুকরো, কাঠের ফ্রেম, আরও কত কী! সেগুলো ডিঙিয়ে পাশ কাটিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলতেই দেখল, একটা হুলো বেড়াল লেজ উঁচিয়ে ওর দিকে সবুজ চোখে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে।

কমলেশ সদর দরজা বন্ধ করে ফিরে এল রোবটটার কাছে। সে তখন গুনগুন করে 'তোমার মুখটা কী সুন্দর, আমি বলবই বলব' গানটা গাইছে, আর গালে-কপালে আঙুল ঘষে মেকাপে পালিশ দিচ্ছে।

কমলেশের গোল-গোল চোখের দিকে তাকিয়ে রোবটটা বলল, 'কী মশাই, এবারে বিশ্বাস হল তো!'

কমলেশ কোনও উত্তর দিতে পারল না। কে জানে, মদের নেশার ঘোরে কমলেশের অবচেতন বিজ্ঞান প্রতিভা কোন-কোন আশ্চর্য গুণ আর কোন-কোন জটিল প্রোগ্রাম গুঁজে দিয়েছে এই যন্ত্রদাসের মধ্যে!

রোবটটা এবার ঘুরে দাঁড়াল কমলেশের দিকে। ধাতব শব্দ তুলে দু-পা এগিয়ে এসে বলল, 'আমাকে তুমি "সুন্দরী" বলে ডেকো। অনেক ভেবে দেখলাম, নামের সঙ্গে মিল থাকাটাই ভালো। নইলে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচনের মতো দশা হবে।'

কমলেশ সুন্দরীকে দেখছিল।

টিন-লোহা-নাটবল্টু সারাটা শরীর জুড়ে দাঁতখিঁচিয়ে আছে। চোখজোড়া একেবারে বেমানান। কান দুটোও তাই। মাথা প্রায় ন্যাড়া। শুধু পিছনদিকটায় একগোছা পরচুলা। রোমির বাতিল করে দেওয়া নকল কেশরাশি। হাত-পায়ের আঙুলগুলো বেঢপ মাপের। হাঁটু আর কনুইয়ের জোড় কাজের চেয়ে শব্দ করে বেশি। আর এখানে-ওখানে কিছু বৈদ্যুতিক তার চোখে পড়ছে।

শুধু পরচুলাটুকু ছাড়া সুন্দরীর জেন্ডার কনফার্ম করার আর কোনও উপকরণ

নেই। ওটা কি কমলেশই নেশার ঘোরে কাল রাতে জুড়ে দিয়েছে? কে জানে! কমলেশের মনে নেই। গত কয়েকমাসে ওর অবচেতন মনের যা হাল হয়েছে তাতে ওটাকে দিব্যি অপারেশান করে বাদ দিয়ে দেওয়া যায়।

কমলেশ সুন্দরীর খুব কাছে এগিয়ে গেল। আর তক্ষুনি রোবটটা এক পা পিছিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই, কী হচ্ছে! হুট করে কে কখন দেখে ফেলবে। প্লিজ, কমলেশ—।'

কমলেশ স্তম্ভিত হয়ে গেল। শয়তান মেশিনটা বলে কী! ওর মাথার দপদপানিটা হঠাৎ সাত ডিগ্রি বেড়ে গেল। মাথার ওপরে ঢিমে তালে ফ্যান ঘুরছে, আর ফ্যানের সঙ্গে তালে-তালে লাল-নীল-হলদে বাতি জ্বলছে—কমলেশের সায়েন্টিফিক মডিফিকেশান। সেই পাখার হাওয়া কমলেশের মাথায় লাগছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। এসব স্বপ্ন, না সত্যি! কমলেশ জেনুইন জেগে আছে তো!

সামনের রংচটা দেওয়ালে ক্যালেন্ডারের পাতা উড়ছে। ১৯৯৪ সাল। কোনও ভুল নেই। বড় মাপের জানলা দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকে পড়েছে ঘরে। পাশের বাড়ির টিভি অ্যান্টেনা দেখা যাচ্ছে। তার মাথায় বাংলাদেশ-টিভি প্রোগ্রাম দেখার জন্য মাছের কাঁটার মতো ছোট অ্যান্টেনা। তাতে একজোড়া পাতিকাক বসে আছে।

কোনওটাই স্বপ্ন নয়। ঘোর বাস্তব।

এমনকী ডানদিকের দেওয়ালে টাঙানো কমলেশ, রোমি আর রিঙ্কুর রঙিন ফটোটাও যে সত্যি!

কমলেশ তাকাল সুন্দরীর চোখে।

সে তখনও বলছে, 'না, কমলেশ, না—এখন না। তুমি নিজেকে একটু কন্ট্রোল করো, লক্ষ্মীটি—।'

কমলেশ আর সহ্য করতে পারল না। একেবারে খেঁকিয়ে উঠল, 'কীসব আবোলতাবোল বকছ!'

'না গো, তোমার চোখ দেখেই আমি সব বুঝতে পেরেছি। তোমার আর কী দোষ বলো। সব দোষ আমার। আমার রূপই আমার কাল হয়েছে।'

কমলেশ বোধহয় মাথার চুল ছিঁড়তে যাচ্ছিল, এমন সময় দরজায় কলিংবেল বেজে উঠল। ঠিক আড়াইবার। দুটো লম্বা টোন, আর তারপরই একটা হাফটোন।

এরকম বিশেষ স্টাইলে কলিংবেলে সুর তোলেন একমাত্র গুরুপদবাবু। গুরুপদ সরকার। এ ফ্ল্যাটবাড়ির বাড়িওয়ালা। একেবারে ওপরতলার ফ্ল্যাটে থাকেন।

সুন্দরীর দিকে কটমট করে একবার দেখল কমলেশ। তারপর চটপটে পায়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

দরজা খুলতেই তাঁকে দেখা গেল।

দশাসই চেহারা। পরনে পাজামা আর গেঞ্জি। হাতে কালচে রঙের শক্তপোক্ত প্যাঁচালো লাঠি। মাথার চুল সাদা। দু-ভুরু আর দু-কানে যেন একখাবলা করে গ্লাসউল

বসানো। মুখের চামড়ায় অনেক ভাঁজ। চোখ কুতকুতে। কানে একটু কম শোনেন। স্ত্রী গত হয়েছেন অন্তত একযুগ। তবে যাওয়ার আগে অকালকুষ্মাণ্ড একটি পুত্র রেখে গেছেন। গত পাঁচবছর ধরে ভদ্রলোকের একমাত্র খাদ্য বোধহয় চ্যবনপ্রাশ। কারণ, পরিচিত সকলকেই তিনি নিয়মিত এই বস্তুটি সেবনের উপদেশ দেন।

কমলেশকে দেখেই গুরুপদবাবু চেঁচিয়ে বললেন, 'বাবা কমলেশ, তোমার ভাড়াটা—।'

কমলেশ একটু অবাক হয়ে বলল, 'এখন তো সবে বিশ তারিখ...।'

গুরুপদ সরকার হেসে বললেন, 'না বাবা, আমি গতমাসের ভাড়াটার কথা বলছি। তুমি যে চেক দিয়েছিলে সেটা বাউন্স করেছে। এই ভাড়া কালেকশান যে কী ঝামেলার! নেহাত ছেলেটা অপোগণ্ড, তাই আমাকেই কালেকশানে বেরোতে হয়।'

'আমার চেক বাউন্স করেছে?' কমলেশ বেশ অবাক হল যেন।

'হ্যাঁ বাবা, তুমি যখনই চেক দাও তখনই বাউন্স করে, বারবার বাউন্স করে। কেন বলো তো?'

'বোধহয় রবারের তৈরি তাই।' একটু থেমে আবার বলল, 'তা ছাড়া ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের ব্যাপারটা সবসময় আমার খেয়াল থাকে না।'

শুধু ব্যাঙ্কে কেন, ব্যালেন্স বোধহয় কোথাও ঠিক নেই কমলেশের। সামান্য এই ষোলোশো টাকা মাসে-মাসে দিতে বেশ অসুবিধে হচ্ছে ওর। যখনই কোনও আবিষ্কার বিক্রি করতে পারে তখনই রাজার জীবনযাত্রা শুরু করে দেয়। মনপ্রাণ ঢেলে নেশা করে। এমনকী লাগামছাড়া দাম দিয়ে ভ্যাট সিক্সটিনাইন কিংবা জনি ওয়াকার কিনে ফ্যালে। কিন্তু এখন এই ভদ্রলোককে ঠেকানো যায় কী করে? আচ্ছা, রোবটটা এঁকে বেচে দেওয়ার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

'মেসোমশাই, কিছু মনে করবেন না, ভুল হয়ে গেছে। আমি আপনার ছেলের মতো—।'

'না!' গুরুপদ সরকার চেঁচিয়ে বললেন, 'তুমি আমার ছেলের চেয়ে অনেক ভালো। ও ব্যাটা একটা—।'

সন্তান সম্পর্কে নামাবলী শুরু হওয়ার আগেই বাধা দিল কমলেশ, 'কতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন? আসুন, ভেতরে আসুন, আপনাকে একটা নতুন জিনিস দেখাব। একটু সাবধানে আসবেন—।'

কমলেশকে অনুসরণ করে ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকে পড়লেন বৃদ্ধ।

শোওয়ার ঘরে ঢুকেই গুরুপদবাবুর নাক কুঁচকে গেল। আমতা-আমতা করে জিগ্যেস করলেন, 'কীসের একটা গন্ধ পাচ্ছি—।'

চকিতে কমলেশের চোখ চলে গেল টেবিলে রাখা মদের বোতলের দিকে। একটু আগেই যিনি বলেছেন, 'তুমি আমার ছেলের চেয়ে অনেক ভালো' তাঁকে এখন কী বলবে কমলেশ!

সুন্দরী বোধহয় কমলেশকে লক্ষ করছিল। ফস করে বলে উঠল, 'ও কিছু নয়, ওষুধের গন্ধ। আপনার তো দেখছি ঘ্রাণশক্তি বেশ প্রবল।'

সুন্দরীর আচমকা কণ্ঠস্বরে রীতিমতো আঁতকে উঠলেন গুরুপদ সরকার। হাতের লাঠিটা দুবার ঠুকলেন মেঝেতে। তারপর কাছে গিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলেন সুন্দরীকে। ওঁর মুখচোখের ভাব দেখে মনে হল না তেমন একটা খুশি হয়েছেন।

'আপনি এই রোবটটা নিয়ে নিন, মেসোমশাই। কাজে লাগবে। বদলে শুধু আমার চারমাসের ভাড়া ইয়ে করে দেবেন—।'

সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নাড়লেন গুরুপদবাবু : 'না, বাবা, ওসব ইয়েটিয়ের মধ্যে আমি নেই। আমি বরং ও-সপ্তাহে তোমার কাছে আসব।'

সুন্দরীর মুখ দিয়ে 'হুঁঃ' গোছের একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ বেরিয়ে এল। তারপর কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কমলেশ গুরুপদবাবুর নজরের আড়ালে হাতজোড় করে অনুনয়ের ভঙ্গি করল। সুন্দরী চাপা গলায় বলল, 'এবারের মতো ছেড়ে দিলাম।'

ছন্নছাড়া ঘরটার চারপাশে চোখ বুলিয়ে গুরুপদবাবু জিগ্যেস করলেন, 'তোমার ওয়াইফের ট্রেনিং এখনও শেষ হয়নি?'

ট্রেনিং? কমলেশ কেমন বিভ্রান্ত হয়ে গেল। তারপরই ওর মনে পড়ল, রোমি ওকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর কমলেশ এই 'ট্রেনিং'-এর গল্পটা তৈরি করেছিল। যারাই ভুরু ওপরে তুলেছে তাদেরই বলেছে, রোমিকে ওর স্কুল থেকে একটা স্পেশাল ট্রেনিং-এর জন্য বাঁকুড়া পাঠিয়েছে। কিন্তু প্রায় আটমাস হয়ে গেল, ট্রেনিংটা এখনও শেষ করতে পারছে না কমলেশ।

ও মিনমিন করে বলল, 'না, মেসোমশাই, এখনও তো শেষ হয়নি দেখছি...।'

'এরকম লম্বা ট্রেনিং-এ ভরতি করলে কেন বউমাকে? একবার শুরু হলে আর শেষ হতে চায় না—।'

কমলেশের ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরোনোর সময় বৃদ্ধ বিড়বিড় করে অনেকটা যেন আপনমনেই বলে উঠলেন, 'মেয়েসমেত এ বড় অদ্ভুত ট্রেনিং!'

দরজা বন্ধ করে শোওয়ার ঘরে ফিরে এল কমলেশ। সত্যি, এ বড় অদ্ভুত ট্রেনিং! স্বামীকে ছেড়ে থাকার প্রশিক্ষণ, বাবাকে ছেড়ে থাকার প্রশিক্ষণ—আর সেইসঙ্গে কমলেশেরও বউ-মেয়েকে ছেড়ে নির্জন বসবাসের প্রশিক্ষণ।

কিন্তু এখনও কমলেশ যে এই নতুন ব্যাপারটাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারল না! দেওয়ালে ছবিটার দিকে চোখ গেল ওর। রোমির ছবির দিকে তাকালেই ওর বুকের ভেতরটা হু-হু করে ওঠে এখনও। আর রিঙ্কু! ও যে সবচেয়ে বেশি মিষ্টি।

রোমি-রিঙ্কুর ট্রেনিং ধীরে-ধীরে শেষ হয়ে আসছে। তারপর...তারপর ফেরার আর পথ থাকবে না। ছবি থেকে চোখ সরিয়ে নিল কমলেশ। বিছানায় বসে ভাবতে লাগল।

আজ বোধহয় মঙ্গলবার। আজই কিশোর আহুজার আসার কথা। বিশাল

চেহারার এই ব্যবসায়ী ভদ্রলোক বেশি বয়েসে বিপত্নীক হয়েছেন। ছেলেমেয়ে নেই কিন্তু অঢেল টাকা আছে। তাঁর খুব শখ একটা প্রমাণ মাপের মেয়ে পুতুলের। পুতুলটায় কলকবজা তেমন একটা না থাকলেও চলবে, তবে বডিটা পাঁউরুটির মতো নরম হওয়া চাই। কমলেশ বহুবার ভদ্রলোককে ফিরিয়ে দিয়েছে। বলেছে, এরকম খেলনা আমি তৈরি করি না। কিন্তু আহুজা নাছোড়বান্দা। বারবার শুধু বলেন, 'আপনি রিফিউজ করলে আমার জিন্দেগিটা একদোম বরবাদ হয়ে যাবে, সায়েন্টিসবাবু। আমি যে কী লোনলি সে আপনাকে আর কী বলব! ভেরি-ভেরি লোনলি—মনে হোয় কি চারপাশে কুছু নাই—সিরফ্ বিরানি আর তনহাই...।'

কমলেশের হাসি পেয়েছিল। যার চারপাশে 'কুছু নাই', একটা খেলার পুতুল ধরে দিলেই তার 'কুছু নাই' মিছে হয়ে যাবে! আজ যদি কিশোর আহুজা আসেন তা হলে স্পষ্ট দু-কথা শুনিয়ে দেবে কমলেশ।

ঠিক এমনসময় টেলিফোনটা বেজে উঠল।

মদের বোতল আর গেলাসের পাশেই টেলিফোন। কমলেশ টেলিফোন ধরতে উঠে দাঁড়াল। কার ফোন হতে পারে? 'সুপারটয় করপোরেশন'-এর এম. ডি.? কমলেশকে আবার চাকরিতে জয়েন করার জন্য সাধাসাধি করতে চাইছেন? উঁহু, কমলেশ কিছুতেই রাজি হবে না। আবিষ্কারের স্বাধীনতা বলে একটা ব্যাপার আছে।

সুন্দরী যথারীতি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের রূপচর্চায় মশগুল। আপনমনে গুনগুন করে কী একটা গানের সুর ভাঁজছিল। ও ড্যাবড্যাবে চোখ দিয়ে কমলেশকে একবার দেখল। তারপর গুনগুন করা থামিয়ে বলল, 'ডার্লিং, যদি আমার ফোন হয় তা হলে বলে দিয়ো আমি বাড়ি নেই—।'

কমলেশ থমকে দাঁড়িয়ে হাঁ করে সুন্দরীকে দেখল। মাত্র কয়েকঘণ্টাতেই এই বকযন্ত্রটা 'ডার্লিং'-এ পৌঁছে গেছে! সত্যি, আজকের রাতটা ভালোয়-ভালোয় কাটলে হয়! শোওয়ার আগে এটার সুইচ অফ করতে ভুলে গেলে চলবে না।

ও কাটা-কাটা সুরে বলল, 'তোমাকে আবার কে ফোন করতে যাবে! তুমি যে আমার ফ্ল্যাটে জন্ম নিয়েছ তাই-ই তো কেউ জানে না!'

সুন্দরী প্রায় মুখঝামটা দিয়ে কমলেশকে দাবড়ে দিল : 'হুঃ! তুমি ওই আনন্দেই থাকো। আজকালকার জোয়ান ছোঁড়াগুলোকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। ওরা রূপের গন্ধ পায়—।'

কথা শেষ করেই আবার গুনগুন, আবার প্রতিবিম্বের সামনে দাঁড়িয়ে রূপচর্চা। কমলেশের ইচ্ছে হল টেনে-টেনে নিজের মাথার চুলগুলো ছিঁড়ে ফ্যালে। কিন্তু টেলিফোন তখনও বাজছিল।

ও তাড়াতাড়ি রিসিভার তুলে নিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'হ্যালো—।'

'সুপারটয় করপোরেশন'-এর এম. ডি. নয়, ওপাশ থেকে রোমির তীব্র কণ্ঠস্বর ভেসে এল : 'আজকাল কি কানেও কম শুনছ নাকি?'

'রোমি, রোমি...' কমলেশের মাথা ঝিমঝিম ভাবটা পলকে কেটে গেল। গলার ভেতরে সুপুরির একটা কুচি আটকে গেছে বলে মনে হল।

'শোনো, কাল সন্ধেবেলা সাতটা-সাড়ে সাতটা নাগাদ আমি যাব। তুমি ঘরে থেকো। ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে হুট করে কোথাও চলে যেয়ো না।'

'না, না, থাকব।' একটু থেমে তারপর, 'রিঙ্কুকে নিয়ে আসবে তো?'

রোমি ঠান্ডা গলায় বলল, 'ওর সামনে পরীক্ষা। আজেবাজে সময় নষ্ট করলে পড়ার ক্ষতি হবে।'

'এক-দেড়ঘণ্টার জন্যে এলে কী আর এমন ক্ষতি হত! অনেকদিন ওকে দেখিনি। খুব দেখতে ইচ্ছে করছে, বিশ্বাস করো—।'

'দেখি, পরীক্ষার পর যদি একদিন নিয়ে যেতে পারি—।'

কমলেশ মনে-মনে রিঙ্কুর মুখটা ভাবল। ও যদি আসত তা হলে কমলেশ আইসক্রিম, ক্যাডবেরি চকোলেট, ঘুগনি, ফুচকা—আরও কত কী নিয়ে আসত কে জানে! এগুলো সবই রিঙ্কুর ফেবারিট ডিশ।

কমলেশ বলল, 'কাল সন্ধেবেলা তোমার জন্যে ''ফ্লুরিজ''-এর চিকেন প্যাটিস আর থাম্স আপ এনে রাখব।'

এগুলো রোমির ফেবারিট, কমলেশ জানে। 'ফ্লুরিজ'-এ ওরা একবারই খেতে গিয়েছিল। তবে কমলেশ মাঝেমধ্যে চিকেন প্যাটিস কিনে নিয়ে আসত।

রোমি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, না, ওসব ঝামেলা করতে যেয়ো না। আমি তো যাব আর কয়েকটা শাড়ি-জামাকাপড়, ব্যাঙ্কের চেকবই-পাশবই, আর মিক্সিটা নিয়েই চলে আসব। মনে আছে, ক'বছর আগে আমাদের অ্যানিভারসারিতে ওটা বড়দি আমাকে প্রেজেন্ট করেছিল?'

মনে আছে। রোমির বড়দি জামশেদপুরে থাকে। স্বামী টাটার বিশাল অফিসার। এইট্টি নাইনে ওদের বিবাহবার্ষিকীর সময়ে ওরা কলকাতায় ছিল। তখনই মিক্সিটা প্রেজেন্ট করেছিল।

রোমি মিক্সি নিতে আসবে। পাশবই-চেকবই, আর শাড়ি-জামাকাপড় নিতে আসবে। মাঝেমাঝেই ও এরকম আসে। দরকারি জিনিসগুলো নিয়ে যায়। পাশবইটা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট হলেও ওতে রোমিরই টাকা থাকত। আর মিক্সি দিয়ে কমলেশ এখন কী করবে! কিছুই আর মেশানোর নেই। বরং রিঙ্কু ম্যাংগো জুস খেতে খুব ভালোবাসত। রোমি নিয়ে গেলে মেয়েটা খুশি হবে।

'রোমি...রোমি...।'

রোমি ফোন নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল, একটু অধৈর্য হয়ে বলল, 'বলো, কী? আমার স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

কমলেশের পুরোনো কথা মনে পড়ছিল। ও প্রাণপণে ভুলতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল না।

কমলেশ থেমে-থেমে বলল, 'রোমি—আবার সবকিছু—ঠিকঠাক করে নেওয়া যায় না? আগের মতো—।'

'অন্য কোনও কথা থাকলে বলো।'

'তোমার পুরোনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে না?'

'পড়ে—তাতে কী?'

তাতে কী! কমলেশ যেন পাথর হয়ে যাচ্ছিল। বিয়ের আগে রোমির সঙ্গে দু-বছরের দুরন্ত ভালোবাসা; মাঠ-ময়দান, ভিক্টোরিয়া, রেস্তোরাঁ, সিনেমা হল, বকখালি বেড়িয়ে আসা; পাগলের মতো চুমু খাওয়া, আদর করা—সব এখন 'তাতে কী'!

একদিন শীতের পড়ন্ত বেলায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পুকুরপাড়ে কাঠের বেঞ্চে বসে ছিল ওরা। সূর্য ঢলে পড়ছিল ডানদিকের আকাশে, আর সামনে শান্ত জলের আয়নায় শ্বেতপাথরের স্মৃতিসৌধটির ছায়া পড়েছিল। রোমির নরম চিকন হাতের পাতা কমলেশের হাতে ধরা ছিল। কমলেশ ওর করেরেখা দেখতে-দেখতে বলেছিল, 'স্মৃতির ছায়া পড়েছিল শীতল জলতলে, প্রতিশ্রুতি আঁকা ছিল তোমার করতলে।'

রোমি ওর হাতটা মুঠো করে আঁকড়ে ধরেছিল।

সেই 'প্রতিশ্রুতি'ও এখন 'তাতে কী' হয়ে গেছে!

এর আগেও রোমি কয়েকবার ফোন করেছে, এই ফ্ল্যাটেও এসেছে কোনও-না-কোনও দরকারে। কিন্তু তখন কমলেশের সংযম ছিল, আহত অভিমান ছিল, আর ভেবেছিল রোমি আবার নিজে থেকেই ফিরে আসবে। সেটা হয়নি।

ইদানীং কমলেশের কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। বুকের ভেতরটা কেমন করতে থাকে। এখনও করছিল।

'রোমি, আমি যদি কোনও অন্যায় করে থাকি তা হলে—।'

'কমলেশ, কী হচ্ছে! এসব বলে বোর কোরো না। যাকগে, তোমার ইনভেনশান আর ডিসকাভারি কীরকম চলছে বলো।'

কমলেশ সুন্দরীর দিকে একবার তাকাল।

আয়নায় সামনে দাঁড়িয়ে তখন সেজে চলেছে। পাউডার, ক্লিনজিং মিল্ক, ময়েশ্চারাইজার, পারফিউম—রোমির উপকরণ যা কিছু আছে একের পর এক মেখে চলেছে। আর ড্রয়ার থেকে রিক্সুর একটা লাল রঙের বো বের করে নিয়ে মাথার একখাবলা পরচুলায় আটকে দিয়েছে। এদিক-ওদিক ঘাড় বেঁকিয়ে রোবটটা আয়নায় নিজেকে দেখছে আর গুনগুন করে গাইছে, 'আমি তোমায় বড় ভালোবাসি, তোমায় বড় ভালোবাসি—।'

টেলিফোনে কথা বলতে গিয়ে কমলেশের গলা ভেঙে গেল। একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে কয়েকবার ঢোঁক গিলে ও বলল, 'কালই একটা নতুন রোবট তৈরি করেছি। খুব সুন্দর দেখতে—।'

'আমার চেয়েও!' রোমি ঠাট্টার সুরে বলল।

'তোমার চেয়ে সুন্দর আমার কাছে আর কেউ নেই, রোমি।' কমলেশের গলা ধরে যাচ্ছিল।

ওরা রাস্তায় বেরোলে সবাই হাঁ করে রোমিকে দেখত—যেন তাজমহল দেখছে। অস্বাভাবিক কিছু নয়। রোমি যে আপাদমস্তক সুন্দর! কতজন যে ওকে সিনেমায় নামার অফার দিয়েছে তার কোনও হিসেব নেই। তবে ফিল্মের ব্যাপারে কমলেশের বরাবরই কেমন একটু অ্যালার্জি আছে। তাই রোমি উৎসাহ দেখালেও কমলেশ আপত্তি করেছে। রোমি বলেছে, 'তুমি চাও না, টিভি-সিনেমায় সবাই আমাকে দেখুক? সবাই জানুক তোমার বউ কত রূপসী!' কমলেশ ওর ছেলেমানুষি গোঁয়ারতুমির সুরে বলেছে, 'না, চাই না। তোমার সুন্দরটুকু শুধু আমার জন্যে। সবাই তোমাকে ওভাবে দেখলে আমি হিংসেয় মরে যাব। আমার ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা থাকবে, হিংসেয় আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। ' কথাটা বলে কমলেশ হেসেছে। রোমিও হেসেছে। কিন্তু সেটাই ছিল বোধহয় শুরু। তারপর একই কথা অনেকবার উঠেছে। ধীরে-ধীরে সুর কেটে গেছে। আর তখনই সুতপন এসেছে রোমির কাছাকাছি।

টেলিফোনের ও-প্রান্তে রোমি হাসল, বলল, 'তবে যে বললে খুব সুন্দর দেখতে!'

কমলেশ নিজেকে সামলে নিতে একটু সময় নিল। তারপর বলল, 'না, না, রোবটটা নিজেই নিজেকে বিশ্বসুন্দরী খেতাব দিয়ে বসে আছে—তাই ও-কথা বলেছি।'

'তা হলে আর কী, বিউটি কনটেস্টে নামিয়ে দাও।' হাসল রোমি।

কমলেশ যেন হঠাৎ পুরোনো হাসির ছোঁয়া খুঁজে পেল। কিন্তু তাতে কী!

'কাল সন্ধেবেলা যাচ্ছি তা হলে।' বলে লাইন কেটে দিল রোমি।

কমলেশ রিসিভার নামিয়ে রাখামাত্রই সুন্দরী বলে উঠল, 'কী, বাবুর প্রেমালাপ শেষ হল?'

কোনও উত্তর না দিয়ে কমলেশ বিছানায় গিয়ে বসে পড়ল। সামনের ঝুলবারান্দার মেঝেতে রোদ নেমে এসে শুয়ে পড়েছে। আগেকার সময় হলে বারান্দার রেলিঙে এখন রোমির ভিজে শাড়ি শুকোত।

কমলেশের মাথার দপদপানিটা বেশ কয়েক ধাপ চাড়া দিয়েছে। একইসঙ্গে মাথার ভেতরে অসংখ্য স্মৃতিকোষে পুরোনো দিনের জলছবিগুলো এলোমেলো ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল।

'কমলেশ, আমার কথায় দুঃখ পেলে?'

কমলেশ মাথা তুলে আয়নার দিকে দেখল। আমুল স্প্রে-র ভাঙা টিন ইত্যাদি এখন ওর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। একটু আগের কথাটা বলার সময় গলার ধাতব স্বর যথেষ্ট মোলায়েম করার চেষ্টা করেছে।

না, কমলেশ মোটেই দুঃখ পায়নি। একটা হতকুচ্ছিত যন্ত্রের মন্তব্যে কে-ই বা

দুঃখ পায়! তা ছাড়া কমলেশের এখন কোনওদিকে মন ছিল না। শুধু ভাবছিল, কাল রোমি এলে ওকে কী বলবে। নিজেকে কি বড্ড বেশি ভিখারি মনে হচ্ছে?

কমলেশ উঠে আয়নার কাছে যেতে চাইল। রোবটটা ওর পথ আগলে দাঁড়িয়ে। এটাকে বিকল করে ভেঙেচুরে শেষ করে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু কাল রোমি যে এটা দেখবে। কমলেশের নতুন আবিষ্কার।

কমলেশ সুন্দরীকে পাশ কাটিয়ে আয়নার দিকে এগোনোর চেষ্টা করতেই রোবটটা আগের মতো ঢং করে আঁতকে উঠে খানিকটা সরে গিয়ে বলল, 'আবার দুষ্টুমি! না, কমলেশ, না—প্লিজ, ওসব আমার ভালো লাগে না। ওঃ, রূপই হয়েছে আমার যত জ্বালা!'

কমলেশ কী করবে ভেবে পেল না। শুধু বিরক্তভাবে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ভয় নেই, তোমার সঙ্গে ফুলশয্যা করার কোনও বাসনা আমার নেই।'

'কামনা-বাসনাই তো মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুন্দরী।

হায় রে আবিষ্কার! কমলেশ আসলে নেশার ঘোরে নিজের জন্য একটি বাঁশ আবিষ্কার করেছে।

তখনই কমলেশ টের পেল, বেশ খিদে পেয়েছে। ও দেওয়ালে টাঙানো ডিজিটাল ঘড়ির দিকে তাকাল। লাল-হলদে-সবুজ এল. ই. ডি. বাতি জ্বলজ্বল করে জানান দিচ্ছে এখন প্রায় পৌনে এগারোটা। ছুটির মা কখন আসবে?

কমলেশের ভালো লাগছিল না। ও রাস্তায় বেরোনোর জন্য তৈরি হতে লাগল। শেভ করে, জামা-প্যান্ট পরে নিয়ে যখন আয়নার সামনে চুল আঁচড়াতে যাচ্ছে, তখন ও খেয়াল করল, সুন্দরী বেশ মনোযোগ দিয়ে ওর প্রতিটি কাজ লক্ষ করছে।

কমলেশের কেমন যেন অস্বস্তি হল। ও নেহাত কথা বলার জন্যই বলল, 'আমি একটু বেরোচ্ছি! তুমি ফ্ল্যাটে একা থাকতে যেন ভয় পেয়ো না। এখুনি অবশ্য ছুটির মা এসে পড়বে।'

সুন্দরীর চোখে আলো জ্বলছিল। ও বলল, 'তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, বেশি দেরি কোরো না যেন।'

সুন্দরীর কথার মধ্যে এমন একটা আপন ভাব ছিল যে, কমলেশ চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে থেমে গেল। রোবটটাকে দেখল। ওটা সত্যি-সত্যি লোহালক্কড়, আই. সি. চিপ আর তার-টার দিয়ে তৈরি তো!

কমলেশ আলতো গলায় বলল, 'তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোতে পারতাম, কিন্তু...।'

'না, না, দরকার নেই।' সুন্দরী ঝটপট বলে উঠল, 'রাস্তায় বেরোলেই আবার ছেলে-বুড়োর দল আমার ওপর একেবারে হামলে পড়বে।' রোবটটা আয়নার দিকে এক পা এগিয়ে গেল : 'নাও, সরো, এবার একটু আয়নাটা দেখি।'

কমলেশ আর দেরি করল না। ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। ছুটির মা এলে

কোনও অসুবিধে নেই। তার কাছে ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি আছে।

একতলার সদর দরজা দিয়ে বেরোতেই গুরুপদবাবুর সঙ্গে দেখা। ফ্ল্যাটবাড়ির লাগোয়া বাগানের পাশে ভদ্রলোক ছোট-ছোট পায়ে ঘুরঘুর করছেন। বোধহয় রোদ পোয়াচ্ছেন। পরনে একই পোশাক এবং হাতে প্যাঁচালো লাঠি।

বাতাসে নতুন শীত-শীত ভাব, আকাশ মেঘলা।

কমলেশ আকাশের দিকে একবার দেখল। তারপর বলতে হয় তাই বলল, 'মেসোমশাই, রোদ চড়া হলে আপনার বেশ আরাম লাগত।'

গুরুপদ সরকার পায়চারি থামিয়ে কমলেশের খুব কাছে এসে ফোঁস করে শ্বাস ফেলে চেঁচিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, বাবা, জানি, রোজ ভাড়া পেলে আমার বেশ আরাম লাগত। কিন্তু তোমরাই তো ভাড়া বাকি ফেলে-ফেলে—।'

কমলেশের হঠাৎই খেয়াল হল, ভদ্রলোক কানে কম শোনেন। ও তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ঠিক আছে, মেসোমশাই, এ নিয়ে পরে কথা হবে—' এবং হনহন করে হাঁটা দিল। নাঃ, ভদ্রলোকের জন্য একটা ফার্স্টক্লাস হিয়ারিং এইড তৈরি করে দিতে হবে।

সবকিছু আবার যেন আগের মতো লাগছিল।

রান্নাঘরে কাপ-প্লেট-চামচের টুংটাং শব্দ। রোমি চা তৈরি করছে। কমলেশ কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ছোট-ছোট শব্দগুলো শুনছিল। শব্দগুলো ওকে রান্নাঘরের দিকে টানছিল। কিন্তু সামনেই চেয়ারে সুতপন বসে আছে। তাই কমলেশ আবার এলোমেলো কথা শুরু করল ওর সঙ্গে।

'তোমার নতুন টিভি সিরিয়ালের কাজ কেমন চলছে?'

আচ্ছা, ঠিক কতদিন পর রোমির হাতে চা খাবে কমলেশ? ও মনে-মনে একটা হিসেব কষতে শুরু করল।

সুতপন বেশ উৎসাহ নিয়ে ওর সিরিয়ালের কথা বলতে লাগল। তেরোটা এপিসোডের মধ্যে চারটে এপিসোডের শুটিং শেষ। তারপর...।

রোমি ওদের চা নিয়ে শোওয়ার ঘরে এসে ঢুকল। ছোট টেবিল থেকে বোতল আর গেলাস আগেই সরিয়ে ফেলেছিল কমলেশ। সেটার ওপরেই চায়ের কাপ-প্লেট রাখল রোমি। টেবিলটা টেনে দিল কমলেশ আর সুতপনের মাঝে। তারপর আবার রান্নাঘরের দিকে গেল নিজের চায়ের কাপ নিয়ে আসতে।

একটু আগেই প্যাটিস খাওয়া শেষ হয়েছে। কমলেশ রোমির বারণ শোনেনি। বিকেলে বেরিয়ে 'ফ্লুরিজ'-এর প্যাটিস নিয়ে এসেছিল।

কথা বলতে-বলতে সুতপন হাসছিল। বেশ সুন্দর চেহারা ছেলেটির। ও নিজেই তো সিরিয়ালে অভিনয় করতে পারে।

রোমি চা নিয়ে এসে বিছানায় বসল। কমলেশের কাছ থেকে একটু দূরে।

সুতপন চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে বলল, 'কমলেশদা, আপনার জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে।'

কমলেশ কৌতূহলী চোখে সুতপনের দিকে তাকাল। সুতপন রোমিকে একবার দেখল। চোখে হাসল। তারপর বলল, 'এখনই যে-সিরিয়ালটার কথা আপনাকে বললাম, মানে, "জীবনের সুখ-দুঃখ", ওটাতে রোমি অভিনয় করছে—হিরোইন।'

কমলেশ চা খাওয়া থামিয়ে রোমিকে দেখল। মুখে তৃপ্তি আর প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার। রোমির সৌন্দর্য এবার সকলে দেখবে, তারিফ করবে। কমলেশের সেই কাল্পনিক ডেথ সার্টিফিকেটের কথা মনে পড়ল। তবে তার বেশি কিছু নয়।

রোমির কাছে কমলেশ নিতান্তই সাধারণ। একটু চটাচটি হলেই ও বলত, 'তুমি নেহাতই একটা সেকেলে ছাপোষা মানুষ—শুধু একটু বিজ্ঞান জানো।'

শত চেষ্টা করেও কমলেশ রোমির ওই ডেফিনেশান পালটাতে পারেনি। আর নিজেকেও পালটাতে পারেনি। তবে ছোট্ট রিঙ্কু সবসময় ওকে আশা জোগাত। মনে হত, এই বুঝি সব আবার ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

'কী হল, তুমি কিছু বলছ না যে!'

রোমির কথায় সামান্য অবজ্ঞার রেশ যেন টের পেল কমলেশ। ওর পরনের গোলাপি-সাদা সিল্কের শাড়ি চকচক করছে। বড় চোখে লাগছে।

কমলেশ স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে বলল, 'এ তো খুব ভালো খবর।'

রোমি সুতপনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সুতপন, দ্যাখো না, এই সিরিয়ালটায় কমলেশের কোনও টেকনিক্যাল হেল্প নেওয়া যায় কি না—।'

'আমি তো কমলেশদাকে ওপেন অফার দিয়েই রেখেছি—।'

কমলেশ বলল, 'না, না, আমি এখন নতুন একটা মেশিন নিয়ে কাজ শুরু করেছি। ওটার পেছনে তিন-চারমাস লেগে যাবে।'

কমলেশ রোমির চোখে তাকিয়েই বুঝতে পারল, ওর মিছে কথা রোমির কাছে ধরা পড়ে গেছে।

রোমি সহজ গলায় বলল, 'কালই তো তুমি ফোনে বললে কী একটা বিউটি কুইন রোবট তৈরি করেছ—।'

'সত্যি, কমলেশদা!' সুতপনের গলায় আগ্রহ।

কমলেশের ভালো লাগল। ও চাইছিল, রোমিই সুন্দরীর প্রসঙ্গ তুলুক, কমলেশের নতুন আবিষ্কার নিয়ে প্রশ্ন করুক।

যাক, ব্যস্ত হওয়ার মতো একটা কাজ পাওয়া গেল। চায়ের কাপ রেখে কমলেশ উঠে এগিয়ে গেল আয়নার কাছে। খবরের কাগজে মুড়ে সুন্দরীকে মেঝেতে শুইয়ে রেখেছিল ও। কাগজের মোড়ক খুলে রোবটটাকে দাঁড় করাল। তারপর সুইচ অন করে দিয়ে বলল, 'এই হল আমার নিউ ইনভেনশান—।'

সজ্ঞান হওয়ামাত্রই সুন্দরী আয়নার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে সাজগোজ শুরু করল। আর সেইসঙ্গে গুনগুন করে গান ধরল, 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব—।'

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই শুরু হয়ে গেল পাগলপারা হাসি। রোমি খিলখিল করে হাসতে শুরু করেছে। শরীর বেঁকিয়েচুরিয়ে মুখ তুলে হাসছে তো হাসছেই।

সুতপনও হাসছিল, তবে অতটা শব্দ করে নয়।

কমলেশ কেমন বোকার মতো সুন্দরীর পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

রোমি হাসির দমক কমিয়ে চোখের জল মুছে বলল, 'এই তোমার বিউটি কুইন!' তারপর আবার হাসি।

সুন্দরী ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রোমির দিকে। তারপর বলল, 'কমলেশ, ওকে থামতে বলো। আমার কানে লাগছে।'

রোমি অনেক কষ্টে থামল। বলল, 'সত্যি, কী সুন্দর! যেমন চেহারা, তেমনই গলা—কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি!'

কমলেশ বিছানার কাছে এগিয়ে এল। রোমি উঠে দাঁড়াল। সুতপনও।

রোমির যা-যা নেওয়ার সবকিছু আগেই বড় একটা শপিং ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়েছিল। ওকে উঠে দাঁড়াতে দেখেই সুতপন ঝুঁকে পড়ে ব্যাগটা হাতে তুলে নিল। হাসতে-হাসতে বলল, 'কমলেশদা, আজ একটা দারুণ জিনিস দেখালেন। আপনার হাত খালি হলে আমাদের টেকনিক্যাল হেল্‌প করার ব্যাপারে একটু ভাববেন কিন্তু—।'

কমলেশ ঘাড় নাড়ল।

রোমি হেসে বলল, 'তোমার এই কিম্ভূতকিমাকার বস্তুটিকে বিউটি কনটেস্টে নামিয়ে দাও—।'

সুন্দরী জোরালো গলায় জবাব দিল, 'ধন্যবাদ, আমার কনফারমেশনের দরকার নেই। আমি জানি আমাকে তোমার চেয়েও সুন্দর দেখতে—' কথা শেষ করেই আবার গুনগুন গান।

রোমির ফরসা মুখ লাল হল। ও কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'আমি যাচ্ছি। তুমি তা হলে লিভ টুগেদারের ভালোই সঙ্গী পেয়েছ—।'

কমলেশ চাইছিল না রোমি এত তাড়াতাড়ি চলে যাক। ও বলল, 'তুমি এই রোবটটার কথায় কিছু মনে কোরো না। এটা ভীষণউলটো পালটা বকে। বড্ড খামখেয়ালি।'

রোমি বিরক্তভাবে বলল, 'তবে তো একেবারে রাজযোটক।'

রোমি দরজার দিকে এক-পা বাড়াতেই কমলেশ প্রায় পথ আগলে দাঁড়াল। মরিয়া হয়ে জিগ্যেস করল, 'রিঙ্কু কেমন আছে? ওকে অনেকদিন দেখিনি—।'

'এখানকার চেয়ে অনেক ভালো আছে।'

কমলেশ সুতপনের দিকে একবার দেখল। তারপর বলল, সুতপন, আমি রোমির সঙ্গে কয়েকটা পারসোনাল কথা বলতে চাই—।'

সুতপন ভদ্র ছেলে। রোমি কিছু বলার আগেই ও বলল, 'আমি বাইরের ঘরে আছি—' তারপর সহজ পা ফেলে বেরিয়ে গেল শোওয়ার ঘর থেকে।

ঝুলবারান্দার দরজার দিকে চোখ গেল কমলেশের। বাইরের রাত কুচকুচে কালো। সেই কালো রাত নতুন শীতের হিমেল বাতাস পাঠিয়ে দিচ্ছিল ঘরের ভেতরে।

'রোমি—।'

'বলো।'

কী বলবে কমলেশ! নিজেকে ভীষণ খাটো মনে হচ্ছে। অথচ ও তো কোনও অন্যায় করেনি! এই অপদার্থ বেঁচে-থাকা তো সাধ করে বেছে নেয়নি!

'রোমি, এভাবে আমি আর পারছি না। তোমার সব কথা আমি মেনে নেব, কিন্তু এভাবে আমাকে আর কষ্ট দিয়ো না...প্লিজ...' কমলেশের কান্না পেয়ে যাচ্ছিল।

রোমি কোনও জবাব দিল না।

'রোমি, তুমি...রিঙ্কু...তোমরা...হয় এখানে চলে এস, নয়তো আমাকে তোমাদের কাছে নিয়ে যাও। এভাবে আমি...আমি...' কমলেশের গলায় বুকে কষ্ট হচ্ছিল।

রোমি এবার কথা বলল, 'এইজন্যেই তোমার সঙ্গে কোনওরকম রিলেশান রাখা প্রবলেম। আমাদের বনিবনা হয়নি, আলাদা আছি, ঠিক আছে। কিন্তু "হ্যালো-হাই" রিলেশান রাখতে তো কোনও ক্ষতি নেই! সেটা দেখছি তোমার এই বস্তাপচা সেন্টিমেন্টের জন্যেই রাখা যাবে না। এমন ছেলেমানুষি করো না! এরপর থেকে দরকারি জিনিসপত্র যা কিছু নেওয়ার সুতপনই এসে নিয়ে যাবে—।'

কমলেশ পাথরের মতো হয়ে গেল। আর কী বলবে ভেবে পেল না। সেন্টিমেন্টের কোনও দাম নেই! সেটাও 'তাতে কী' হয়ে গেছে! কমলেশের চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল।

'কমলেশ—।'

রোমি নয়, সুন্দরী ওর নাম ধরে ডেকেছে। আয়না ছেড়ে এক-পা এগিয়েও এসেছে ওদের দিকে।

'কাকে কী বলছ, কমলেশ! তোমার কথা ও বুঝবে না। ওর...ওর শুধু বাইরেটা সুন্দর। আমার সঙ্গে ওর কোনও তুলনাই হয় না। হোপলেস বেচারি হতভাগিনী—।'

আগুন জ্বলে গেল।

রোমি চিৎকার করে উঠল, 'তুমি যেমন, ঠিক সেরকম রোবটই তৈরি করেছ। এসব তোমার শয়তানি কারিকুরি। অভদ্র, ছোটলোক! আমাকে ডেকে এনে...।'

'রোমি, প্লিজ। রোমি—' কমলেশ আকুলভাবে কিছু একটা বলতে চাইল। সুতপন হন্তদন্ত হয়ে এসে ঢুকল ঘরে।

রোমি ধারালো চোখে একবার সুন্দরীকে দেখল, তারপর সুতপনকে নিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ফ্ল্যাটের দরজা খোলা এবং বন্ধ করার শব্দ এ-ঘর থেকেই স্পষ্ট শুনতে পেল কমলেশ।

অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে শীতের হাওয়া অনুভব করল। তারপর রবারের পা নিয়ে বিছানায় গিয়ে বসল। ওর ভেতরে কিছু একটা হচ্ছিল। একটা বালিশ আঁকড়ে উপুড় হয়ে শুয়ে কমলেশ বোকার মতো হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল।

আর সুন্দরী শুধু অবাক হয়ে কমলেশকে দেখছিল।

অনেক...অনেকক্ষণ পর কমলেশ যেন কারও ডাক শুনতে পেল। চোখ খুলতেই দেখল, ঘর অন্ধকার। কখন লোডশেডিং হয়েছে টের পায়নি। বারান্দার খোলা দরজা দিয়ে বাইরের রাত আবছাভাবে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু আর কিছুই কমলেশ দেখতে পাচ্ছে না। শুধু অন্ধকার।

'কমলেশ—।'

খুব কাছ থেকে নরম গলায় সুন্দরী ওর নাম ধরে ডাকছে।

অন্ধকারে বাঁ-হাতের কাছটায় ধাতব ছোঁয়া টের পেল কমলেশ।

সুন্দরী আবার ডাকল, 'কমলেশ—।'

একটা সুন্দর গন্ধ কমলেশের নাকে এল। ও বড় করে শ্বাস নিল। হাত বাড়াতেই এবড়োখেবড়ো শীতল ধাতুর ছোঁয়া লাগল। কমলেশের হাত আলতো করে ছুঁয়ে যেতে লাগল রোবটটার শরীর। গন্ধটা যেন আরও তীব্র হয়েছে। কমলেশের নেশা ধরে যাচ্ছিল। ডানহাতটা সুন্দরীর বুকের কাছটায় যেতেই ছোট্ট দরজার নবটা টের পেল।

গন্ধটা কি ওর ভেতর থেকেই আসছে?

কমলেশের মাথা ঠিকঠাক কাজ করছিল না। চোখ জ্বালা করছিল, মাথা দপদপ করছিল।

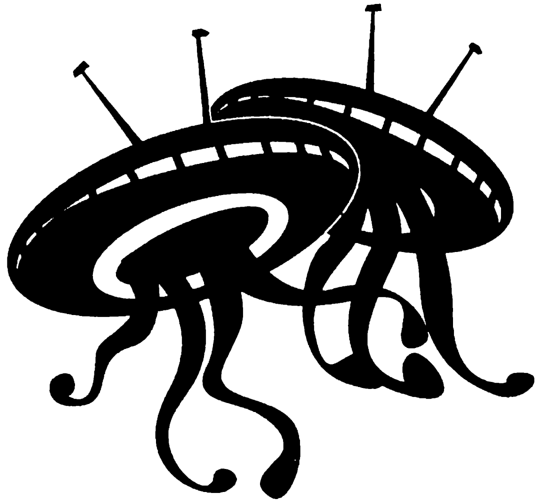
নব টেনে দরজাটা খুলে ফেলল কমলেশ।

মনে হল, গন্ধটা আরও বেড়ে গেছে। কমলেশকে নিশির মতো টানছে।

রোবটটাকে দু-হাতে আঁকড়ে ধরে কোনওরকমে উঠে বসল কমলেশ। অনুমানে ভর করে মুখটা নিয়ে গেল খোলা দরজার খুব কাছে। বুক ভরে শ্বাস নিল। তারপর অন্ধকারের মধ্যেই চোখ মেলে সুন্দরীর ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করল।

'কমলেশ—।'

দরজার ভেতরে মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে আচ্ছন্ন কমলেশ নরম গলায় ডেকে উঠল, 'সুন্দরী—। তোমার ভেতরটা কী সুন্দর...!'



পিকনিকে তিনটে বিকেল

কয়েকটা ঝোপঝাড় সরিয়ে বেরিয়ে এল বিকাশ। চোখ-মুখ যেন কীরকম, চুল ছড়িয়ে গেছে কপালে। অসহায়ভাবে এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে নমিতাকে দেখতে পেল। দেখে যেন ভরসা পেল। চটপট ওর কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'আমার সঙ্গে চল, তোকে একটা দারুণ জিনিস দেখাব।'

নমিতা খালি পায়ে ঘাসের ওপরে হাঁটছিল। দুপুরের রোদ নিস্তেজ হয়ে বিকেল এসে পড়েছে। সেইসঙ্গে ঠান্ডা বাতাস বুঝিয়ে দিচ্ছে এখন শীতের সময়। পিছনে একটু দূরে অপর্ণা, সুজিত, সমীর, নিখিল, কেয়া, মিমি, সিতি ওরা সব গাছতলায় বসে তাস খেলছে, টেপরেকর্ডার চালিয়ে র‍্যাপ শুনছে। ওদের কাছ থেকে একটু দূরে একটা সবুজ বেডকভার পেতে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে অরুণ। ওর নাকি জ্বর-জ্বর লাগছে।

নমিতার কিছু ভালো লাগছিল না। তাই এপাশটায় এসে একা-একা পায়চারি করছিল। গঙ্গা এখান থেকে অনেক দূরে, দেখা যায় না। তবে 'নদীর কাছাকাছি আছি' ভাবলেই মনটা কেমন হয়ে যায়। অন্তত নমিতার হয়।

বিকাশ ওর খুব কাছে এসে বলল, কী রে, কথা বল—নাকি পাত্তাই দিবি না?

নমিতা মুখ তুলে বিকাশকে ভালো করে দেখল। হায় রে আমার সহপাঠী! পাত্তা দিলে তারপর যখন পাত্তা পাও তখন কেন নিজেকে সংযত করো না!

বিকাশ এমনিতে একটু গায়ে-পড়া বোধহয়। নাকি শুধু নমিতার জন্যই গায়ে পড়া? সামান্য ছুতো পেলেই বলে, নে, হ্যান্ডশেক কর।

নমিতা এড়িয়ে যায়। বলে, এসব আমি ভালোবাসি না।

বিকাশ আবার বলল, সত্যি বলছি, নমি। চল, তোকে একটা দারুণ জিনিস দেখাব—তুই লাইফে কখনও দেখিসনি।

নমিতার কৌতূহল হচ্ছিল। কিন্তু ওই 'নমি' শব্দটা এক অদ্ভুত বিরক্তি ছড়িয়ে দিল মনে। শুধু নামটা সংক্ষিপ্ত করে ডাকলেই কি দূরত্ব সংক্ষিপ্ত হয়!

পিকনিকের প্রস্তাবে নমিতা প্রথমটায় রাজি হয়নি। কিন্তু ক্লাসের বন্ধুদের উৎসাহে শেষ পর্যন্ত আর আপত্তি বজায় থাকেনি। তার ওপর নিখিল আবার বলেছিল, দ্যাখো বস, এটাই রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে আমাদের লাস্ট ইয়ার। তারপর কে কোথায় চাকরি-বাকরি নিয়ে চলে যাবে, কার কোথায় ম্যারেজ-ফ্যারেজ হয়ে যাবে—শালা, ঝট করে স্টুডেন্ট থেকে এক্স স্টুডেন্ট হয়ে যাব। না, এই লাস্ট পিকনিক—যেতে তোমাকে হবেই।

নিখিলকে নমিতার খারাপ লাগে না। সত্যিই বন্ধু। ইয়ারকি ফাজলামির সুযোগে কখনও অসভ্যতা করে না।

ক্লাসরুমে ওদের জটলার মধ্যে কখন যেন সমীর নমিতার ঠিক ঘাড়ের ওপর এসে দাঁড়িয়েছিল। পিঠের কাছে সামান্য ছোঁয়া পেয়েই চাবুকের মতো ঘুরে তাকিয়েছে নমিতা ঃ অ্যাই, তুই আগে আমার ঘাড়ের কাছ থেকে সরে দাঁড়া।

সমীর খানিকটা অপ্রস্তুত হওয়ার ভান করে বলল, কেন, আমি কী করলাম? পিকনিকের ব্যাপারে তোর ওপিনিয়ানটা শুনতে এসেছিলাম শুধু...।

নিখিল চোখের চশমাটা ঠিক করে নিয়ে বলল, সমীর, আর কতদিন তোকে মাইরি বারণ করব! সবসময় দেখি তুই নমিতার গায়ের ওপরে ঝুঁকে না পড়ে কোনও কথা বলতে পারিস না। তুই কি শালা ম্যাগনেট যে, নমিতার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে ঢুকে পড়লেই ঢলে পড়িস?

সমীর সরে গিয়ে ইতস্তত করে কী যেন বলছিল বিড়বিড় করে। নমিতাই নিখিলকে বাধা দিল, ওসব বাদ দে। কাজের কথা বল।

তো সকলে মিলে চেঁচামেচি হইহই করে আলোচনা হল 'কাজের কথা'। পিকনিক হবে। আগামী রবিবার—ছাব্বিশে ডিসেম্বর। স্পট ভদ্রেশ্বর। মিমি আর সুজিত ভদ্রেশ্বরে থাকে। ওরাই সব খোঁজখবর করে ঠিক করে রাখবে। কার নাকি একটা বিশাল বাগান আছে—সেটাই আইডিয়াল স্পট হবে পিকনিকের।

পিকনিকে আসার জন্য অরুণও অনেকবার বলেছিল নমিতাকে। ডিপার্টমেন্টের তিনতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল ওরা দুজনে। কাছাকাছি আর কেউ ছিল না।

তুই চল। তুই না গেলে আমিও যাব না।

নমিতা অবাক হয়ে হেসেছিল ঃ এরকম খ্যাপামির মানে?

তুই কি সবসময়েই শুধু মানে জানতে চাইবি? তা হলে তো আমাকে লেখাপড়া ছেড়ে তোর জন্যে একটা মোটাসোটা মানেবই লিখতে হয়।

নমিতা সামান্য নীচু গলায় বলেছিল, অরুণ, এই কয়েকটা বছর আমরা একসঙ্গে পড়াশোনা করছি। আর ক'টা মাস মাত্র বাকি! সহজভাবে এ ক'টা দিন কাটিয়ে দেওয়া যায় না?

অরুণ মাথা নামিয়ে বলেছে, আমি পারছি না। সবসময় যে তোর কথাই মনে পড়ে।

অন্য কথা ভাব, তা হলে আর মনে পড়বে না।

তুই কোনও ব্যাপারই সিরিয়াসলি নিস না কেন বল তো?

নমিতা অরুণের দিকে তাকাল। কিন্তু আশ্চর্য, ওর চোখ লম্বা বারান্দায় দাঁড়ানো অরুণকে দেখতে পেল না। বরং বাইরের লন থেকে বেড়ে ওঠা কদম গাছ, রাধাচূড়া আর বুলবুলি দেখল। বিকেলের রোদ কয়েকটা বিল্ডিংয়ের ফাঁক দিয়ে এসে ওদের চুমু খাচ্ছে।

নমিতা একটু চুপ করে থেকে বলল, যেটা সিরিয়াসলি নেওয়ার সেটা সিরিয়াসলি নিই। অন্য কেউ সিরিয়াস বলে বোঝাবে তারপর সেটা সিরিয়াসলি নেব—এসব থিয়োরিতে আমি বিশ্বাস করি না।

কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল অরুণ। বারান্দায় এখন ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। অফ পিরিয়ডে ছেলেমেয়েরা এখানে ভিড় করে, গল্পগুজব করে। আর অনেক সময় কেউ-কেউ টিফিন খায়। যেমন মিমি আর সুজিত রোজই এই বারান্দার চওড়া রেলিঙে টিফিন বাক্স রেখে ভাগাভাগি করে টিফিন খায়।

একটা ফোঁস শব্দ করে পকেট থেকে একটা ক্যাডবেরি চকোলেট বের করল অরুণ। বলল ছোট্ট করে, তোর জন্যে এনেছি।

নমিতা হাত বাড়াল না। এটা নেওয়াই যায়। কিন্তু ও জানে, নেওয়া মানেই এর একটা ভুল অর্থ খুঁজবে অরুণ। আচ্ছা, এক ক্লাসে পড়া মানেই একটা প্রেম-ভালোবাসার ব্যাপার থাকতে হবে! জোড় বাঁধতে হবে! শুধু সহপাঠী হয়ে দিনগুলো কাটানো যায় না?

নমিতা জানে অরুণ ব্যথা পাবে, তবু বলল, হঠাৎ ক্যাডবেরি দিচ্ছিস?

অরুণের ফরসা মুখ লাল হল। কোনওরকমে বলল, ঠিক আছে, নিস না।

এ-কথা বলেই চকোলেটটা ও ছুড়ে ফেলে দিল নীচের লনে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহন করে হাঁটা দিল, নমিতার কাছ থেকে দূরে চলে গেল।

নমিতা ভেবেছিল অরুণ বোধহয় পিকনিকে যাবে না, কিন্তু রবিবার সকালে অরুণ এল। হাওড়া স্টেশনের বড় ঘড়ির নীচে ওরা পাঁচজন দাঁড়িয়েছিল। মিমি আর সুজিতের আসার কোনও ব্যাপার নেই। ওরা পিকনিক স্পটে গিয়ে ভোরবেলা থেকেই আয়োজন শুরু করে দেবে। আর কেয়া শ্রীরামপুরে থাকে। ও বলেছে আমি আর

উলটোদিকে আসব না, সোজা সুজিতদের বাড়ি চলে যাব। তারপর স্পটে দেখা হবে।

সিতিকণ্ঠ তখন ফোড়ন কেটেছিল, হ্যাঁ, সেই ভালো, গাছপালা ঘেরা উপবনে দেখা হবে ভালোবাসা বেদনায়।

সুজিতের সম্পর্কে কেয়ার একটু দুর্বলতার ব্যাপার আছে। সেটা সবাই জানে, কিন্তু কিছু করার নেই। সিতিটা একটু ঠোঁট কাটা। ঘড়ির নীচে দাঁড়িয়ে ফস করে বলে বসল, অ্যাই, যদি মিমির আজকে জ্বর-টর হয়, যেতে না পারে, তা হলে কেয়া তো গোল করে দেবে।

অন্য অনেকে হেসে উঠল, কিন্তু নমিতা হাসতে পারল না। মানুষের অনেক সত্যিকারের ব্যথার জায়গা থাকে। ও শুধু বিরক্তভাবে বলল, সিতি, সবকিছুর একটা লিমিট আছে।

সিতি বলল, হ্যাঁ, জানি। কিন্তু ভালোবাসার কোনও লিমিট নেই, সোনা। তুমি জানো না বুঝি? এখন ছোট তো, বড় হলে বুঝতে পারবে।

সিতির বলার ঢঙে প্রায় সবাই হেসে উঠল। আর তখনই নিখিল আর অরুণকে দেখা গেল। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসছে। ওরা হস্টেলে থাকে, রুমমেট। তাই একসঙ্গে এসেছে।

নিখিল বলল, অ্যাই, অরুণের মাইরি বেশ জ্বর হয়েছে। আমি বারণ করলাম, শুনল না। বলল, না, পিকনিকে আমি যাবই।

অরুণের গায়ে মোটা চাদর। চোখ একটু লাল, ছলছল করছে।

ওকে দেখে নমিতার মায়া হচ্ছিল। কাছে গিয়ে বলল, জ্বর নিয়ে এলি কেন?

তোর জন্যে।

নমিতা আর কোনও কথা বলল না। এই হচ্ছে মুশকিল। বন্ধু হিসেবে যদি স্বাভাবিক উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা হয় তা হলেও সেটার ব্যাখ্যা করা হবে অন্য সম্পর্ক দিয়ে।

ওরা সবাই মিলে হইহই করে এগোল দু-নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে। বিকাশ গেল টিকিট কেটে নিয়ে আসতে।

চলতে-চলতে সমীর কখন যেন নমিতার কাছে এসে গিয়েছিল। ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, আজ তোকে বিউটিফুল লাগছে।

নমিতা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল হতবাক হয়ে। তারপরই এক ধাক্কায় কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে দিয়ে শাসনের গলায় বলেছিল, আমার সঙ্গে এসব অসভ্যতা কখনও করবি না। আমি কিন্তু এখান থেকেই ফিরে যাব—পিকনিকে যাব না।

নিখিল আর সিতি এগিয়ে এল সমীরের কাছে। সিতি বলল, সমীর, কী হচ্ছে! তুই দেখছি পিকনিকের মুডটাই একেবারে জন্ডিস করে দিবি!

সমীর মিনমিন করে বলল, না রে, আমি তো কিছু করিনি...মানে...।

নিখিল হাত-পা নেড়ে বলে উঠল, ওসব মানে-টানে আমাদের বুঝিও না, বাপ!

শুধু জোড়হাত করে বলছি, তোমার ওই নমিতা-স্পেশাল ম্যাগনেটিক প্রপার্টিটা আজকের দিনটার জন্যে লক-আপে ভরে রাখো, কাল ব্রাহ্মমুহূর্তে আবার শান দিয়ে বের কোরো।

সমীর তখনও কোনওকিছু না বোঝার ভান করে বোকা-বোকা হাসছে।

এমন সময় বিকাশ টিকিটগুলো এনে নমিতার হাতে দিল। ওর আঙুলের ছোঁয়া টের পেল নমিতা। বিকাশ সমীরের মতো বেহায়া নয়। আবার অরুণের মতো চুপচাপও নয়। ও যে ঠিক কী চায় নমিতা বুঝতে পারে না। ওর সবকিছু কেমন জট পাকিয়ে যেতে চায়। কেমন যেন পাগল-পাগল লাগে।

ট্রেনে উঠেই পাগলটার কথা আবার মনে পড়ল নমিতার। ওর ছোটকাকার বন্ধু। মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। মোটরবাইক নিয়ে ঘুরে বেড়াত দিনরাত্তির। একটা বিয়েবাড়িতে আলাপ হওয়ার পরই বলেছিল, আপনি আমার চেয়ে একযুগ ছোট।

নমিতার ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল ঃ এক যুগ মানে?

মানে আর কী, সিম্প্‌ল ম্যাথামেটিক্স—মানে বারো বছরের ছোট।

তারপরই গলা ছেড়ে হাসি।

দেখতে-দেখতে কী যে হল, নমিতার সবকিছু যেন ওলটপালট হয়ে গেল। ওকে দু-তিন দিন না দেখলেই খারাপ লাগত। অফিসের কাজে মাঝে-মাঝেই ট্যুরে যেতে হত ওকে। তখন এস. টি. ডি. করে কথা বলত নমিতার সঙ্গে। তা ছাড়া এমনি ফোন তো ছিলই। কথা বলতে কী যে ভালোবাসত পাগলটা! ওর কথাগুলো নমিতার মনে পড়ছিল বারবার। আর ঠান্ডা বাতাস ট্রেনের জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ে চোখেমুখে আদর করছিল।

নমিতা, জানো, একটা পাগল তোমাকে পাগলের মতো ভালোবাসে?

আবার একদিন ফোন করে বলে, এখন কী পরে আছ—শাড়ি না ম্যাক্সি?

কিংবা আর কোনওদিন ঃ তুমি আমার ভালোবাসার বালিকা। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল তক, আপাদমস্তক, তোমায় ভালোবাসি।

অথবা ঃ এই মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা করলাম, তোমাকে একবার না দেখে জলস্পর্শ করব না।

একদিন হঠাৎই পাগলটা রাত সাড়ে ন'টায় মোটরবাইক নিয়ে নমিতার বাড়িতে এসে হাজির। সে কী হেনস্তার ব্যাপার! কী লজ্জা! নমিতাকে ডেকে বলে কি না, কী করব বলো, একবার ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করল যে!

নমিতাকে পিছনে বসিয়ে বেপরোয়া বাইক চালাত পাগলটা। হাওয়ায় চুল উড়ত দুজনের, নমিতার আঁচল উড়ত। কিছু বলতে গেলে বলত, একটাই তো জীবন, ম্যাডাম। তাই কেতায় বাঁচার চেষ্টা করছি।

এইভাবে বোধহয় আটমাস আর কয়েকটা দিন কেটেছিল। তারপরই, হঠাৎ একদিন, পাগলটা উধাও হয়ে গেল। তিনদিন চারদিন কেটে গেল ফোন করে না,

আসে না। এসে বলে না, তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছিল।

ছোটকাকাকে বলে-কয়ে খবর নিতে রাজি করিয়েছিল নমিতা। পাঁচদিনের দিন রাতে খবর পাওয়া গেল। মোটরবাইক অ্যাকসিডেন্টে সব শেষ। ধূপকাঠি আর ফুলের মালার কাছে হার মেনেছে বেপরোয়া পাগলটা। ও কেতায় বাঁচতে চেয়েছিল।

প্রায় তিনদিন ধরে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল নমিতা। চারপাশটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র সঙ্গী ছিল ঘুমের ওষুধ আর রাতজাগা চোখ। তখন প্রত্যেকটা মুহূর্তে ওর কান্না পেত। টেলিফোন বেজে উঠলে কান্না পেত। ম্যাক্সি পরলে কান্না পেত।

পাগলটা একদিন হাসতে-হাসতে বলেছিল, তোমার কথা ভেবে-ভেবে মরি, মরে গিয়েও তোমার কথা ভাবি।

এখন কি সত্যিই ও নমিতার কথা ভাবছে?

এক অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে দিয়ে দেড়বছর কেটে গেছে। অন্য একটা নমিতা যেন দূর থেকে এই বিষণ্ণ নমিতাকে দ্যাখে। আর ভাবে, বাঁচতে হবে। পাগলটা বলত, বাঁচাটাই আসল, নমিতা, মৃত্যুটা ফাঁকি।

পাগলটার কথা নমিতার সহপাঠীরা কেউ স্পষ্ট করে জানে না। নমিতাও জানাতে চায়নি কখনও।

পিকনিকের রান্নাবান্না হইহুল্লোড় নাচগানের মধ্যে নিজেকে জোর করে মিশিয়ে দিতে চাইছিল নমিতা। কিন্তু কী করে যেন তাল কেটে যাচ্ছিল।

সুজিতের নিয়ে আসা টেপরেকর্ডারে 'চড় গয়া উপর রে, অটরিয়ামে লোটন কবুতর রে, গুটুর-গুটুর' বাজছিল আর অপর্ণা অদ্ভুতভাবে শরীর দুলিয়ে নাচছিল।

বিশাল বাগানের গাছপালা ঝোপঝাড়ের মধ্যে কখন যেন সুজিত আর মিমি হারিয়ে গিয়েছিল। কেয়া আর নিখিল খুঁজতে যাবে বলে রওনা হচ্ছে, ঠিক তখন সিতি মেয়েলি গলায় বলে উঠল, পিকনিকে এসে জোড়ায়-জোড়ায় হারিয়ে গেলে খুঁজতে নেই, সোনা। তোমরা এখন ছোট তো, বড় হলে বুঝতে পারবে কেন খুঁজতে নেই।

সঙ্গে-সঙ্গে হাসির হররা ছুটল খোলা বাগানে।

অরুণ বারবারই নমিতাকে দেখছিল। আর সমীরও নানান ছুতোনাতায় নমিতার আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল। বিকাশ পাখি দেখছিল, গাছের পাতা কুড়োচ্ছিল। মাঝে-মাঝে নমিতার কাছে এসে ডাকছিল, চল না, গাছপালার মধ্যে একটু ঘুরে আসি।

নমিতা যায়নি। ও দল থেকে সরে গিয়ে ঘাসপাতার ওপরে হাঁটছিল। পাগলটার কথা মনে পড়ছিল আবার। ওদের থেকে কত আলাদা ছিল! নমিতাকে একদিন বলেছিল, ম্যাডাম, ভগবান যে সাংঘাতিক দয়ালু সেটা কী করে বোঝা যায় জানো?

কী করে? অবাক নমিতা জিগ্যেস করেছিল।

বাঁচার জন্যে যে-তিনটে জিনিস সবচেয়ে জরুরি, ভগবান সেই তিনটে জিনিসই

বিনি পয়সায় ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

কী জিনিস?

জল, বাতাস আর ভালোবাসা।

তারপরই খোলামেলা হাসি।

নমিতার কিছুই ভালো লাগছিল না। তবে বিকাশের কথায় ওর সামান্য কৌতূহল হচ্ছিল। মনটাকে অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য ও বিকাশের সঙ্গে যেতে রাজি হল। বলল, চল, কী দেখাবি...।

গাছপালা ঝোপঝাড়ের দিকে এগোতে-এগোতে বিকাশ পকেট থেকে একটা সুন্দর চাবির্ রিং বের করল। নীল রঙের মোল্ডেড প্লাস্টিকের চাকতি থেকে তিনটে ছোট-ছোট রিং ঝুলছে। তাতে চারটে চাবি।

চাবির রিংটা নমিতাকে দেখিয়ে বিকাশ বলল, এটা ভালো করে দ্যাখ।

নমিতা দেখল, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারল না বিকাশ কী বলতে চাইছে।

বিকাশ বলল, এটা আমার চাবির রিং। আমার পকেটে ছিল। আমি একটা জায়গায় ঘুরে আসতেই এটা তিনটে হয়ে গেল।

কথাটা বলেই পকেট থেকে হুবহু একইরকম আরও দুটো চাবির রিং বের করল বিকাশ। নমিতা অবাক হয়ে দেখল। সত্যি, কোনও তফাত নেই! কেউ যেন কোনও আশ্চর্য জেরক্স মেশিন দিয়ে চাবির রিংটাকে কপি করে দিয়েছে।

দুটো হেলে পড়া আমগাছের পাশ দিয়ে ওরা বাগানের আরও নির্জন অংশে চলে গেল। সেখানে শুধু নারকেল আর সুপুরি গাছ। কিন্তু তার মাঝখানটায় খানিকটা পরিষ্কার ফাঁকা জায়গা। সেখান থেকে ওপর দিকে তাকালে গাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলোকে মন্দিরের চূড়ার মতো মনে হয়।

একবার পিছনদিকে তাকাল নমিতা। অনেক দূরে গাছপালার ফাঁক দিয়ে নিখিল, কেয়া ওদের দেখা যাচ্ছে। ওদের কাছ থেকে খানিকটা দূরে ইটের উনুন, এঁটো বাসনপত্র আর শালপাতার থালা। সেগুলো ঘিরে কয়েকটা কাক আর কুকুর।

নমিতা টেপরেকর্ডারের গানের মিহি গুনগুন শব্দ শুনতে পেল এতদূর থেকেও। আর ঠিক তখনই ওর বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল।

কারণ, ওর কানের কাছে মুখ এনে বিকাশ হঠাৎই বলে উঠেছে, নমি, বল তো আমি কে?

নমিতা থতমত খেয়ে বিকাশকে দেখল। কিন্তু ভয় পেল না। বিকাশের সাহস কখনও বিপদসীমা ছাড়াতে পারে না।

কিন্তু নতুন ধরনের একটা গুনগুন শব্দ ওর কানে এল। অবাক হয়ে চারপাশে তাকাল নমিতা। গাছে ঘেরা ছোট্ট ফাঁকা জায়গাটায় কেমন যেন একটা ভারী বাতাবরণ। বাতাস নড়ছে খুব ধীরে। আর তারই মধ্যে কোনও অলৌকিক গুনগুন।

বিকাশ আবার জিগ্যেস করল, বল তো, আমি কে?

নমিতা অস্বস্তি কাটিয়ে বলে উঠল ঃ যাঃ, ইয়ারকি মারিস না, বিকাশ—।

বল না, আমি কে? এবার বিকাশের গলাটা অনুনয়ের মতো শোনাল।

নমিতা জোর করে হাসল ঃ তুই বিকাশ।

হাসিস না। আমার সবকিছু কেমন গুলিয়ে গেছে। এই জায়গাটায় ঢুকে পড়ে আবার বেরিয়ে যাওয়ামাত্রই দেখি আমি...।

কয়েকটা গাছের আড়াল থেকে আরও দুটো বিকাশ বেরিয়ে এল ওদের সামনে। ওই দুজন বিকাশের মুখেও কেমন বিমূঢ় ভাব। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে বিকেলের রোদের কয়েকটা তির এসে পড়েছে ওদের মুখে, গায়ে।

নমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে আর্ত গলায় তিনজন বিকাশ বলে উঠল, আমরা কিছুতেই বুঝতে পারছি না আমাদের মধ্যে কে আসল আর কে জেরক্স কপি।

মৌমাছির গুঞ্জনের শব্দ তখনও শোনা যাচ্ছিল। ওদের কথাগুলো কেমন যেন অপার্থিব প্রতিধ্বনির মতো শোনাল নমিতার কানে। ওদের ঘিরে থাকা গাছগুলোর পাতা অস্বাভাবিকভাবে নড়ে উঠল বাতাসে। অদ্ভুত এক আলোর রেখা ছায়াঘেরা মাটিতে আঁকিবুকি টেনে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল নিমেষে। আর গুনগুন শব্দটাও থেমে গেল তৎক্ষণাৎ।

নমি, আমি এখন নিজেকেই চিনতে পারছি না। আমার অবস্থা এখন এই চাবির রিংটার মতো।

কেমন যেন হাহাকারের সুর ভেসে উঠল বিকাশের গলায়।

সমীর আর অরুণের কথা মনে পড়ল নমিতার। এই রহস্যে ঘেরা জায়গাটা থেকে বেরোলেই কি একটা নমিতা তিনটে নমিতা হয়ে যাবে? তখন আসল নমিতাকে খুঁজে পাবে না কেউ। বিকাশ, সমীর আর অরুণ—প্রত্যেকেই একজন করে নমিতা পেয়ে যাবে। ওরা সবাই ওদের মতো করে সুখী হবে। আর আসল নমিতার মন শুধু পাগলটার কথা ভাববে। পাগলটার কথা ভাববে।

ঘরে ফেরা পাখির ডাক শুনতে পেল নমিতা। মাথার ওপর চোখ তুলে তাকাল। নারকেল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা গেল। ভিনগ্রহ থেকে কেউ এই অলৌকিক জেরক্স মেশিন নিয়ে আসেনি তো! যা দিয়ে যে-কোনও জিনিসের জেরক্স কপি করা যায়!

আবার তিনজন বিকাশের দিকে তাকাল নমিতা। বিকেলের মরা রোদ ওদের চোখে-মুখে। তিনজন বিকাশ অসহায়ভাবে তিনটে বিকেল দেখছে।



ধূমকেতু যখন আসে

মধুময় রাতের আকাশ দেখছিলেন। কালো পরদায় কাচপোকা টিপ হয়ে জ্বলছে। চন্দ্র, গ্রহ, তারা, নীহারিকা। তারই মাঝে একটি আকর্ষণীয় উজ্জ্বল বিন্দু—ধূমকেতু সুইফ্‌ট-টাট্‌ল। খালি চোখে ওটাকে চিনে নিতে কোনও অসুবিধেই নেই। এখনকার হিসেবমতো আর পাঁচবছর পরেই, ২১২৬ সালের ১৪ আগস্ট, এই বেপরোয়া ধূমকেতু এসে পৌঁছবে পৃথিবীর কক্ষপথে। তারপর সেকেন্ডে ষাট কিলোমিটার বেগে ছুটে চলা দু-কোটি মিলিয়ন টন ওজনের বস্তুটির সঙ্গে সংঘর্ষ হবে এই প্রাচীন পৃথিবীর। ব্যস, সব গল্প শেষ। শেষ হয়ে যাবে দিন-রাতের খেলা।

'দাদাভাই, কোনটা? ওইটা—ওই যে হলদে বলের মতন?'

টুবুনের দিকে ঘুরে তাকালেন মধুময়। কিশোর মুখমণ্ডলে চাঁদের আলো পড়েছে। কী নিষ্পাপ দেখাচ্ছে! চাঁদের আলো কি পাপ ধুয়ে দেয়?

খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে মধুময়ের শীত-শীত করছিল।

এখন অঘ্রাণের শুরু। হানাদার বাতাস পাতা খসানোর কাজ করে চলেছে গোপনে। মধুময়ের সাদা চুল এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আর জ্যোৎস্না সেই ফিনফিনে সাদা সুতোয় খেয়ালখুশি মতো নকশি-কাঁথা বুনে চলেছে একমনে।

মধুময় স্ট্যান্ডে দাঁড় করানো টেলিস্কোপটার দিকে আঙুল দেখিয়ে নাতিকে কাছে ডাকলেন, 'এখানে আয়, এই টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে দেখ। আরও স্পষ্ট দেখা যাবে—।'

টুবুন দাদুর কাছে এগিয়ে এল। টেলিস্কোপের ঘষা কাচের পরদায় চোখ রাখল। একটু দেখেই বলল, 'ওরে ব্বাবা, শুধু আলো আর কালো-কালো ফুটকি। এটাই কি ধূমকেতু, দাদাভাই?'

'হ্যাঁ।' আকাশের দিকে চোখ রেখে মধুময় বললেন, 'আর পাঁচবছর পর। তোমার বয়েস যখন উনিশ বছর হবে, তখন ওই ধূমকেতুটা পৃথিবীকে এসে ধাক্কা মারবে।'

টেলিস্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে টুবুন জিগ্যেস করল, 'কী হবে তখন?'

আকাশের দিকে আনমনা চোখে তাকিয়ে মধুময় বললেন, 'সব ধ্বংস হয়ে যাবে—।'

'বাঃ রে, কেউ পৃথিবীটাকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে না? ধূমকেতুটাকে সামান্য ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেই হয়—ওটা পৃথিবীকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে।'

'এত বছর ধরে সবাই সেই চেষ্টাই করছে রে। আমিও করছি। এতদিনের পৃথিবীটা নিমেষে ধ্বংস হয়ে যাবে এটা কেউ সইতে পারে!'

মধুময়ের কথা শেষ হতে-না-হতেই দীপান্বিতার গলা শোনা গেল, 'বাবা, আপনার ফোন।' তারপর একটু থেমেই ঃ 'টুবুন, নীচে এসো। ঠান্ডা লেগে যাবে। এমনিতেই তো সারাটা দিন খকখক করে কাশছ—।'

ছাদের সিঁড়ির মুখে দীপান্বিতা ছায়ার মতো এসে দাঁড়িয়েছিল। কথাগুলো ও খারাপভাবে বলেনি। কিন্তু তবুও মধুময় যেন অতৃপ্তির ছোঁওয়া টের পেলেন।

টুবুনকে নিয়ে দীপান্বিতা নীচে নেমে গেল। সিঁড়িতে যে পায়ের আওয়াজ উঠল তার মধ্যে কি বাড়তি শক্তি ছিল? নাকি শোনার ভুল?

অন্ধকার সিঁড়ি ধরে নেমে এলেন মধুময়। বাল্‌বটা কেটে গেছে আজ প্রায় দিনদশেক। কিন্তু এখনও পালটানো হয়নি। অঞ্জনের সময় হয়নি। নিজের ব্যাবসা নিয়ে বড় বেশি ব্যস্ত ও। টুবুনের পড়াশোনা নিয়েও বসতে পারে না কখনও। এই নিয়ে দীপান্বিতার সঙ্গে অঞ্জনের মাঝেমধ্যেই কথাকাটাকাটি হয়।

টেলিফোনটা অঞ্জনদের বসবার ঘরে। বাড়িটা এখনও মধুময়েরই নামে। কিন্তু তবুও কী করে যেন ঘরগুলোর নাম 'অঞ্জনদের বসবার ঘর', 'টুবুনের পড়ার ঘর', 'দীপান্বিতার রান্নাঘর', এইরকম হয়ে গেছে। এমনকী বারান্দা, অলিপথ, একফালি উঠোন—সবজায়গাতেই বেহিসেবিভাবে কেউ যেন ভাগাভাগির পাঁচিল তুলে দিয়েছে।

বসবার ঘরে পা দিয়েই মধুময় দেওয়াল-ঘড়িতে ন'টার মিষ্টি ঘণ্টা শুনতে পেলেন।

রোজকার সবকিছুই যদি এরকম মিষ্টি হত!

বসবার ঘরে ঢুকে দেখলেন, অঞ্জন পারসোনাল কম্পিউটারে বসে ব্যাবসার হিসেবপত্র বা ওই জাতীয় কিছু নিয়ে ব্যস্ত। সবসময় হিসেব নিয়েই থাকে ও। মাঝে-

মাঝে মধুময় অবাক হয়ে ভাবেন। এই কি তাঁর একমাত্র পুত্র! একেই কি পাখির মতো মমতায় তিনি আর অঞ্জলি এই এত্তটুকুন থেকে বড় করে তুলেছিলেন! আঃ, যদি অঞ্জলি আজ থাকত কী কষ্টই না পেত! এই কষ্ট থেকে বাঁচার জন্যই অঞ্জলি একযুগ আগে ছবি হয়ে গেছে। ওর গলায় শুকনো ফুলের মালা দোলে।

বসবার ঘরের এক কোণে কম্পিউটার, আর তার বিপরীত কোণে ভিডিয়োফোন। ঘরের দেওয়ালের সর্বত্র অঞ্জন, দীপান্বিতা আর টুবুনের ছবি। অঞ্জলি সেই কবেই চালান হয়ে গেছে মধুময়ের একতলার এক কোণের ঘরের আস্তানায়। রোজ রাতে শোওয়ার আগে মধুময় অঞ্জলির ফটোর সঙ্গে কথা বলেন।

'জানো, আর পাঁচবছর পরে পৃথিবীর দারুণ বিপদ আসছে। এখন থেকে চেষ্টা না করলে সব শেষ হয়ে যাবে।'

ফিকে হয়ে আসা রঙিন ফটোয় অঞ্জলির ভুরু ধনুকের মতো বেঁকে গেল : 'কেন গো? তুমি, খোকা, টুবুন, দিপু...তোমরা খুব সাবধানে থেকো।'

মধুময় হাসেন। বিষণ্ণ হাসি। ওঁর বলতে ইচ্ছে করল : 'অঞ্জু, কিছুই আর আগের মতো নেই। সব পালটে গেছে।'

তারপর মধুময় ওকে বলেছেন সুইফ্‌ট-টাট্‌ল-এর কথা।

সেই কোন ১৮৬২ সালে দুই মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী লিউইস সুইফ্‌ট আর হোরেস টাট্‌ল এই ধূমকেতুটিকে প্রথম লক্ষ করেন। খালি চোখেই পৃথিবীর মানুষ তাকে দেখতে পেয়েছিল—এখনকার মতন। লোকে এই ধূমকেতুটির নাম দিয়েছিল 'গ্রেট কমেট অফ ১৮৬২'। পরে তার নাম রাখা হয় 'সুইফ্‌ট-টাট্‌ল'—ওই দুই জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নামে।

কে জানত, কালক্রমে এই ধূমকেতুই ডেকে আনবে পৃথিবীর শেষ দিন!

ভিডিয়োফোনে সীতাংশুর ছবি। সীতাংশু রায়। দুঁদে উকিল। মধুময়ের একরকম বন্ধুর মতো। মধুময় জানেন সীতাংশু কেন ফোন করেছেন।

'কী খবর, সীতাংশু?' ভিডিয়োফোনের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বললেন মধুময়।

সীতাংশু হাসলেন। বললেন, 'খবর আর কী! এখন তো উকিলদের শ্বাস ফেলার সময় নেই। পাঁচবছর পর দুনিয়া খতম হয়ে যাবে, সেই ভেবে সবাই খালি উইল করছে। ভাবছে, সম্পত্তি ভোগ করার জন্যে ওয়ারিশ বহাল তবিয়তে দিব্যি বেঁচে থাকবে।' হো-হো করে হেসে উঠলেন সীতাংশু : 'এই তুই যেমন ভাবছিস।'

মধুময় হাসলেন না। বললেন, 'আমার লেখাটা তুই পড়েছিস?'

'হ্যাঁ, পড়েছি। তোর লেখা দেখে একটা খসড়া উইল আমি দাঁড় করিয়েছি। ওটা পড়ে আমাকে গ্রিন সিগন্যাল দিলেই আমি সবকিছু ফাইনাল করে দেব।'

মধুময় সামান্য আনমনা হয়ে পড়েছিলেন। ভিডিয়োফোনের পাশে রাখা শো-কেসের কাচে ছেলের আবছায়া প্রতিবিম্ব দেখতে পেলেন। অঞ্জন এই মুহূর্তে আর

কম্পিউটারে কাজ করছে না। মধুময়ের কথা শুনছে, ওঁকে লক্ষ করছে।

গত ক'দিন ধরেই বাড়ির অবস্থা থমথমে। মধুময় সবই বোঝেন। কী করে যেন ওঁর উইল করতে যাওয়ার ব্যাপারটা দীপান্বিতা অথবা অঞ্জন জেনে গিয়েছিল। তারপর থেকেই ওদের কপালে ভাঁজ পড়েছে। সীতাংশুর টেলিফোন এলেই ওরা আর সহজ-স্বাভাবিক থাকতে পারে না।

গত কয়েকমাস ধরেই এগিয়ে আসা ধূমকেতুর কক্ষপথ যথেষ্ট খুঁটিয়ে লক্ষ করছেন মধুময়। তাঁর টেলিস্কোপের ব্যাস মাত্র সাড়ে ছ'-ইঞ্চি। কিন্তু কার্ল জাইসের নিখুঁত লেন্স—চন্দ্র, গ্রহ, তারা কী স্পষ্ট দেখা যায়!

মধুময় কলকাতার একটি জ্যোতির্বিদ সংস্থার সক্রিয় সদস্য। সংস্থার সাপ্তাহিক মিটিং-এ এই ভয়ংকর ধূমকেতুকে ধ্বংস করার নানান পরামর্শ দেন তিনি। সে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও হয়। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্থা এই সঙ্কট নিয়ে ভাবছে। ধূমকেতুকে ঘিরে ধ্বংসের কতরকম যে কুসংস্কার আছে! সেগুলো কি এবার সত্যি হতে চলেছে?

মধুময় কথা বলা শেষ করে ভিডিয়োফোনের সুইচ অফ করতেই অঞ্জন ডেকে উঠল ঃ 'বাবা!'

মধুময় ছেলেকে দেখলেন। ওর ঘাড়ের কাছে চুলগুলো কেমন খোঁচা-খোঁচা হয়ে আছে। উদ্ধত ঘোড়ার কেশরের মতো।

'কিছু বলবি?'

'উইল কি না করলেই নয়?'

মধুময় ধাক্কা খেলেন। এই প্রথম বুঝি সরাসরি সংঘর্ষ হতে চলেছে। দুটি মহাজাগতিক জ্যোতিষ্কের কক্ষপথের কাটাকুটি খেলা। কিছুতেই কি এই সংঘর্ষ এড়ানো যায় না?

'খোকা, আমার উইলে তোর কোনও ক্ষতি হবে না। শুধু মাইকেলনগরের বাগানটুকু আমি মানমন্দির করার জন্যে আমাদের সোসাইটিকে দান করে যেতে চাই। তা ছাড়া—।'

অঞ্জন ক্ষিপ্র হাতে চোখের চশমা খুলে এক ঝটকায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমি আর শুনতে চাই না, বাবা! তুমি সারা পৃথিবীকে ধূমকেতুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে খেপে উঠেছ, অথচ নিজের ছেলেকে বাঁচাতে পারছ না।' একটু থেমে চোখ নামাল অঞ্জন। চাপা অভিমানের গলায় বলল, 'আমি এতদিন কিছু বলিনি। জানতাম না, মানুষ এতটা অকৃতজ্ঞ হতে পারে—।'

অঞ্জলি! শুনতে পাচ্ছ, খোকা কী বলছে! মধুময় ডুকরে উঠলেন মনে-মনে। একযুগের ভাত-কাপড়ের ঋণে তিনি কি খোকার কেনা জনম্‌দাস হয়ে গেছেন! ওঁর যে বড় আশা ছিল, যে-কোনও দিন, যে—কোনও দিন, খোকা আবার ছোটবেলার মতো হয়ে যাবে। এখনকার টুবুনের মতো। অঢেল কৌতূহল থাকবে, কিন্তু লিপ্সা

থাকবে না।

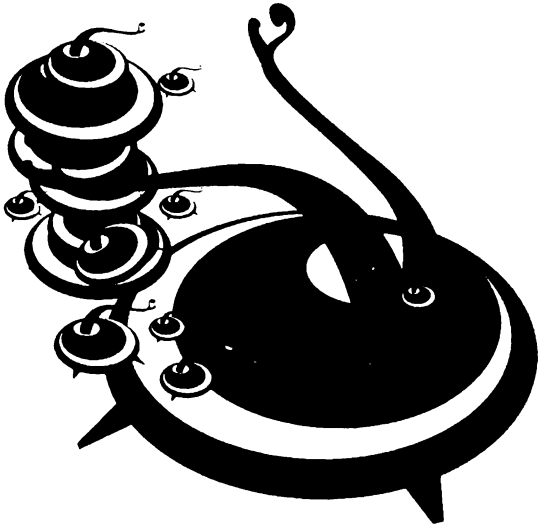
এতদিন পর্যন্ত বড় প্রত্যাশা নিয়ে সেই মুহূর্তটার জন্য অপেক্ষা করে ছিলেন মধুময়। স্থির প্রতিজ্ঞায় নিজের কক্ষপথে পরিক্রমা করে গেছেন অবিরাম। কিন্তু...।

মধুময়ের শরীরে এক অদ্ভুত জ্বালা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কানে এল, পাশের ঘরে দীপান্বিতা রুক্ষভাবে টুবুনকে ধমকাচ্ছে। টুবুন কি ফুঁপিয়ে কাঁদছে? মধুময়ের কানে সবরকম শব্দ জড়িয়ে যাচ্ছিল, জট পাকিয়ে যাচ্ছিল।

কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ছাদে ফিরে এলেন মধুময়। প্রত্যাশাহীন অবাঞ্ছিত এক বৃদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী। যে গ্রহ-তারা চেনে, অথচ আত্মীয়দের চিনতে পারে না। মধুময় অবাক চোখে আকাশের দিকে তাকালেন। গ্রহ-তারা-নীহারিকা বয়েসে কত প্রাচীন! কত প্রাচীন ওদের সংসার! কিন্তু তবুও ওদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ এতটুকু কমে না। কী অনুগতভাবে ক্রমাগত ঘুরে যায় কক্ষপথে! সময়ের ঘড়ি ওদের এই টানে ক্ষয় ধরাতে পারে না।

ক্লান্ত মধুময় রাতের আকাশে উজ্জ্বল সুইফ্‌ট-টাট্‌লকে দেখলেন। ভাঙাচোরা গলায় বললেন, 'তুই ছুটে আয়। আমার দিকে ছুটে আয়!' বাঁ-হাতে নিজের বুকে কয়েকবার আলতো আঘাত করে বৃদ্ধ বলে উঠলেন ঃ 'আমি তোর জন্যে বুক পেতে অপেক্ষা করব।'

শুধু কালো রাত আর ঠান্ডা বাতাস মধুময়ের হাহাকার শুনছিল।



চিত্রার অদৃশ্য মৃতদেহ

আসুন, আমার বউ চিত্রার সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই। ওই যে, সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়ে বেশ জোরালো গলায় গান গাইছে। গানে সুর নেই বটে, কিন্তু কথা তো আছে! কথা হল চিত্রার সবচেয়ে প্রিয়। দিনে কম করে আড়াই লক্ষ শব্দ উচ্চারণ করে এই রমণী। বোধহয় আগের জন্মে শালিখ কিংবা চড়ুই ছিল।

চিত্রার শরীরের যৌবন আছে। বড় বেশিরকম যৌবন। গায়ের রং মাজা। মুখের শ্রী মাঝারি। যখন, প্রায় এক যুগে আগে, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়, তখনও ওর চেহারা একইরকম ছিল। না, ভুল ভেবেছেন—ভালোবেসে আমাদের বিয়ে হয়নি। বরং বলা যায়, ওই ব্যাপারটা হয়ে গিয়েছিল প্রয়োজন থেকেই।

আমরা দুজনে সরকারি আর্ট কলেজে ছবি আঁকা শিখতাম। তখন চিত্রা একটু বেশি আহ্লাদি আর গায়ে-পড়া ছিল। ওকে দেখে আমার সবসময়েই মনে হত, সন্তান উৎপাদনের বকযন্ত্র। কথাটার আদৌ কোনও মানে হয় কিনা জানি না, কিন্তু মনে যে হত সেটা সত্যি। অথচ বিয়ের পরে জেনেছিলাম চিত্রা বন্ধ্যা বসুন্ধরা।

দারুণ নম্বর পেয়ে পাশ-টাশ করার পর বিদেশে যাওয়ার একটা সুযোগ

পেলাম। এরকম স্বপ্ন আমার একটু-আধটু ছিল। কিন্তু যাতায়াতের প্লেনভাড়া জোটানোর ব্যাপারটা আমার কাছে ছিল রীতিমতো দুঃস্বপ্ন। কোত্থেকে টাকা পাই? ঠিক তখনই সহপাঠী অতনু একটা মতলব শোনাল। বলল, চিত্রার বাবা নাকি জামাই খুঁজছেন।

প্রথমটা আমার লজ্জা করেছিল। অনেক নীতি-ফিতি ছিল ছোটবেলা থেকে। কিন্তু বেশ মনে আছে, কয়েকটা রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। মনের মধ্যে রোজই চলত লড়াই। উচ্চাশা আর নীতির দাঁত-নখ লড়াই। আমি জানতাম শেষ পর্যন্ত কে জিতবে। উচ্চাশাই জিতল। চিত্রার বাবার কাছে মাথা জমা দিয়ে বিদেশে গেলাম। না, আমি একা নয়, সঙ্গে ছিল আমার নতুন বউ চিত্রা।

কলেজ থেকে পাশ করে বেরোনোর পর থেকেই চিত্রার ছবি আঁকার শখ মিটে গিয়েছিল। তার বদলে ওর নিত্যনতুন শখ গজাতে লাগল। দেশ বেড়ানো, সেলাই, মডেলিং, হাতের কাজ, আরও সব কতরকম কিম্ভূত শখ। আমি যখন মনপ্রাণ দিয়ে ছবি আঁকতাম তখন চিত্রা কানের কাছে ওর নতুন শখের বৃত্তান্ত বকবক করে যেত। আমার তুলির টান ভ্রষ্ট হত। নিবিড় মনোযোগ নষ্ট হত। কিন্তু ক্রীতদাস আমি কী-ইবা করতে পারি। সহ্য করাটাই যে আমার একমাত্র গুণ।

বিদেশ থেকে দেশে ফিরে বছর গড়াতে লাগল, আর চিত্রার কথাও বাড়তে লাগল সমানুপাতিক হারে। এ ছাড়া আমার প্রতিটি ছবির প্রথম সমালোচক হল চিত্রা। সাদা ক্যানভাসে তুলির প্রথম আঁচড়ের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কানের কাছে শুরু হয়ে যেত ওর সমালোচনার ধারাবিবরণী। এ যে কী অসহ্য যন্ত্রণা! এমনও হয়েছে, আমার অজান্তে আমার অসমাপ্ত ছবিতে নিজের খুশিমতো বেশ কিছু রদবদল করে দিয়েছে চিত্রা। তারপর ভোরবেলা চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে বুক অসভ্যভাবে উঁচু করে আড়মোড়া ভাঙতে-ভাঙতে বলেছে, এবার ছবিটা অনেক বেটার দেখাচ্ছে না। আমি ছোট্ট করে 'হুঁ' বলে চুপ করে থেকেছি। কিন্তু মাথার ভেতর তখন টগবগ করে রক্ত ফুটছে।

গত বারোবছর তিনমাস সময়ের মধ্যে চিত্রার অন্তত সতেরোটা ছবি আঁকতে বাধ্য হয়েছি আমি। কখনও ওর পরনে চটুল পোশাক, কখনও-বা পোশাকহীন নিরাবরণ। কিন্তু একটা ছবিও ওর পছন্দ হয়নি। কারণ, ওর মতে ছবিগুলোতে হয় ওর ব্যক্তিত্ব ফোটেনি, কিংবা ওর চোখের অতলান্ত গভীরতা ধরা পড়েনি, নয়তো ওর সুললিত যৌবনের কোমলতা অনুপস্থিত।

হ্যাঁ, আমি জানি, ছবিগুলো ওর মতো হয়নি। কারণ, তুলির প্রথম টান শুরু করার পর থেকেই আমার বুকের ভেতরে দাস-মনোবৃত্তি তোলপাড় করত। মনে হত, একটা শেকল বাঁধা জানোয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে। তখন ওই বিকৃত মনের অবস্থায় যে-ছবি আমি আঁকতাম তাতে চিত্রার

ঠোঁটজোড়া হত বিশাল, চোখে থাকত শয়তানি, আর শরীরে ঝরে পড়ত পাশবিক কামনা।

এখন আমার ছবি বেশ ভালোই বিক্রি হয়। শিল্পী হিসেবেও আমার নাম-ডাক হয়েছে। ইচ্ছে করলে এবং চেষ্টা করলে চিত্রার বাবার দেওয়া সেই প্লেনের টিকিটের দাম এখন আমি সুদসমেত শোধ করে দিতে পারি। কিন্তু তাতে কোনও লাভ নেই। চিত্রা তো থাকবে আমার কাছেই, শোবে আমার সঙ্গে, আমার প্রতিটি তুলির টানের কুৎসিত সমালোচনা করবে, নিজের বীভৎস সব শখ নিয়ে অনর্গল কথা বলে যাবে, আর আমার কানের পরদা কেঁপে যাবে অবিরাম। এইভাবে চিত্রার শব্দদূষণে ক্রমাগত ডুবে যাব আমি। শেষ পর্যন্ত হয়তো পাগল হয়ে যাব।

সুতরাং এইরকম একটা মনের অবস্থায় যদি আমি চিত্রাকে খুন করার কথা ভেবে থাকি তা হলে আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে দোষ দেবেন না। এও জানি, আপনাদের মধ্যে কেউ-কেউ হয়তো বলবেন, অ্যাদ্দিন কী করছিলেন, মশাই? বারোবছর ধরে এই যন্ত্রণা সহ্য করেছেন! অনেক অগেই আপনার ওকে খতম করে দেওয়া উচিত ছিল।

মানছি, উচিত ছিল। বহুবার ভেবেছি ওকে খুন করার কথা, কিন্তু ক্রীতদাসের সাহসে কুলোয়নি। তা ছাড়া, পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়ও ছিল। আর ধরা পড়লেই তো ছবি আঁকা শেষ। যে ছবি আঁকার চর্চার জন্যে এত কাণ্ড, সেই ছবিই যদি না আঁকতে পারি, তা হলে চিত্রাকে খুন করে আর লাভ কী।

কিন্তু নিয়তি বোধহয় আমার নিঃশব্দ হাহাকার শুনতে পেয়েছিল। তাই একদিন ধর্মতলার মোড়ে দেখা হয়ে গেল অনুতোষের সঙ্গে।

অনুতোষ আমার সঙ্গে হেয়ার স্কুলে পড়ত। এখন বিশাল বিজ্ঞানী। সবসময়েই লন্ডন-আমেরিকা করে বেড়াচ্ছে। তা ছাড়া অনুতোষ ছবিরও সমঝদার। ফলে আমার নাম জানত। শুধু জানত না, আমিই ওর স্কুলের সেই মুখচোরা সহপাঠী।

অনুতোষ আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল ওর বাড়িতে। ওর নানান আবিষ্কার দেখাল। তার মধ্যে একটা যন্ত্র আমাকে অবাক করে দিল। যন্ত্রটা নিয়ে অনুতোষ এখনও গবেষণা করছে। তবে তার গুণাগুণ শুনে আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম। আর তখনই চিত্রাকে খুন করার ইচ্ছেটা বাস্তব চেহারা নিতে চাইল আমার মনে। নাঃ, চিত্রাকে দেওয়ালে ঝোলানো ফটো করে দিতে আর কোনও বাধা নেই।

গত পাঁচ-সাত বছর ধরে প্রচুর খুনজখমের গল্প আমি পড়েছি। তার মধ্যে বউকে খুন করার গল্পগুলো বেশি মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। তাতে দেখেছি, এক-একটা গল্পে খুনের পদ্ধতি এক-একরকম। আবার মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলার চেষ্টাও নানারকমের। যেমন, একজন সাহেব তার বউয়ের মৃতদেহটা ছোট-ছোট টুকরো করে

পুড়িয়ে ফেলেছে ফায়ার প্লেসে। কাজটা এতই ভয়াবহ যে, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া ফায়ার প্লেস হাতের কাছে পাবই বা কোথায়? বড়জোর মৃতদেহের টুকরোগুলোকে গ্যাসের উনুনে পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু মাংস পোড়ার গন্ধ পেয়ে আমার প্রতিবেশীরা অবশ্যই হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। এমনিতেই তারা সবসময় পরের ছিদ্র খুঁজে বেড়ায়, সুতরাং তাদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনও কারণ নেই। তা ছাড়া বউ নিরুদ্দেশ হওয়ার একটা জুতসই ব্যাখ্যাও তো খাড়া করতে হবে আমাকে।

আর-একটা গল্পে নায়ক তার বউয়ের মৃতদেহ পাতালঘরের দেওয়ালের ফাঁপা অংশে লুকিয়ে দেওয়ালটা নতুন করে গেঁথে দিয়েছিল। পুলিশ তন্নতন্ন করে খানাতল্লাশ চালিয়েও সেই মৃতদেহের হদিস পায়নি। কিন্তু অহঙ্কারী নায়ক পুলিশের সামনেই যখন পাতালঘরের দেওয়ালের গায়ে লাঠি ঠুকে গাঁথুনির প্রশংসা করতে থাকে, তখনই কোথা থেকে যেন শোনা যায় অপার্থিব এক কান্নার সুর। গাঁথুনির ভেতর থেকেই যেন ভেসে আসছে সেই কান্না। তৎপর পুলিশের দল সন্দিহান হয়ে গাঁথুনি ভেঙে ফেলে। তখনই দেখা যায়, নায়কের বউয়ের বিকৃত মৃতদেহের মাথার ওপরে বসে আছে তারই পোষা কালো বেড়াল। ভুল করে বউয়ের মৃতদেহের সঙ্গে সে এই কালো বেড়ালটিকেও জীবন্ত কবর দিয়েছিল। ফলে, একটা বেড়াল চোখের পলকে যেন ফাঁসির দড়ি হয়ে গেল।

গল্পগুলোর মধ্যে উদ্ভট গল্পও বেশ কয়েকটা ছিল। একটা লোক তো তার বউয়ের মৃতদেহ দু-বোতল চাটনি দিয়ে স্রেফ খেয়েই ফেলেছিল। এই জঘন্য কাজ করার সময় খিদে বাড়ানোর জন্যে লোকটা কুড়ুল দিয়ে তার বাগানের সবক'টা গাছ কেটে ফেলেছিল। নাঃ, পড়লে বিশ্বাস হতে চায় না। এটা শুধু গল্পেই মানায়।

তারপর চোখে পড়েছে খুব জনপ্রিয় পদ্ধতির গল্প—যেখানে বউয়ের মৃতদেহ বড় ট্রাঙ্ক কিংবা সুটকেসে ভরে পাচার করা হচ্ছে, ফেলে রেখে আসা হচ্ছে ট্রেনের কামরায়, অথবা নির্জন কোনও রাস্তার ধারে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে দেখেছি পুলিশ মৃতদেহটা খুঁজে পাওয়ার পর থেকেই বিপদের শুরু। কী করে যেন গন্ধ পেয়ে ওরা ঠিক খুঁজে পায় খুনিকে। তা ছাড়া নাকগলানে পাড়াপড়শিরা যদি ট্রাঙ্ক বা সুটকেস নিয়ে রওনা হতে দ্যাখে তা হলেই চিত্তির।

আর আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, বউ যখন খুন হয় তখন সন্দেহের তালিকায় প্রথম নামটি সবসময়েই তার স্বামীর। সুতরাং, চিত্রা খুন হলে আমার নামই থাকবে সবার আগে। তা ছাড়া ওর বাবা, আমার ডার্লিং শ্বশুরমশায়, বিকট বড়লোক। আদরের মেয়ের খুন হওয়াটা বা নিরুদ্দেশ হওয়াটা উনি কিছুতেই চুপচাপ মেনে নেবেন না।

দিনের পর দিন ভেবে-ভেবে মাথার চুল ছিঁড়েছি আমি। চিত্রার মৃত্যুটাকে

আত্মহত্যা কিংবা দুর্ঘটনা হিসেবে চালানো যায় কি না তাও ভেবেছি। কিন্তু মনের মতো কোনও প্ল্যান আসেনি মাথায়। বহু ভেবে-ভেবে সার কথা যা বুঝেছি তা হল, চিত্রাকে খুন করতে হবে, মৃতদেহ লোপাট করতে হবে, এবং সবশেষে ওর উধাও হয়ে যাওয়ার একটা জুতসই ব্যাখ্যা খাড়া করতে হবে।

তবে গল্পে হোক আর সত্যি হোক, একটা ব্যাপার আমি লক্ষ করে দেখেছি ঃ মৃতদেহ যদি খুঁজে পাওয়া না যায় তা হলে কিছুতেই পুলিশ জুতসই কোনও কেস দাঁড় করাতে পারে না। সুতরাং কী করে চিত্রাকে খুন করব, তার চেয়েও বড় প্রশ্ন হচ্ছে, কী করে ওর মৃতদেহ লোপাট করব।

এই প্রশ্নের উত্তরই আমি খুঁজে চলেছি গত পাঁচ-সাত বছর ধরে।

না, মনের মতো কোনও উত্তর পাইনি। মনে-মনে যে কত লক্ষ গল্প আমি লিখে ফেলেছি! কিন্তু সবক'টা গল্পেই শেষ পর্যন্ত স্বামী বেচারা ধরা পড়ে গেছে। আর তারপরই ইলেকট্রিক চেয়ার কিংবা ফাঁসির দড়ি।

সুতরাং অনুতোষের যন্ত্র আমাকে হাতে চাঁদ পেড়ে দিল। আমার এতদিনের প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া গেল যেন।

কফির কাপে চুমুক দিচ্ছিলাম আর গভীর টান মারছিলাম হাতের সিগারেটে। চোখ-কান-মন সবই অনুতোষের দিকে। ও আমাকে তখন যন্ত্রটার কথা বলছিল।

যন্ত্রটার নাম দিয়েছি টাইম লকার, বুঝেছিস?

আমি অবাক হয়ে বললাম, টাইম লকার? তার মানে?

যন্ত্রটা আমাদের কাছ থেকে খানিকটা দূরেই দাঁড়িয়ে। চেহারায় দুশো লিটার মাপের একটা রেফ্রিজারেটরের মতো। রং হালকা নীল। চকচকে ধাতুর হাতল লাগানো দরজায়। আর পাশের দিকটায় ছোট্ট একটা ডায়ালের মতো কী যেন, তার পাশেই লাল রঙের একটা বোতাম।

অনুতোষ কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সিগারেটে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে এগিয়ে গেল টাইম লকারটার দিকে। হাতলে টান মেরে দরজাটা খুলে দিল।

ভেতরে অনেকটা জায়গা। দুটো তাকও রয়েছে। সবটাই ধাতুর পাত দিয়ে তৈরি।

বুঝতেই পারছেন, যন্ত্রটার মধ্যে এমনিতে কোনও বিশেষত্ব নেই। নেহাতই সাদামাটা শৌখিন একটা আলমারি। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তরে অনুতোষ কী বলল জানেন?

টাইম লকার।—হাসল অনুতোষ ঃ এর মধ্যে কোনও জিনিস ঢুকিয়ে যদি পাশের দেওয়ালের ডায়ালটা এইদিকে কুড়ি ডিগ্রি ঘুরিয়ে বোতামটা টিপে দিস, তা হলে দরজা খুলে দেখবি ভেতরে কিছুই আর নেই। সব ফাঁকা।

যাঃ, অসম্ভব!—আমি সিগারেট গুঁজে দিয়েছি অ্যাশট্রেতে। কফির কাপ হাতে চলে গেছি বিজ্ঞানী অনুতোষের কাছে। বলেছি, না, ভাই, বিশ্বাস হচ্ছে না।

অনুতোষ একবার তাকাল আমার দিকে। তারপর হঠাৎই আমার হাত থেকে কফির কাপ-প্লেট একরকম কেড়ে নিল। সেটা রেখে দিল টাইম লকারের ওপরের তাকে। এবং দরজা বন্ধ করে ডায়াল ঘুরিয়ে বোতাম টিপে দিল।

অনুতোষ চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, নে, এবার দরজা খুলে দেখ—।

আমি অবাক চোখে আমার স্কুলজীবনের বন্ধুকে দেখতে-দেখতে টাইম লকারের হাতল ধরে টান মারলাম। এবং হতবাক হয়ে গেলাম।

টাইম লকার সেই আগের মতোই খালি।

আমার ফ্যালফ্যালে চাউনি দেখে অনুকম্পার হাসি হাসল অনুতোষ। বলল, ওই কাপ আর প্লেট এখন হাইপারস্পেসে চলে গেছে। আমাদের স্পেস-টাইম ছেড়ে চলে গেছে ফোর্থ ডায়মেনশনে।

আমার মাথায় ব্যাপারটা ঢুকল না। হাইপারস্পেস! ফোর্থ ডায়মেনশন। সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য গুলিয়ে যাক, ক্ষতি নেই—শুধু টাইম লকার ঠিকমতো কাজ করলেই আমি খুশি।

অনুতোষের ভেতরে বিজ্ঞানী সত্তা তখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ও আপনমনেই বকবক করে বলে চলেছে ওর টাইম লকার তৈরির ইতিহাস। আমি ওর কথাগুলো শুনছিলাম, কিন্তু মনে-মনে গলা টিপে খতম করছিলাম চিত্রাকে। আমার বিষধর চিত্রসমালোচককে।

অনুতোষ বলছিল,...সুপারকন্ডাক্টর দিয়ে কয়েকটা কয়েল তৈরি করে তাতে কারেন্ট পাঠিয়ে তৈরি করেছি সুপার-ম্যাগনেটিক ফিল্ড। তার ওপরে চালিয়েছি নকল মহাকর্ষ। তা ছাড়া আরও অনেক কিছু করেছি, তুই সেসব বুঝবি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেরকমটা চাইছিলাম সেরকম হল না। দেখি, এরপর আর কী কারিকুরি করা যায়...।

নিকুচি করেছে অনুতোষের বৈজ্ঞানিক কচকচির। আমি তখন মনে-মনে 'পেয়েছি অভয়পদ, আর ভয় কারে...' গাইছি।

আমার মুখচোখে বোধহয় খুশি আর উত্তেজনার ছাপ পড়েছিল। সেটা দেখে অনুতোষ একটু অবাক হয়ে গেল। টাইম লকারের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, কী ব্যাপার বল তো?

আমি নিজেকে সামলে নিয়ে মজা করে বলেছি, না, ভাই, এখন বলব না। আমার মতো ছবি আঁকিয়েদের এমনিতেই পাগল বলে বদনাম আছে। তবে এটুকু বলতে পারি, তোর এই যন্ত্রটা দেখে আমার একটা আইডিয়া এসেছে।

না, না, ভুলেও ভাববেন না চিত্রাকে 'নেই' করে দেওয়ার আইডিয়াটা আমি অনুতোষকে বলতে চাইছি। ও আমার স্কুলের বন্ধু—তার বেশি কিছু নয়। সুতরাং রহস্যময় হাসি হেসে বললাম, তোর এই যন্ত্রটা ক'দিনের জন্যে আমাকে ধার দিতেই হবে।

কেন বল তো?—অনুতোষ অবাক চোখে তাকায় আমার দিকে।

আমি তখন চাপা গলায় বললাম, তোকে বলছি, কিন্তু ব্যাপারটা একদম ফাঁস করবি না। আমি হাইপারস্পেস নিয়ে ছবি আঁকা শুরু করব। সুররিয়েলিস্টিক ঢঙে একটা সিরিজই এঁকে ফেলব। বুঝতেই তো পারছিস, এই দারুণ আইডিয়ার ব্যাপারটা যদি অন্য কোনও আর্টিস্ট টের পেয়ে যায় তা হলে আমারই ক্ষতি। আর্টিস্টদের মধ্যে কীরকম বাজে টাইপের রেষারেষি জানিস তো!

না, অনুতোষ যে আমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে তা বলব না। তবে আমি যেভাবে নাছোড়বান্দার মতো ওকে ধরেছি তাতে ওর ঠুনকো আপত্তি টিকল না। তা ছাড়া ওর গবেষণার জন্যে বিশহাজার টাকা ডোনেশান দিতেও রাজি হয়ে গেলাম আমি। আরও বললাম, বন্ধুত্বের খাতিরেই ওর একটা অয়েল পোর্ট্রেট করে দেব—একেবারে বিনা পারিশ্রমিকে।

অনুতোষের মুখ দেখেই বুঝলাম, আমার এক-একটা অয়েল পেইন্টিং কী দামে বিক্রি হয় সে সম্পর্কে বেশ ভালোরকম ধারণাই ওর আছে। ওর মুখে প্রত্যাশা ফুটে উঠল। সেটা দেখে আমার হাসি পেল। অনুতোষ জানে না, চিত্রার জোয়াল থেকে মুক্তি পেতে আমি একটা কেন, একহাজার অয়েল পেইন্টিং ফ্রি-তে বিলোতে পারি।

সুতরাং এইভাবে, অনেক অনুনয় ও মেহনতের পর, অনুতোষের টাইম লকার পরদিনই চলে এল আমার বাড়িতে। এবং এবার যে-গল্প আমি 'লিখতে' চলেছি সারা দুনিয়া খুঁজেও যে তার জুড়ি পাওয়া যাবে না সেটা আমি জানি।

চিত্রা যে বাক্সটা—মানে, টাইম লকারটা—দেখে একশো আটটা প্রশ্ন করবে সেটা নিশ্চয়ই আপনারা অনুমান করতে পেরেছেন। ও প্রথমেই জানতে চাইল, এই অকেজো ফ্রিজটা আমি কোন জাহান্নম থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছি।

আমিও মিনমিন করে জবাব দিয়েছি, সস্তায় পেয়ে গেলাম, তাই—মানে...।

ও ঠোঁট-মুখ বেঁকিয়ে বলল, ওঃ, সেই বিয়ের আগে থেকেই তোমার এইরকম ভিখিরি মেন্টালিটি। সবসময়েই হাত পেতে ঘুরঘুর করছ।

বুঝলাম, ও সেই একযুগ আগের প্লেনভাড়ার ব্যাপারটা আমাকে মনে করিয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু আমি কোনও জবাব দিলাম না। কারণ, আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই চিত্রা—অথবা, বলা ভালো চিত্রার মৃতদেহ—রওনা দেবে হাইপারস্পেস না কী যেন—সেই জাহান্নামের পথে। যেখানে মা-কালীর কোলে আমার বউ চিত্রা

ডাকিনী-যোগিনী সেজে বসে থাকবে।

এরপর স্বাভাবিকভাবেই চিত্রার কথা বলার হার মারাত্মক রকমের বেড়ে গেল। আমি বেশ শান্তভাবেই ওকে বললাম যে, এই আলমারিতে আমার ছবি আঁকার সরঞ্জাম থাকবে, আর টুকটাক জিনিস থাকবে। তারপর মনে-মনে বললাম, আর থাকবে তোমার মৃতদেহ।

দেরি করতে চাইনি আমি। তাই সেদিন রাতেই চিত্রা যখন অচেতন ঘুমে নিঃঝুম তখন ওর গলা টিপে ধরলাম। বিশ্বাস করুন, গলা টেপার সময়ে হাসি পাচ্ছিল আমার। এই কি সেই গলা, যে-পথ বেয়ে গত বারোবছর তিন মাসে অন্তত সাড়ে সতেরো কোটি কথা বেরিয়ে এসেছে! কী ভয়ংকর অপশক্তিই না লুকিয়ে রয়েছে এই দানবীর ভোকাল কর্ডে! আমার হাত শিল্পীর হাত। কিন্তু খুনও বোধহয় এক শিল্পকলা। নইলে কী করে অমন শক্তি দিয়ে আমি চেপে ধরতে পারলাম চিত্রার গলা!

কিছুক্ষণ দাপাদাপি করল ও। চোখ খুলে নাইট ল্যাম্পের আলোয় বোধহয় চিনতে পারল ওর আততায়ীকে। ওর পায়ের ঝাপটায় মশারির একটা কোণের বাঁধন ছিঁড়ে গেল। কিন্তু একটু পরেই সব ছটফটানি শেষ। খেল খতম।

মনে হল আমি যেন পাখির মতো ডানা মেলে ভেসে পড়েছি আকাশে। আমার স্বাধীন ডানায় কারও শাসনের ছাপ নেই। ক্রীতদাসের শেকল ছিঁড়ে গেছে চিরতরে।

স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে বাকি কাজগুলো সেরে ফেললাম আমি। চিত্রার মৃতদেহটা টেনে নিয়ে গেল্াম টাইম লকারের কাছে। তারপর কোনওরকমে ঠেলেঠুলে গুঁজে দিলাম ভেতরে। ওর 'দ' হয়ে বসে থাকা দেহটা দেখে মনে হল ওটা আমার গত বারোবছর তিনমাস বিবাহিত জীবনের প্রতীক। তবে ওর মুখের কঠিন রেখাগুলো এখন ততটা স্পষ্ট নয়। বরং চিত্রাকে এখন অনেক নিরীহ মনে হচ্ছে। শুধু মুখে একটা বিস্ময়ের ছাপ। হবেই তো। আচমকা গলা টিপে ধরেছিলাম যে!

আলমারি খুঁজে বের করে নিলাম ওর গোটাপাঁচেক প্রিয় শাড়ি-ব্লাউজ। তার সঙ্গে যোগ হল একজোড়া শৌখিন জুতো, টুথব্রাশ, স্নো-পাউডার, লিপস্টিক, ময়েশ্চারাইজার, আর কিছু মেয়েলি জিনিস। সেগুলো একে-একে ভরে দিলাম টাইম লকারে। তারপর অনুতোষের নির্দেশ মতো ডায়াল ঘুরিয়ে বোতাম টিপে দিলাম।

এর কারণ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আমার ফ্ল্যাট থেকে শুধু চিত্রা উধাও হয়ে গেলেই তো হবে না। তার সঙ্গে এই শাড়ি, জামাকাপড়, প্রসাধনের জিনিসও উধাও হওয়া দরকার। কারণ, কাল সকালেই আমি আমার সুইট ডার্লিং শ্বশুরমশায়কে টেলিফোনে জানিয়ে দেব যে, চিত্রা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে জানি না।

এই একই কথা বলব পাড়াপড়শিকে এবং পুলিশকে। তার পরই পুলিশ শুরু করে দেবে তাদের চুলচেরা অনুসন্ধানের কাজ।

যা ভেবেছিলাম তাই হল। শ্বশুরমশায় এবং পুলিশ—এই দু-তরফের জেরায়-জেরায় জেরবার হয়ে গেলাম আমি। কিন্তু একটুও ভেঙে পড়লাম না। কারণ, গতকাল রাতেই টাইম লকারের বোতাম টিপে দরজা খুলে দেখে নিয়েছি লকার খালি। সেখানে চিত্রার মৃতদেহ নেই, শাড়ি-ব্লাউজ নেই, স্নো-পাউডার নেই, কিচ্ছু নেই। অনুতোষ আমাকে হাতেনাতে দেখিয়ে দিয়েছিল টাইম লকারের মাহাত্ম্য। কিন্তু তবুও যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। অনেকবার হাত বোলালাম টাইম লকারের ভেতরে। আঙুলের ডগায় শুধু ঠান্ডা ধাতুর পাতের ছোঁওয়া। চিত্রা ইত্যাদি সত্যিই মিলিয়ে গেছে হাইপারস্পেসে।

সুতরাং একটুও ভেঙে পড়িনি আমি। পুলিশি জেরা চলল সারাদিন ধরে। সম্ভব-অসম্ভব নানান প্রশ্ন করল ওরা। সব প্রশ্নের উত্তরই যে ঠিকঠাক দিতে পারছিলাম তা নয়। বেশ কয়েক জায়গায় ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল। আমার শ্বশুর পাইপ টানতে-টানতে পায়চারি করছিলেন ঘরে। যেন খুব কঠিন কোনও সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমাধানের পথ খুঁজছেন স্বয়ং পুলিশ কমিশনার। আর সাদা পোশাকের দুজন অফিসার তন্নতন্ন করে সার্চ করছিল আমার ফ্ল্যাট। ইউনিফর্ম পরা দুজন কনস্টেবল ফ্ল্যাটের দরজায় পাহারায় দাঁড়িয়ে।

চিত্রার মৃতদেহ উধাও হওয়ার পর টাইম লকারের ভেতরে টুকিটাকি কিছু জিনিস সাজিয়ে রেখেছিলাম কাল রাতেই—কয়েকটা তুলি, প্যালেট, বোর্ডপিন, আর কাপ-প্লেট। পুলিশ অফিসাররা সেগুলোও খুঁটিয়ে দেখল। লকারের গায়ের ছোট ডায়াল আর বোতামটা দেখিয়ে প্রশ্ন করল আমাকে, এগুলো কী?

আমি নির্বিকারভাবে জবাব দিলাম, কী জানি না। মান্ধাতার আমলের পুরোনো ফ্রিজ। আমি স্রেফ আলমারি হিসেবে ব্যবহার করব বলে জলের দরে কিনেছি। তারপর রংচং করে নিয়েছি—।

সুতরাং পুলিশের যাবতীয় তৎপরতার ফলাফল অশ্বডিম্ব। কিন্তু চলে যাওয়ার সময় আমার ডার্লিং শ্বশুর যেভাবে আমার দিকে তাকালেন তাতে বুঝলাম, উনি সহজে আমাকে ছেড়ে দেবেন না। কারণ, আর কেউ না জানুক উনি জানেন, চিত্রা কখনও অন্য কোনও পুরুষকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেনি। স্বামী হিসেবে আমাকে ওর খুব পছন্দ ছিল। এরকম ক্রীতদাস স্বামী যে সহজে পাওয়া যায় না!

আমার শ্বশুরের টাকাপয়সা অঢেল। ফলে নিষ্ফল তদন্ত করে-করে পুলিশ যদি ঝিমিয়ে পড়ে তা হলে তাদের চাঙ্গা করে তোলার দাওয়াই তাঁর জানা আছে। তাই মনে হয়, পুলিশ খুব সহজে চিত্রা অন্তর্ধান রহস্যের তদন্তে ক্ষান্তি দেবে না।

দেখা গেল, আমার কথাই ঠিক। দিনের পর দিন পুলিশ আমাকে বিরক্ত

করে চলল। দু-চার দিন বাদেবাদেই তারা নতুন-নতুন প্রশ্ন নিয়ে হাজির হতে লাগল। আর আমার হাসি পাচ্ছিল। একটা মৃতদেহের এত দাম! মৃতদেহ খুঁজে না পাওয়া গেলে পুলিশ সত্যি কত অসহায়!

যতই দিন যেতে লাগল পুলিশের প্রশ্নের সংখ্যা কমে আসতে লাগল। আমার শ্বশুরের কপালে এখন দুশ্চিন্তার বলিরেখা। মুখের সেই প্রতিজ্ঞার ছাপ কোথায় মিলিয়ে গেছে। দুনিয়ার আত্মীয়স্বজনের কাছে খোঁজ করেও চিত্রার হদিস পাননি উনি। এমন কী চিত্রা বিদেশে পাড়ি দিতে পারে এই সম্ভাবনার কথা ভেবে চিত্রার ফটো নিয়ে এয়ারপোর্টেও খোঁজ করেছে পুলিশ। কিন্তু সেখানেও হতাশা।

এইভাবে, বুঝলেন, যখন প্রায় একমাস কেটে গেছে, তখন একদিন সন্ধেবেলা আমার ডার্লিং এল আমার ফ্ল্যাটে। সঙ্গে সাদা পোশাকের স্বাস্থ্যবান একজন লোক। লোকটাকে আগে দেখিনি, তবে তার চোখের চাউনি আর চোয়ালের রেখা স্পষ্ট বলে দিল, সে পুলিশের লোক।

আমরা সোফায় বসে কথা বলছিলাম। পুলিশের লোকটা আমার হাত ধরে দুঃখপ্রকাশ করল। বলল, এতদিন ধরে আমরা অকারণে আপনাকে ট্রাব্‌ল দিয়েছি, কিছু মনে করবেন না।

শ্বশুরমশায়ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, চিত্রার জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে। ও বড় জেদি মেয়ে। কে জানে অভিমান করে কোথায় চলে গেছে। দেখো, আমার মন বলছে, ও আবার একদিন তোমার কাছে ফিরে আসবে। তোমাকে সন্দেহ করেছিলাম বলে কিছু মনে কোরো না।

ওদের অনুতাপ আমাকে খুশি করল। এতদিনের শত্রুতার ভাবটা সরে গেল মন থেকে। আমার চোখের সামনে এখন একজন অসহায় পিতা আর একজন ব্যর্থ পুলিশ অফিসার। এতদিন ওদের জন্যে আতিথেয়তার ছিটেফোঁটাও করিনি। আজ, এখন, চায়ের অনুরোধ করলাম।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে সাধারণ কথাবার্তা হচ্ছিল। আমি আমার চিত্রাহীন নিঃসঙ্গ জীবনের কথা বলছিলাম। আমার শ্বশুরমশায় মাঝে-মাঝেই সহানুভূতি দেখাচ্ছিলেন।

হঠাৎই যে আমার কী হল কে জানে! সোফা ছেড়ে সটান উঠে চলে গেলাম টাইম লকারের কাছে। ওটার গায়ে চাপড় মেরে বললাম, এই পুরোনো বাচ্চা আলমারিটা চিত্রার ভীষণ পছন্দ হয়েছিল, জানেন। ও বলছিল, যদি ও সারাটা জীবন এতটুকু পুঁচকে একটা আলমারির ভেতরে কাটাতে পারত তা হলে বেশ হত।

বুঝতেই পারছেন, অহঙ্কার, স্রেফ অহঙ্কার। খুন করে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে মেডেল গলায় ঝুলিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা তো কম কথা নয়! সুতরাং সেই অহঙ্কারের বশেই লকারের দরজাটা একটানে খুলে ফেললাম আমি। টুকিটাকি জিনিসে

সাজানো ছিমছাম ভেতরটা দেখিয়ে ওদের বললাম, কী সুন্দর, না!

আর তখনই বেখাপ্পা ব্যাপারটা নজরে পড়ল আমার। এটা এল কোথা থেকে? একটা চিনেমাটির প্লেট, তার ওপরে একটা কাপ। কাপে লালচে মতন তলানি রয়েছে খানিকটা। আর সেই কাপ-প্লেটের পাশে রাখা একটা কাপ কাত হয়ে পড়ে গেছে।

বুঝতে পেরেছেন কি ব্যাপারটা? পারেননি? কী করে পারবেন! আমারই যে বুঝে উঠতে অনেকটা সময় লেগেছিল। তারপর বুঝতে পারলাম, এটা হল অনুতোষের সেই কাপ-প্লেট—টাইম লকারের মাহাত্ম্য বোঝানোর জন্যে যে-কাপ-প্লেট লকারের ভেতরে রেখে উধাও করে দিয়েছিল অনুতোষ। এতদিন পর আচমকাই সেই কাপ-প্লেট ফিরে এসেছে হাইপারস্পেস থেকে। এখন মনে পড়ছে, অনুতোষ বলেছিল, ওর যন্ত্রটা এখনও গবেষণা স্তরে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত যেরকম চেয়েছিল সেরকমটা হয়নি। সেইজন্যেই কি টাইম লকারে রেখে উধাও করে দেওয়া জিনিস কিছুদিন পর খেয়ালখুশি মতো ফিরে আসে হাইপারস্পেস থেকে!

আমার কপালে ঘামের ফোঁটা, মাথা ঝিমঝিম করছে। চোখে কি ঝাপসা দেখছি সবকিছু? কোনওরকমে টাইম লকারের দরজা বন্ধ করে দিলাম। তারপর দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার শ্বশুরমশায় আর অফিসার ভদ্রলোক সোফা ছেড়ে উঠে পড়ছে না কেন? ওদের চা খাওয়া কি এখনও শেষ হয়নি?

ঠিক তখনই টুকিটাকি জিনিস পড়ে যাওয়ার শব্দ হল লকারের ভেতরে। আর একটা বীভৎস উৎকট দুর্গন্ধে ভরে উঠল গোটা ঘরটা। একমাসের বাসী মৃতদেহের দুর্গন্ধ।

সঙ্গে-সঙ্গে চায়ের কাপে চুমুক দেওয়া থামিয়ে দু-জোড়া তীব্র চোখ তাকাল টাইম লকারের দিকে। পুলিশ অফিসারটি উঠে পড়ল সোফা ছেড়ে। এগিয়ে গেল লকারের দিকে।

আমি জানি, টাইম লকারের দরজা খুললে এখন কী চোখে পড়বে।

মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার ঠিক আগে আমার মনে হল, চিত্রাই জিতে গেল শেষ পর্যন্ত। আমাকে শায়েস্তা করতে ও হাইপারস্পেস থেকেও ফিরে এসেছে।



জীবনের সুর

পৃথিবীর হিসেবে প্রায় দু-বছর পরে স্পেসভিউতে অলককে দেখল তনুজা। হলোগ্রাফিক পদ্ধতিতে তৈরি করা অলকের প্রতিবিম্ব যেন মায়া নয়—বাস্তব। দেখে মনেই হয় না, আসল মানুষটা রয়েছে তিন লক্ষ চুরাশি হাজার চারশো কিলোমিটার দূরে—চাঁদে। চন্দ্রনগরীর স্থাপত্যের কাজে অলক সরকারি দায়িত্ব নিয়ে রওনা হয়েছিল দু-বছর আগে। তারপর একটানা দু-বছর মানুষটার কোনও দেখা নেই, কোনও কথা নেই। শুধু কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে স্বামীর সংক্ষিপ্ত খবর এসে পৌঁছেছে তনুজার কাছে ঃ 'আপনার স্বামী অলক দত্ত ভালো আছেন।' সরকারের ছক-বাঁধা নিয়মকানুনের সিলমোহর যেন লাগানো রয়েছে এই সংক্ষিপ্ততম সংবাদের প্রতিটি শব্দে। কিন্তু নিয়ম না মেনে তনুজার উপায় নেই। তাই বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে ও শুধু অপেক্ষা করেছে। দিন গুনেছে, ঘণ্টা গুনেছে, মিনিট গুনেছে। তারপর গত সপ্তাহেই নতুন খবর এসেছে ঃ স্থাপত্যের কাজে অলক দত্তের দায়িত্ব শেষ, সে ফিরে আসছে সাতদিন পরে।

চন্দ্রনগরী নির্মাণ নিয়ে কেন যে এত গোপনীয়তা বা নিয়মের কড়াকড়ি তা জানে না তনুজা। সে নিয়ে ওর কোনও মাথাব্যথাও নেই। ওর চিন্তা শুধু অলককে নিয়ে। বিয়ের পর স্বামীকে মাত্র ছ'টা মাস ও কাছে পেয়েছে, ভালোবাসতে পেরেছে—তারপরই সে দিয়েছে চাঁদে পাড়ি। নিরুপায় অলক যাওয়ার সময়ে শুধু বলে গিয়েছিল, ডার্লিং, দেখবে কয়েকটা মাস হুউস করে কেটে যাবে। তারপর এসে তোমাকে চাঁদের

গল্প শোনাব—চাঁদের আলোয় বাগানে বসে। তারপর...।

স্পেসভিউতে অনেক কথা বলল অলক, কিন্তু তনুজার কিচ্ছু কানে ঢুকছিল না। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল, ছুটে গিয়ে 'সত্যিকারের প্রতিবিম্ব'টাকে জড়িয়ে ধরে প্রচণ্ড আবেগে কয়েকটা চুমু খায়, আদরে-আদরে অস্থির করে তোলে, ওর বুকে দমাদম কিল মেরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, তারপর...।

অলককে আগের মতোই সুন্দর দেখাচ্ছিল। তনুজা শুধু বলল, তুমি এক্ষুনি আমার কাছে ফিরে এসো।

বলেই স্পেসভিউর কানেকশান কেটে দিল।

তার পরদিনই বাড়িতে এসে হাজির হল অলক।

হোভার-মোবিল বাড়ির কাছে এসে থামল। গাড়ি থেকে নামল অলক। তারপর রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম টিপে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় গাড়িটাকে ফেরত পাঠিয়ে দিল।

বাড়ির দরজার মুখোমুখি হয়ে আবার রিমোট কন্ট্রোল ইউনিটের বোতাম টিপল অলক। দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল। অলক বাড়িতে ঢুকল। তারপর দেখতে পেল তনুজাকে। ও দু-হাত বাড়িয়ে ডাকল, তনু! আমি এসে গেছি।

তনুজা যেন হাওয়ায় ভেসে ছুটে এল অলকের কাছে। দু-হাতে আঁকড়ে ধরল ওকে। অলক! আমার অলক!

অলকের বুকে মাথা রেখেই প্রথম একটা অচেনা অস্বস্তি টের পেল তনুজা। কেমন যেন আড়ষ্ট লাগছে অলককে। ওর বাহুডোরে যেন সেই আবেগ, সেই জোর আর নেই। তনুজা মুখ তুলে স্বামীকে দেখল। না, ওর মুখে সত্যিই রয়েছে বহুদিন পরে প্রিয়জনের কাছে ফিরে আসার তৃপ্তি, প্রিয়জন মিলনের আকাঙক্ষা।

তনুজা নতুন অস্বস্তিটা প্রকাশ করল না। গোপন করে রাখল বুকের মধ্যে। এমনটা বিশ্বাস করা খুব কষ্ট যে, চন্দ্রনগরীতে গিয়ে অলক দ্বিতীয় কোনও তরুণীর প্রেমে পড়েছে।

কিন্তু প্রতিদিন অস্বস্তির মাত্রা বাড়তেই থাকল। অলকের হাঁটা-চলা, শোওয়া-বসা সবই কেমন যেন অদ্ভুত। তা ছাড়া এই দুধ খেতে গিয়ে গ্লাস ভাঙছে, নয়তো চায়ের কাপ খসে পড়ছে হাত থেকে, কিংবা চলতে গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে চেয়ার-টেবিলে।

তনুজা বিরক্ত হয়ে একদিন বলেই ফেলল, তোমার কী হয়েছে বলো তো?

ওরা ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল। অলক কাপটাকে দু-হাতে আঁকড়ে ধরে মুখ নামিয়ে একটু-একটু করে অতি সাবধানে চা খাচ্ছিল। ওর খাওয়ার ভঙ্গি দেখে ভীষণ বিরক্ত হল তনুজা। শুধু চায়ের কাপ নয়, তনুজাকে ধরার সময়েও অলকের একইরকম আতঙ্ক থাকে—এই বোধহয় বাঁধন ঢিলে হয়ে খসে পড়ে যাবে তনুজা।

তনুজার কথায় অলক চোখ নামাল। কী বলবে? এভাবে বাড়িতে ফিরে আসাটা

ওর ঠিক হয়নি। হেডকোয়ার্টারে ওর জানানো উচিত। কিন্তু অলকের কথা শুনলে ওরা কি হাসাহাসি করবে না?

অলক বলল, আমার একরকম অসুখ করেছে, তনু—।

কী অসুখ? বলো তো ডাক্তারবাবুকে...।

না, না, তার দরকার নেই। সেরকম কিছু নয়।

তনুজার অদ্ভুত লাগল। এই মানুষটা দুটো বছরে এরকম বিচিত্রভাবে পালটে গেল! যখন-তখন জিনিসপত্র ভাঙছে, ঠিকমতো হাঁটা-চলা করতে পারছে না, এমনকী নতুন বিয়ে করা বউকে ঠিকঠাক আদর পর্যন্ত করতে পারছে না—অথচ বলছে, সেরকম কিছু নয়!

আশ্চর্য!

তনুজার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। বুকের মধ্যে পীড়নের যন্ত্রণা। এ কোন অলক ফিরে এল চন্দ্রনগরী থেকে! এই অদ্ভুত মানুষটাকে নিয়ে একটা মসৃণ দাম্পত্য জীবন কি ভাবা যায়?

যতই সহ্য করছিল ততই বাষ্প জমছিল তনুজার মনে। চাপ বাড়ছিল ক্রমশ। অবশেষে একদিন সন্ধের মুখে অলক একটা ফুলকাটা কাচের ফুলদানি ভেঙে ফেলতেই তনুজা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। একেবারে ফেটে পড়ল।

বিয়ের ঠিক পরে-পরেই একটা কিউরিয়ো শপ থেকে আড়াইশো বছরের পুরোনো একজোড়া কাচের ফুলদানি কিনেছিল তনুজা। চিনদেশে তৈরি জিনিসটার গড়ন, রং ও কারুকাজ সত্যিই মুগ্ধ করার মতো। তনুজার ভীষণ কাচের ফুলদানির শখ। বাড়িতে নানারকম মাপের, গড়নের আর রঙের ফুলদানি রয়েছে। সবই তনুজার কালেকশান। সারি-সারি সুন্দর করে ওগুলো সাজানো রয়েছে তাকে। সেখানেই ছিল এই চিনে ফুলদানি জোড়া। অলক যে কী করতে ওখানে হাত দিতে গিয়েছিল কে জানে। ওর কোন এক অসর্তক মুহূর্তে তারই একটা মাটিতে পড়ে চুরমার। একেবারে টুকরো-টুকরো।

রাগে অন্ধ হয়ে তনুজা যে ঠিক কী-কী বলেছে ওর খেয়াল নেই। এটুকু বুঝতে পেরেছে যে, কথাগুলো বলার সময়ে ওর কোনও জ্ঞানগম্যি ছিল না। প্রিয় ফুলদানি চুরমার হয়ে যেতে ওর সংযম আর ধৈর্যের বাঁধও বোধহয় চুরমার হয়ে গিয়েছিল।

তনুজা যখন থামল তখন অলক দু-হাতে মুখ ঢেকে একটা সোফায় বসে পড়েছে। যেন একটা জড় পদার্থ বসে আছে—ভাঙাচোরা, নিষ্প্রাণ।

তনুজা বুঝতে পারল অলক কাঁদছে। ওর শরীরটা ফুলে-ফুলে উঠছে। শোনা যাচ্ছে অবরুদ্ধ ফোঁপানি।

তনুজা মরমে মরে গেল যেন। ওর সংবিৎ ফিরে এল। সত্যিই তো! চিনে ফুলদানির চেয়ে অলক ওর কাছে অনেক বেশি প্রিয়!

অলকের কাছে এগিয়ে গেল তনুজা। সোফার হাতলে বসে অলকের পিঠে

হাত রাখল। তারপর ওর মাথাটা টেনে নিল বুকে।

অলক! অলক!

অলক তনুজার শরীর আঁকড়ে ধরতে চাইল। ভারী গলায় বলল, আমি আর সইতে পারছি না, তনু!

তনুজা কোনওরকমে বলল, কিছু মনে কোরো না, সোনা। আমার ভুল হয়ে গেছে।

অলক চোখ মুছে মুখ তুলে তাকাল। বলল, ভুল তোমার নয়—আমার। কারণ, গ্র্যাভিটির ব্যাপারটা আমি হিসেবের মধ্যে ধরিনি।

গ্র্যাভিটি? মাধ্যাকর্ষণ?—তনুজা অবাক হয়ে অলককে দেখল।

হ্যাঁ, চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ।—অলক তনুজার শরীরে মিশে যেতে চাইল। বলল, চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর প্রায় ছ'ভাগের এক ভাগ, তনু। আর সেই কম মাধ্যাকর্ষণের জগতে দু-দুটো বছর কাটিয়ে এসেছি আমি। তারপর ফিরে এসেছি জন্মভূমিতে—যে জন্মভূমির টান চাঁদের ছ'গুণ। মাধ্যাকর্ষণ কেন আছে আমরা এখনও জানি না। একে চোখে দেখতে পাই না, একে রুখতে পারি না, শুধু অসহায়ভাবে অনুভব করতে পারি। তাই পৃথিবীতে ফিরে এসে আর সবকিছু আবার খুব চেনা লাগলেও, মাধ্যাকর্ষণ যেন অচেনা হয়ে গেছে! তাই চাঁদের অভ্যেস থেকে পৃথিবীর অভ্যেসে আমি সহজে ফিরতে পারছি না। এখানে আমার হাঁটা-চলা, কথা বলা, এমনকী তোমাকে আদর করা পর্যন্ত ভীষণ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার উচিত ছিল, হেডকোয়ার্টারে মাসখানেক কাটিয়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান রপ্ত করে তার পরে তোমার কাছে ফিরে আসা।

অলককে নিজের আরও কাছে টেনে নিল তনুজা। ভাবল এই অদৃশ্য মৌলিক আকর্ষণের কথা। জন্মমুহূর্ত কিংবা তারও আগে থেকে কোনও ভ্রূণ অথবা শিশু এই আকর্ষণ অনুভব করে। তারপর তার পরিমণ্ডলেই বেড়ে ওঠে। মাধ্যাকর্ষণ তার রক্তের অণু-পরমাণুতে মিশে যায়। এর শিকড় অনেক-অনেক গভীরে।

তনুজা অলকের চোখের জল মুছিয়ে দিল। বেচারা অলক! চন্দ্রনগরী স্থাপন করতে গিয়ে ও জন্মভূমির টান ভুলে বসে আছে।

তনুজা বলল, কী বলছ তুমি! এতদিন পর আমার কাছে ছাড়া আর কোথায় তুমি ফিরবে! আর ক'টা দিন। তারপরই আবার সবকিছু আগের মতো সহজ সরল হয়ে যাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

অলকের মুখে হাসির হালকা রেখা ফুটে উঠল। বলল, সত্যি তনু?

তনুজা বলল, সত্যি।

ওদের সুখের আকর্ষণের বাঁধনে মাধ্যাকর্ষণ যে চিড় ধরিয়েছিল তা জোড়া লেগে যাবে ধীরে-ধীরে। যতই হোক, পৃথিবীর টান যে চাঁদের ছ'গুণ।



বুকের ভেতরে

তিরি আমাকে এক ধাক্কা মারল। ওর হাত নাড়া দেখে মনে হবে যেন মাছি তাড়াচ্ছে, কিন্তু যে-প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ধাক্কাটা আমার বুকে এসে লাগল তাতে মনে হল যেন, হাত নয়, ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিন।

আমি ছিটকে পড়ে গেলাম পেছনে। পড়তে-পড়তেই শুনলাম, দেওয়ালের কোণে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো সুমিতা এক ভয়ংকর চিৎকার করে উঠেছে।

একটা ফাইবার গ্লাসের চেয়ার আমার শরীরের ধাক্কায় কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল। সেটা ধরে ওঠার চেষ্টা করতেই তিরির পাশে দাঁড়ানো লোকটা চকিতে ছিটকে এল কাছে। ইস্পাতের পাতে মোড়া বুটের গুঁতো মারল আমার পেটে। চোখের সামনে হাজারটা নক্ষত্র ঝলসে উঠে অলৌকিক সুপারনোভা ঘটে গেল। পাঁচকোনা ঘরের ফাইবার গ্লাসের দেওয়ালগুলো নাগরদোলার মতো বনবন করে ঘুরপাক খেতে লাগল। আর তারই মধ্যে সুমিতা একের পর এক চিৎকার করে চলল। মনে হচ্ছিল, ঘুরপাক খাওয়া নাগরদোলাটা কখনও বুঝি থামবে না। আর সুমিতার চিৎকারও বোধহয় তাই।

'এখনও বলে দাও, ওরা কোথায় লুকিয়ে রয়েছে।'

তিরির রুক্ষ স্বরের প্রশ্নটা যেন সুদীর্ঘ এক টানেলের মধ্যে দিয়ে পৌঁছে গেল আমার কানে। অদ্ভুতভাবে প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল বারবার ঃ '...কোথায় লুকিয়ে

রয়েছে? কোথায় লুকিয়ে রয়েছে? কোথায়...।'

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে নিলাম কয়েকবার। হঠাৎই সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। কারা কোথায় লুকিয়ে রয়েছে? আমি তার কী জানি? সুমিতাই বা এখানে কী করছে?

আমার বুকে যে-লোকটা গুঁতো মেরেছিল তার মনে বোধহয় দয়া হল। ঝুঁকে পড়ে অনায়াসে চেপে ধরল আমার বাঁ-হাত। তারপর তার চেয়েও অনায়াসে এক ঝটকায় খাড়া করে দিল আমাকে। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'রুদ্রপ্রসাদ চৌধুরি, বীরত্ব দেখিয়ে কোনও লাভ নেই। এই ঘরে তোমাদের অনেক ইয়ার-দোস্ত বহু বীরত্ব দেখিয়ে গেছে। সেসব বীরত্বের এঁটোকাঁটা এখন যেখান-সেখানে ছত্রখান হয়ে পড়ে আছে।' একটু থেমে আবার বলল, 'আমরা কাজ শুরু করলে শেষ না করে থামি না—।'

তিরি আমার কাছে সরে এল। আলতো ধাক্কায় আমাকে ঠেলে বসিয়ে দিল একটা চেয়ারে। তারপর আমার মুখের কাছে মুখ এনে জিগ্যেস করল, 'চৌধুরি, সত্যি করে বলো তো, এইরকম জেদের কোনও মানে হয়? কেন বেকার গোঁ ধরে বসে আছ?'

আমি জোর-জোরে শ্বাস নিলাম। বুকের ভেতরে কষ্ট হচ্ছিল। জিভটা বুলিয়ে নিলাম ঠোঁটের ওপর। সত্যিই কি আমি ছেলেমানুষি গোঁ ধরে বসে আছি? একটু পরেই কি আমার বীরত্বের এঁটোকাঁটা এই ঘরের মেঝেতে নয়ছয় হয়ে পড়ে থাকবে? সুমিতার দিকে একবার দেখলাম। চিৎকার থেমে গেছে, তবে চোখ-মুখ ফোলা, চোখে জল, শরীরটা ফুলে-ফুলে উঠছে। ওর সহ্যশক্তি এত কম তা আগে কখনও বুঝতে পারিনি। ও আমার সঙ্গে সিকিওরিটি কন্ট্রোল ডিভিশনে কাজ করছে আজ প্রায় বারোবছর। কিন্তু তা সত্ত্বেও নমনীয় রয়ে গেছে।

তিরি সোজা হয়ে দাঁড়াল। ডাকল, 'ইকা, চৌধুরিকে একটু জল দাও। ওর এখন জলের দরকার।' তারপর হেসে বলল, 'আর যদি শেষ পর্যন্ত মুখ না-ই খোলে তাহলে শান্তিজলের দরকার পড়বে।'

ঘরে আমরা মোট পাঁচজন। পঞ্চম লোকটির নামই বোধহয় 'ইকা'। কারণ তিরির কথায় সে নড়ে উঠল। এতক্ষণ সুমিতার কাছাকাছি একটা টেবিলে ভর দিয়ে বসেছিল। চোখের চাউনি চতুর। বেশ মনোযোগ দিয়ে এতক্ষণ ধরে ঘরের কর্মকাণ্ড দেখেছে, কিন্তু কোনও কথা বলেনি। এখন, ফাইবার গ্লাসের একটা গ্লাস হাতে আমার দিকে এগিয়ে আসতে-আসতে বলল, 'তিরি, এবার ছেলেটাকে ছেড়ে মেয়েটাকে ধরো, মনে হয় তাড়াতাড়ি কাজ হবে।'

তিরি ধীরে-ধীরে মাথা দোলাল। বলল, 'কথাটা এমনিতে ঠিকই, তবে এখানে লাভ নেই। ওই টানেলের ম্যাপ শুধু চৌধুরিই জানে। এই লোকটা—এর মাথার ভেতরেই রয়েছে খবরটা—' আমার মাথায় আঙুলের কয়েকটা টোকা মারল তিরি : 'সেটা যে করে হোক আমাদের বের করতে হবে।'

আমার পাঁজরায় তীব্র ব্যথা। মাথা ঝিমঝিম করছে—যেন মাথার ভেতরে অসংখ্য উলের বল গুঁজে দিয়েছে কেউ। কতক্ষণ এই অত্যাচার চলবে কে জানে! চলুক। যে করেই হোক মুখ বন্ধ করে থাকতে হবে আমাকে। কারণ, শুধু আমার ওপরেই নির্ভর করছে একশো শিশুর ভবিষ্যৎ—মানবজাতির ভবিষ্যৎ।

বাড়িয়ে দেওয়া জলের গ্লাসটা কোনওরকমে মুঠোয় ধরে ঢকঢক করে জলটা খেয়ে নিলাম। খালি গ্লাসটা খসে পড়ল আমার দুর্বল হাত থেকে। ফাইবার গ্লাসের সঙ্গে ফাইবার গ্লাসের ঠোকাঠুকির শব্দ হল কয়েকবার।

সুমিতা আমার কাছে এগিয়ে এল এবার। তিরি সরে গেল একপাশে। ইকাও পাশ দিল সুমিতাকে। ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে আশার ছোঁয়া দেখতে পেলাম। সুমিতা হয়তো পারবে আমার মুখ খোলাতে। অন্তত ওরা তাই ভাবছে।

শ্যামলা রং। টানা-টানা ভুরু। দীর্ঘ চোখ। ধারালো নাক। চোয়ালের রেখা স্পষ্ট। মাথার ঘন চুল ঢলে পড়েছে গালে, চোয়ালের রেখাকে কিছুটা তরল করে তুলেছে। ওর বাঁ-কানের খুব কাছে একটা বড় তিল আছে। এখন চুলের আড়াল থাকায় দেখা যাচ্ছে না।

এই হল সুমিতা।

প্রায় বারোবছর আমরা কাছাকাছি কাজ করেছি। একসঙ্গে হেঁটেছি অনেক পথ। প্রথমে ও ছিল শুধুই সহকর্মী। তারপর বন্ধু। তারপর...।

ওর ঠান্ডা দুটো হাতের চেটো চেপে বসল আমার দু-গালে। ওর হাতে আমার আঁজলা করা মুখ। সুমি—সুমিতা। ও কান্না চাপতে পারছিল না। তার চেষ্টাও করছিল না।

'রুদ্র—।'

আমি ওকে দেখলাম ভালো করে। এখন দুর্বল হলে চলবে না। যতটা সম্ভব বেপরোয়া জেদ ফুটিয়ে তুললাম মুখে।

'বলে দাও, রুদ্র। বলে দিলে পরে ওরা আমাদের ছেড়ে দেবে—।'

কথাটা বলে শত্রু তিনজনের দিকে তাকাল সুমিতা। আশ্বাস চাইল।

তিরি নিষ্ঠুর হেসে মাথা ঝোঁকাল দুবার। হ্যাঁ, ছেড়ে দেবে আমাদের। এখন অন্তত তাই বলছে।

ঘরের পাঁচ দেওয়ালে পাঁচটা পোলারয়েড জানলা। সূর্যের তেজ বাড়লে জানলার কাচের রং কালচে হতে থাকে। সামনের জানলা দিয়ে দূরে রুক্ষ প্রান্তর চোখে পড়ছে। আর সেখানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা গাছের কঙ্কাল। পাতা নেই, সবুজ নেই, ক্লোরোফিল নেই।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে আমার শীত করছিল। অথচ টের পাচ্ছি, কপালে ঘাম।

সামনের মসৃণ টেবিলে পড়ে রয়েছে দুটো লেজার অটোমেটিক। আর তার

পাশেই একটা কম্পিউটার টার্মিনাল আর ছোট কন্ট্রোল প্যানেল। কম্পিউটারের মনিটরে সবুজ লেখার হিজিবিজি। প্রকৃতির সব সবুজ কি এখন শুধু কম্পিউটারের পরদাতেই পাওয়া যাবে?

সামনে দাঁড়ানো তিনজন শত্রুকে দেখছিলাম আমি। তিরি, ইকা—তৃতীয়জনের নাম জানি না। জেনে কোনও লাভ নেই। কারণ ওরা তিনজনই সমান হিংস্র, সমান নিষ্ঠুর। আতঙ্ক ওদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

তিনজনের চেহারার মধ্যেও কি কোনও তফাত আছে? বোধহয় না। সেই একইরকম লম্বাটে মুখ, হনু দুটো বড় বেশি রকমের উঁচু, চোখ দুটো যেন ছুরিতে চেরা গর্ত, ভুরু প্রায় নেই, গোঁফ-দাড়িহীন মাকুন্দ মুখ, উঁচু কপালের একেবারে শেষ প্রান্ত থেকে কালো চুলের শুরু—চুলগুলো যেন আঠা দিয়ে মাথার সঙ্গে চেপে সাঁটা। আর সবমিলিয়ে ভাবলেশহীন মুখ কী ভয়ংকর!

ওদের পোশাকও অদ্ভুত। চামড়া আর ধাতুর পাত দিয়ে তৈরি। গায়ের সঙ্গে এমনভাবে চেপে বসে আছে যে, শরীরের শক্তিশালী পেশি দিব্যি জানান দিচ্ছে।

সুমিতা আমাকে আদর করছিল। ওর নরম হাত পরম আত্মীয়ের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার মুখে, গালে, ঠোঁটে, চোখে, মাথার চুলে। আকুল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে নীরব মিনতি জানাচ্ছে ক্রমাগত ঃ বলে দাও, রুদ্র, বলে দাও—।

কী বলে দেব? কিছুই মনে পড়ছে না। সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে, ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে।

'আমার কিছুই মনে পড়ছে না, সুমি—।'

নাম-না-জানা তৃতীয় লোকটা যেন বাতাসে ভেসে ছিটকে চলে এল আমাদের কাছে। বাঁ-হাতের এক ঝটকায় সুমিতাকে ঠেলে দিল। ও প্রায় পাঁচহাত দূরে গিয়ে পড়ল। চিৎকারও বোধহয় একটা করে থাকবে। সেটা আমি ঠিক শুনতে পাইনি, কারণ পরক্ষণেই উগ্র রাগে লোকটা আমার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে শুরু করেছে পাগলের মতো ঃ 'মনে পড়ছে না! ন্যাকা—।'

'সল, কী হচ্ছে!' তিরি এগিয়ে এসে লোকটাকে বাধা দিল।

সল গজগজ করতে-করতে সরে গেল আমার কাছ থেকে। তিরি আলতো করে কয়েকটা থাপ্পড় মারল আমার গালে—যেন আমার চেতনা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছে। তারপর ওর বাঁ-হাতটা তুলে ধরল আমার মুখের কাছে। হাতটাকে থাবার মতো করে আঙুলের নখগুলো দেখাল। ছোট্ট তেকোনা তীক্ষ্ণ নখ—ঈগল পাখির চেয়েও ধারালো। কড়ে আঙুলের নখটা আমার গালের ওপরে বসিয়ে টেনে দিল তিরি, বলল, 'আমি তোমাকে সব মনে করিয়ে দিচ্ছি, চৌধুরি।'

গালে জ্বালা, যন্ত্রণা। গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। বুকের ভেতরেও প্রায় একই অবস্থা। কিন্তু তাও আমাকে যে মুখ বন্ধ করে থাকতেই হবে।

তিরি বলতে শুরু করল।

আমার চোখ বুজে আসছিল অবসাদে। মাথা ঢলে পড়তে চাইছে কাঁধের ওপর। আচ্ছন্ন এক অবস্থার মধ্যে তিরির অলৌকিক ধারাবিবরণী ঢুকে পড়ছিল আমার কানে। অসংখ্য ভোমরা যেন গুনগুন করে চলেছে কানের কাছে।

পৃথিবীতে যে পারমাণবিক যুদ্ধ একটা হবেই সেটা আমরা জানতাম। আমাদের ভয় ছিল, সেই ভয়ংকর মহাযুদ্ধে মানবজাতি হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। শুধু থেকে যাবে প্রাণহীন কলকারখানা, বইপত্র, আর রুক্ষ পৃথিবী। তাই গত সত্তরবছর ধরে ব্যবস্থা নিয়েছি আমরা। মাটির নীচে তৈরি হয়েছে অসংখ্য সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধা। মেঠো ইঁদুর যেমন মাটির নীচে গর্ত করে বাসা বাঁধে। তারপর সুড়ঙ্গের সঙ্গে সুড়ঙ্গ জুড়ে গিয়ে তৈরি হয়ে যায় জটিল ভুলভুলাইয়া। শুধু ইঁদুররাই পথ চিনে চলতে পারে সেই গলিপথে। বিজ্ঞানীরা বহু গবেষণা করেছেন এই সুড়ঙ্গবাসী ইঁদুরদের জীবনযাপন নিয়ে। তারপর তারই অনুকরণে তৈরি করা হয়েছে আমাদের মাটির নীচের জগৎ। সেখানে রাখা হয়েছে একশোজন শিশুকে। পঞ্চাশটি পুরুষ-শিশু, পঞ্চাশটি নারী-শিশু। সুস্থ, সতেজ, সবল। আপাতত তাদের দেখাশোনার কাজে রয়েছে দশজন ধাত্রী-শিক্ষিকা।

সুড়ঙ্গের মধ্যেই তৈরি করা হয়েছে নিরাপদ আস্তানা। সেখানে মজুত রয়েছে কুড়িবছরের ঘন খাবার। রয়েছে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র, বই-খাতা, গবেষণাগার। পারমাণবিক যুদ্ধের কোনওরকম আঁচ পৌঁছবে না সেখানে।

সুতরাং কোনও মহাপ্রলয়ে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ—মানবসভ্যতা—শেষ হয়ে গেলেও মাটির নীচে লুকোনো ওই শিশুরা নতুন করে একদিন গড়ে তুলবে নতুন মানবসভ্যতা। স্তব্ধ কলকারখানাকে ওরা আবার সচল করে তুলবে। আবার সবুজে-সবুজে ভরিয়ে দেবে চারদিক।

মাটির নীচের ওই লুকোনো জগতের খোঁজ পাওয়া নেহাত সহজ নয়। নানা জায়গায় ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে প্রায় একহাজার সুড়ঙ্গের মুখ। এই সুড়ঙ্গের পথ ধরে যদি কেউ নীচে নেমে যায়, তাহলে সে আর ফিরবে না। পথ হারিয়ে শেষ পর্যন্ত খিদে-তেষ্টায় প্রাণ দেবে। সুতরাং এরকম ঝুঁকি কেউ নেবে না। তিরিরাও নেয়নি।

মাত্র বছরদুয়েক হল ওই শিশুরা মাটির নীচে জীবনযাপন শুরু করেছে। ক্রমেই অভ্যস্ত হয়ে উঠছে ওরা। আর আমরা সিকিওরিটি কন্ট্রোল থেকে প্রতিটি মুহূর্তে নজর রেখেছি ওদের ওপর। এমনসময়...।

না, পারমাণবিক যুদ্ধ নয়। কোথা থেকে হাজির হল তিরি, সল আর ইকাদের দল। সবাই বলতে লাগল, ওরা এসেছে অন্য কোনও গ্রহ থেকে। কিন্তু ওদের মহাকাশযানটা আমরা কোথাও খুঁজে পাইনি।

ওরা এসে সব তছনছ করে দিল। ওদের শক্তিশালী মারণাস্ত্র হাজার-হাজার মানুষকে নির্বিচারে খতম করে চলল। ওদের ক্ষমতার কাছে আমাদের সবই অকেজো।

এর মধ্যে যতটুকু জেনেছি, তিরিরা এক অদ্ভুত রাসায়নিক নিষ্কাশন পদ্ধতি নাকি বের করেছে। এই পদ্ধতির সাহায্যে অত্যন্ত কম খরচে ওরা পৃথিবীর মাটি থেকে বের করে নিতে পারছে সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন, ক্যালশিয়াম, আরও কত কী! গাছের পাতা থেকে ওরা বের করে নিচ্ছে হাইড্রোজেন, কার্বন, অক্সিজেন। আর পশুপাখির হাড় থেকে পেয়ে যাচ্ছে ক্যালসিয়াম। পশু বলতে তার মধ্যে মানুষও রয়েছে।

নিষ্কাশিত এই সব পদার্থ ব্যবহার করে আধুনিক উন্নত প্রযুক্তির শিল্পের পত্তন করবে ওরা। মানবসভ্যতাকে পিষে গুঁড়িয়ে খতম করে শুরু হবে উন্নয়নের কাজ। এতে বাধা দেওয়ার কোনও উপায় নেই। বাধা দিতে গিয়ে সিকিওরিটি কন্ট্রোল প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ধ্বংস হয়ে গেছে আমাদের তৈরি বন্ধু যন্ত্রমানব—রোবট ও অ্যান্ড্রয়েড। গত তিনমাস ধরে ক্রমাগত অত্যাচারের পর পৃথিবী এখন আর সবুজ গ্রহ নেই। বরং এখন তার চেহারা বাদামি অথবা লাল।

তিরিদের খতমের খেলা এখনও থামেনি। নানান গোপন তথ্য খুঁচিয়ে বের করার জন্যে কিছু লোককে ওরা এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে। যেমন, পরিত্যক্ত এই সিকিওরিটি বিল্ডিং-এ এখন রয়েছি আমি আর সুমিতা।

তিরির কথায় সব মনে পড়ে যাচ্ছিল আমার। সব।

'...তোমাদের সিকিওরিটি কন্ট্রোলের চিফ ব্রিগেডিয়ার রাজামানি আমাদের হাতে খতম হওয়ার আগে ওই সুড়ঙ্গের কথা বলে গেছে—' দু-আঙুলের চাপে আমার গালের ক্ষতস্থান রগড়ে দিয়ে বলল তিরি, 'এ-ও বলে গেছে, তার লোকেশান ম্যাপ, কো-অর্ডিনেট, সব তোমার জানা। একমাত্র তুমিই জানো।' তিরি হাসল নিষ্ঠুরভাবে। ওর লাল টুকটুকে ঠোঁট সামান্য ফাঁক হল। বলল, 'কোনও লাভ নেই, চৌধুরি। তুমি কানাগলিতে ঢুকে পড়েছ। আর ওই খবর আমাদের জানিয়ে দিলে তোমার লজ্জা পাওয়ারও কিছু নেই। বললাম তো, তোমার চেয়ে অনেক বড়-বড় বীর এই ঘরে অনেক বীরত্ব দেখিয়ে গেছে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল তিরি। সেটা সাপের নিশ্বাসের মতো শোনাল। আর পরক্ষণেই কোমরের বেল্টের কোন অদৃশ্য পকেট থেকে বের করে নিল সরু তীক্ষ্ণ ফলার একটা ছুরি। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় ছুরি ও তিরির মুখ একইরকম দেখাল—হিংস্র নেকড়ের মতো।

তিরি আমার ওপরে ঝুঁকে পড়ে সলকে বলল, 'সল, ভিডিয়োতে সুড়ঙ্গের মুখগুলো একে-একে দেখাতে থাকো।'

সল টেবিলে রাখা ছোট প্যানেলের বোতাম টিপল। সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের একটা দেওয়াল বিশাল ভিডিয়ো পরদা হয়ে গেল। সেখানে ফুটে উঠল পৃথিবীর রঙিন রুক্ষ জমি, আর সুড়ঙ্গের মুখ। প্রতিটা মুখের নির্দিষ্ট নম্বর রয়েছে। এখন যেটা দেখা যাচ্ছে, তার নম্বর একত্রিশ।

ছুরির তীক্ষ্ণ মুখ আমার রগে চেপে ধরল তিরি। বলল, 'চৌধুরি, কোথা থেকে খোদাইয়ের কাজ শুরু করব বলো—।'

সুমিতা কোথা থেকে যেন ছুটে এল আমার কাছে। চিৎকার করে কেঁদে উঠল। হাঁটুগেড়ে বসে মাথা ঘষতে লাগল আমার কোলে। তারপর অবুঝ মেয়েটা জড়ানো গলায় কিছুক্ষণ ধরে কী যে বলল কিছুই বোঝা গেল না।

অবশেষে মেয়েটা মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে। চোখে সেই নীরব মিনতি। ওঃ, অসহ্য!

তিরি একটু সরে দাঁড়িয়েছিল। সেদিকে একবার তাকিয়ে সুমিতা বলল, 'রুদ্র, বলে দাও ওদের। তা হলে ওরা আমাদের ছেড়ে দেবে। লক্ষ্মীটি—' তারপর গলার স্বর প্রায় ফিসফিসের পর্যায়ে নামিয়ে এনে বলল, 'রুদ্র, আমরা তখন তৈরি করব নতুন সভ্যতা। তুমি আর আমি—।'

এত যন্ত্রণার মধ্যেও তেতো হাসি পেল আমার। অবুঝ রমণী! তোমার মা হওয়ার ক্ষমতা আর কতদিন? সাত বছর? আট বছর? তোমার কাছ থেকে মৃত পৃথিবী বড়জোর আটটি শিশু পেতে পারে। যদি তারা সবাই বাঁচে, তা হলে আবার ষোলো থেকে আঠেরোবছর অপেক্ষা। কিন্তু মাটির নীচের ওই শিশুজগৎ? মাত্র পনেরোবছর পরেই ওরা প্রতি বছরে পঁচিশজন করে বাড়বে। এইভাবেই গড়ে উঠবে নতুন মানবসভ্যতা। তা ছাড়া, এখন তিরিদের গোপন খবর বলে দিলেই যে ওরা আমাদের বাঁচতে দেবে তার কোনও মানে নেই। আর, আমি...আমি...।

না, সত্যি কথাটা এবার বলে দেওয়াই ভালো। মন শক্ত করে সেটাই স্পষ্ট গলায় বললাম সুমিতাকে। আমার কথা তিরি, সল আর ইকাও শুনতে পেল। এবং চারজনই চমকে উঠল ভীষণভাবে।

আমি বললাম, 'তুমি ভুল করছ, সুমিতা। আমি মানুষ নই—অ্যান্ড্রয়েড—যন্ত্রমানব। যার শরীর আর চেহারা হুবহু মানুষের মতো কিন্তু চলে ব্যাটারিতে।'

সুমিতা অপার বিস্ময়ে আমাকে দেখতে লাগল। ওর হাত স্পর্শ করল আমার শরীর। পরীক্ষা করতে চাইল আমার রক্ত-মাংস। জানি, পরীক্ষা করে কোনও তফাত টের পাবে না। সেটা ও ভালো করেই জানে। ও অবাক হয়েছে অন্য কারণে। সিকিওরিটি কন্ট্রোলের একজন হোমরাচোমরা কর্তা মানুষ নয়, অ্যান্ড্রয়েড, এই ব্যাপারটাই ও মেনে নিতে পারছে না। আসলে এটাও আমাদের সিকিওরিটির একটা ছক। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র করার জন্যেই এই পরিকল্পনা।

আমি সাধারণ রোবট নই, কারণ তার চেহারা যন্ত্রের মতো। বরং লোকঠকানোর কাজে অ্যান্ড্রয়েড অনেক বেশি সুবিধেজনক। তবে রোবটশাস্ত্রের সব সূত্রই আমরা মেনে চলি। সেইভাবেই তৈরি আমরা। সেটাই যে নিয়ম।

ইকা এগিয়ে এসে সুমিতাকে প্রায় চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গেল দূরে। তিরি আর সল আমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। তিরি ছুরির ফলাটা চেপে ধরল

আমার বাঁ-ভুরুর নীচে। জিগ্যেস করল ঠান্ডা গলায়, 'তুমি তা হলে বলবে না?'

এইবার আমি মন খুলে হাসতে পারলাম। এবার তো ওদের বোঝা উচিত, মানুষের ক্ষতি হয় এমন কোনও গোপন খবর আমি কখনওই ফাঁস করতে পারব না। রোবটশাস্ত্রের প্রথম সূত্র আমাকে বাধা দেবে। আমার পজিট্রনিক ব্রেন তখন আর কাজ করবে না। সুতরাং প্রথম সূত্রটা স্পষ্টভাবে শুনিয়ে দিলাম ওদের ঃ 'রোবট কখনও কোনও মানুষের ক্ষতি করতে পারবে না, অথবা নিষ্ক্রিয় থেকে কোনও মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দেবে না।'

আমি মাথা নাড়লাম আপনমনেই। আমার বাঁ-চোখের ওপরে চামড়া ফুটো হয়ে রক্ত গড়াল। কষ্ট করে তিরির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তিরি, তুমিই বলো, ওই সুড়ঙ্গের হালহদিস জানিয়ে কী করে আমি আগামীদিনের মানবসভ্যতাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিই—।'

সল রুক্ষ গলায় তিরিকে বলল, 'এর চামড়া, রক্ত, মাংস সবই তো মানুষের মতো। অথচ বলছে রোবট, মানে অ্যান্ড্রয়েড। লোকটা ব্লাফ দিচ্ছে না তো?'

তিরি কী যেন ভাবছিল আপনমনে। অনেক অ্যান্ড্রয়েড ওদের হাতে ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু ওরা মানুষ ভেবেই সেগুলোকে ধ্বংস করেছে। এখন আমাকে নিয়ে কী করবে ও?

তিরি বিড়বিড় করে বলল, 'না, ব্লাফ নয়। অ্যান্ড্রয়েডরা জীবকোষ দিয়ে তৈরি। ওরা রোবট হলেও হুবহু মানুষের মতো। শুধু ওই ব্যাটারিটা ছাড়া—।'

আমি বিধ্বস্ত সুমিতাকে দেখছিলাম আর মনে-মনে আওড়াচ্ছিলাম, 'আমি রোবট, আমি অ্যান্ড্রয়েড, প্রথম সূত্র অমান্য করতে পারি না আমি। যত কষ্টই ওরা আমাকে দিক, যত যন্ত্রণাই হোক। রোবট কখনও মানুষের কোনও ক্ষতি করে না। কখনও না।'

ইকা এগিয়ে এল এবার। ওর সঙ্গে সলের চোখাচাখি হল। দুজনে প্রায় একইসঙ্গে বলে উঠল, 'তিরি, তা হলে ওই ব্যাটারিটাই খোঁজা যাক—।'

চোখের পলকে আমাকে শূন্যে তুলে নিল ইকা ও সল। সটান আছড়ে ফেলল ফাইবার গ্লাসের মেঝেতে। তারপর বেপরোয়া হাত চালিয়ে খুলে নিতে লাগল পোশাক-আশাক।

ক্রমশ আমার শীত বাড়তে লাগল। দেওয়ালের পরদায় তখনও রুক্ষ প্রান্তরের ছবি, সুড়ঙ্গের একত্রিশ নম্বর মুখ।

সুমিতার দিকে দেখলাম। ওর চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। এই বারোবছরে একটা রোবটকে ভালোবেসে ফেলেছিল ও! যার হৃদয় প্লাস্টিকের তৈরি! যার চোখের পলক পড়ে শরীরের গভীরে লুকোনো ব্যাটারির জোরে!

বুকের বাঁ-দিকে ছুরিটা বসিয়ে দিল তিরি। ব্যাটারি খোঁজার কাজ শুরু হয়েছে। ছুরির আঘাতে ছিন্ন হচ্ছে স্নায়ু, ধমনী, শিরা। অসহ্য যন্ত্রণা। দাঁতে দাঁত চেপে সইতে

চেষ্টা করলাম আমি। আমি মানুষবেশী রোবট। প্রথম সূত্র ডিঙিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। রোবট কখনও মানুষের ক্ষতি করে না। কখ্‌খনও না। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলাম।

যন্ত্রণায় আমি চিৎকার করছিলাম, হাত-পা ছুড়তে চেষ্টা করছিলাম। চোখে আর বুকে অসহ্য জ্বালা।

সুমিতা তখনও অবাক চোখে আমাকে দেখছে। একটা রোবটকে আগে কখনও বোধহয় এমনভাবে শেষ হয়ে যেতে দেখেনি ও।

ইকা, সল আর তিরির ঠোঁট চিরে মাঝে-মাঝেই বেরিয়ে আসছিল জান্তব গর্জনের টুকরো। আমার বুকের ভেতরে ওরা প্রাণপণে খোঁড়াখুঁড়ি করে চলেছে।

আমার খুব ঘুম পাচ্ছিল, চোখ বুজে আসতে চাইছে বারবার। কিন্তু আর কিছুক্ষণ সহ্য করতে পারলেই নিশ্চিন্ত হতে পারি আমি। কারণ, একবার অজ্ঞান হয়ে গেলেই আর কোনও ভয় নেই। তখন আর কোনওরকম যন্ত্রণা আমি টের পাব না। চোখের সামনে এই অমানুষগুলোকে আর দেখতে পাব না, দেখতে পাব না সুমিকে। আমার সুমিকে।

সুমিতা কোনওদিনই জানতে পারবে না, আমার বুকের ভিতরে সত্যি-সত্যি কোনও ব্যাটারি নেই। আর প্লাস্টিকও নেই ছিটেফোঁটা। প্রথম সূত্র শুধু আমাকে সহ্য করার শক্তি জোগাক, এই আমার প্রার্থনা। আমি যে রোবট, এই মিথ্যে কল্পনাকে আঁকড়ে ধরে আমি তিরিদের সঙ্গে এই লড়াইয়ে জিততে চাই।

ওরা আমার বুকের ভেতরে খুঁড়ে যাক অনন্তকাল। আমার বুকের গভীরতা ওরা জানে না। ওই অতল গভীর থেকে কখনওই ওরা খুঁজে বের করতে পারবে না ভবিষ্যতের মানবসভ্যতার ঠিকানা।



মাদারি যখন খেলা দেখায়

রোগা শরীরটাকে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে দয়াল মানিক ঢুকে পড়েছিল চিচিঙ্গে মাচার নীচে। বাখারির খুঁটির ডগায় তার বেঁধে তৈরি মাচা। বাইরে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর, কিন্তু মাচার নীচে পঞ্চমুখী পাতার ছায়ায়-ছায়ায় শরীর ঠান্ডা।

দয়াল কুঁজো হয়ে মাথা নীচু করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল প্রায় বুকসমান উঁচু মাচার তলায়। সুতলি দিয়ে থান ইটের টুকরো বেঁধে দিচ্ছিল চিচিঙ্গের ডগায়। ইটের টানে চিচিঙ্গে গুলো সোজা হয়ে ঝুলে পড়বে নীচের দিকে। লাঠির বাড়ি খাওয়া সাপের মতো তা হলে আর জট পাকিয়ে যাবে না। পঞ্চমুখী পাতার সঙ্গে লটকে যাবে না ফলের দেহগুলো।

আহা! ফলগুলোর চেহারা কী! যেন মোটাসোটা লাউডগা সাপ এক-একটা! শুধু গায়ে যা সাদা ডোরাকাটা দাগ। সেইসব সাপদের পাশ কাটিয়ে অদ্ভুতভাবে মাচার তলায় চলেফিরে বেড়াচ্ছিল দয়াল মানিক। ওর কালো কুষ্ঠি শরীরে শুধু হেঁটো ধুতি। আর শরীরটা ঝুঁকে পড়ায় এই আলোছায়াতেও স্পষ্ট দেখা যায় শিরদাঁড়ার গুটলির সার।

দয়াল যতই চলে-ফিরে বেড়ায় ততই খিদে পাক মারে ওর পেটে। জট পাকিয়ে যাওয়া চিচিঙ্গের মতোই পাকাতে থাকে, মোচড়াতে থাকে। সেই কোন

সকালে পান্তাভাত কাঁচালঙ্কা ডলে নুন দিয়ে পাকিয়ে মুখে পুরেছে। আর সঙ্গে কাঁচকলা সেদ্ধ। নাঃ, মুখে রোচে না, তবু শিবু ডাক্তার বলেছে, কাঁচকলায় ভিটামিন, পান্তা ভাতে ভিটামিন, এমনকী শালা কাঁচালঙ্কা আর নিমকেও ভিটামিন। তুমি যা-ই খাও না কেন শালা তাতেই নাকি শুধু ভিটামিন আর ভিটামিন! এই যে দয়াল এখন চিচিঙ্গে চষে বেড়াচ্ছে তাতেও তো ভিটামিন!

কাছাকাছি সনাতন নায়কদের বাড়িতে রঙিন টিভি আছে। তাতে নাকি সরকার এসব ভিটামিনের বিজ্ঞাপন দেখায়। আলু-পেঁয়াজের খোসাতেও ভিটামিন, আবার ভাতের ফ্যান, হাতেগড়া রুটিতেও ভিটামিন।

হাঁপাতে-হাঁপাতে মাচার তলা থেকে বেরিয়ে আসে দয়াল। অতি কষ্টে শিরদাঁড়াটা সোজা করে ধীরে-ধীরে সিধে হয়ে দাঁড়ায়। শিরদাঁড়ার গুটলির সার সোজা হয়। মটমট শব্দ হয় তাতে। দয়াল ক্ষণিকের তরে ঝাপসা দ্যাখে চোখে। তারপর সরু-সরু শিরা বের করা কালো হাত দুটোর দিকে তাকায়। গরু খোঁজার মতো হন্যে হয়ে ভিটামিন খোঁজে। ওর নাভির চারপাশে খিদে পাক দেয়, হা-ডু-ডু খেলে বেপরোয়া।

সূর্য মাথার ওপরে গনগনে আগুন। কিন্তু তবুও চারপাশে দৃষ্টি দিলে সবুজের মেলা দেখে মনটা জুড়োয়।

চোখের সামনেই চিচিঙ্গের পঞ্চমুখী পাতার ঝাঁক। তার মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট সাদা ফুল। ফলন আরও বাড়বে, আরও বাড়বে।

নিজের খেত থেকে চোখ সরতেই কালু মণ্ডলের ধানখেতের দিকে নজর পড়ে দয়ালের। হাঁটু সমান ধানগাছের মেলায় খেত একেবারে সবুজ মাঠ। মাঠে বাতাস খেলা করে, রোদ্দুর খেলা করে। ধানখেতের পাশ ঘেঁষে বয়ে গেছে সরু নদী ঘিয়া। ঘোলা জলে টান তেমন নেই। বড়সড়ো একটা নালা যেন। তবে চাষের জল পাওয়া যায়। কখনও ঘিয়ার জল, কখনও আকাশের জল।

নদীর পাড় ঘেঁষে কাশের ঝোপ। কয়েকটা সাদা ফুল ফুটেছে। দুলছে বাতাসে। তার পিছনে আবার ধানখেত। সবুজের পর সবুজ। চলে গেছে বহুদূর।

ঠিক তখনই বস্তুটি নজরে পড়ল দয়ালের। এমনধারা বিচিত্র বস্তু কখনও দেখেনি ও। না, এমন নয় যে চোখের ধন্দ। তা ছাড়া এখন গনগনে গরমের মরশুমও নয় যে, গরম ভাপ উঠবে জমি থেকে, নজর হিজিবিজি খেলবে।

দয়াল হাতের চেটো দিয়ে চোখের ওপরে টুপি তৈরি করে। তীক্ষ্ণ নজর চালিয়ে ভালো করে দেখার চেষ্টা করে। হ্যাঁ, ঠিকই তো। কোনও ভ্রম নেই।

সবুজ আর সবুজের মাঝে হঠাৎই যেন মাথা ফুঁড়ে উঠেছে একটা রংবেরঙের ঘর। ঠিক একটা বাক্সের মতো বাক্সটার গায়ে রামধনুর মতো বর্ণের খেলা। দয়ালের মনে হল, সেই রঙের নকশা যেন বহুরূপীর মতো খেয়ালখুশি পালটাচ্ছে।

রঙিন বাক্সটার মাথায় বড়সড়ো একটা বাটি বসানো। বাটিটা এদিক-ওদিক ঘুরপাক খাচ্ছে। স্যাটেলাইট আপিসে এরকম বাটি দেখেছে দয়াল।

দয়াল আশেপাশে তাকাল। কেউ কোথাও নেই। সামনের কাঁচা সড়ক ধরে একটা ছোঁড়া সাইকেল প্যাডেল করে চলে গেল। বাক্সটার পানে ঘুরেও তাকাল না।

দয়াল মানিক রাস্তায় উঠে এল। চোখ ছোট করে দেখতে লাগল আজব রঙিন বাক্সটাকে।

ঠিক তখনই একটা প্রাণীকে দেখতে পেল। বাক্সটাকে ঘিরে লাফাচ্ছে, ঘুরে-ঘুরে নেচে বেড়াচ্ছে। ঠিক যেন একটা গঙ্গাফড়িং।

ধানখেতের ওপর দিয়ে দুটো ধবধবে সাদা বক উড়ে গেল। উড়ে যেতে-যেতে বাঁক নিল। তারপর এই আজব বাক্সটার পাশ দিয়ে চলে গেল দিগন্তরেখার দিকে।

হঠাৎই জোরে বাতাস বইতে লাগল। উড়তে লাগল দয়াল মানিকের কাঁচাপাকা চুল। আর তখনই ও ঠাহর করতে পারল অজানা প্রাণীটা হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে।

প্রথমটা দয়াল ঠিক বুঝতে পারেনি। কাকে ডাকছে? ও তাকাল চারপাশে। না, দয়াল ছাড়া আর তো কোনও জনপ্রাণী নেই!

দয়ালের পেটের ভেতরটা এমনিতেই ফাঁকা, সেটা আরও ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকতে লাগল। এবং অচেনা প্রাণীটার হাতছানির টানে ও ধীরে-ধীরে এগোতে লাগল আজব বাক্সটার দিকে।

সড়ক থেকে নামল ধানখেতে। খানিকটা আল ধরে, খানিকটা কাশঝোপের পাশ দিয়ে, নদীর পাড়ের লালচে নরম মাটি মাড়িয়ে এগিয়ে চলল। পায়ের তলায় কাঠি কাঁটা ফুটল কয়েকবার, কিন্তু দয়ালের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। ও এগোতেই থাকল।

ঘিয়ার পাড় ঘেঁষে যখন বাক্সটার পাশাপাশি পৌঁছল তখনও সেই প্রাণীটা বাক্স ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে, নাচছে, আর হাতছানি দিয়ে সুর করে ডাকছে দয়ালকে। এখন তার গলা শুনতে পাচ্ছে দয়াল মানিক : 'এসো ভাই, আজব খেলা দ্যাখো ভাই। এসো ভাই...।'

দয়াল ধানখেতের মধ্যে দিয়ে বাক্সটার দিকে এগিয়ে চলল। একটা চুম্বক যেন ওকে টানছে। আর চলতে-চলতেই প্রাণীটাকে খুঁটিয়ে দেখল দয়াল।

বাক্সটার মতোই আজব প্রাণীটার পরনের পোশাক। গলা থেকে ঝুলে পড়েছে এক অদ্ভুত রকমের জোব্বা। হালকা হলুদ রং। তার ওপরে লাল নীল কালো আর সবুজ রঙের তারা। গনগনে রোদ্দুরে দপদপ করছে। জোব্বার কোমরের কাছ থেকে মানুষের মতোই দুটো হাত বেরিয়ে রয়েছে।

সেই হাত দুটো নাচছে তালে-তালে, আর ডাকছে দয়াল মানিককে।

লোকটার মাথায়—হ্যাঁ, কাছ থেকে দেখার পর প্রাণীটাকে লোক বলেই মনে হয়েছে দয়ালের—লোকটার মাথায় বেখাপ্পা এক টুপি। টুপির মাথা থেকে সরু-সরু লিকলিকে দুটো তার বেরিয়ে উঠে গেছে হাতখানেক ওপরে। তাদের ডগায় দুটো ছোট-ছোট লাল রঙের বল। ঠিক যেন প্রজাপতির শুঁড়। নাচের তালে-তালে সেই শুঁড় নড়ছে, দুলছে।

লোকটার মুখে মুখোশের মতো কী একটা আঁটা। সেখানেও নানা রঙের আঁকিবুকি। শুধু চোখ আর নাকের কাছে ফুটো। সেই ফুটো দিয়ে জ্বলজ্বলে চোখের মণি দেখা গেল বোধহয়। অন্তত দয়ালের তাই মনে হল।

দয়ালকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখে লোকটার হাত-পা ছোড়া আরও বেড়ে গেল যেন। সে গলা ফাটিয়ে তখন গাইছে ঃ

'ক্ষুধাহরণের খেলা গো ভাই
ক্ষুধাহরণের খেলা—
এ খেলাটি খেললে পরে
খিদে—থাকবে না দুইবেলা—'

দয়াল অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখছিল। চোখের ভ্রম নয় মোটেই। সবুজ ধানখেতের মাঝে রোদে ঝকঝক করছে রঙিন বাক্সটা। কিন্তু লোকটা বলে কী! ক্ষুধাহরণের খেলা! এ খেলা খেললে দু-বেলা খিদে থাকবে না!

সঙ্গে-সঙ্গে দয়ালের পেটের ভেতরটা মুচড়ে উঠল খিদের টানে। এখনই তো ওর বাড়ি ফেরার কথা। ফিরে যা পায় দুটি গুঁজে দেবে মুখে। পুন্যিটা কী রেঁধেছে তা নির্ভুল বলে দিতে পারে দয়াল। দুটি ভাত, চিচিঙ্গে সেদ্ধ আর শাপলার জোলো ঝোল। সঙ্গে কাঁচালঙ্কা।

পুণ্যির আর দোষ কী! এই একফালি জমি। তাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনরকম চাষ। চাষের খরচ জুগিয়ে আর থাকেটা কী। পুন্যি ইস্টিশানের কাছে ঝোপড়ি হোটেলগুলোয় রাঁধে, বাসনও মাজে। বছরের পর বছর ধরে এই কাজ করে-করে ওর হাতগুলো খোঁদল হয়ে গেছে। দেখে মনে হয় বুঝি বেটাছেলের হাত। হুঁঃ, বেটাছেলেই বটে! নইলে মা হতে পারে না! দয়াল অন্তরে ভাবে, পুন্যির মধ্যে কোথাও বুঝি পাপ আছে। ওর জন্যে কম জড়িবুটি করা হয়েছে! কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।

এ এক দিক দিয়ে বোধহয় ভালোই হয়েছে। এই দিনকালে দুটি পেট টেনেহিঁচড়ে চলাই যে দায়!

দয়াল মাথার ওপরে সূর্যের দিকে তাকায়। সামান্য বুঝি হেলে পড়েছে পশ্চিমে। একটু দূরেই দুটো বাচ্চা-বাচ্চা মেঘ। নরু লস্করের বাছুর দুটোর মতো। ওরা গুটিগুটি এগিয়ে আসছে সূর্যের দিকে। তখন যদি খানিক ছায়া নামে!

দয়াল ক্রমে-ক্রমে পৌঁছে গেল রঙিন বাক্সটার কাছে। বাজিকর লোকটা নাচতে-নাচতে গান গাইতে-গাইতে ঝপ করে একটা গোপন দরজা খুলে দিল। ঠিক যেন ম্যাজিক, ভোজবাজি।

এ-খেলার টিকিট লাগে না? দয়াল একবার ভাবল। তারপর নেশা করা মানুষের মতো ঢুকে পড়ল বাক্সের ভেতরে ভোজবাজির ভুলভুলাইয়ায়। নিঝুম দুপুরে লোকটার গান তখনও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

মিনিট পনেরো পরেই বেরিয়ে এল দয়াল। দুবার ঢেঁকুর তুলল। খাওয়াটা বড্ড বেশি হয়ে গেছে। প্রথমে নটে শাক, শুকনো লঙ্কা ভাজা দিয়ে শুরু। তারপর একে-একে নারকোল দিয়ে মুগডাল, বেগুন ভাজা, মাছের মুড়ো দিয়ে অকালের বাঁধাকপির তরকারি, আর ভেটকির ঝাল। সবার শেষে দই আর মিঠে পাতা এলাচ দিয়ে পান। এ একেবারে বিয়ের নেমন্তন্ন।

জিভের ডগা দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছিল দয়াল। খাবারের কুচো মনে হয় আটকে আছে দাঁতের ফাঁকে। ডালে নুন একটু টান-টান হয়েছিল, আর বাঁধাকপির তরকারিতে হলুদটা সামান্য বাড়তি ছিল। তবে মাছের ঝালটা বেশ রান্না হয়েছে—একদম কটকটে ঝাল। দয়াল ঝাল খেতে খুব ভালোবাসে। তার জন্যে পেটও ব্যথা করে মাঝে-মধ্যে। শিবু ডাক্তার দ্যাখে, ওষুধ দেয়।

ঘরে ফিরে পুন্যিকে যখন বলল যে, কিছু খাবে না, তখন পুন্যি খুশি হল, আবার অবাকও হল। খুশি এই কারণে যে, ও আজ একপেটা খেতে পারবে। আর অবাক হল স্বামীটার কথা শুনে। এই ঘোর দুপুরে কে পাত পেড়ে খাওয়াবে লোকটাকে! তাও আবার কতরকম পদ! মিছে কথা বলছে না তো?

দয়াল তখন বিশদভাবে ওর খাওয়ার গল্প করছিল, আর ঝালের চোটে মুখ সরু করে বারবার শব্দ করে বাতাস টানছিল।

খাওয়াদাওয়ার পর পুন্যি চেপে ধরল দয়ালকে।

'বলো না গো, কে তোমায় অমন খাইয়েচে।'

দয়াল মাথা নাড়ল : 'সে বলতে পারব নারে—।'

দয়ালের মনে পড়ে গেল সেই আজব লোকটার কথা : 'এই ক্ষুধাহরণের খেলার কথা কাউকে বোলো না হে। একদম গোপন রাখবে। বলে যদি দাও, তা হলে আর কোনওদিন তুমি আমার দেখা পাবে না—এ কথাটি নিশ্চয় জেনো।'

সুতরাং দয়াল ঠোঁট টিপে রইল। লোকটা কোথা থেকে এসেছে কে জানে।

এ-গাঁয়ের তো নয়। তা হলে হয়তো ভিন-গাঁ কি ভিন-দেশ থেকে এসে পড়েছে এখানে। কিন্তু বিনিপয়সার খেলা দেখিয়ে তার কী লাভ? সে যাই হোক, মনে-মনে বাজিকরকে গড় করে দয়াল। আর তার গানের কলি কানে বাজতে থাকে : 'ক্ষুধাহরণের খেলা গো ভাই, ক্ষুধাহরণের খেলা...।'

ঠিক একইরকম আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল নদু শেখের জীবনে।

সময়টা তখন ঝাঁ-ঝাঁ দুপুর। আকাশের দিকে তাকালে কে বলবে দশমিনিট আগেও ঝমাঝম বৃষ্টি নেমেছিল। এ বছরে বৃষ্টি ভালো হয়নি। অথচ আকাশ-বাতাস দেখলে মনে হয় বর্ষার বুঝি যাই-যাই ভাব। আর জল যদিও বা হয় তাও আলটপকা আচমকা। তাই নদুর রোজকার কাজ জোটে না ঠিকমতো। তিনদিন আগে আবহাওয়া অনুমান করে সরল মাইতির জমিতে ধান রুয়েছে। কিন্তু তারপরই শুরু হয়েছে বৃষ্টি। মাইতির জমিতে জল দাঁড়িয়ে গেছে, ডুবে গেছে ধানচারা। আর দু-তিনদিনের মধ্যে যদি জল ছাড়িয়ে চারাগুলো মাথাচাড়া না দেয় তো সব শেষ। কেঁচে গণ্ডূষ করতে হবে।

কাল নদুর কাজ ছিল না। মাইতির আর-একফালি জমিতে লাঙল দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু লাঙল গেল মেরামতিতে। তাই অন্য কোনও কাজ খুঁজতে বেরিয়েছিল নদু।

কাল কাজ জোটেনি, তবে আজ জুটেছে। পাট ছাড়ানোর কাজ। সুবল চৌধুরির পাট দু-সপ্তা ধরে ডোবায় পচছে। তারই আঁশ ছাড়াতে হবে। এ-ডোবায় আগে খেপলা জাল ফেলেছে নদু। তার জন্য পয়সাও পেয়েছে সুবল চৌধুরির কাছে।

অল্পসল্প বর্ষায় ডোবার জল কিছুটা বেড়েছে। সেই ডোবাতেই উরু-জলে দাঁড়িয়ে ছিল নদু। পাটের গোটাসাতেক লাট তখনও ভাসছে। একটা লাট নিয়ে তার গোড়ায় কাঠের মুগুর পিটল নদু। পরপর পিটুনি খেয়ে গোড়ার আঁশগুলো ছেড়ে গেল। তখন লাটের মাঝামাঝি জায়গায় হাতের চাপে লাটটা দু-টুকরো করে ফেলল। অমনি সাদা প্যাঁকাটির ডগা বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু আঁশের জোড় থেকে গেল। হাত-পা ভেঙে হাড়ের ডগা যেমন উঁকি দেয়, অথচ মাসের জোড় টিকে থাকে—সেরকম।

নদু এবার অভ্যস্ত হাতে মুগুর পিটে-পিটে প্যাঁকাটির গোছ বের করে নিতে লাগল। যখন প্রায় বেরিয়ে এসেছে তখন মুগুর জলে ভাসিয়ে হাতের টান মেরে কাজ সারল। প্যাঁকাটির গোছা দুটো ছুড়ে দিল পাড়ে। তারপর পাটের লাছি থেকে টুকরো-টাকরা ভাঙা প্যাঁকাটি বের করে ফেলে দিল। পাটের লাছি জলে বারবার ডুবিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিংড়ে নিল গামছার মতো। তারপর প্যাঁচ দিয়ে গেঁট মেরে লাছিটা ছুড়ে দিল পাড়ে।

নদুর ডানা দুটো ব্যথা করছিল। গায়ে-পিঠে চড়চড়ে রোদ্দুর। অথচ উরু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঠান্ডা। দু-একটা মেনি মাছ আর জলপোকা নদুর পায়ে মাঝে-মাঝে ঠোকর মারছিল, ওর সেদিকে কোনও লক্ষ ছিল না। কারণ খিদের চোটে পেটের ভেতরে তখন ইঁদুরদের তাণ্ডব নৃত্য।

আর পারা যাচ্ছে না। জলের মধ্যে পাঁকের ওপর পা ফেলে-ফেলে শরীরটা পাড়ে টেনে তুলল নদু। পাটের অনেকগুলো লাছি পড়ে আছে পাড়ে। পেটটা শান্ত করে এসে তারপর সেগুলো ছড়িয়ে দেবে রাস্তার ধারের দড়িতে। প্যাঁকাটির গোছগুলোও শুকোতে দেবে।

নদু রাস্তায় উঠে এল। রাস্তার ধার ঘেঁষে ভিজে পাট শুকোচ্ছে দড়িতে। আর প্যাঁকাটির পাঁচ-ছ'টা গোছা টুপির মতো করে দাঁড় করানো সার দিয়ে।

নদু তাকাল চারপাশে। দূরের কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালে দুটো ফিঙে বসে। পাশের মাঠে তিনটে গরু চরে বেড়াচ্ছে। ডাকছে মাঝে-মাঝে।

আকাশের দিকে তাকাল নদু। পরিষ্কার। দু-চারটে সাদা মেঘ। কিন্তু ধানজমির শেষ প্রান্তে একসার ঝাঁকড়া গাছের পিছনে আকাশের গায়ে কালো মেঘের পটি। বৃষ্টি আসতে পারে কিছুক্ষণের মধ্যে। তা হলেই মাইতির চারা শেষ। ওই চারাগুলোয় নদুর হাতের স্পর্শ ছিল।

রাস্তা ধরে কয়েক পা ফেলামাত্রই অদ্ভুত দৃশ্যটা দেখতে পেল নদু শেখ। ঠিক যে-দৃশ্য দেখেছিল দয়াল মানিক।

সুতরাং নদু যেন নেশার টানে বাঁধা পড়ল। ওর পা ওকে টেনে নিয়ে চলল ধানখেতের মাঝে দাঁড়ানো ঝকমকে রঙিন বাক্সটার দিকে। রং পালটানো বাক্স ঘিরে রঙিন পোশাক পরা ভিন-দেশি মাদারি তখন নাচছে, গাইছে, ডাকছে গান গেয়ে ঃ

'ক্ষুধাহরণের খেলা গো ভাই
ক্ষুধাহরণের খেলা
এ-খেলাটি খেললে পরে
খিদে—থাকবে না দুইবেলা—'

ক্রমে-ক্রমে নদু শেখ পৌঁছে গেল সেই রঙিন জগতের দরজায়। পেটের মোচড় নিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

ভেতরটা অন্ধকার, ছোট্ট একটা ঘরের মতো। সেই ঘরে নদু যখন দিশেহারা, ঠিক তখনই একটা দেওয়ালে একটা ছবি ফুটে উঠল—বায়োস্কোপের ছবি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটা বড় স্টেইনলেস স্টিলের থালা, তার পাশে এক গ্লাস জল।

থালার পাশেই একটা হাত—অপেক্ষা করছে। থালায় খাবার দেওয়ার অপেক্ষা। হাতের চেহারা কালো, শিরা ওঠা। নদু জানে, এই মুহূর্তে যদি ও নিজের হাতটা দেখতে পেত তা হলে ছবির হাতের সঙ্গে তফাত খুঁজে পেত না।

থালায় চার হাতা ভাত দিল কেউ। গরম-গরম ভাত। ভাপ উঠছে। গন্ধ ছড়াচ্ছে।

নদু শেখ গরম ভাতের তাপ টের পেল। ঘ্রাণও এল নাকে। আ—ঃ! নদুর জিভে জল এসে গেল। আর ঠিক তখনই কেউ দু-চামচ ঘি দিল পাতে। একটু নুন দিল। টিয়াপাখির মতো সবুজ দুটো কাঁচালঙ্কা দিল।

কালো হাতটা ঘি দিয়ে ভাত মাখতে শুরু করল। তারপর ভাতে নুন ও কাঁচালঙ্কা মেখে নিল কালো হাতটা। আর নদু শেখ ওর জিভে গরম-গরম ঘি-ভাতের স্বাদ পেল।

ঘিয়ের পরেই গরম গরম ডাল। তাতে পেঁয়াজ ভাজা আর ফোড়ন দিয়ে সম্ভার দেওয়া। আর ডালের সঙ্গে নারকোল দিয়ে মোচার ঘণ্ট—ঘণ্ট থেকে গরম মশলার গন্ধ বেরোচ্ছে।

নদু শেখ দেখছিল কালো হাতটা কেমন পাগলের মতো ডালভাত মেখে মোচার ঘণ্ট দিয়ে খেয়ে চলেছে। শব্দ শুনতে পাচ্ছে নদু, গন্ধ পাচ্ছে, টের পাচ্ছে রান্নার প্রতিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ স্বাদের কণা। ওর মনে হচ্ছিল বুঝি ও নিজেই খেয়ে চলেছে, গপগপ করে।

অন্ধকার ঘরে, এইভাবে, চলতে থাকল ক্ষুধাহরণের খেলা।

ডালের পর এল বড় পোনা মাছের কালিয়া আর সরষে বাটা দিয়ে ইলিশ। পাতে আরও দু-হাতা গরম ভাত পড়ল। কালো হাতটা খেতে লাগল আয়েস করে, আয়েস করে। এবং সবশেষে থালা চেটেপুটে আঙুল চুষে শেষ করল খাওয়ার পাট।

পরপর দু-গ্লাস জল খেল বায়োস্কোপের হাতটা। কিন্তু এমনই সে-ছবির চালাকি যেন মনে হল নদু শেখই ঢকঢক করে জল খাচ্ছে, ওরই গলা থেকে খাবারের দলা নেমে গেল পাকস্থলীর দিকে।

নদু শেখ তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলল অন্ধকার ঘরে। ওর কেমন যেন ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল।

একটু পরেই রঙিন ঘরের ভেতরে পরদার বায়োস্কোপ মিলিয়ে গেল আর দরজা খুলে গেল। বাইরের ধানখেতে বেরিয়ে এল নদু। আর সঙ্গে-সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে গেল আবার।

এপাশ-ওপাশ নজর চালিয়েও মাদারিকে আর দেখতে পেল না নদু। মাথার ওপরে মেঘ জেমেছে, হয়তো বৃষ্টি নামবে। হলদে ফড়িং-এর ঝাঁক উড়ছে এখানে ওখানে।

ধানখেত ধরে রাস্তার দিকে এগোল নদু। সারের বস্তা বোঝাই করে গরুর গাড়ি চলেছে রাস্তা দিয়ে। তার পিছনে দুটো সাইকেল। না, ওরা কেউই দেখছে না রঙিন জাদুঘরটার দিকে।

নদু একবার তাকাল ঘাড় ঘুরিয়ে। আশ্চর্য! ভোজবাজি যেন। কেউ নেই! না ওই রঙিন জাদুঘর, না তার রঙিন জাদুকর! হুস করে কোথায় মিলিয়ে গেছে। সে মিলিয়ে যাকগে। পরে আবার এরকম কোনও ঘোর দুপুরে তার দেখা পেলেই হল।

রাস্তায় উঠে এল নদু। বড় ঘুম পাচ্ছে ওর। চলতে-চলতে পুরোনো একটা ধানকল চোখে পড়ল। ধানকলটা এখন অচল। দরজায় জং ধরা তালা। বাইরের দাওয়ায় দুটো পুরোনো আমলের লোহার সিন্দুক। ডালা কাত হয়ে বেঁকে আছে।

ধানকলের দাওয়ায় উঠে পড়ল নদু শেখ। দাওয়ার মাথায় টিনের চাল। তার নানা জায়গায় ফুটো।

ফাটল ধরা ইট বের করা দাওয়াতে শুয়ে পড়ল নদু। আর তখনই ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। সামনের গাছপালা, খেত, খোড়ো কুঁড়েঘর সব ঝাপসা হয়ে গেল। কয়েকটা শকুনি-মুরগি রাস্তার ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বৃষ্টি নামতেই সামনের সাইকেল সারাইয়ের দোকানের চালার নীচে ঢুকে পড়ল। কঁক-কঁক করে ডাকতে লাগল।

বৃষ্টি আরও জোরে ঝেঁপে এল। দুটো কালো ছাগল কোথা থেকে খোঁটা উপড়ে এসে দড়ি খোঁটা সব টানতে-টানতে ম্যা-ম্যা করে ডাকতে-ডাকতে ছুটে চলল রাস্তা দিয়ে।

বৃষ্টির সঙ্গে বেড়ে উঠল বাতাসের তেজ। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা তিনটে তালগাছ দুলতে লাগল। বৃষ্টির ছাট নদুর গায়ে এসে লাগছিল। কিন্তু তারই মধ্যে ওর চোখে ঘুম নেমে এল। ঘুমের মধ্যে ও সুন্দর-সুন্দর স্বপ্ন দেখতে লাগল।

ঠিক ঘণ্টাখানেক পরেই খিদের তীব্র মোচড়ে নদু শেখের ঘুম ভেঙে গেল।

ও কিছুতেই ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারল না। ক্ষুধাহরণের খেলা খেলার পর কী করে সেই পুরোনো খিদে সাতগুণ ভয়ংকর হয়ে আবার ফিরে আসে? এ তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার! মোচার ঘণ্ট, পোনা মাছের কালিয়া, সরষে বাটা দিয়ে ইলিশ—ওগুলো সব গেল কোথায়? সবই কি তা হলে বায়োস্কোপের মায়া? ক্ষুধাহরণের খেলা তা হলে শুধুই খেলা!

ক্ষুধার্ত নদু শেখ তাজ্জব হয়ে ভাবতে থাকে। কোথায় যেন একটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। অথচ বাজিকর বলে দিয়েছিল বারবার করে : 'এ-খেলার কথা কাকপক্ষীকেও বোলো না হে। এ বড় গোপন চতুরালি। যদি গোপন রাখো তবেই আবার আমার দেখা পাবে—এ কথাটি নিশ্চয় জেনো।'

*

ক্ষুধাহরণের খেলা খেলার পর, ঘণ্টাখানেক পর, দয়াল মানিকেরও তীব্র খিদে পেয়েছিল। কিন্তু লজ্জায় সে-কথা ও পুন্যিকে বলতে পারেনি। অবশ্য বলেও কোনও লাভ ছিল না। কারণ ততক্ষণে পুণ্যির খাওয়া শেষ, চেটেপুটে শেষ।

সুতরাং দয়াল মানিক আবার কাজের অজুহাতে পথে বেরিয়ে পড়েছে—যদি আবার সেই অদ্ভুত মাদারির দেখা পেয়ে যায়।

না, দেখা পায়নি।

তবে দিনের পর দিন অনেকেই সেই অদ্ভুত প্রাণীটার দেখা পেল। ঘোর দুপুরের গনগনে রোদে নির্জন ধানখেতের মাঝে। আর ক্রমে-ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল এই আশ্চর্য জাদুকরের কথা। গাঁয়ের প্রায় সকলেই জেনে গেল তার ক্ষুধাহরণের খেলার কথা। যারা এই খেলা খেলতে পারেনি তারা সন্নাটা দুপুরে খুঁজতে লাগল লোকটাকে।

প্রৌঢ় খালেক মিঞা তাকে খোঁজে।

বুড়ি মতিয়া তাকে খোঁজে।

বালক নির্মল পাইক খোঁজে তাকে।

কিশোরী সরিফাও খোঁজে।

খোঁজে জোয়ান মানুষের দল।

আর দয়াল মানিক কিংবা নদু শেখও খোঁজে তাকে। আরও একটিবার যদি ওই খেলা খেলার সুযোগটি মিলে যায়।

সেদিন বিকেলে এই বর্ণচোরা মাদারিকে নিয়েই জটলা চলছিল রতনের চায়ের দোকানে।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। চায়ের দোকানের খড়ের চাল থেকে ছ'টা-আটটা সবুজ ধানগাছ বৃষ্টির জল পেয়ে মাথাচাড়া দিয়েছে। দোকানের ভেতরে রেডিয়োতে গান চলছে ঃ 'আমার গরিব নওয়াজ...ও আমার গরিব নওয়াজ...' আর বাঁশের তৈরি বেঞ্চে বসে আছে চার-পাঁচজন মানুষ। তাদের হাতে চায়ের গ্লাস।

সলিল পাত্র এখানকার হাইস্কুলের মাস্টার। কলকাতায় গিয়ে পড়াশোনা করে এসেছে। সে কথা বললে আর সকলে মনোযোগ দিয়ে শোনে। এখনও শুনছিল। শ্রোতাদের মধ্যে রতনও ছিল। তক্তপোশে বসে ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে বিস্কুটের বোয়েম সাফ করছিল আর কান খাড়া করে শুনছিল সলিল মাস্টারের কথা।

সলিল পাত্রের বয়েস অল্প। চোখা নাক-মুখ। চোয়ালের হাড় উঁচু। গাল সামান্য বসা। মাথায় কোঁকড়া চুল। চোখ চকচকে। আর সবসময় চেঁচিয়ে কথা বলে।

কাল দুপুরে হাইস্কুলের একটা ছাত্র সামনের পুকুরে ডুবে মারা গেছে। সাঁতার জানত ছেলেটা, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে কী করে ডুবে মারা গেল কেউ জানে না। এ নিয়ে সারাটা দিন ধরে অনেক জল্পনাকল্পনা হয়েছে রতনের দোকানে। আর সত্যি কথা বলতে কি, তাতে দোকানে ভিড় বেড়েছে, বিক্রিবাটাও হয়েছে অন্যদিনের তুলনায় বেশি।

আজ সকালে ছেলেটার লাশ খুঁজে পাওয়া গেছে।

এই দুর্ঘটনার জন্য হাইস্কুল ছুটি দেওয়া হয়েছে আজ। সকাল থেকে একটু আগে পর্যন্ত ওই ছেলেটার মৃত্যু নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছিল রতনের দোকানে। হঠাৎই কে যেন তুলে দিয়েছে সেই বাজিকরের কথা। আর তারপরই একে-একে এসে গেছে দয়াল মানিক, নদু শেখ ও আরও অনেকের কথা।

সলিল মাস্টার চেঁচিয়ে কথা বলছিল, '...এসবে বিশ্বাস করার কোনও মানে নেই, নারানদা। ওসব ওদের চোখের ভ্রম, মরীচিকা। কী দেখতে কী দেখেছে সে ওরাই জানে! কই, আমি তো দেখতে পাইনি! আমি তো হাটে-মাঠে কত ঘুরি—।'

নারান মণ্ডল বাঁ-হাতে চায়ের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল, ডানহাতে বিড়ি। ময়লা ধুতি টেনে কোলের কাছে জোট পাকানো। ফোকলা মুখ নেড়ে বলল, 'তার মানে আপনে বলতি চান সক্কলে ভুল দেখেছে? ভুলই যদি দেখবে তা হলে ওদের খিদে তেষ্টা মরল কেমন করে, বলেন—।'

সলিল পাত্র চায়ের গ্লাস নামিয়ে রেখে হাত নাড়ল, বলল, 'আঃ হা, আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। সত্যি-সত্যি ওদের খিদে তেষ্টা মরেছে কি? ওই কিছুক্ষণের জন্যে খিদের ব্যাপারটা শুধু ভুলিয়ে রেখেছে। ওভাবে কি খিদে চাপা দেওয়া যায়?'

আর-এক শ্রোতা হরিপদ সাহা বলে উঠল, 'তা হলে কি মাস্টারমশায় ব্যাপারটা ভূত-প্রেতের কারসাজি? কিন্তু ভূত-প্রেত দিনদুপুরে দেখা যাবে এও কি বিশ্বেস করা যায়, বলুন—।'

বোতল সাফ করা থামিয়ে রতন বলল, 'এর পেছনে কারও ফন্দি নাই তো?'

সলিল পাত্র দাঁত দিয়ে নখ কাটল। ভুরু কুঁচকে চোখ ছোট করে বলল, 'এখন তো এইসবই চলছে। খিদের জ্বালা ভুলিয়ে রাখার কারসাজি। এভাবে জ্বালা কখনও কেউ ভোলে, নারানদা!' রতনের দিকে তাকিয়ে সলিল বলল, 'এসব যদি ওদের চোখের ভ্রম না হয় তা হলে নিশ্চয় জানবে এর পেছনে কারও মতলব আছে, কারসাজি আছে।'

সলিল পাত্রের জোরালো কথায় ঘাড় নাড়ে রতন। নারান মণ্ডল, হরিপদ

সাহাও ঘাড় নাড়ে। মাস্টারমশায় ঠিকই বলেছে। কিন্তু কাল দুপুরে ওই কচি ছোঁড়াটা হঠাৎই বা অপঘাতে মারা গেল কেন? ঘোর দুপুরে কোনও জিন কি গাঁয়ের মাথায় ভর করেছে?

ওরা সকলে সলিল পাত্রের কথায় ঘাড় নেড়ে সায় দিচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু ওদের বুকের ভেতরে একটা লালসা চুপিসারে কাজ করছিল। ইস, একটিবার যদি ওই মাদারির দেখা পাওয়া যায়! যদি একটিবার ওরা খেলতে পারে ক্ষুধাহরণের খেলা!

বাইরে তখন বৃষ্টি ও অন্ধকার—দুয়েরই তেজ বেড়েছে।

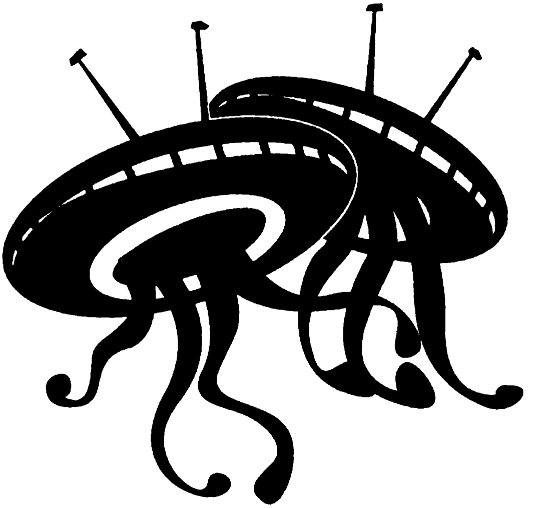
সলিল পাত্র যখন দলবল নিয়ে গাঁয়ের মাঠে-ঘাটে বনেবাদাড়ে তন্নতন্ন করে সেই শয়তান বাজিকরের তল্লাশ করছে, সে তখন গাঁয়ের একেবারে শেষ প্রান্তে—ঘিয়া নদী পেরিয়ে অশ্বত্থ, পাকুড়, ইউক্যালিপটাসের জঙ্গলে আলোছায়ার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে। পরনে তার সেই অদ্ভুত রঙিন পোশাক। কিন্তু বহুবর্ণ গাড়িটা—অথবা ভোজবাজির সেই ঘর—কোথাও চোখে পড়ছে না।

ভিনগ্রহীর পোশাক পরা মানুষটা গাছের ছায়ার আধোআঁধারিতে দাঁড়িয়ে হঠাৎই কেমন ক্লান্ত ভঙ্গিতে তার পোশাক ছাড়তে শুরু করল। গায়ের জোব্বা, মাথার অদ্ভুত টুপি ইত্যাদি খুলে ফেলতেই মাদারির সারেগামা পাঁজর দেখা গেল। তার গায়ের রং, চামড়ার ভাঁজ আর কৃশকায় চেহারা দেখে মনে হয়, তার নাম দয়াল মানিক অথবা নদু শেখ হতে পারত খুব সহজেই।

আকাশের দিকে তাকিয়ে মাদারি হাঁপায়। মেঘ নেই একফোঁটা। সব যেন শুকনো কাঠ। শরীরের ভেতরটাও। খিদের নাগরদোলা ঘুরছে নাভিকে ঘিরে। এখন তাকে যেতে হবে আর-এক মাদারির খোঁজে—যে তাকে ভাতা দেয়, ভাত দেয়, ক্ষুধাহরণের খেলা দেখানোর গাড়ি দেয়, সাজসজ্জা দেয়।

এত খিদের মধ্যেও হাসি পায় মানুষটার। আশ্চর্য! যে আর-একজনের কথামতো ভোলাভালা মানুষগুলোকে ভরদুপুরে ধানখেতের মাঝে রোজ ক্ষুধাহরণের খেলা দেখিয়ে বেড়ায় সে খিদে ভুলে থাকতে পারছে না কিছুতেই!

মাটির দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে ক্লান্ত দেহে পথ চলতে থাকে লোকটা। মনে-মনে শপথ নিতে চায়, আর কখনও এই খেলা দেখাবে না সে। বরং ওই ভোলাভালা মানুষগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। তারপর ভরদুপুরে সবাই মিলে খুঁজে বেড়াবে আসল মাদারিকে—যে সবসময় আড়ালে থেকে সবাইকে পুতুলনাচের খেলা দেখায়।



সুখ-দুঃখের সরণি

চিৎকার-চেঁচামেচি ইত্যাদি রাস্তা থেকেই শুনতে পাচ্ছিলেন সুরনাথ। মালবিকার গলা। স্বর তীব্র করে কথা বলছে অলকার সঙ্গে। সাদা কথায় ঝগড়া। কিন্তু কিছু বলার উপায় নেই। কারণ বলামাত্রই ছোট চোখ বড় করে অবাক গলায় চিৎকার করেই বলবে, 'কী বলছ, দাদা! ঝগড়া কোথায়? আমি শুধু বউদিকে বলছিলাম—।'

বাকিটা আর শোনার প্রয়োজন নেই। সুরনাথের কাছে যেটা ঝগড়া মনে হয়, মালবিকার কাছে তা কোনওমতেই ঝগড়া নয়। অল্পবয়েসে স্বামী ভানুপ্রতাপ মারা যাওয়ার পর থেকেই মালবিকা রুক্ষ হয়ে গেছে। অথচ তার আগে ওর কথাবার্তা কী সুন্দর ছিল! সুরনাথের ভালো লাগত। ভালো লাগত আর সবার।

ভানুপ্রতাপের টিটেনাস হয়েছিল। একেবারে হঠাৎ। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে মালবিকাকে বলেছিল, জুতোর শুকতলা ফুঁড়ে নাকি একটা পেরেক ঢুকে গেছে পায়ে। তারপর ডাক্তার দেখানোর গা করেনি। শুধু লাল ওষুধ লাগিয়ে সেঁক দিয়েছিল। কিন্তু দেড়দিন পরেই পা ফুলে ঢোল। ডাক্তার, হাসপাতাল। তারপর আড়াইদিনের টানাপোড়েনের পর সব শেষ। একটা বইয়ের অনেকগুলো পাতা ছিঁড়ে নিয়ে কেউ যেন আচমকা শেষের পাতাটা তুলে ধরল চোখের সামনে। সমাপ্ত।

ভানুপ্রতাপের শেষ সময়ে সুরনাথ কাছে ছিলেন। একটা প্রাইভেট নার্সিং হোমে

চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল। চিকিৎসার যাবতীয় খরচ দিয়েছিল কোম্পানি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। শেষশয্যায় ভানুপ্রতাপকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ওঁরা তিনজন ঃ সুরনাথ, মালবিকা, আর মালবিকার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আটবছরের রানা—রানাপ্রতাপ।

ভানুপ্রতাপ ঠোঁট নেড়েছিল, কিন্তু তাতে শব্দ ওঠেনি। ওর চোখ-মুখ দেখে সুরনাথ বুঝতে পেরেছিলেন ওর কথা। তাই মালবিকার মাথায় আশ্বাসের হাত রেখেছিলেন। চোখের জল লুকোনোর চেষ্টা করেননি। সুরনাথ নির্বোধ, সেইজন্যেই কিছু লুকিয়ে রাখতে পারেন না।

মালবিকা চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল। রানা প্রথমটায় স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু হঠাৎ মা-কে কেঁদে উঠতে দেখেই বাবাকে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করে দিল। কান্না এত সংক্রামক যে, বলার নয়।

কাঁদতে-কাঁদতেই 'বাবা! বাবা!' বলে কীসব বলছিল রানাপ্রতাপ। একটা কথাও বোঝা যাচ্ছিল না। তবে বালকের শোকের সুর সুরনাথের বুকে গভীর দাগ কেটে দিচ্ছিল। সম্পর্কের সুতোয় মৃত্যু বেপরোয়া টান দেয় সবসময়। বড় অবাধ্য।

অফিস আর ইনশিয়োরেন্স কোম্পানি থেকে ভানুপ্রতাপের পাওনাগন্ডা বুঝে পেতে মাসছয়েক মতো লেগেছিল। তারপরই বেহালার অফিসের কোয়ার্টার ছেড়ে দিয়ে মালবিকা আর রানা চলে এসেছিল সুরনাথের কাছে। সে কি আজকের কথা!

দেখতে-দেখতে সাতাশটা বছর গড়িয়ে গেছে। এসেছে ছেলে অপরূপ, আর মেয়ে মমতা। সুরনাথ মাঝবয়েসি থেকে প্রৌঢ় এবং প্রৌঢ় থেকে বৃদ্ধ হয়েছেন। আর অলকার সুন্দর মুখশ্রী ভরাট হতে-হতে, চিবুকে ভাঁজ পড়তে-পড়তে কখন যেন বার্ধক্য ছুঁয়ে ফেলেছে।

বাড়িতে ঢুকে সুরনাথ লাঠিতে ভর দিয়ে সবে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করেছেন, রাণুর মায়ের সঙ্গে মুখোমুখি। হাতে আবর্জনার পুঁটলি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আর-এক হাতে মাথায় ঘোমটা টেনে দিতে চেষ্টা করল রাণুর মা।

সুরনাথ হাসলেন মনে-মনে ঃ রাণুর মায়ের মাসমাইনে তিনি দেন না, দেয় রানা আর অপু। তবুও এই কাজের মহিলা সুরনাথকে সমীহ করে। এ কি বয়েসের পাওনা?

অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে মালবিকার গলার স্বর ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছিল। বিষয়টা কী? ভাবলেন সুরনাথ। তারপর মাথা নাড়লেন। বিষয় জেনে কোনও লাভ নেই। কারণ সমাধানের পদ্ধতিটা তাঁর জানা। এ-বাড়িতে যে-সমস্যাই মাথাচাড়া দিক না কেন, দেখা গেছে তার সমাধানের পথে একমাত্র বাধা সুরনাথ। সমস্যাটা কখনও ঘরের, কখনও খাটের, কখনও টেবিলের বা বাথরুমের—অর্থাৎ, যা হোক কিছু হলেই হল। অঙ্কের উত্তর যেহেতু সবসময় জানা সেহেতু অঙ্কের

ধরন-ধারণ জানার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ আর নেই। এ যেন যে-কোনও বিষয় থেকে ঘুরে-ঘুরে সেই গরু রচনায় ফিরে আসা।

সুরনাথের মাথার তালুর কাছে সাদা চুলের আস্তানায় দুর্ভিক্ষ লেগেছে। তবু আশ্চর্য, ওই জায়গাটাই বারবার চুলকোয়। চটি ছেড়ে পাপোশে পা মুছে ঘরে ঢুকলেন। জানলার পাশে দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখলেন হাতের লাঠিটা। ঝগড়ার বিষয়টা তাঁর কানে ঢুকে পড়ছিল এবার। না, এখন অলকা নয়, অপুও নয়। মালবিকা চিৎকার করছে ছেলের সঙ্গে। রানার সঙ্গে।

'তুই আর আমাকে শেখাতে আসিস না। দিনরাত্তির খালি তনুর কথায় নাচবি।'

'মা! বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।' রানাপ্রতাপ গম্ভীর গলায় বলল।

তনু—তনুশ্রী রানার বউ। তনু আবার কী করল?

'তুই যা তো এখান থেকে। মেয়েদের কথায় থাকতে লজ্জা করে না তোর? আমার গয়না ভাঙব না গড়ব সে আমি ঠিক করব। কেন, তনুকে কি কম দেওয়া হয়েছে? জিগ্যেস কর না তোর মামিকে, কোন সাতনরী হার দিয়েছিল মমতাকে—।'

রানাই প্রথম সুরনাথকে দেখতে পেল। চুপ করে গেল বটে, কিন্তু মুখে বিরক্তির ছোঁওয়া লেগে রইল।

অলকা আলতো গলায় বলল, 'এখন থাক, ছোড়দি—।'

মালবিকা ঠাকুর পুজোয় বসবে বোধহয়। কারণ হাতে ক'টা শিউলি আর নয়নতারা ফুল। দোতলার পিছনদিককার বারান্দায় চার-পাঁচটা ফুলগাছের টব আছে। মালবিকা তার তদারকি করে। আর মাঝে-মাঝে সুরনাথের নাতি পলাশ। রানাপ্রতাপের ছেলে। সাড়ে সাতবছর মাত্র বয়েস, কিন্তু ভীষণ চটপটে, ফুটফুটে।

এখন সকাল সবে আটটা। নভেম্বরের শেষ। বাতাসে শীতের আলপিন। সুরনাথ রোজ উষাভ্রমণে বেরোন ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। যদি কুয়াশার আড়াল না থাকে তা হলে শুকতারাকে চিনে নেওয়া যায়। মাফলারে কান-গলা ঢেকে, পায়ে উলের মোজা পরে সুরনাথ বেরিয়ে পড়েন। কাঁপা ঠোঁটে গুনগুন গানের কলি : শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে, গুরুদেব দয়া করো দীনজনে...।

উত্তর কলকাতার এই অঞ্চলটা গলিময়। ডাইনে-বাঁয়ে-সামনে-পিছনে শুধু গলি। বড় রাস্তা খুঁজে পাওয়া ভার। নতুন কোনও লোক এ-অঞ্চলে এলে পথ হারিয়ে ফেলবেই। পাড়ার ছেলে-ছোকরারা ঠাট্টা করে বলে ভুলভুলাইয়া সরণি। তা এই ভুলভুলাইয়া সরণির এ-গলি ও-গলি করে একসময় একটা খোলা মাঠে পৌঁছে যান সুরনাথ। একটা বকুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভোরের সূর্য দেখেন। তখন বাচ্চা বয়েসের কথা মনে পড়ে যায়। মাইকেলনগরে বাবার হাত ধরে ভোরবেলায়

বেরোতেন রোজ। কী ভালো লাগত। বাবা হাঁটতেন আর নানা গল্প শোনাতেন ঃ জন্তু-জানোয়ারের গল্প, মানুষের গল্প, আর গাছপালা নদীনালার গল্প। বাবা জরিপের কাজ করতেন, ঘুরে বেড়াতেন নানা জায়গায়। খুব ধার্মিক ছিলেন। অনুগত ছিলেন দেবদেবীর। অপ্রিয় সত্য বলতে সঙ্কোচ করতেন না।

বাবা চলে গেছেন প্রায় চার যুগ আগে। তবুও দীর্ঘকায় ঋজু মানুষটাকে সুরনাথ কখনও ভুলতে পারেন না। ফুল সাজানো খাটে তাঁর শোয়ানো মৃতদেহও ছিল টানটান। বাবা সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু একফোঁটা চোখের জল ফেলেননি। সুরনাথ, অলকা, মালবিকা কাঁদছিল। বাবা দুর্বল স্বরে বলেছিলেন, 'কেঁদো না। পুরোনো চলে না গেলে নতুনের জায়গা হবে কেমন করে?' তারপর কিছুক্ষণ দম নিয়ে সুরনাথকে বলেছিলেন, 'জ্ঞানত তোমাকে কখনও কুশিক্ষা দিইনি। কর্তব্য থেকে কখনও বিচ্যুত হবে না। মালাকে তোমার দায়িত্বে রেখে গেলাম।'

সেই বাবার শেষ কথা।

ভোরের মাঠে ছেলেরা ছুটোছুটি করে বল খেলছিল। ঘাসে হিম পড়েছে। যেখানে ঘাস নেই সেখানে পায়ে-পায়ে সামান্য ধুলো উড়ছিল। এই মাঠেই একসময় বল খেলেছে অপরূপ। ধুলো তখনও উড়েছে, কিন্তু এ-ধুলো নতুন। পুরোনো ধুলো আর নেই। পুরোনো চলে না গেলে নতুনের জায়গা হবে কেমন করে?

হাত-পা নেড়েচেড়ে ব্যায়াম করছিলেন সুরনাথ, একটা ছেলে খেলা থামিয়ে হঠাৎই তাঁকে জিগ্যেস করল, 'দাদু, ক'টা বাজে?'

সুরনাথ সূর্যের অবস্থান দেখে অনুমান করে বললেন, 'সাড়ে ছ'টা হবে—'

সূর্যই এখন সুরনাথের ঘড়ি।

সূর্যের দিক থেকে চোখ নামিয়ে আকাশরেখা দেখলেন। মনটাকে মাঝে-মাঝে ছুটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে ওই আকাশরেখার দিকে, যেখানে দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, যন্ত্রণা নেই—গরু রচনাও নেই।

ধীরে-ধীরে বাড়ি ফেরার পথে অদ্ভুত কতকগুলো কথা মনে হচ্ছিল সুরনাথের। দুঃখ কাকে বলে? সুখই-বা কী? আনন্দ কাকে বলে?

আজকাল এসবই মনে হয়। ছোটবেলার খেলার সাথীদের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে স্কুলের কথা। মাইকেলনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয় এই এত্তটুকু। মাঠঘাট গাছপালাটাই ছিল বেশি। বকুল গাছ থেকে বকুল ফল পাড়তেন। তারপর বকুল বিচি ঘষে-ঘষে বাঁশি। সেই বাঁশির বিনিময়ে বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া যেত অনেক কিছু ঃ পেনসিল কাটার কল, রঙিন ছবি, কত কী!

চুমকির কথাও মনে পড়ে। ফ্রক ছেড়ে সবে শাড়ি ধরেছে। জনার্দনস্যারের কোচিংয়ে পড়তে যেত। খুব হাসত। যে-কোনও কথাতেই হাসত। কোচিংয়েই প্রথম আলাপ হয়েছিল। তারপর নীতিন আর পরি—দু-বন্ধুর প্ররোচনায় কত না কাণ্ড

করেছিলেন সুরনাথ! কাগজের বল ছোড়াছুড়ি, চুমকির প্র্যাকটিক্যাল খাতায় ছবি এঁকে দেওয়া, ওকে গল্পের বই পড়তে দেওয়া। তারপর সেই বইয়ের মধ্যে করেই একদিন চিঠি। ওঃ, কী ভয়! কী ভয়! চব্বিশ ঘণ্টা ধরে বুকের ভেতরে যেন ফুটবল খেলা চলছিল। তারপর...।

এমনি করেই কেটে গিয়েছিল কয়েক মাস। বাবা-মা আত্মীয়স্বজনকে লুকিয়ে এই খেলায় এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ। তারপর হঠাৎই একদিন চুমকিরা বেড়াতে গেল বসিরহাট—ওর মাসির বাড়ি। বলেছিল, ফিরে আসবে পনেরোদিন পর। চোদ্দোদিন যেতে-না-যেতেই সুরনাথ নীতিনকে সঙ্গে করে যশোর রোডের কিনারায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন সারাদিন। প্রত্যেকটা বাস থামামাত্রই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতেন বাস থেকে নামা যাত্রীদের। বুকের মধ্যে জোরে-জোরে শব্দ হত। কিন্তু সেই চেনামুখ মেয়েটা নামত না। পনেরোর পর ষোলো, সতেরো...কুড়িদিন পেরিয়ে গেল।

একদিন ফিরে এল ওরা সবাই। শুধু চুমকি ছাড়া। পরে খবর পেলেন পরির কাছে। ও নাকি বসিরহাটেই থাকবে। ওখানে থেকেই পড়াশোনা করবে।

আশ্চর্য! সেদিন প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন সুরনাথ। একটা মাছ কেউ আচমকা তুলে ফেলেছে ডাঙায়। মাছটা ছটফট করছে, কিন্তু মরছে না কিছুতেই।

পরি আর নীতিনের কথায় একদিন বসিরহাটে গিয়েওছিলেন সুরনাথ। এলোমেলোভাবে খুঁজেছিলেন মেয়েটাকে। জানা কথাই, এভাবে ঠিকানা ছাড়া কাউকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, কিন্তু তবুও মন মানতে চায়নি। বারবারই মনে হচ্ছিল, এই বুঝি হঠাৎ করে রাস্তার মাঝে দেখা হয়ে যাবে চুমকির সঙ্গে। বেনি দুলিয়ে কোচিংয়ে পড়তে যাচ্ছে।

না, দেখা হয়নি ওর সঙ্গে। ফেরার সময় সারাটা পথ মুখে রুমাল গুঁজে চোখের জল ফেলেছেন সুরনাথ। পরি আর নীতিন অনেক সান্ত্বনা দিয়েছিল। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।

সেই সময়ে বারবারই মনে হত আত্মহত্যার কথা। কত মানুষই তো কত দুঃখে শেষ করে দেয় নিজের জীবন। খবরের কাগজে রোজই তো থাকে কারও-না-কারওর চলে যাওয়ার খবর। কিন্তু বাবা রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করতেন নিয়মিত। বলতেন, আত্মহত্যা মহাপাপ। সুরনাথকে সেই পাঠ শুনতে হত। পাঠ শুনতে-শুনতে ডুরে শাড়ি পরা হারানো মেয়েটার জন্য কাঁদতেন সুরনাথ। বাবা ভাবতেন, চোখের জল দ্রৌপদীর দুঃখের জন্য, অথবা লাঞ্ছিতা সীতার জন্য।

সুরনাথ আত্মহত্যা করেননি। কিন্তু পথেঘাটে চুমকির মতো শাড়ি পরা কোনও মেয়েকে দেখলেই তাঁর বুকে হঠাৎই হাতুড়ি পড়ত। কল্পনায় ওকে দেখতে পেতেন বসিরহাটের কোনও বাড়িতে। সে-বাড়ির বাগানে দুটো বকুল গাছ। বাতাসে নড়ছে।

ধীরে-ধীরে বয়েস বেড়েছে সুরনাথের। বাবা-মায়ের সঙ্গে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। তখন নিজেকে বুঝিয়েছেন, প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এরকম একটা ছেলেমানুষি ভালোবাসা থাকে। এর কোনও দাম নেই।

অথচ আজ কিছুদিন ধরেই চুমকির কথা খুব মনে পড়ছে। আর আত্মহত্যার কথাও। কিন্তু একজন সত্তর বছরের বৃদ্ধ আত্মহত্যা করেছে, এই খবরটা কেমন শোনাবে? বৃদ্ধদের আত্মহত্যা মানায় না। আত্মহত্যা করারও একটা বয়েস থাকে। সে-বয়েস সুরনাথ পেরিয়ে এসেছেন বহুদিন। তাই আত্মহত্যার কথা মনে হলেই সুরনাথ তাঁর সাদা বাক্স আর কালো বাক্স নিয়ে খেলতে বসে যান।

এ এক অদ্ভুত খেলা! সুরনাথের নিজের তৈরি।

সকলের জীবনেই সুখ-দুঃখের স্মৃতি থাকে। সুরনাথেরও আছে। এই স্মৃতিগুলো তিনি ভরে রেখেছেন দুটো কাল্পনিক বাক্সে। সুখের স্মৃতি রাখার বাক্সটার রং সাদা। আর দুঃখের স্মৃতিগুলো রেখেছেন কালো রঙের একটা বাক্সে। সন্দেহ নেই, কালো বাক্সটা সাদা বাক্সের চেয়ে মাপে অনেক বড়। বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রেই বোধহয় তাই।

সুরনাথ মাঝে-মাঝেই এই বাক্সগুলো নিয়ে খেলতে বসে যান। রাতের অন্ধকারে অলকার পাশে চোখ চেয়ে শুয়ে থাকেন সুরনাথ। খেলতে থাকেন সাদা বাক্স কালো বাক্সের খেলা। এ-খেলায় অনেক সুবিধে। একা-একাই খেলা যায়। আর খেলার সময় কোনও শব্দ কিংবা হইচই হয় না।

কল্পনায় সাদা বাক্সটা কোলের ওপর তুলে নেন। তারপর বাক্সের ডালা খুলে একটা-একটা করে সুখের স্মৃতিগুলো বের করেন। সেগুলো ঘষে-মেজে ঝকঝকে করে তোলেন, যাতে কোনওদিন মলিন না হয়। এর মধ্যে রয়েছে হারানো ছেলেবেলা, মাইকেলনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চুমকি, পরি, নীতিন, বাবার হাত ধরে বেড়ানো, মায়ের আদর, অলকার সঙ্গে ফুলশয্যার রাত, ওকে নিয়ে পুরীতে বেড়িয়ে আসা দিনগুলো, মালবিকার বিয়ে, অপরূপ আর মমতার পৃথিবীতে আসা, মমতার বিয়ে, আর সবশেষে রানাপ্রতাপের ছেলে—সুরনাথের নাতি পলাশ—সবচেয়ে প্রিয় খোকাটির জন্ম।

এরকম আরও কত!

সত্যি, ভাবেন সুরনাথ, সাদা বাক্সটা বেশ বড়। সাদা বাক্সের সমস্ত অলংকার ঘষে-মেজে বাক্সে তুলে রেখে সযতনে বাক্সের ডালা আবার বন্ধ করে দেন। তারপর অন্ধকারে চোখ বোজেন।

আর তখনই কালো বাক্সটা খুলে যায় এক ঝটকায়। সুরনাথ না চাইলেও নিষ্ঠুর দুঃখের স্মৃতিগুলো একে-একে বেরিয়ে আসে, উদোম হয়ে নির্লজ্জভাবে নাচতে থাকে চোখের সামনে। চুমকির হারিয়ে যাওয়া, বাবা-মায়ের চলে যাওয়া, ভানুপ্রতাপের

শেষ দিনটি, অলকার বদলে যাওয়া, রানাপ্রতাপ আর অপুর অচেনা মুখ, আর গরু রচনার সেই হতবাক বড়-বড় চোখে তাকিয়ে থাকা গরুটা।

বড় কষ্টের। সুরনাথের কালো বাক্সটা সাদা বাক্সের চেয়ে মাপে অনেক বড়, অনেক।

আজকের সাতসকালে যে-সমস্যাটা নিয়ে মালবিকা, রানা, অলকা, বা তনুশ্রী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে, সেটা বোধহয় সোনাদানার ভাগাভাগি নিয়ে। সুরনাথ জানেন, এ নিয়ে বিশদ আলোচনার পর দেখা যাবে, মমতার বিয়ের সময় অলকার কোনও একটা পরামর্শ তিনি আমল দেননি, তার জন্যই আজকের এই সমস্যা জন্ম নিয়েছে। তখন গরু রচনার হতভাগা গরুটা শূন্য চোখে হাঁ করে চেয়ে থাকবে। আর চোখে জল কাটবে। জল কাটবে।

সমস্যা থেকে দূরে থাকার জন্য যতক্ষণ পারা যায় বাড়ির বাইরে থাকেন সুরনাথ। পাড়া-প্রতিবেশীদের ফাইফরমাশ খাটেন টুকটাক। আর লাঠি হাতে ঘুরে বেড়ান, বা কারও বাড়ির রোয়াকে বসে থাকেন, সঙ্গী পেলে গল্প করেন।

নিজের প্রয়োজনের কথাটা কখনও কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারেন না। তিনি নিজে যেমন অন্যের প্রয়োজন বেশিরভাগ সময়েই অন্তর দিয়ে বুঝে নেন, ঠিক তেমনটাই আশা করেন অন্যের কাছে। আর সেইজন্যই তাঁকে বঞ্চিত হতে হয় বেশি করে।

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুকের ভেতর থেকে। সয়ে গেছে, সবটাই সয়ে গেছে। এখন শুধু যাওয়ার অপেক্ষা। তাঁর শেষ শয্যায় শুধু একটা ছোট্ট মুখ দেখতে চান তিনি। পলাশের নিষ্পাপ মুখ।

ভোরবেলা স্কুলে যায় পলাশ। রানা দিয়ে আসে সাইকেলে করে। আর ছুটির সময় সুরনাথ নিয়ে আসেন ওকে। তখন অনেক গল্প করেন ওর সঙ্গে। দিলখোলা খোশগল্প।

'দাদু, সাইকেল দু-চাকায় চলে, কিন্তু মোটরগাড়ির চার চাকা লাগে কেন?'

'অত্তসব কি আমি জানি, দাদুভাই! ওসব বিজ্ঞানের ব্যাপার—।'

পলাশের সব জিনিসেই কৌতূহল। ওর প্রশ্নের কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই।

সুরনাথ ছেলেটাকে নানা গল্প শোনান। রূপকথার গল্প, জন্তু-জানোয়ারের গল্প, সুখ-দুঃখের গল্প।

বিকেলে পলাশকে নিয়ে মাঠে বেড়াতে যান সুরনাথ। ও হুটোপুটি করে খেলে। আর সুরনাথ বসে থাকেন গাছতলায়। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায়। মনে হয়, মাইকেলনগরের মাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর চোখের সামনে শিশু সুরনাথ খেলছে।

মাঠ থেকে ফেরার পথেও অনেক গল্প হয় দাদু-নাতিতে।

এই তো সেদিন ফেরার সময় এক দুঃখী কৃষকের গল্প শোনাচ্ছিলেন সুরনাথ, ছেলেটা ফস করে জিগ্যেস করে বসল, 'দাদু, দুঃখ কাকে বলে?'

সুরনাথ চমকে গেলেন। চুমকির কথা মনে পড়ে গেল পলকে। কাকে বলে দুঃখ? যখন চারপাশে সবকিছু হাসিখুশি থাকা সত্ত্বেও মনটা খুশি হতে পারে না, তাকেই কি দুঃখ বলে?

সুরনাথ চুপ করে ছিলেন। জবাব দিতে পারেননি। ইদানীং এই প্রশ্নগুলো মনের কোণে উঁকি মারছে বারবার।

সুখ কাকে বলে? যে-কোনও অবস্থায় তৃপ্তি পাওয়ার নামই কি সুখ? মনে পড়ে গেল, সেই ছেলেবেলায় খেলতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন ইট-পাথরের ওপরে। হাঁটুর কাছে মাংস উঠে গিয়েছিল। অসহ্য জ্বালা করছিল। রক্ত পড়ছিল। সুরনাথ তখন চুমকির মুখটা মনে করার চেষ্টা করছিলেন প্রাণপণে। স্পষ্ট মনে আছে, জ্বালা-যন্ত্রণা কমে গিয়েছিল পলকে। সুরনাথ সুখী হয়েছিলেন। এরকম কত রকমফের হতে পারে সুখী হওয়ার!

অনেকক্ষণ ভেবে বলেছিলেন, 'তোমাকে ছেড়ে চলে গেলে আমার খুব মন খারাপ হবে। তাকেই বলে দুঃখ।'

'যাঃ, তুমি আবার কোথায় যাবে!'

পলাশ সুরনাথের চলে যাওয়ার কথা মোটেই মানতে পারেনি। সুরনাথ অবাক হয়ে বালককে দেখছিলেন। এই হতভাগাটাই এখন একমাত্র পিছুটান। ওর সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের স্মৃতি জমা হয়ে যায় সুরনাথের সাদা বাক্সে। বাক্সটা মাপে বাড়তে থাকে। কিন্তু কালো বাক্সের চেয়ে বড় হতে পারে না কখনও।

সুতরাং ক'দিন পরে পলাশ যখন এসে মেলা দেখতে যাওয়ার বায়না ধরল তখন রাজি না হয়ে পারেননি। দেশবন্ধু পার্কে নাকি এক 'ইলেকট্রনিক ফেয়ার' শুরু হয়েছে।

রানা অফিসের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তনু সংসারের কাজকর্মের হাল ধরতে গিয়ে বেসামাল। আর মালবিকার ঠাকুরঘরই সব। অপুকেও নাকি পলাশ একবার বলেছিল। তাতে 'কাকু' বলেছে, 'আজ নয়, কাল।' ব্যস, ওই পর্যন্তই।

মেলার কথায় অনেক স্মৃতিই মনে এসে ভিড় করে। তার দু-একটা গল্প পলাশকে শোনাতেই খিলখিল করে হেসে উঠল নাতি। বলল, 'ওসব পুরোনো খেলা না, দাদু। এসব একেবারে তাক লাগানো খেলা। দেখলে তুমি চমকে যাবে। জানো, আমাদের ক্লাসের অর্ণব গিয়েছিল কাল। বলল, কম্পিউটারের খেলা আছে, টাইম মেশিনের খেলা আছে, রোবট ডিটেকটিভ আছে—সে তুমি না দেখলে বুঝবে না।'

আজকালকার যুগের অনেক কিছুই বুঝতে পারেন না সুরনাথ। এখন নাকি

যন্ত্রের যুগ। যন্ত্রই মানুষকে সুখী রাখে। সুতরাং নাতিকে নিয়ে এক সন্ধেয় বেরিয়ে পড়লেন তিনি।

যে-মাঠে মেলা বসেছে, সে-মাঠটা বেশি দূরে নয়। বাসে চারটে মাত্র স্টপেজ। কিন্তু সারাটা পথ পলাশ উত্তেজনা আর রোমাঞ্চে চনমন করতে লাগল। হাত-মুখ নেড়ে কত কথা বল দাদুর সঙ্গে। মেলায় গিয়ে কী-কী করবে তার লম্বা ফিরিস্তি শুনিয়ে দিল বারবার। বাবার কাছে বায়না করে দুশো টাকা পেয়েছে পলাশ—মেলায় নানা খেলা দেখার জন্য। সে-টাকা এখন দাদুর হেফাজতে।

বাস থেকে নেমে কয়েক পা হাঁটতেই নানা রঙের আলোর হাতছানি। বিচিত্র আলোয় সাজানো যেন এক আরব্যরজনী। পলাশ দাদুকে একরকম টেনেই নিয়ে চলল।

সুরনাথ লাঠি ঠকঠকিয়ে তাল রাখতে পারছিলেন না ওর সঙ্গে। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় অলকা বলেছিল, 'ছেলেটার দিকে খেয়াল রেখো। এমন কাণ্ড কিছু কোরো না যাতে তনুর কাছে মুখ খেতে হয়—।'

সুরনাথ চুপ করেছিলেন। কথার পিঠে কথা বলে লাভ নেই। তাঁর ভাষা ওরা কেউ বুঝতে পারে না—একমাত্র হাত ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া এই দস্যি ছেলেটা ছাড়া।

টিকিট কেটে মেলায় ঢুকে অবাক হয়ে গেলেন সুরনাথ। এ কোথায় এলেন তিনি! রূপকথার জগৎ যেন সত্যি হয়ে উঠেছে।

নিশি পাওয়া মানুষের মতো পলাশের পিছু-পিছু ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তিনি।

টিকিট কেটে দাদুকে নিয়ে পলাশ ঢুকে পড়ল 'কথা বলা কম্পিউটার'-এর ঘরে।

সুন্দর করে সাজানো ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা চকচকে কাচের বাক্স। তার ভেতরে বসানো রয়েছে একটা সুপারকম্পিউটার 'ক্রে-১০'। একটা মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে যে-কোনও প্রশ্ন করলেই কম্পিউটার তার ধাতব যান্ত্রিক স্বরে উত্তর দিচ্ছে। উত্তর দেওয়ার সময় তার প্যানেলের লাল-নীল-হলদে-সবুজ বাতিগুলো জ্বলছে নিভছে। সামনে টাঙানো ডিজিটাল বোর্ডে প্রশ্ন করার নির্দেশ লেখা রয়েছে।

সুরনাথ পড়লেন ঃ কোনও ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা চলবে না, কোনও দার্শনিক প্রশ্নও করা চলবে না। শুধুমাত্র তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন। যেমন ঃ 'মেট্রো রেল কত ভোল্টেজে চলে?', 'শহিদ মিনারের উচ্চতা কত?', 'রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম কবিতা কী?', 'মিশরের পিরামিডের বয়েস কত?' এইরকম আরও সব হরেকরকম প্রশ্ন।

পলাশের খেলার পর সুরনাথের পালা। দাদুকে পলাশ খেলাবেই। অতএব

নিরুপায় সুরনাথ সুপারকম্পিউটারের সামনে ভ্যাবাচাকা হয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। তাঁর বেশিরভাগ প্রশ্নই অর্থহীন—অন্তত কম্পিউটারের কাছে। 'মানুষ এতদিন বাঁচে কেন?' 'সুখ কাকে বলে?'—এইরকম গোটাতিনেক প্রশ্ন করতেই কম্পিউটার যান্ত্রিক গলায় জানিয়ে দিল, 'অর্থহীন প্রশ্ন। নির্দেশ মেনে তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন করুন।'

পলাশও বারবার বলতে লাগল, 'কী হচ্ছে দাদু! একটা বুদ্ধির প্রশ্ন করো না।'

বুদ্ধির প্রশ্ন? সব প্রশ্ন কেবলই মাথা খাটিয়ে করতে হবে? মনের ভেতর থেকে কোনও প্রশ্ন করা যাবে না? কম্পিউটারের ক্ষমতা এতই সীমাবদ্ধ!

সুতরাং সতর্ক সুরনাথ মাথা খাটিয়ে কয়েকটা মামুলি প্রশ্ন করতে পারলেন। কম্পিউটারও দিব্যি তার উত্তর দিল।

'কথা বলা কম্পিউটার'-এর পর 'রোবট ডিটেকটিভ'। তারপর 'মহাকাশের রোমাঞ্চ'। পলাশের পাল্লায় পড়ে সব খেলাই খেলতে লাগলেন সুরনাথ। খেলতে খেলতে তাঁর বয়েস যেন কমে যাচ্ছিল। খেলাগুলো সম্পর্কে ডিজিটাল বোর্ডে নানা কথা লেখা : 'রোল প্লেয়িং গেম', 'ভারচুয়াল রিয়েলিটি', 'হলোগ্রাফিক গ্রাফিক্স', আরও অদ্ভুত-অদ্ভুত সব কথা।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছিল। পলাশকে তাড়া দিতেই ও অনুনয়ের সুরে বলে উঠল, 'ওই খেলাটাই লাস্ট, দাদু—প্লিজ।'

সুরনাথ তাকিয়ে দেখলেন : 'সময় সাফারি'।

আরও কাছে এগোতেই 'সত্যিকারের টাইম মেশিন' কথাটাও চোখে পড়ল। টিকিট কাটার পর একজন লোক এগিয়ে এসে খেলার নিয়মকানুন জানিয়ে দিল বিশদভাবে। লোকটির সঙ্গে পলাশ ঢুকে পড়ল একটা ঘরে। তারপর পরদা টেনে দিল কে যেন।

পরদার বাইরে দাঁড়িয়ে সুরনাথ অপেক্ষা করতে লাগলেন। লক্ষ করলেন, তাঁর পিছনে যারা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের প্রায় সকলেই কমবয়েসি—সুরনাথের মতো বৃদ্ধ কেউই নেই।

সুরনাথের সঙ্কোচ হচ্ছিল। নাতির সঙ্গে মেলায় এসে এ কী বিড়ম্বনা! নিজের বয়েসটার কথা ভুলে যাওয়া মোটেই ঠিক হয়নি।

আর ঠিক তখনই পরদা সরিয়ে বেরিয়ে এল পলাশ, পিছনে সেই লোকটি।

পলাশ সুরনাথের হাত চেপে ধরে উত্তেজিত গলায় বলল, 'দাদু, কী দারুণ খেলা! ডিজনিল্যান্ড দেখলাম, ব্রাজিলের পেলের খেলা দেখলাম, আইজ্যাক নিউটনকে দেখলাম অঙ্ক করছে, সিপাহি বিদ্রোহ, আইফেল টাওয়ার—আরও কত সব জিনিস দেখলাম...।'

পরদার পাশে দাঁড়ানো লোকটি সুরনাথকে তাড়া দিয়ে ডাকল, 'জলদি আসুন,

দাদু, দেরি হয়ে যাচ্ছে—' তার মুখ দেখে বোঝা গেল, সুরনাথকে দেখে বেশ অবাক হয়েছে।

পলাশ বলল, 'তাড়াতাড়ি যাও, দাদু। আমি এইখানে দাঁড়িয়ে থাকব—তোমার কোনও চিন্তা নেই।'

সুরনাথ ইতস্তত করছিলেন। নিশ্চয়ই নানারকম ফিল্ম দেখিয়ে বাচ্চাদের ভুলিয়ে মুগ্ধ করার ব্যবস্থা রয়েছে ভেতরে। তবে তাঁর মতো একজন বৃদ্ধকে ওরা বোধহয় ভোলাতে পারবে না।

ভেতরে ঢুকতেই পরদা টেনে দিল লোকটি। পলাশ আড়াল হয়ে গেল। তখনই ঘরটাকে খুঁটিয়ে দেখলেন সুরনাথ।

ছিমছাম সাজানো ঘর। লুকোনো আলোয় আলোময়। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা বিচিত্র চেহারার গাড়ি। গাড়িটায় কোনও চাকা নেই। গাড়ির ওপরটা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ডোমে ঢাকা। গাড়িতে বসার আসন মাত্র একটাই। তবে কোনও স্টিয়ারিং নেই। তার বদলে রয়েছে একটা প্যানেল। প্যানেলের ওপরে কয়েকটা বোতাম, রঙিন বাতি, দুটো ডায়াল, আর একটা ডিজিটাল ঘড়ি রয়েছে। অন্তত সুরনাথের তাই মনে হল।

পেশাদারি সুরে লোকটি সুরনাথকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

এই গাড়িটা সাধারণ গাড়ি নয়, টাইম মেশিন। এতে চড়ে প্যানেলের ডায়াল ঘুরিয়ে অতীতে যে-সময়ে যেতে চাই তার সময়টা সেট করে দিতে হবে। আর দ্বিতীয় ডায়ালটা আসলে একটা ডিজিটাল ডিকশনারি। ইতিহাসের কোনও ঘটনা বা দ্রষ্টব্য কোনও জিনিস দেখতে চাইলে তার নাম বোতাম টিপে ফুটিয়ে তুলতে হবে ডায়ালের ওপরের ছোট পরদায়। তারপর নির্দিষ্ট কয়েকটা বোতাম টিপলেই মনের মতো দৃশ্য দেখা যাবে। তবে এই সময়-ভ্রমণ শুধুমাত্র অতীতে হতে পারে, ভবিষ্যতে নয়।

সবকিছু বুঝিয়ে দেওয়ার পর লাল রঙের একটা ছোট্ট বোতাম ভালো করে দেখিয়ে দিল লোকটি। এই বোতাম টিপে ফিরে আসতে হবে এই ঘরে—অর্থাৎ বর্তমান সময়ে।

সুরনাথকে গাড়িতে বসতে সাহায্য করল লোকটি। তাঁর হাতের লাঠিটা রেখে দিল ঘরের এক কোণে। বৃদ্ধকে সিটে বসিয়ে বলল, 'আপনি একটুও ভয় পাবেন না যেন। আপনি যেখানেই বেড়াতে যান না কেন, সেখানকার কেউ আপনাকে দেখতে পাবে না। আর কোনওরকম অসুবিধে হলেই ওই লাল বোতামটা টিপে দেবেন, কেমন—?'

ঘরের এক কোণে গিয়ে দাঁড়াল লোকটি। কী যেন একটা করল, সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের আলোর তেজ কমতে শুরু করল। অন্ধকার হয়ে আসা ঘরের এক কোণ

থেকে লোকটির আবছায়া মূর্তি বলে উঠল, 'এবারে মেশিন চালু করুন—।'

কাঁপা হাতে বোতাম টিপলেন সুরনাথ। বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে। শিশুদের এই খেলায় বৃদ্ধ বয়েসে কেন নাম লেখালেন তিনি? আশঙ্কা আর রোমাঞ্চ লুকোচুরি খেলছিল তাঁর মনের মধ্যে। ঠিক তখনই আবছা অন্ধকারে একটা লেখা ফুটে উঠল তাঁর চোখের সামনে : 'কোথায় বেড়াতে যেতে চান আপনি?' সেইসঙ্গে 'বেড়াতে' যাওয়ার জন্য কোন-কোন বোতাম কীভাবে পরপর টিপতে হবে তারও স্পষ্ট নির্দেশ ফুটে উঠল।

দিশেহারা সুরনাথ বিয়ের পরে পুরীতে বেড়াতে যাওয়ার সময়টা বেছে নিলেন। বোতামগুলো টিপে দিলেন ঠিকঠাক। বুঝতে পারছিলেন, যন্ত্র তাঁকে কিছুতেই সেখানে নিয়ে যেতে পারবে না। বাচ্চাদের ভোলানোর জন্য ওরা নানারকম ফিল্মের ব্যবস্থা রাখে—সুরনাথের বেলা সে তো আর সম্ভব নয়...।

ঠিক তখনই অলকাকে দেখতে পেলেন। কী আশ্চর্য!

তরুণী সদ্যবিবাহিতা অলকা পড়ন্ত বিকেলে হোটেলের সমুদ্রমুখী বারান্দায় দাঁড়িয়ে। হু হু সাগরিকা বাতাসে ওর চুল উড়ছে। হাতিবাগানের শ্রীমার্কেট থেকে গোলাপি সাদা ফুলকাটা একটা শাড়ি খুব পছন্দ করে কিনেছিলেন সুরনাথ। অলকা সেই শাড়িটা পরে আছে।

সুরনাথের বুকের ভেতরে কষ্ট হল। চোখ জ্বালা করতে লাগল। অলকা যদি সারাজীবন এইরকম থাকত। যদি কোনও কালো বাক্স না থাকত সুরনাথের জীবনে!

সুরনাথ একবার ডেকে উঠলেন অলকার নাম ধরে : 'বউ।' এটা সুরনাথের দেওয়া অলকার একান্ত গোপন নাম। গত দশবছরে এই নামটা কি একবারও ব্যবহার করেছেন তিনি? মনে পড়ে না।

অলকা সুরনাথের ডাক শুনতে পেল না। ওর ঠোঁট নড়ছিল। বোধহয় গান গাইছে গুনগুনিয়ে। জীবন্ত এক ছবি।

সুরনাথ আবার হাত দিলেন বোতামে। স্মৃতিপথের গোলকধাঁধায় আজ স্বেচ্ছাচারীর মতো ঘুরে বেড়াবেন তিনি। সুতরাং পর্যটক সুরনাথ ফিরে গেলেন ছেলেবেলায়।

মাইকেলনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। একেবারে চোখের সামনে। ওই তো নীতিন, পরি! টিফিনের সময়ে খেলতে বেরোচ্ছে মাঠে। মাঠের প্রান্তে পরপর কয়েকটা বকুল গাছ। সুরনাথ জানেন, খেলার শেষে ওরা বকুল ফল পাড়বে। ওরা সবাই আছে, শুধু সুরনাথ সেখানে নেই।

এরপর শুধু বোতাম টেপার খেলা।

জনার্দনস্যারের কোচিংয়ে চুমকিকে দেখতে পেলেন সুরনাথ। বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। ওঃ, সেই ডুরে শাড়িটা! সারাটা জীবন ধরে এই শাড়িটার রং সুরনাথ

ভুলতে পারলেন না কিছুতেই। জীবনে এক-একটা জিনিস এরকম থাকে।

চুমকিকে দেখতে-দেখতে সুরনাথ সাদা বাক্সটার কথা ভাবছিলেন। সাদা বাক্সে চুমকির অনেক স্মৃতি, অনেক গল্প। আর কালো বাক্সে চুমকির হারিয়ে যাওয়ার দুঃখ। চুমকি ছিল বলেই তো ওকে হারাতে কষ্ট হল। সাদা বাক্স থেকেই কি তা হলে কালো বাক্সের জন্ম? সাদা-কালোয় কোনও তফাত নেই?

চুমকিকে দেখার দিনগুলোয় পরপর ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সুরনাথ। ওকে গল্পের বই পড়তে দেওয়া, চিঠি দেওয়া, পুকুরপাড়ের কলাবাগানে লুকিয়ে দু-মিনিট কথা বলা।

না, চুমকির কোনও কথাই শুনতে পাচ্ছেন না সুরনাথ। আর সেইজন্যই হয়তো চুমকির ভালোবাসা-আতুর মুখের প্রতিটি খুঁটিনাটি গভীর মনোযোগে লক্ষ করতে পারছেন।

ওঃ, কী সুন্দর ছিল অতীতের এই দিনগুলো!

সুরনাথ আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন স্মৃতিপথে। ভাবলেন, লাল বোতাম টিপে ফিরে না গেলে ক্ষতি কী! যদি থেকে যাই এই গাছপালা প্রকৃতিমাখা ছেলেবেলায়! চুমকির কাছে! তাঁর অভাব টের পাবে না কেউ। অলকা, মালবিকা, রানা, তনু, অপু, মমতা, রাণুর মা, কেউ টের পাবে না। শুধু পলাশ—।

ঠিক তখনই কচি গলায় একটা ডাক শুনতে পেলেন যেন।

'দাদু!' পলাশ ডাকছে!

সত্যিই কি পলাশ ডাকছে?

চুমকিকে দেখতে-দেখতেই পলাশের ডাক কানে গিয়েছিল সুরনাথের। এক অদ্ভুত টানাপোড়েন তাঁকে অস্থির করে তুলল। স্মৃতিপথে হারিয়ে যাওয়া মানুষটা অন্ধের মতো হাতড়ে-হাতড়ে ফিরে আসতে চাইল বর্তমানে। আর তখনই মনে পড়ে গেল উপেক্ষাময় জীবনের কথা, উত্তর জানা অঙ্কের কথা, গরু রচনার কথা।

লাল বোতামটার ওপরে সুরনাথের আঙুল অপেক্ষা করতে লাগল। পলাশ কি এখনও ডাকছে? আর চুমকি, নীতিন, পরি, ওরা সবাই...।

'দাদু...।'

ছিন্নবিচ্ছিন্ন সুরনাথ গভীর শূন্য চোখে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। লাল বোতামের ওপরে তাঁর আঙুল তখনও অপেক্ষা করছে...।



বিকল্পকবি সুবল বসু

সুবলকে খুব একটা কেউ চেনে না। আমার ছেলেবেলার বন্ধু। একসঙ্গে খেলাধুলো করতাম দেশবন্ধু পার্কে। তারপর স্কুল পেরিয়ে কলেজ, ইউনিভারসিটি—এবং সবশেষে চাকরি। সুবল আমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি সবসময়। যেমন, কলেজে আমরা একইসঙ্গে ফিজিক্স অনার্স নিয়ে পড়েছি। তারপর, নম্বর যথেষ্ট ভালো থাকা সত্ত্বেও, ও হঠাৎই একদিন জানাল, আর পড়ব না।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, কেন? পড়বি না কেন?

মাথার কোঁকড়া চুলের গোছায় টান মেরে সুবল বলেছে, নাঃ, পড়াশোনার মধ্যে কোনও সিমেট্রি নেই—।

আমি ঘাবড়ে গেলাম। সিমেট্রি? প্রতিসাম্য? পড়াশোনার মধ্যে আবার সিমেট্রির খোঁজ পড়ল কেন?

ওকে অনেক করে বোঝালাম। ফিজিক্সে আমার চেয়ে ওর নম্বর বেশি ছিল। সুতরাং বারবার করে বললাম, এরকম ভুল করিস না। মাসিমা মেসোমশাই কষ্ট পাবে।

সুবল কোনও কথায় কান দিল না। পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। তখন পার্কের সীমানায় ইউক্যালিপটাস গাছের মাথায় লাল সূর্য হেলে পড়েছে।

পার্কের বড় মাঠে বল খেলছে সবাই। ধুলো উড়ছে।

সুবল বলল, অতীন, একটা ব্যাপার খেয়াল করেছিস?

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। শ্যামলা রং। চোখ উজ্জ্বল। সেখানে লালচে ছায়া পড়েছে। জিগ্যেস করলাম, কী?

এই রোজ সূর্য ওঠা আর অস্ত যাওয়ার মধ্যে কেমন একটা সিমেট্রি—।

সত্যিই তো, আগে তেমন করে ভাবিনি। ভোরের সূর্যও লাল, শেষবেলার সূর্যও লাল। আর দুপুরের সূর্য সবচেয়ে প্রখর। জ্বলন্ত এক হলদে চোখ।

সুবল আবার বলল, ঠিক একইরকম ব্যাপার চাঁদের মধ্যেও রয়েছে। আস্তে-আস্তে বাড়ে, আবার আস্তে-আস্তে কমে। অমাবস্যা-পূর্ণিমার সিমেট্রি—।

আমার ভারী অদ্ভুত লাগল। সূর্য বা চাঁদের আচরণে প্রতিসাম্য আছে বলেই পড়াশোনার মধ্যেও সিমেট্রি থাকতে হবে! এ কী অদ্ভুত দাবি!

সুবল বলল, অতীন, গত কয়েকমাস ধরে সিমেট্রি খোঁজাটা আমার একটা অসুখের মতো হয়ে গেছে। বিশ্বাস কর, আমি আর পারছি না—।

ওর কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা অসহ্য যন্ত্রণা লুকিয়ে ছিল। আর সেই সময়ে ওর মুখে কেমন এক অসহায় ছেলেমানুষের ভাব ফুটে উঠেছিল। আমার খুব কষ্ট হল। ছেলেটা পাগল হয়ে যাবে না তো?

সন্ধের ছায়া গাঢ় হচ্ছিল ক্রমশ। ছেলের দল খেলা শেষ করে ফিরে যাচ্ছে। পাখিরা বড়-বড় ঝাঁকড়া গাছের আস্তানায় ফিরে এসে রোজকার ঝগড়াঝাঁটি শুরু করে দিয়েছে। সুবলকে বললাম, ওসব আজেবাজে চিন্তা ছাড় তো। চল, ওঠ—।

পাড়ার দিকে ফিরতে-ফিরতে আমি জিগ্যেস করলাম, তোর হঠাৎ করে এসব সিমেট্রির কথা মনে হল কেন?

ও একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, অতীন, তুই কখনও আমার পুরো নামটা খেয়াল করেছিস?

কেন করব না? সুবল বসু—।

ও গাঢ় গলায় বলল, নামটা উলটো করে পড়লে কী হয় বল তো!

আমি বিড়বিড় করে ওর নামটা আওড়ালাম। সুবল বসু...সুবল বসু...আরে! এ যে দেখছি একই নাম ফিরে পাচ্ছি!

ওকে কথাটা বলামাত্রই ও বিষণ্ণ হাসল। বলল, আমিও প্রথমটা অবাক হয়েছিলাম। এ ধরনের শব্দ কিংবা সেনটেন্সকে ইংরেজিতে প্যালিনড্রোম বলে। গ্রিক 'প্যালিন্‌ড্রোমাস' শব্দ থেকে এসেছে। এর মানে হল, এমন কোনও শব্দ, বাক্য বা সংখ্যা যা সোজা কিংবা উলটো করে পড়লেও পালটায় না। দ্বিমুখী অবিকল—

আমি একটু অবাক হয়েই ওর কথা শুনছিলাম। এতসব অ-পদার্থবিদ্যার

জিনিস ও পড়ল কখন?

জিগ্যেস করতেই সুবল বলল, সাধ করে কি আর পড়েছি। এ-লাইব্রেরি সে-লাইব্রেরি ঘেঁটে সামান্য কয়েকটা লেখাপত্তর পড়তে পেরেছি। তাতেই আমার স্পষ্ট মনে হয়েছে, আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোথায় যেন একটা প্যালিন্‌ড্রোমের মতো সিমেট্রি রয়েছে। যেমন তোকে বললাম চাঁদ আর সূর্যের কথা—।

আমি কী বলব ভেবে পেলাম না।

সুবল শব্দ করে হাসল। সামনে থেকে একটা গাড়ি হেডলাইট জ্বেলে ছুটে আসছিল। ওর মুখে জোরালো আলো পড়ল। সেখানে কয়েকটা চিন্তার ভাঁজ দেখতে পেলাম।

সুবল বলল, শুধু নাম নয়। নামের ব্যাপারটা টের পাওয়ার পরও আমি এ নিয়ে এতটা ভাবিনি। কিন্তু নামের সঙ্গে জন্মতারিখটা মেলাতেই কেমন যেন হয়ে গেলাম।

কত তোর জন্ম তারিখ?

১৯ জানুয়ারি ১৯৯১—।

তাতে কী হল?

কাছাকাছি একটা পানের দোকানে আমাকে টেনে নিয়ে গেল ও। একচিলতে কাগজ আর ডট পেন চেয়ে নিয়ে লিখল : ১৯-১-৯১। তারপর বলল, শুধু জন্মসালটা যে প্যালিন্‌ড্রোমিক সংখ্যা তা নয়, ১৯১৯১ সংখ্যাটাও একটা দ্বিমুখী অবিকল।

আমরা আবার হাঁটতে শুরু করে দিলাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ পাশাপাশি হাঁটার পর সুবল আবার বলল, আমার পিসিমা আমাকে ঠাট্টা করে সবসময় বলে বাপ কা বেটা। কারণ, প্রথম কথা বলতে শিখে আমি নাকি বাবা বলেছিলাম। সাধারণত বাচ্চারা 'মা' কথাটা দিয়ে শুরু করে। এ নিয়ে কখনও কিছু ভাবিনি। কিন্তু প্যালিন্‌ড্রোম ব্যাপারটা মাথায় ঢোকার পর অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, 'বাবা' শব্দটা দ্বিমুখী অবিকল—।

আমি হেসে বললাম, এসব নিতান্ত কাকতালীয় ছাড়া আর কিস্যু না—।

সুবল হাসল না। বলল, অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা, আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিও নাকি নিছকই কাকতালীয় ঘটনা।

হেমন্তের রাতের বাতাস আমার ঘাড়-গলা ছুঁয়ে গেল। সুবলের কথায় কাঁটা দিল গায়ে।

এরপর বেশ কিছুদিন ওর সঙ্গে দেখা নেই। হঠাৎই একদিন হাতিবাগান বাজারে নরেনের সঙ্গে দেখা। নরেনও আমার কলেজের বন্ধু। তবে এখন বিধান সরণি আর বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে ফোটোগ্রাফির দোকান করেছে। নিছক কুশল

বিনিময় করে ওকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলাম, কিন্তু নরেন আমাকে ডাকল। বলল, একটু বাইরে আয়, তোর সঙ্গে কথা আছে।

ভুরু কুঁচকে নরেনের পেছন-পেছন বাজারের বাইরে বেরিয়ে এলাম। ফলের দোকানগুলোর সামনে গাছতলায় দাঁড়িয়ে নরেন জিগ্যেস করল, অ্যাই, সুবলের কি মাথায় কোনও গোলমাল হয়েছে?

আমি বললাম, না তো। তবে ও আর পড়াশোনা করবে না—।

সে না করুক। আরে, এখন তো ও আমার দোকানে প্রায়ই আসে। প্রথম তো আমার নাম নিয়ে পড়েছিল। বলল, আমার নামটা নাকি প্যালিন্‌ড্রোম না কী যেন। তারপর মুখের আধখানা করে ফটো তোলাতে শুরু করেছে। ওর মুখের ডানদিকের ছবি তুলে, বাঁ-দিকের আধখানার সঙ্গে মিলিয়ে বলতে হবে কতটা কি তফাত। বোঝ ব্যাপার! ওর মুখের ছবি তুলে সুপারইমপোজ করে মিলিয়ে-টিলিয়ে তো দিলাম। তারপর থেকে ও বিভিন্ন লোকের ছবি নিয়ে আসতে শুরু করল। সব ছবি থেকেই শুধু মুখের ছবিটুকু তুলে নিয়ে ডান দিকের আধখানা বাঁ-দিকের আধখানার সঙ্গে মিলিয়ে কতটা গরমিল তা বলে দিতে হবে—।

তুই করে দিয়েছিস সেগুলো?

হ্যাঁ, করব না কেন। পয়সা দেওয়ার ব্যাপারে ও কখনও গোলমাল করেনি। তা ছবি-টবি সব দেখে সুবল ভীষণ মুষড়ে পড়েছিল। কারণ, কারও মুখেরই দুটো আধখানা হুবহু মিলছিল না। আমরা তো ফটো তুলি, জানি। যে-কোনও মানুষের মুখকে লম্বালম্বি দু-ভাগে ভাগ করলে দুটো ভাগ কখনও আয়নার ছায়ার মতো একরকম দেখতে হয় না। ওকে সে-কথা বলতেই কেমন চুপসে গেল। দোকানের আর-পাঁচজন কাস্টমারের সামনেই বলল, 'আমার থিয়োরি তাহলে ভুল? হতেই পারে না।' তারপর দুমদাম করে বেরিয়ে গেল দোকান ছেড়ে।

একটু দম নিল নরেন। তারপর বলল, সেইজন্যেই তোকে জিগ্যেস করলাম সুবলের মাথায় কোনও গোলমাল হয়েছে কি না—।

আমি হতবাক হয়ে মাথা নাড়লাম। একটা অটোরিকশা আমাদের পেছনে এসে কর্কশ স্বরে হর্ন বাজাচ্ছিল। আমি 'আসি' বলে আবার বাজারে ঢুকলাম।

সেদিন বিকেলে সুবলকে দেখলাম। মাথার মাঝবরাবর সোজা করে সিঁথে কেটেছে। আর দুপাশের চুলের ছাঁদ হুবহু একরকম। বুঝলাম, ও নিজের থিয়োরি প্রমাণ করার চেষ্টায় আছে। কিন্তু থিয়োরিটা যে ঠিক কী, সেটাই আমার মগজে কখনও ঢোকেনি।

আমি ওকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু সুবলই আমাকে ডাকল। বলল, আয় না, বোস, ক'টা কথা বলব তোকে—।

সুতরাং নিরুপায় হয়ে ওর সঙ্গে বসে পড়লাম ফুটপাথের একটা চায়ের

দোকানে। ভাঁড়ে চা নিয়ে চুমুক দিতে শুরু করলাম। দু-এক চুমুক পরেই সুবল হঠাৎ বলল, জানিস, অতীন, আমি কবিতা লেখার চেষ্টা করছি।

আমি চুপচাপ দেখতে লাগলাম ওকে। এখন আর সহজে অবাক হব না আমি।

সুবল ওর জামার পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করল। তারপর সেটা খুলে দেখাল আমাকে ঃ

ভালোবাসা, শুধু ভালোবাসা

ভালোবাসা বড়, অনেক বড়,
প্রিয়তমা হে—
ঈশ্বর, আকাশ, সাগর
সবকিছু মিছে।
ভালোবাসা এইটুকু বুকে—
যেন মহাকাশ।

মহাকাশ যেন বুকে,
এইটুকু ভালোবাসা।
মিছে সবকিছু—
সাগর, আকাশ, ঈশ্বর।
হে প্রিয়তমা,
বড়, অনেক বড় ভালোবাসা।

কবিতাটা পড়েই বুঝলাম, সুবল এর মধ্যেও সিমেট্রি এনেছে। কবিতার নামে তো বটেই, এমনকী প্রথম স্তবক আর দ্বিতীয় স্তবকও হুবহু এক। প্রথম স্তবকটা উলটে পড়লেই পাওয়া যাবে দ্বিতীয় স্তবক।

আমি হেসে বললাম, তুই তা হলে কবি হয়েছিস!

কবিতার কাগজটা পকেটে রেখে সুবল পালটা হাসল। মাথার মাঝবরাবর সিঁথে কাটায় ওর মুখটা একটু যেন অন্যরকম লাগছে। ও বলল, অতীন, আমি কবি নই—বিকল্পকবি।

এবারে অবাক হলাম। বিকল্পকবি কথাটার মানে কী?

সুবল বুঝল আমার প্রশ্নটা। বলল, আমার কবিতা সবই প্যালিন্‌ড্রোম। তাই আমার কবি-পরিচয়ও বিকল্পকবি। অর্থাৎ, সাধারণ কবির থেকে আলাদা, আর তা

ছাড়া...তুই রাগ করবি না তো!

না, না, রাগ করব কেন?

একটু সঙ্কোচের সঙ্গে সুবল বলল, খেয়াল করিসনি, 'বিকল্পকবি' শব্দটা একটা প্যালিন্‌ড্রোম—।

নাঃ, নরেনের কথাই দেখছি ঠিক। ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে ভাঁড়টা ফেলে উঠে দাঁড়ালাম ঃ চলি—।

সুবল আমাকে হাত ধরে টেনে বসাল। দোকানদারকে বলল আবার চা দিতে। তারপর নিজের চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, অতীন, আমার দুঃখ কী জানিস? আমার কথা কেউ মন দিয়ে শুনতে চায় না। তুই যদি একটু শুনিস, তা হলে আমার মনটা শান্ত হয়। শুনবি?

ওর গভীর দুটো চোখে কাতর অনুনয় ফুটে উঠেছিল। পাশের বেঞ্চে বসা আর-একজন মাঝবয়েসি খদ্দের আমাদের দেখছিল। দ্বিতীয় ভাঁড় চা হাতে নিয়ে আমি বললাম, বল, শুনব।

প্রথম ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে দ্বিতীয় ভাঁড়ে চুমুক দিল সুবল। বলল, প্রকৃতিতে কত সিমেট্রি আছে দেখেছিস? একটা গাছের কথাই ধর—কাণ্ডের দুপাশে মোটামুটি সমতা বজায় রেখে বেড়ে ওঠে। এ ছাড়া পশু-পাখি, এমনকী মানুষও। তাদের চেহারার আদলে কি সিমেট্রি নেই? যেমন, আমাদের শরীরে যেসব জিনিস জোড়সংখ্যায় আছে, সেগুলো সমানভাব দুপাশে সাজানো। যেমন, হাত-পা, চোখ, আঙুল, মেয়েদের বুক। আর যেগুলো একটা করে রয়েছে, সেগুলো ঠিক দেহের মাঝবরাবর সাজানো। কপাল, নাক, মুখ, নাভি! তা হলে এবার তুই-ই বল, আমাদের শরীরটা একটা প্যালিন্‌ড্রোম কি না?

সত্যি, এভাবে কখনও ভাবিনি। সুবলকে আমি কী বলব, পাগল, না দার্শনিক?

সুবল ভূতে পাওয়া মানুষের মতো বলে যাচ্ছিল।

এ ক'মাসে আমি অনেক বইপত্তর পড়ে ফেলেছি। তুই ভাবিস না যে, দ্বিমুখী অবিকল কবিতা আমিই প্রথম লিখেছি। বাংলায় আমার আগে কেউ লেখেনি ঠিকই, তবে বহুকাল আগে সংস্কৃতে লেখা হয়েছে। সংস্কৃতে লেখা 'শিশুপাল বধ' কবিতায় এরকম চরণ ছিল। পণ্ডিতরা এগুলোকে বলত 'সর্বোতোভদ্র'—অর্থাৎ, সবদিক থেকেই নিখুঁত। দেখ, ঠিক এইরকম ব্যাপারটাই প্রকৃতির বহু জায়গায় রয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গ্রহ, উপগ্রহ, তারা থেকে পরমাণুর ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, কোয়ার্ক—কোনওটাতেই এর অভাব নেই।

আমাদের চা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। ওঠার মুখে সুবল বিড়বিড় করে বলল, শুধু শালা আমাদের জীবনটাতেই কোনও সিমেট্রি নেই।

ওর কথাগুলো আমি শুনতে পেয়েছিলাম। তখন বুঝতে পারিনি, এই

প্যালিন্‌ড্রোম পাগল ছেলেটা সিমেট্রির জন্যে কতদূর যেতে পারে।

এর বছরদেড়েক পরে সুবল কনকলতা নামের একটি মেয়েকে বিয়ে করল। মেয়েটি রেলওয়েতে চাকরি করে। বিয়েটা শুনেছিলাম প্রেম করেই, কিন্তু সুবল নিজে আমাকে কখনও কিছু বলেনি। শুধু বলেছিল, ওর নামটাকে ছেঁটে আমি 'কনক' করে নিয়েছি। বুঝলাম, বিয়ের পরেও ওর মাথা থেকে প্যালিন্‌ড্রোমের ভূত যায়নি।

এরপর সুবলের সঙ্গে খুব একটা দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। ও বাড়ি ছেড়েই বেরোত খুব কম। তবে রাস্তায় কনকলতার সঙ্গে দেখা হলে সুবলের খবর নিতাম। শুনতাম, ও নাকি দিনরাত্তির বই আর কাগজপত্রে মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে। এ ছাড়া ঘরের সব জিনিসই ও নতুন করে সাজিয়েছে—যাতে মোটামুটি একটা সিমেট্রি বজায় থাকে। আর খুঁটিনাটি যে-কোনও জিনিস কেনার সময়েও তাই। যেমন, সিলিং ফ্যান কিনেছে চার ব্লেডের। গোলমরিচ ঢালার ছোট্ট শৌখিন কৌটোয় বিজোড় সংখ্যার ফুটো ছিল বলে নিজে আর-একটা ফুটো করে নিয়েছে।

কনকলতার মুখে আমি যন্ত্রণার ছাপ দেখেছিলাম। সুবল যে চাকরি-বাকরি করে না, তা নিয়ে ওর কোনও দুঃখ নেই। কিন্তু ও আর-একটু স্বাভাবিক হয়ে উঠলে ভালো হত। অসহায় কনকলতাকে মেকি আশ্বাস ছাড়া আর কী-ই বা আমি দিতে পারতাম!

দিন চার-পাঁচ আগে একদিন দেখা পেলাম সুবলের।

রাত সাড়ে ন'টার সময়ে অরবিন্দ সেতুর রেলিঙে একা-একা বসে রয়েছে।

আমি মুদির দোকান থেকে বিস্কুট কিনে বাড়ি ফিরছিলাম। হঠাৎই একটা গাড়ির হেডলাইটের আলোয় ওকে চিনতে পারলাম।

কাছে গিয়ে সুবলকে দেখে খুব কষ্ট হল। এ কী চেহারা হয়েছে ওর! চুল উসকোখুসকো, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, চামড়ায় শুকনো ভাঁজ। শূন্য চোখে তাকিয়ে অরবিন্দ সেতুর ওপরে ছুটে চলা যানবাহনগুলো দেখছে।

সুবল।

আমার ডাকে ও চমকে উঠল। একটু দেরিতে চিনতে পারল আমাকে। তারপর ম্লান হেসে বলল, ও, তুই—।

এত রাতে এখানে বসে কী করছিস?

ও স্বাভাবিক সুরে জবাব দিল, দেখছি, যে-গাড়িগুলো এই ব্রিজের ওপর দিয়ে যায়, সেগুলো আবার ফিরে আসে কি না। জানিস অতীন, নম্বর মিলিয়ে দেখেছি, বেশিরভাগ গাড়িই আবার ফিরে আসে। এটাকে নিশ্চয়ই তুই সিমেট্রি বলে মানবি?

আমি ওর হাত ধরে ওকে রেলিং থেকে নামালাম, বললাম, বাড়ি যা। তোর বউ একা রয়েছে বাড়িতে—।

সুবল কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর আপনমনে দু-বার ঘাড় নেড়ে রওনা হল বাড়ির দিকে। মনে হল, একটা জটিল অঙ্ক মেলাতে গিয়ে ও হিমসিম খাচ্ছে—কিছুতেই সেটা মিলছে না।

ঠিক এর দু-দিন পর, অর্থাৎ, গত বৃহস্পতিবার আত্মহত্যা করেছে সুবল।

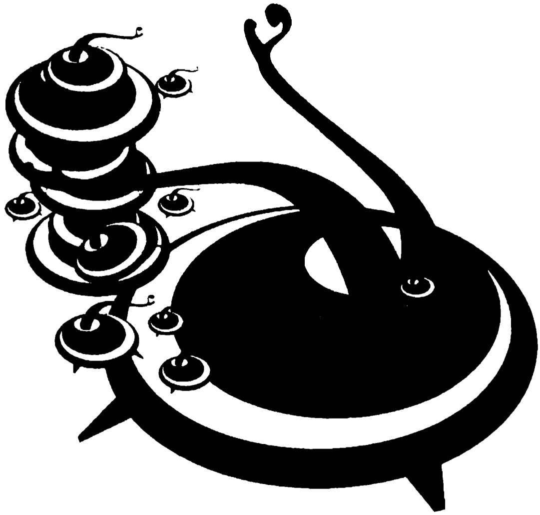
পাড়ার বেশিরভাগ লোকই এই অমিশুকে ছেলেটাকে চিনত না। কিন্তু আত্মহত্যা করার ফলে ওকে চিনে ফেলল সবাই।

চার ব্লেডের পাখার সঙ্গে নাইলনের দড়ি বেঁধে ফাঁস তৈরি করেছিল সুবল। ফাঁসের দুপাশে দড়ি দিয়ে সমান মাপের দুটো ফুল তৈরি করা—ঠিক বাচ্চা মেয়েদের বিনুনির মতো।

এ ছাড়া একটা সুইসাইড নোটও লিখে গেছে ও ঃ

জীবন এইরকম সবচেয়ে ভলো—
ভ্রূণ থেকে যৌবন, যৌবন থেকে ভ্রূণ,
ভালো সবচেয়ে, এইরকম জীবন।

জীবনের সিমেট্রির কথা মৃত্যুর আগের মুহূর্তেও ভোলেনি বিকল্পকবি সুবল বসু।



চরম অস্ত্র

কন্ট্রোল টাওয়ারের ইমার্জেন্সি ভিডিয়োফোন হঠাৎই জেগে উঠল। জ্যামিতিক আকারের ছ'কোণা ঘর। ফাইবারগ্লাসের দেওয়ালে ঘেরা। ঘরের মাঝখানে কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে বসেছিলেন জেনারেল ডেভিড সোয়ার্জকফ, পাশে মার্কিন অস্ত্রবিভাগের প্রধান টমাস ফাউনটেন।

সোয়ার্জকফ মুখের ওপরে হাত রেখে দুশ্চিন্তায় মাথা ঝুঁকিয়ে চোখ বুজে ছিলেন। আর ফাউনটেন তাকিয়ে ছিলেন প্যানেলের কম্পিউটার পরদার দিকে। তাঁর কপালে কয়েকটা ভাঁজ বলে দিচ্ছে যুদ্ধে তাঁরা সুবিধেজনক অবস্থায় নেই। যে-যুদ্ধ কয়েকঘণ্টায় শেষ হওয়ার কথা তা আজ গড়িয়ে কয়েকদিন, এমনকী দেড়সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। উপসাগরের একটা ছোট্ট দেশ যে এইভাবে রুখে দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন লড়তে পারে এ-কথা কেউই ভাবতে পারেননি।

টমাস ফাউনটেন প্রেসিডেন্টের কথা ভাবছিলেন। জরুরি মিটিং-এ তিনি স্পষ্টই আদেশ দিয়েছেন ঃ 'নিত্যনতুন মারাত্মক অস্ত্র তৈরি করুন। ফ্যাক্টরিতে চব্বিশঘণ্টা কাজ চলবে। চব্বিশঘণ্টা মানে চোদ্দোশো চল্লিশমিনিট—তার একমিনিটও কম নয়।'

সুতরাং আর্মস ফ্যাক্টরির চিফ ইঞ্জিনিয়ার জোসেফ আইনস্টাইনকে ফাউনটেন সেইরকমই নির্দেশ দিয়েছেন। আইনস্টাইন এই পদে আছেন প্রায় বারোবছর। বয়েস

মাত্র চল্লিশ, কিন্তু এর মধ্যেই কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত ছ'টা ক্ষেপণাস্ত্রের পেটেন্ট নিয়েছেন। তৈরি করেছেন লেজার নিয়ন্ত্রিত 'স্মার্ট' বোমা। নিত্যনতুন মারণাস্ত্র তৈরিতে আইনস্টাইনের জুড়ি নেই। এখন আইনস্টাইনই দেশের একমাত্র ভরসা। সারা বিশ্বের কাছে মার্কিন শক্তির ভাবমূর্তি যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে সোয়ার্জকফ, ফাউনটেন সকলেই তাকিয়ে আছে আইনস্টাইনের অভিনব আবিষ্কারের দিকে।

ফাইবারগ্লাসের একটা দেওয়াল জুড়ে ফুটে উঠেছিল আইনস্টাইনের রঙিন ছবি। ইমার্জেন্সি ভিডিয়োফোনে আইনস্টাইন কথা বলতে চান।

মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকা সোয়ার্জকফকে খোঁচা মারলেন ফাউনটেন। তারপর কন্ট্রোল প্যানেলের একটা বোতাম টিপতেই জোসেফ আইনস্টাইনের কথা শোনা গেল।

'গুড মর্নিং, স্যার—।'

'জলদি বলো, কী খবর? নতুন কিছু বের করতে পারলে?' ফাউনটেন বুঝতে পারছিলেন তাঁর প্রত্যাশা ও কৌতূহল মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যুদ্ধের পরিস্থিতিতে আবেগ ইত্যাদি কিছুতেই আর নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে না।

সোয়ার্জকফ বললেন, 'একটু আগেই খবর এসেছে, আমাদের নতুন ক্ষেপণাস্ত্রগুলোও ওরা অকেজো করে দিতে পেরেছে। তার ওপর সাগরে তেল ঢেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আমাদের নৌ-বাহিনী আর এগোতে পারছে না। এদিকে প্রায় দু-শো প্লেন ধ্বংস হয়ে গেছে। ওঃ, আইনস্টাইন, ডু সামথিং ফর গড্স সেক, উইল য়ু?'

দেওয়ালে আইনস্টাইনের ছবি হাসল, তারপর কথা বলল, 'স্যার, আমাকে এত চাপ দেবেন না, আমি আর পারছি না। আসলে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে আমার শুধু পদবিটুকুরই মিল, প্রতিভার ছিটেফোঁটাও মিল নেই। তবে প্রেসিডেন্টের আদেশ, তাই আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি।' আইনস্টাইন এবার ফাউনটেনকে লক্ষ করে বললেন, 'কেন স্যার, গত সপ্তাহে আপনাদের দু-দুটো নতুন ক্ষেপণাস্ত্র আমি তৈরি করে দিইনি?'

ফাউনটেন ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তা দিয়েছ—।'

'তবে সেগুলোকেও শত্রুপক্ষ ঘায়েল করতে পেরেছে।' বিদ্রূপের সুরে বলে উঠলেন সোয়ার্জকফ, 'এখন তৃতীয় বিশ্বের সবক'টা দেশ আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করছে। আমাদের ক্ষেপণাস্ত্রের নামে পোষা পায়রার নাম রাখছে—।'

শেষ কথাটায় যেন চমকে উঠলেন আইনস্টাইন। অপমানের সামান্য ছায়াও যেন নেমে এল মুখে।

ফাউনটেন বললেন, 'এখন সবাই ভাবছে রেগনের আমলে আমরা যে স্টার ওয়ার্স-এর জিগির তুলেছিলাম, তার সবটাই ফাঁকা আওয়াজ। আশ্চর্য, এত সব আধুনিক অস্ত্র ওইটুকু একটা পুঁচকে দেশ পেল কেমন করে?'

সোয়ার্জকফ ব্যঙ্গের সুরে ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, 'তা-ও বুঝতে পারছেন না? আমরাই গত দশবছরে যেসব অস্ত্র বেচেছি সেগুলোই এখন বুমেরাং হয়ে আমাদের ঘাড়ে ফিরে আসছে।'

'কিন্তু আমরা তো সাধারণত সেকেলে অস্ত্র বেচে থাকি—।'

ফাউনটেন কোনও জবাব দিলেন না।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। কিছু একটা না করলেই নয়। তারপর মরিয়া চোখে তিনি তাকালেন জোসেফ আইনস্টাইনের ছবির দিকে। বললেন, '১৯৪৫-এর ৬ আগস্টের কথা মনে আছে, আইনস্টাইন? আমি চাই হিরোশিমা-নাগাসাকির মতো কিছু একটা হেস্তনেস্ত হোক। এমন কিছু একটা তোমাকে তৈরি করতেই হবে যাতে এই যুদ্ধ একেবারে খতম হয়ে যায়। আর কোনও বিকল্প আমাদের হাতে নেই। আটঘণ্টা অন্তর-অন্তর এই কন্ট্রোল টাওয়ারে আমাকে কনট্যাক্ট করবে। ওভার অ্যান্ড আউট।'

কন্ট্রোল প্যানেলের বোতাম টিপলেন ফাউনটেন। আইনস্টাইনের হতবুদ্ধি মুখের ছবিটা দেওয়াল থেকে মুছে গেল। বেচারা যে-চাপের মধ্যে কাজ করছে! ওঁকে আর দোষ দিয়ে লাভ কী!

ফাউনটেনের চোখ জ্বালা করছিল। গত চব্বিশঘণ্টা দু-চোখের পাতা এক করতে পারেননি।

সোয়ার্জকফের অবস্থাও তাই। তিনি জড়ানো গলায় জিগ্যেস করলেন, 'প্রেডিডেন্টকে একটু পরেই খবর জানাতে হবে। কী বলব?'

ফাউনটেন কন্ট্রোল প্যানেলের টিভি পরদার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সেদিকে চোখ রেখেই বললেন, বলবেন প্রগ্রেস স্যাটিসফ্যাকটরি। আশা করছি কাল সকালের মধ্যে কিছু একটা ব্যবস্থা হবে।'

রাত ঠিক একটার সময় ইমার্জেন্সি ভিডিয়োফোনে কথা বললেন জোসেফ আইনস্টাইন। সোয়ার্জকফ জেগে ছিলেন, কিন্তু ফাউনটেন কন্ট্রোল প্যানেলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ভিডিয়োকল বোতাম টিপে অ্যাকসেপ্ট করে সোয়ার্জকফ জাগিয়ে দিলেন ফাউনটেনকে।

আইনস্টাইন বললেন, 'গুড নিউজ, স্যার। একটা মারাত্মক মিসাইল তৈরি করে ফেলেছি। ওটা লঞ্চ করার জন্য এক্ষুনি ব্যবস্থা করুন। আপনি যা চেয়েছিলেন একেবারে তাই। যদি এটা ফায়ার করে যুদ্ধ খতম না করতে পারি তা হলে আর কিছু করার নেই।'

সোয়ার্জকফ জিগ্যেস করলেন, 'এক্সপ্লোসিভ পাওয়ার কত টন?'

'সেটা হিসেবের বাইরে, স্যার,' আইনস্টাইন গর্বের সঙ্গে জানালেন, 'তবে এর

নাম দিয়েছি "ওয়ার-স্টপার"—নাম শুনেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন স্যার। আর আপনাকে ধন্যবাদ, স্যার, কারণ আপনার জন্যেই এই ক্ষেপণাস্ত্রের আইডিয়াটা পেয়েছি।'

সোয়ার্জকফ অবাক হয়ে গেলেন। ফাউনটেন ভিডিয়ো কানেকশন অফ করে দিয়ে চারিদিকে এমার্জেন্সি রেডিয়ো মেসেজ ছড়িয়ে দিলেন।

চারঘণ্টার মধ্যেই স্পেস প্লেনে করে 'ওয়ার-স্টপার' পৌঁছে গেল যুদ্ধ ঘাঁটিতে এবং সঙ্গে-সঙ্গেই কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে বসরা বন্দর-শহর লক্ষ করে ক্ষেপণাস্ত্রটি ছুড়ে দেওয়া হল। বহুজাতিক বাহিনীর অফিসার ও সৈনিকরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধ খতম হতে চলেছে।

বসরার ভোরের আকাশে 'ওয়ার-স্টপার'-এর বিস্ফোরণ ঘটল। ইরাকি সমর-বিশারদরা শত চেষ্টাতেও এই অভিনব ক্ষেপণাস্ত্রটিকে ঘায়েল করতে পারেননি।

কিন্তু বিস্ফোরণের সঙ্গে-সঙ্গে হতবাক হয়ে গেল সকলে। কোথায় চোখধাঁধানো আগুন? কোথায় বিষাক্ত ধোঁয়া? তার বদলে চোখে পড়ল তুষার-কুচির মতো অসংখ্য সাদা ফুটকি ভোরের আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে।

ওগুলো ক্রমশই চেনা গেল ঃ হাজার-হাজার সাদা পায়রা পাগলের মতো ডানা ঝাপটে উড়ে বেড়াচ্ছে আকাশে। সদ্য উঁকি দেওয়া সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ছে ওদের ডানার পালক থেকে। রাস্তায় লক্ষ-লক্ষ মানুষ এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখার জন্য জড়ো হয়ে গেল।

পায়রাগুলো আরও নীচে নেমে আসতেই ওদের কারও-কারও ঠোঁটে ধরা পলিমার দিয়ে তৈরি ইংরেজি হরফগুলো সকলের চোখে পড়ল। উড়ন্ত পায়রার ঝাঁক নিজেদের সাজিয়ে নিতেই পাঁচ অক্ষরের শব্দটা সকলে পড়তে পারল ঃ PEACE।

পায়রার ঝাঁক তখনও আনন্দে উড়ছে..উড়ছে...।



অশনি ও আবেগথেরাপি

ঘড়িতে সকাল আটটা। কিন্তু অশনি তখনও আড়মোড়া ভাঙছিল। ওর বড় বেড-টি-র শখ। একটু আগেই ও বেড-টি-র স্বপ্ন দেখেছে। মুক্তোমালা আদর করে ওকে ডাকছে। বিয়ের প্রথম দিককার মতো নরম ছোঁয়ায় ওর ঘুম ভাঙাচ্ছে। তারপর ঘুম-জড়ানো চোখ খুলতেই হাতে তুলে দিচ্ছে ধোঁয়া-ওঠা চায়ের কাপ। কিন্তু কী অদ্ভুতভাবে স্বপ্নের মধ্যেই অশনি বুঝতে পারছিল ও ভুল দেখছে—অর্থাৎ, স্বপ্ন দেখছে। ওটা ধোঁয়া-ওঠা চায়ের কাপ না হয়ে হবে রোয়া-ওঠা ফুলঝাড়ু। আর বেড-টি-টা নির্ঘাত ডেথ-বেড-টি।

বিছানায় উঠে বসে সবে প্রথম হাইটা তুলছিল অশনি। হাই ইনকমপ্লিট রয়ে গেল। মুক্তোমালা কী কাজে যেন শোওয়ার ঘরে এসেছিল, ঠান্ডা গলায় ফরমান শুনিয়ে গেল, জলদি বাজারে যাও। বাবার শরীরটা ভালো নয়। দেরি হলে রান্না দেরি হবে, আর রান্না মানে অফিসে দেরি হলে শেষে কিন্তু আমার দোষ দিয়ো না।

বাবা বলতে অশনির পিতা, মুক্তোমালার শ্বশুর। কিন্তু সে কেবল ভারতীয় সামাজিক বিধি অনুসারে। অশনির বদ্ধমূল বিশ্বাস, ওর বিয়ের পর থেকেই ওর নিজের পিতা মুক্তোমালার পিতায় রূপান্তরিত হয়েছে। তার ওপর মুক্তোমালার আসল পিতা মাইনাস হয়ে গেছে সেই কোন ছোটবেলায়। সেইজন্যই ও হয়তো অশনির ফাদারকে নিজের ফাদারের পুনর্জন্ম বলে ধরে নিয়েছে। কে জানে! মোট কথা ফাদার আর ডটারের স্নেহ-শ্রদ্ধা-ভালোবাসার লড়ালড়িতে অশনির অবস্থা 'মাপ করো' উপদেশ পাওয়া ভিখিরির মতো।

অতএব মুখ বেজার করে বাজারের থলে নিয়ে অশনি বেরিয়ে পড়ল। বেরোনোর সময়ে দেখল বসবার ঘরে সোফায় হেলান দিয়ে বাবা খবরের কাগজ পড়ছে। সামনের টেবিলে চা-বিস্কুট। মুক্তোমালা বাবাকে আর-একটা বিস্কুট সাধছে। আর বাবা একটি হত্যারহস্য খবরের কাগজ দেখে-দেখে বউমা অথবা মেয়েকে পড়ে শোনাচ্ছে।

হুঁ! বাবার শরীর ভালো নয়! আর অশনি বুঝি দারা সিং! যখন-তখন যা খুশি হুকুম করলেই হল। কিন্তু মুক্তোমালার হুকুমের প্রতিবাদ করা অশনির সাহসে কখনও কুলোয়নি। প্রতিবাদ করার কথা ভেবেছে বহুবার, ঠিক শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম জপ করার মতো—কিন্তু আসল কাজের সময়েই দ্যাখে ওর হাত-পাগুলো কেমন বশে থাকে না। বুকটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে। আর মুক্তোমালার কথা মানতে ইচ্ছে করে। ভয়ে হোক, ভক্তিতে হোক, ওর বাধ্য হতে ইচ্ছে করে।

সুতরাং বেরোনোর মুখে অশনি বলে গেল, চা-টা গরম করে রেখো, বাজারটা সেরে আসছি।

অশনির এই করুণ কাহিনি আজকের নয়, কম সে কম আধযুগ পুরোনো। এতদিনের চেষ্টাতেও ও সিংহ হয়ে উঠতে পারেনি—সেই শশকটিই রয়ে গেছে।

অশনির চেষ্টার রকমফের ছিল মন্দ নয়। একবার বাবার সঙ্গে পিস ট্রিটি, মুক্তোমালার সঙ্গে যুদ্ধং দেহি। এবং তার আশু ফলাফল সগৌরবে পরাজয়ঃ বরণং। তারপর শাড়ি-গয়না দিয়ে মন নরম করার চেষ্টা। তাতেও কিছুদিন পর বোঝা গেল সেটা একমুখী পরিকল্পনা। লাভের মধ্যে রানিসাহেবার মরজিমাফিক কখনও-সখনও ভালোবাসা আদান-প্রদানের লাইসেন্স। অর্থাৎ যে-কে সেই।

অতঃপর বন্ধুদের পরামর্শ নিতে গিয়ে শুনল তারাও অনেকটা একই টাইপের সাজেশান বহুদিন যাবৎ খুঁজে বেড়াচ্ছে। তখন কে যেন বলেছিল, শোন, এটা স্রেফ তোর মনের ব্যাপার। তুই বরং একবার সাইকিয়াট্রিস্ট দেখা।

চুপিচুপি তাই করেছিল অশনি। সবকিছু শোনার পর মনের ডাক্তার ওকে খুঁটিয়ে জরিপ করেছে। তারপর আচমকা প্রশ্ন করেছে, গলার কাছটা ভারী-ভারী লাগে? এমন মনে হয় যে, কোনও মালা-টালা পরে আছেন?

অশনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে বলেছে, হ্যাঁ...না...মানে, মাঝে-মাঝে মনে হয়।

ডাক্তারবাবু টেবিলে চাপড় মেরে গর্বের হাসি হেসে বলে উঠেছেন, এই তো, কেস ক্লিয়ার! একটা বেঙ্গলি প্রবাদ আছে জানেন তো, বানরের গলায় মুক্তোমালা? আপনার বউয়ের নামটাই এমন যে, সেটাকে ওই প্রবাদের সঙ্গে কানেক্ট করে নিয়ে আপনি নিজেকে ইয়ে...আই মিন হীনম্মন্যতায় ভোগেন। একটা সারভেন্ট সাইকোলজি সবসময় আপনার মধ্যে কাজ করে চলে।

অশনি পাথর। গলার কাছে উঠে আসা কাতর আর্তনাদটাকে অতি কষ্টে গিলে ফেলল।

ডাক্তারবাবু সেসব গ্রাহ্যই করলেন না। বলে চললেন এক নিশ্বাসে, আপনি বউয়ের নামটার কথা ভুলে যান। তা হলেই সব ও-কে হয়ে যাবে। সিক্সটি ফোর, প্লিজ।

শেষের কথাটা যে ভিজিটের অঙ্ক সেটা বুঝতে অশনির কয়েক সেকেন্ড সময় লেগে গিয়েছিল।

মুক্তোমালাকে অশনি মাঝে-মধ্যে 'মালা' বলে ডাকত। ডাক্তার দেখিয়ে ফেরার পরই ও মালা নামটাকে পারমানেন্ট করে দিল। মুক্তোমালার বিস্ময় অথবা ভ্রূকুটি ওকে টলাতে পারেনি। কিন্তু তাতেও ফলং নাস্তি।

তখন মরিয়া হয়ে অশনি তন্ত্র-মন্ত্র-তাবিজ-কবচ খুঁজতে লাগল। বশীকরণ... খুশিকরণ সবরকম পদ্ধতিরই খানাতল্লাশ নিতে শুরু করল। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনগুলো গোয়েন্দার চোখে বিশ্লেষণ করতে লাগল। অলৌকিক শক্তিওয়ালা 'মহাপুরুষদের' দোরে-দোরে গোপন ধর্নার আয়োজন শুরু করল। যে করে হোক মুক্তি চাই-ই চাই! 'স্ত্রৈণ' উপাধি নিয়ে অশনি বৈতরণী পেরোতে চায় না।

'ঠিক এইরকম একটা মানসিক অবস্থার মধ্যে একটা অদ্ভুত বিজ্ঞাপন অশনির নজরে পড়ল।

রাত্রিবেলা খবরের কাগজের দখল পেয়ে কাগজটা খুঁটিয়ে পড়ছিল, তখনই শেষ পৃষ্ঠার ছোট্ট বিজ্ঞাপনটায় চোখ আটকে গেল ঃ

বৈজ্ঞানিক যুগের নবতম অবদান

আবেগথেরাপি

দূর থেকে প্রিয় কিংবা অপ্রিয়জনের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন। যন্ত্রটির আকার পকেট ট্রানজিস্টারের মতো—ব্যবহারের সু-উপযোগী। দাম মাত্র দুশো টাকা। প্রখ্যাত তান্ত্রিক বিজ্ঞানীর অমূল্য আবিষ্কার—তন্ত্র ও বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়। ব্যবহারে সন্তুষ্ট না হলে টাকা ফেরত।

তারপর প্রাপ্তিস্থান উল্লেখ করে একটা ঠিকানা দেওয়া আছে।

অশনি আর দেরি করল না। পরদিন সকালেই অফিস থেকে সোজা প্রাপ্তিস্থানে গিয়ে হাজির। কড়কড়ে দুইশত টাকা প্রদান। এবং পকেট ট্রানজিস্টারের আকৃতিসম্পন্ন আবেগথেরাপি যন্ত্র আনয়ন।

বাড়িতে এসেই যন্তরটা নিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ল অশনি। ওর প্রাইভেসি বলতে এই ছয় বাই চার ঘরটুকু। অতএব সেখানে বসে নিরাপদে যন্ত্রটি দেখতে লাগল আর সঙ্গে দেওয়া নিয়মাবলীর ছাপা কাগজটা বারবার করে খুঁটিয়ে পড়তে লাগল।

অশনি আনন্দে খুশিতে কাঁপতে শুরু করল। ছাপা কাগজটায় যা-যা লিখেছে তা যদি সত্যি-সত্যিই হয়, তা হলে তো মার দিয়া কেল্লা। এতদিনে বোধহয় ক্রীতদাস

জীবনের অবসান হবে। কিন্তু অশনি কি সেরকম কপাল করে এসেছে? এইটুকু যন্ত্রের কি সত্যিই এতটা শক্তি হতে পারে?

যন্ত্রটা ছোট্ট ট্রানজিস্টার রেডিয়োর মতো দেখতে। রং কালো। একদিকে আধুলি মাপের একটা ছোট্ট জানলা। মুখে জাল দেওয়া। আর উলটোদিকে কুড়িটা ছোট-ছোট 'নব'—ঠিক রেডিয়োর ভলিয়ুম কন্ট্রোল নবের মতো। এ ছাড়া অন-অফ করার জন্য একটা খুদে সুইচ আছে।

নবগুলোর প্রত্যেকটায় এক-দুই করে কুড়ি পর্যন্ত নম্বর দেওয়া আছে। নম্বরগুলো এক-একটা আবেগের সাংকেতিক নাম। যেমন নিয়মাবলী পড়ে অশনি জেনেছে পাঁচ নম্বরটার অর্থ ভালোবাসা। সাত নম্বরটা ক্রোধ। তেরো নম্বরটা উদাসীনতা। উনিশ নম্বর অশ্রদ্ধা। এরকম কুড়িরকম আবেগের কুড়িটা নম্বর। যে-ব্যক্তিকে আবেগথেরাপি করা প্রয়োজন তার মাথার দিকে প্রথমেই যন্ত্রের ওই ছোট্ট জানলাটা তাক করতে হবে। তারপর সুইচ টিপে যন্ত্রটা অন করে দরকার মতো নব ঘোরাতে হবে। যেমন সাত নম্বর নবটা পুরো ডান দিকে ঘুরিয়ে দিলে সেই মানুষটি রাগে একেবারে আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠবে। আবার পুরো না ঘুরিয়ে আধাআধি ঘোরালে রাগটাও হবে মাঝামাঝি। এভাবে প্রত্যেকটা আবেগকেই আলাদা করে খুশিমতো কন্ট্রোল করা যায়। যেমন-যেমন দরকার তেমন-তেমন করে আবেগের ডোজ খুশিমতো কমাতে বাড়াতে পারবে অশনি।

দু-একটা বিজ্ঞানের কথাবার্তাও নিয়মাবলীর কাগজটায় লেখা আছে। যেমন, যন্ত্রটা অন করলেই তার জানলা দিয়ে একরকম অদৃশ্য তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ বেরিয়ে আসে। সেটা নির্দিষ্ট ব্যক্তির মগজের কোশগুলোকে উত্তেজিত করে তোলে। বিভিন্ন নব ঘোরালে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের কম্পাঙ্ক আর ধরনধারণ পালটে যায়, আর সেই অনুযায়ী মগজের বিভিন্ন অংশের কোশ উত্তেজিত হয়ে মানুষটিকে বিভিন্নরকম আবেগ প্রকাশে বাধ্য করে। মানুষের মধ্যে মূল যে-কয়েকটি আবেগ রয়েছে সেগুলোকে ফ্রয়েডীয় রীতিতে আরও শাখা-প্রশাখায় ভাগ করে মোট কুড়িটি আবেগ-উপআবেগ পাওয়া গেছে। আবিষ্কারক তান্ত্রিক-বিজ্ঞানী আশা করেন যে, এতেই খদ্দেরের চাহিদা ভালোরকম মিটে যাবে।

কী ব্যাপার, বাথরুমেই ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?—মুক্তোমালার ঝাঁজালো গলা শোনা গেল ঃ জলদি বেরোও, বাবা যাবেন। কোনও একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই।

অশনি তখন বিশরকম আবেগের বিশরকম নম্বর মুখস্থ করছিল। চমকে উঠে যন্ত্র আর কাগজ তোয়ালের আড়ালে লুকিয়ে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। বউয়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই হেসে উঠে বলল, অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা, বিবিজি!

মুক্তোমালা তাচ্ছিল্যের গলায় বলে উঠল, পাগল আর কাকে বলে!

অশনির সেসব গ্রাহ্য হওয়ার নয়। ও তখন মনে-মনে আওড়াচ্ছে ঃ...পাঁচ—ভালোবাসা, ছয়—লোভ, সাত—ক্রোধ—।

অশনি অ্যাকশন শুরু করল রাতে।

*

বিয়ের পরপর বেচারা বউয়ের ভালোবাসা পেত নিয়মিত। কিন্তু তারপরই অকস্মাৎ সেখানে ভাঁটা পড়েছে। প্রথম তিন-চার বছরে সন্তান না আনার পরিকল্পনা নিয়েছিল দুজনেই। অথচ পরিবার নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে-সঙ্গে স্বামীকে আদর সোহাগ করার ব্যাপারেও সরকারি রেশনিং-এর অভিশাপ লেগেছে। বউয়ের এই ভাবসাব দেখে অশনি একদিন বলেই ফেলেছিল, মালা, তুমি মাইরি ফ্রিজিড।

মালা সঙ্গে-সঙ্গে চোখ মটকে বলেছে, আর তুমি বুঝি ভিসুভিয়াস!

অশনি ফিউজ হয়ে গেছে।

এরপর প্রাকৃতিক কি কৃত্রিম কারণে জানা নেই, তিন প্রাণীর সংসার তিন প্রাণীরই রয়ে গেছে—অশনি, পিতা ও পত্নী। শুধু লক্ষ্মী নামে শান্তশিষ্ট একটি কাজের মেয়ে সকাল-বিকেল আসে। মুক্তোমালা মেয়েটিকে খুবই পছন্দ করে, ভালোবাসে, আবার বকা-ঝকাও করে। বাড়িতে সবাই স্নেহ-শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় মিলিয়ে-মিশিয়ে বেশ মাখো-মাখো হয়ে আছে, শুধু অশনিই যেন আমড়ার আঁটি—মেঝেতে দিনরাত ড্রপ খাচ্ছে।

ঘড়িতে এখন নিশ্চয়ই এগারোটা বাজে। অশনি বিছানায় গা ঢেলেছে সাড়ে দশটায়। তখন থেকেই ঘুমের ভান করে চোখ বুজে মটকা মেরে পড়ে আছে। যন্তর বালিশের তলায় রেডি।

একটু পরেই মালা এসে আলো নিভিয়ে পাশে শুয়ে পড়ল। অশনি আস্তে-আস্তে একটা হাত বাড়িয়ে মালার বাহুতে রাখল। সামান্য চাপ দিয়ে কাছে টানল। সঙ্গে-সঙ্গেই শান্ত গলায় জবাব ভেসে এল, চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ো—বিরক্ত কোরো না। এবং অশনির হাতটা অহিংসপথে যথাস্থানে ফিরিয়ে দেওয়া হল।

মাঝে-মধ্যেই অশনি এরকম হাত ফেরত পায়। কিন্তু আজ আর নয়! অশনি একেবারে সহিংস হয়ে গেল। অন্ধকার বালিশের নীচ থেকে যন্ত্র বের করে সুইচ অন করল। তারপর সন্তর্পণে ছোট্ট জানলাটা স্ত্রীর মস্তকে তাক করে পঞ্চম বোতামটিকে পুরোটা ঘুরিয়ে দিল। ওয়ান-টু-থ্রি স্টার্ট।

মুক্তোমালা চকিতে স্বামীর দিকে ফিরল। তারপর অশনিকে একেবারে জাপটে ধরল।

অশনি কোনওরকমে যন্ত্রটাকে বালিশের খাঁজে নামিয়ে রাখল—অবশ্য যন্ত্রের জানলাটা তখনও মোটামুটি মালার মাথার দিকে তাক করা। তারপর মালার সঙ্গে অন্ধকারে সুর মেলাল।

মালা যে এরকম ভিসুভিয়াসের মতো উদ্দাম হয়ে উঠতে পারে, তা অশনি কখনও কল্পনাও করেনি। এ যেন বিলিতি ফুলশয্যার রাত। তার ওপর রাতের যেন আর শেষ নেই। আনন্দে আর বিস্ময়ে অশনি কোনও কথা বলতে পারছিল না।

ঘণ্টাখানেক পর অশনি মুক্তোমালার হাত থেকে মুক্ত হল। তারপর ও যন্ত্রটাকে

অফ করে অন্ধকারেই কপাল তিনবার ঠেকাল। জয় বাবা তান্ত্রিক বিজ্ঞানী! গরিবের কপাল তা হলে শেষ পর্যন্ত খুলল!

সকালবেলা অশনি লক্ষ করল, মুক্তোমালা ঠিক সহজভাবে ওর সঙ্গে কথা বলতে পারছে না। দু-একবার চোখও নামিয়ে নিল। না, গত রাতের কথা মালা ভোলেনি। ভোলার কথাও নয়।

বাজার-টাজার সেরে এসে অশনি বাবার সঙ্গে চায়ের আসরে যোগ দিল। বাবা এখনও খবরের কাগজ পড়ছে। খবরের কাগজের দখল না পেয়ে অশনি আজ আর অখুশি হল না। চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে দিব্যি টুকটাক গল্প জুড়ে দিল। বারকয়েক অকারণেই বলে ফেলল, বুঝলেন বাবা, এখন হল গিয়ে বিজ্ঞানের যুগ।

বাবা বলল, হুঁ—। চোখের নজর কিন্তু খবরের কাগজের দিকে।

মুক্তোমালা ব্যস্তভাবে একবার ঘরে ঢুকে বাবার সুবিধে-অসুবিধের কথা জিগ্যেস করল—আর কিছু লাগবে কি না, বাবা কোথাও বেরোবেন কি না, বেরোলে কখন বেরোবেন ইত্যাদি।

অশনি অনেকক্ষণ ধরে মালার শ্বশুর-ভক্তি দেখল। তারপর গম্ভীরভাবে বলল, আজ শরীরটা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে—অফিস যাব না। রান্নার জন্যে আর তাড়াহুড়ো কোরো না।

মুক্তোমালা চুপ করেই ছিল। কিন্তু কাগজ নামিয়ে বাবা সন্তানের দিকে তাকাল। চিন্তিত সুরে জানতে চাইল, কেন, ম্যাজম্যাজ করছে কেন?

অশনি মালার দিকে তাকাল। মুক্তোমালা চকিতে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

তখন অশনি একটু হেসে বিজ্ঞভাবে বলল, এখন হল গিয়ে বিজ্ঞানের যুগ—। তারপর চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে পড়ল। অফিস কি আর ও এমনি-এমনি কামাই দেবে! আবেগথেরাপি যন্ত্র দিয়ে মালার ওপরে নতুন-নতুন অ্যাকশন করে বিজ্ঞানের দিগ্বিজয়কে ও অব্যাহত রাখবেই।

ও এখন লক্ষ্মীর গলা শুনতে পাচ্ছে। বেচারি মালার তিরস্কার সবই নির্বিবাদে গ্রহণ করে। বউয়ের মুখে অশনি কত কোটিবার যে শুনেছে, এরকম মেয়ে হয় না! আর কথায়-কথায় অশনির সঙ্গে লক্ষ্মীর তুলনা তো আছেই!

সুতরাং এটাই সেকেন্ড অ্যাকশনের মাহেন্দ্রক্ষণ।

যন্ত্রটা জামার আড়ালে লুকিয়ে অশনি রান্নাঘরের কাছাকাছি গিয়ে হাজির। মুক্তোমালা তখন লক্ষ্মীর ওপরে শাসন ফলাচ্ছে। কারণ, বাসন ঠিকমতো মাজা হয়নি। মাজা বাসনের গায়ে এঁটো লেগে আছে।

তোকে রোজ-রোজ একই কথা বলি, তবু তোর চৈতন্য হয় না।

লক্ষ্মী কাঁচুমাচু মুখে চুপ।

অশনি যন্ত্রটা লক্ষ্মীর মাথার দিকে তাক করে সুইচ টিপে সাত নম্বর নব বোঁ

করে ঘুরিয়ে দিল। ক্রোধ স্টার্ট।

সঙ্গে-সঙ্গে লক্ষ্মী মুখঝামটা দিয়ে ফোঁস করে উঠল ঃ অত যদি তোমার ছুচিবাই, বউদিদি, তো নিজে মেজে নিলেই পারো। দিনরাত্তির অমন ট্যাকট্যাক করে কথা আর সহ্য হয় না।

মুক্তোমালা স্পিক্‌টি নট। ওর চোখ দুটো রসোগোল্লার মতো হয়ে গেছে। যেন মঙ্গলগ্রহ থেকে পাঁচ-পাওয়ালা কোনও প্রাণী আচমকা ওর সামনে এসে হাজির হয়েছে।

লক্ষ্মী, এসব কী যা-তা বলছিস! তুই কি পাগল হয় গেলি?

কী বললে, বউদি, আমি পাগল! তা তুমি রোজ অমন ছাগলের মতো আমায় গুঁতোও কেন বলো দিকি? ন্যায্য কথা বললেই যত দোষ! কোথাকার লাটসাহেবের বউ এয়েছেন যেন, হুঁঃ!—লক্ষ্মী দূরে দাঁড়িয়ে থাকা অশনিকে একঝলক দেখল।

যা, তুই এক্ষুনি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা!—মুক্তোমালার মুখ টকটকে লাল। হাত-পা রাগে থরথর করে কাঁপছে।

অশনি মনে-মনে মুচকি হেসে উনিশ নম্বর নবটাকে আড়াই প্যাঁচ ঘুরিয়ে দিল। ব্যস, ক্রোধের ওপর অশ্রদ্ধার বিষফোঁড়া চেপে বসল।

হুঁঃ—বেরিয়ে যা বললেই যেন বেরিয়ে যেতে হবে। তোমার বাপের বাড়ি যে বেরিয়ে যাব?—লক্ষ্মী মুখ ঘুরিয়ে অশনির দিকে তাকিয়ে বলল, এটা দাদাবাবুর বাড়ি। দাদাবাবু বললে তবেই বেরোব—।

লক্ষ্মীর এই কথায় মুক্তোমালা চোখ কপালে তুলে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে-কাঁদতে কীসব বলতে লাগল বোঝা গেল না। লক্ষ্মী তখনও সমানে মুখ চালিয়ে যাচ্ছে। অশনি উলটোদিকে নব ঘুরিয়ে সুইচ টিপে যন্ত্রটা অফ করে দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে লক্ষ্মীর চোখ কপালে তোলার পালা।

তোমায় এসব কী অকথা-কুকথা বললুম গো, বউদিদি! আমার মাথায় কি শাঁকচুন্নি ভর করেছিল! এ কী পাপ করলুম গো আমি!—বলেই হাউমাউ করে কেঁদে মেয়েটা সটান মালার পা জাপটে ধরল ঃ আমায় তুমি বঁটি দিয়ে কেটে ফ্যালো। আমার মুখে নুড়ো জ্বেলে দাও গো—।

অশনি আরও কয়েকসেকেন্ড দাঁড়িয়ে দুই লেডিজের লাগামছেঁড়া কান্নাকাটি দেখল। অকারণেই গলা তুলে বলল, বুঝলে, এ হল গিয়ে বিজ্ঞানের যুগ। তারপর চলে যেতে গিয়েই দেখল পিছনে বাবা দাঁড়িয়ে। চেঁচামেচি কান্নাকাটি শুনেই বোধহয় এসেছে।

অশনি যন্ত্রটা কিছুক্ষণ আগেই লুকিয়ে ফেলেছিল। তবে বাবা দেখতে পেয়েছে কি না কে জানে। অশনি বাবাকে চুপচাপ পাশ কাটিয়ে চলে গেল ভেতরের ঘরের দিকে।

•

অশনি লক্ষ করল, মালার পুরোনো প্রতাপ যেন ধীরে-ধীরে অনেকটা মিইয়ে

গেছে। কথাবার্তা কম বলছে। প্রতি পদে অশনিকে ডাক দিতেও ভুলে যাচ্ছে। আপনমনেই কী যেন ভাবছে।

সারাদিনের সামান্য কথাবার্তায় অশনি জেনেছে লক্ষ্মী এখনও কাজে বহাল রয়েছে। অনেক করে ক্ষমা-টমা চেয়ে ও নাকি স্বীকার করেছে ওদের ফ্যামিলিতে বরাবরই ভূতে-পাওয়ার রোগ আছে। এরকম ও আর কখনও করবে না। করলে গলা টিপে বউদিদিমণি যেন ওর মুখে নুন ঠেসে দেয়। এরকম আরও কত কথা।

মুক্তোমালা এসব কথা বাবাকে বলছিল। অশনি কোনওরকমে হাসি চেপে সেখান থেকে সরে এসেছে।

বিকেলে বাবা বেরিয়েছিল। রোজই এরকম আড্ডা মারতে বা তাস-টাস খেলতে বেরোয়। সাতটা-সাড়ে সাতটা নাগাদ বিষণ্ণমুখে ফিরে এসে বউমাকে খবর দিল, জানো, আজ সকালে হরিপদ মারা গেছে। স্ট্রোক হয়েছিল।

হরিপদ বোস বাবার প্রাণের বন্ধু। সেই কোন ছোটবেলা থেকেই দুজনে প্রায় গলায়-গলায়। সুতরাং বাবা যে আঘাত পাবে তাতে আর সন্দেহ কী!

বাবা মুখ কালো করে চেয়ারে বসতেই মুক্তোমালা একগাল হেসে বলল, সত্যি, একটা দারুণ খবর শোনালেন, বাবা।

বাবা চমকে উঠে বউমার মুখের দিকে তাকাল।

স্নেহের বউমা তখন আপনমনেই বলে চলেছে, সত্যি, কতদিনে যে এরকম খুশির খবর শুনিনি। হরিপদ কাকা মারা গেছেন! আঃ, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বুড়ো হয়ে কী কষ্টটাই না পাচ্ছিলেন। হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে—।

বউমা! এসব কী বলছ তুমি? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে!

পাশের ঘরের জানলা থেকে চুপিসাড়ে অশনি সব দেখছিল। চিতাবাঘের মতো ঘাপটি মেরে যন্ত্রটাকে ও তাক করে রেখেছিল মালার মাথা লক্ষ্য করে। খুশি ও আনন্দের এক নম্বর নব পুরোটা ঘোরানো।

বাবা ও বউমার অবস্থা যখন চরমে, তখন অশনি যন্ত্রটা অফ করে ভিজে বেড়ালটি সেজে পাশের ঘরে এসে প্রবেশ করল। সঙ্গে-সঙ্গে মুখে আঁচল চেপে মালা তিরবেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

অশনি ভালোমানুষি সুরে জানতে চাইল, কী হয়েছে, বাবা?

বাবা মাথায় হাত রেখে বসেছিল। আস্তে করে শুধু বলল, বউমাকে ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করো। তোমার সম্বন্ধ ঠিক করার সময়ে যতদূর খোঁজ নিয়েছিলাম তাতে ওদের ফ্যামিলিতে পাগলামির ধাত আছে বলে শুনিনি। অবশ্য...।

অশনি ছোট্ট করে 'হুঁ' বলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

মালার খোঁজে শোওয়ার ঘরে এসে দেখল ঘর অন্ধকার করে বেচারি বিছানায় উপুড় হয়ে ফুলে-ফুলে কাঁদছে। উৎফুল্ল অশনি দরজাটা বন্ধ করে বউকে সান্ত্বনা দেওয়ার মহান কর্তব্য পালন করতে মনোযোগ দিল।

*

অশনি বাবাকে কখনও রাগতে দেখেনি বা চিৎকার করে কথা বলতে শোনেনি। ওর খুব সাধ হচ্ছিল আবেগথেরাপি যন্ত্রের কেরামতি দেখিয়ে বাবাকে তেলেবেগুনে আগুন করে দেয়। সেইজন্যেই তক্কে-তক্কে ছিল। পরদিন সকালে চায়ের টেবিলেই সুযোগ এসে গেল।

মনে-মনে অশনি ঠিক করেছিল, আজই ও মুক্তোমালাকে শেষবারের মতো টাইট দেবে। তা হলে ওর সাধ পূর্ণ হবে। পত্নী বশ মানবে। আর অশনিও রোজ ভোরবেলা বেড-টি পাবে।

মালার অবস্থা আপাতত মোটেই সুবিধের নয়। গতকাল রাতে অশনিকে জড়িয়ে ধরে খুব কান্নাকাটি করেছে। না, যন্ত্রটা ব্যবহার করতে হয়নি। কাঁদতে-কাঁদতেই মালা স্বামীকে বলেছে, আমার বোধহয় মাথা-টাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। নইলে বাবার সামনে ওরকম আজেবাজে কথা বলি! আবার দ্যাখো, লক্ষ্মী মেয়েটাও কেমন বজ্জাত। সক্কালবেলায় পাগলের মতো কী ঝগড়াটাই না করল। আচ্ছা, আমরা সবাই কি আস্তে-আস্তে পাগল হয়ে যাচ্ছি?...কে জানে, হয়তো শনির দশায় ধরেছে।

অশনি বউকে আদর করতে-করতে বলেছে, তুমি ওসব বাজে চিন্তা ছেড়ে একটু ঘুমোও তো দেখি!

তারপর মুচকি হেসে মনে-মনে বলেছে, এসব শনির দশা নয়, ডার্লিং অশনির দশা!

মুক্তোমালার মুষড়ে পড়া অবস্থা দেখে অশনির মনের ভাব সমবেদনার দিকে টার্ন নিয়েছিল। সেইজন্যই কাল রাতে আর যন্ত্র দিয়ে ভালোবাসা আদায় করেনি। কিন্তু আজ সকালে নিজের দীর্ঘদিনের অত্যাচারিত হওয়ার ইতিহাস রোমন্থন করতেই 'বাঙালি জাগো' মনোভাব ফিরে এল। তার ওপর 'বেড-টি' না পাওয়ার আক্ষেপ ও বিরক্তি। অতএব ওয়ান-টু-থ্রি, অ্যাকশন।

চায়ে পরপর ক'টা চুমুক দিয়ে বাবা বলল, বউমা, চা-টা আজ দারুণ হয়েছে। আমাকে আর-একটা বিস্কুট দাও তো।

অশনি থেরাপি যন্ত্রের ক্রোধ, বিরক্তি, তাচ্ছিল্য ও অশ্রদ্ধা—মোট চারটে নব ফুল অন করে মুক্তোমালার মস্তক তাক করে বসেছিল। অতএব বউমা মুখে নেড়ে বলে উঠল, বিস্কুট লাগলে নিজে নিয়ে নিন, আমি দিতে পারব না। বসে-বসে খালি ফরমাস।

অশনি এবার যন্ত্র তাক করল বাবার মাথার দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে বাবা চেয়ার ছেড়ে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করে বলল, ডটার-ইন-ল, হোল্ড ইয়োর টাং! ডোন্ট ফরগেট, আই অ্যাম ইয়োর ফাদার-ইন-ল।

বাবা একসময়ে প্রাইমারি স্কুলে ইংরেজি পড়াত। বেঁচে থাকতে মায়ের মুখে শুনেছিল, রেগে গেলে বাবা নাকি ক্রমশ ইংরেজি শব্দের ব্যবহার বাড়াতে থাকে আর

গলার স্বর উঁচু পরদায় তোলে। অশনির বালক বয়েসে মা বিদায় নিয়েছে। বাবা-ই ওকে মানুষ করেছে, কিন্তু ভদ্দরলোকের রুদ্রমূর্তি অশনির কখনও দেখার সুযোগ হয়নি। আজ হচ্ছে।

ফাদার-ইন-ল আর ডটার-ইন-ল ততক্ষণে পানিপথের যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে। আর অশনির যন্ত্র তালে তাল মিলিয়ে একবার একে তাক করছে, আর-একবার ওকে।

এমনসময় ঘরে ঢুকে পড়ল লক্ষ্মী। বিচিত্র দৃশ্য দেখে সে তো একেবারে থ। অশনিকে লক্ষ্য করে বলল, এসব কী কাণ্ড হচ্ছে গো, দাদাবাবু?

অশনি অমনি অন্য নবগুলো কমিয়ে দিয়ে ফুল ডোজে বিনয় চালিয়ে দিল। ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে বাবা ও বউমা বৈষ্ণব বিনয়ে গদগদ।

বাবা কোমল সুরে তখন বলতে শুরু করেছে, আমাকে ক্ষমা করে দাও, বউমা। আমার ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে। আর কখনও এরকম হবে না।

আর বউমাও কম যায় না। মাথায় ঘোমটা দিয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে ঝপ করে শ্বশুরমশাইকে এক সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ঃ অন্যায় আমার হয়েছে, বাবা। আমায় শাস্তি দিন।

তারপর একটানা অনুশোচনা, অনুতাপ, বিলাপ, প্রলাপ ইত্যাদি চলছিল, অশনি যন্তর অফ করে ঘর থেকে সটকে পড়ল।

লক্ষ্মী তখনও হাঁ করে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। বোধহয় গতকাল বউদিমণির সঙ্গে ওর বিচিত্র ঝগড়ার কথা ভাবছিল।

ততক্ষণে সংবিৎ ফিরে পেয়ে, লক্ষ্মীকে দেখে ফাদার-ডটার দুজনের অবস্থাই ডেলিকেট।

অশনি নাটকের শেষটুকু উঁকি মেরে দেখেই শোওয়ার ঘরে ঢুকে পড়ল। হাতের যন্ত্রটা লক্ষ্মী দেখতে পেয়েছে কি না কে জানে!

শেষ সংশয়ের উত্তর অশনি পেয়ে গেল একটু পরেই। ফোলা চোখ নিয়ে নাক টানতে-টানতে ঘরে এসে ঢুকল মালা। ঢুকেই সটান অশনির পা জড়িয়ে ধরে বলল, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে তুমি বাঁচাও।

অশনি যন্ত্রটা লুকিয়ে ফেলেছিল। বউকে দু-হাতে ধরে দাঁড় করিয়ে অবাক হয়ে বলল, কীসের বাঁচানোর কথা বলছ, মালা? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!

অশনির বুকে মাথা রেখে মালা বলল, লক্ষ্মী আমাকে সব বলেছে। তুমি হাতে করে রেডিয়োর মতো কী একটা নাড়াচাড়া করছিলে আর তাতেই নাকি আমার আর বাবার মাথার গোলমাল শুরু হয়ে গিয়েছিল। কালও যখন লক্ষ্মী আমার সঙ্গে ঝগড়া করছিল তখনও তোমার হাতে ওই কালো রঙের যন্ত্রটা ছিল। তুমি সব জানো। সেদিন রাতেও নিশ্চয়ই ওই যন্ত্রটা তুমি কাজে লাগিয়েছিলে। নইলে—।

অশনি আর কঠোর হতে পারল না। আবেগে গদগদ হয়ে মালাকে সব ফাঁস করে দিল। এমনকী বালিশের নীচ থেকে আবেগথেরাপি যন্ত্রটা বের করেও দেখাল।

মালা দুঃখ-কান্না সব ভুলে গিয়ে হাঁ করে যন্ত্রটা দেখতে লাগল। দেখা, শোনা, শেষ হলে ও বলল, তাই বলে শুধু-শুধু তুমি আমাকে এরকম নাজেহাল করলে?

অশনি পালটা প্রশ্ন করল, শুধু-শুধু মানে?

তারপর যন্ত্রসমেত হাত নেড়ে বলল, আমার দাবিদাওয়া না মিটলে এই যন্ত্রের রাইট অ্যান্ড লেফট অ্যাপ্লিকেশান চলতেই থাকবে।

মালা অবাক হয়ে জানতে চাইল, কীসের দাবিদাওয়া?

অশনি একে-একে সবিস্তারে নিজের বঞ্চিত জীবনের ইতিহাস বউকে শুনিয়ে দিল। এমনকী বেড-টি খাওয়ার অতৃপ্ত বাসনার কথাও বাদ দিল না।

মালা সব শুনে হেসে বলল, ব্যস, এই? কাল থেকে তুমি দেখে নিয়ো। তুমি হলে আমার সব, তোমাকে আমি কখনও হেলা-শ্রদ্ধা করতে পারি! তবে লক্ষ্মীটি, ওই যন্ত্রটা তুমি বাড়ি থেকে বিদেয় করো। নইলে সবসময় ভয়ে-ভয়েই আমি মরে যাব। বাব্বাঃ, কী লজ্জা, কী লজ্জা!

শ্বশুরের সঙ্গে এনকাউন্টারের কথা মনে করে মালা মরমে মরে গেল যেন।

অশনি এগিয়ে এসে বউকে নতুন বউয়ের মতো করে আবার কাছে টানল। মুক্তোমালা নীচু গলায় বলল, তুমি আজ আর অফিসে যেয়ো না। বাবাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আগে ঠান্ডা করো। বাবাকে আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছি না।

অশনি বলল, তথাস্তু। আর যন্তরটাকেও আমি আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করে দিচ্ছি। তা বলে তোমার শর্ত তুমি ভুলো না যেন! কাল সকালের বেড-টি দিয়েই আমার নতুন লাইফ শুরু হোক। প্রমিস?

মুক্তোমালা ওর হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে বলল, প্রমিস! প্রমিস! প্রমিস!

সঙ্গে-সঙ্গে 'হিপ হিপ হুররে' বলে এক কানফাটানো চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল অশনি এবং পরমুহূর্তেই আবেগথেরাপি যন্ত্রটাকে সর্বশক্তি দিয়ে এক ভয়ংকর আছাড় মারল মেঝেতে।

[মুক্তোমালা প্রতিদিনই ছোট্ট ট্রানজিস্টার রেডিয়ো মাথার কাছে নিয়ে শুতে যায়। আজও সঙ্গে নিয়েছিল। অশনি ঘুম ভেঙে দেখল সেটা দু-টুকরো হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে। আর সামনের দেওয়ালে মালার বাপের বাড়ির হোল ফ্যামিলির গুরুদেবের ফটো টাঙানো ছিল—সেই ফটোর কাচ ভেঙে চৌচির। এবং গুরুদেবের ঠোঁটে যেন তান্ত্রিক-বিজ্ঞানীর হাসি।

মুক্তোমালা তখন রাগ-থমথমে মুখে সদ্য-স্বপ্ন-ভেঙে-জেগে-ওঠা স্বামীকে কটমট করে দেখছে।]



মনে পড়ার খেলা

পুকুরের জলের ওপিঠে কৃষ্ণচূড়ার পাতা বেয়ে রোজ যেমন সূর্য ওঠে তেমনি আজও উঠেছিল। ভোরবেলায় জানলার গ্রিল ঘেঁষে চায়ের কাপে চুমুক দিতে ভালো লাগে, আজও লাগছিল। হঠাৎই পিছন থেকে রুবির গলা শুনতে পেলাম।

'তোমাকে একটা দরকারি কথা বলব।'

না দেখেই বুঝলাম, ও বিছানায় উঠে বসেছে। মাথার চুল এলোমেলো। কপালের টিপটা বোধহয় ঠিকঠাক নেই।

আমি গাছের পাতার নড়াচড়া দেখছিলাম। ছোট-ছোট পাখি উড়ছিল কয়েকটা। শব্দ করে কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, 'বলো—।'

'আমি তোমাকে আর ভালোবাসি না—।'

হাত থেকে চায়ের কাপ পড়ে গেল। কাপ-প্লেট শত টুকরো-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ঘরের মেঝেতে। জানলার ফ্রেমে বাঁধানো আকাশটা পলকে ঘোলাটে হয়ে গেল। আর চনমনে সূর্যটা মুখ ভার করে গাছ বেয়ে আবার নেমে যেতে লাগল দিগন্তের ওপিঠে।

আমি অসহায়ভাবে ঘুরে তাকালাম রুবির দিকে। ওর সুন্দর মুখটাকে অবাক চোখে দেখলাম। চার বছর ধরে ছন্নছাড়া পাগলের মতো ওকে ভালোবেসেছি। আর

আজ, এখন, ভালোবাসা আর নেই! সব শেষ!

'রুবি, কী বলছ তুমি! আমি—' আমার গলা বুজে গেল। চোখ করকর করছিল।

রুবি এতটুকু বিচলিত হল না। বাঁ-হাত দিয়ে ওর মাথায় কী যেন খুঁজছিল। তারপর হাতটা এগিয়ে দিল আমার দিকে। বলল, 'শান্তনু, এই নাও তোমার ভালোবাসা।'

আমি হাত পেতে আমার ভালোবাসা ফিরিয়ে নিলাম। আমার হাতের ফরসা তালুর ওপরে একটা সিলিকন মাইক্রোচিপ। তার গা থেকে বেরিয়ে রয়েছে চোদ্দোটা ধাতুর পিন। ভালোবাসায় কাঁটা আছে।

রুবি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিল। এখন সাততাড়াতাড়ি নিজের জিনিসপত্র গোছগাছ করছে। সুটকেসে ভরে নিচ্ছে শাড়ি-জামাকাপড়। এইসব কাজের মধ্যেই ও কথা বলছিল।

'আমার স্মৃতিকোশে আমাদের ভালোবাসার ব্যাপারে যা-কিছু স্মৃতি ছিল সবই জমা আছে ওই চিপের ভেতরে। তুমি অন্য কোনও রোবট-মেয়ে নিয়ে এলে তার মাথায় ওই চিপটা বসিয়ে দিয়ো। তা হলে সে তোমাকে আমার মতোই ভালোবাসবে।'

আমি কাঁদছিলাম। ভালোবাসা হারিয়ে গেলে এত কষ্ট হয় জানতাম না। রুবি পুরোপুরি রোবট নয়। অর্ধেক মানবী, অর্ধেক রোবট। ওরা রূপে গুণে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উন্নত। ওরা ভালোবাসতে জানে অদ্ভুতভাবে। ওদের ভালোবাসার টান অলৌকিক। সেইজন্যেই রুবিকে নিয়ে এসেছিলাম 'অ্যানড্রয়েড সেন্টার' থেকে। ভালোবেসেছিলাম মন আর শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু দিয়ে। ওকে ঘিরে আমার স্মৃতির সবটাই সুখের।

সেন্টারের ডিরেক্টর আমাকে ভয়ের কথাটাও শুনিয়েছিলেন। যে-কোনওদিন যে-কোনও মুহূর্তে এই অর্ধমানবীরা ভালোবাসাহীন হয়ে যেতে পারে। সেই আঘাত আমি সইতে পারব তো? মনে আছে, আমি বলেছিলাম, আমার ভালোবাসার ওপরে আমার আস্থা আছে। অথচ আজ, এই অপরূপ সকালে, আমাকে কাঁদিয়ে রুবি ভালোবাসাহীন হয়ে গেল।

রুবি আর কোনও কথা বলছিল না। শুধু যান্ত্রিক ঢঙে একটার পর একটা কাজ সারছিল। আর আমি বোকার মতো সিলিকন চিপটা মুঠো করে ধরে বসেছিলাম।

একটু পরে চোখ মুছে ধরা গলায় ওকে বললাম, 'রুবি, মনে পড়ে, বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়ে একটা গোটা দিন কীভাবে আমরা কাটিয়েছিলাম? গঙ্গায় ভেসে ছিলাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা—।'

রুবি কাজ থামিয়ে ভাবলেশহীন মুখে আমাকে দেখল। একটু থেমে বলল, 'তুমি কি পুরোনো কোনও কথা বলছ? আমার কিচ্ছু মনে নেই। সব ধরা আছে ওই মাইক্রোচিপের ভেতরে। নতুন কাউকে এনে ওই চিপটা লাগিয়ে দিয়ো, তার সব

মনে পড়ে যাবে।' রুবি আবার গোছগাছে মন দিল। ব্যস্ত পায়ে এ-ঘর ও-ঘর করতে লাগল।

আমি মাথা নীচু করে বসে রইলাম। মাথার ভেতরে আলপিন ফোটাচ্ছে কেউ। এক কথায় চার বছরের ভালোবাসা শেষ! রুবি তো সব ভুলে গেল। কিন্তু আমি তো মানুষ! আমি এত সহজে সব ভুলে যাই কেমন করে? আমার মাথার ভেতরে তো আর মাইক্রোচিপ নেই!

একটু পরেই সাদামাটা 'যাচ্ছি' বলে রুবি চলে গেল। ওর পরনে নীল-সাদা ফুলকাটা সিল্কের শাড়ি। সাউথ ইন্ডিয়ায় বেড়াতে গিয়ে ওকে কিনে দিয়েছিলাম। রংটা ওর খুব পছন্দ ছিল। কিন্তু জানি, এখন আর ওর কিছু মনে নেই। সেইসব 'অপ্রয়োজনীয়' স্মৃতি জমা রয়েছে আমার হাতের এই মাইক্রোচিপের ভেতরে।

আমি যে এখন কী করি!

সামনেই বিমূর্ত গ্রাফিক ঢঙের স্তম্ভের ওপরে বাসানো রয়েছে আমার আর রুবির রঙিন হলোগ্রাম। হাত মুঠো করে আমি সেই স্তম্ভ ঘিরে ঘুরতে লাগলাম। চারপাশ থেকে দেখতে থাকলাম রুবিকে। স্বপ্নের মতো চোখ, সবুজ টিপ, আর ঘন কালো চুলে নিয়ম-ছাড়া ঢেউ।

আমার বুকের ভেতরে পাগলের মতো কুড়ুল চালিয়ে কেউ কাঠ কাটছিল। হাহাকার ভরা চোখে হাতের মাইক্রোচিপটাকে দেখলাম। চার বছরের এত ভালোবাসা এইটুকু সিলিকন চিপের ভেতরে ধরে গেল! ভালোবাসা এতই নমনীয়!

সারাটা দিন ধরে অসহ্য যন্ত্রণা আর ছটফটানির পর ঠিক করলাম, বাঁচতে গেলে আমাকে ভুলতে হবে। যে-করেই হোক এই ভালোবাসার স্মৃতি আমাকে ভুলতে হবে। তখনই আমার 'মেমোরি ম্যানেজমেন্ট সেন্টার'-এর কথা মনে পড়ল।

সেন্টারের রিসেপশান রুমে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটি সুবেশা তরুণী এসে আমার সামনে দাঁড়াল। মাথার ওপরে ডিজিটাল ডিসপ্লে প্যানেলে আমার নাম জ্বলে উঠেছে, তার পাশেই একটা কোড নম্বর ঃ সি-ফোর।

মেয়েটি আমাকে হাসিমুখে ইশারা করল। ওর হাসির সঙ্গে রুবির কিছুটা মিল লক্ষ করলাম। ওরও জন্ম কি অ্যানড্রয়েড সেন্টারে?

শব্দ-হয়-না-এমন মেঝেতে পা ফেলে নানান করিডর ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। গোলকধাঁধার বহু জটিল পথ পেরিয়ে অবশেষে একটা বিশাল কাচের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। সামান্য হেসে তরুণী আমাকে ভেতরে ঢোকার জন্য ইশারা করল। তারপর ঘুরে রওনা হল করিডর ধরে। আমি কয়েকসেকেন্ড ওর সুন্দর ঢঙে হেঁটে যাওয়া দেখলাম। তারপর কাচের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এলাকায়।

সাদা পোশাক পরা জনাতিনেক মানুষের হাত ঘুরে শেষপর্যন্ত একটা ছোট মাপের ঘরে এসে হাজির হলাম। ঘরে সাদা আলখাল্লা পরা একজন মানুষ পারসোনাল কম্পিউটারের সামনে বসে কীসব কাজ করছিলেন। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন ঃ 'আসুন, মিস্টার সরকার। আপনার কেসটা আমার হাতে পড়েছে। আমার নাম শ্যামল দত্ত। আশা করি আপনাকে সাহায্য করতে পারব—।'

ডক্টর দত্ত বয়স্ক মানুষ। গালের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। জুলপি নুন-মরিচ। চোখে চশমা। থুতনিতে ফ্রেঞ্চকাট। ওঁকে দেখে ভরসা পাওয়া যায়।

ডক্টর দত্তর নির্দেশমতো একটা এয়ার কুশনে বসলাম। বাতাসের চাপে ভেসে থাকা গদি-চেয়ারে বসলেই কেমন যেন ঘুম পায়। উনি আমার খুব কাছে এগিয়ে এলেন। কতকগুলো যন্ত্রের বোতাম নিয়ে নাড়াচড়া করলেন। তারপর আমার মাথাটা পিছনদিকে হেলিয়ে দিয়ে বললেন, 'মিস্টার সরকার, এবারে গোটা গল্পটা ধীরে-ধীরে বলুন। আপনি কী ভুলতে চান, কেন ভুলতে চান...সব খুলে বলুন।'

আমি রুবির কথা বলতে শুরু করলাম। আমার চোখ বুজে এসেছিল। মাঝে-মাঝে ডক্টর দত্তের সহানুভূতি মাখা গলা শুনতে পাচ্ছি। যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে কথাগুলো। আমি সম্মোহিতের মতো চার বছরের প্রেমের উপন্যাস স্মৃতি থেকে পড়ে গেলাম। বললাম, আমি রুবিকে ভুলতে চাই। ওর ভালোবাসা ভুলতে চাই।

আমার কথা শেষ হলে ডক্টর দত্ত বললেন, 'আপনি যেমন হেলান দিয়ে চোখ বুজে রয়েছেন সেরকমই থাকুন। তবে মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনবেন, আর দরকার মতো জবাব দেবেন।'

আমি রুবির কথা ভাবছিলাম। চোখ বুজে থাকা অবস্থাতেই ছোট্ট করে বললাম, 'হুঁ—।'

'মেমোরি ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে কয়েকটা দরকারি কথা আপনাকে বলে নিতে চাই, মিস্টার সরকার।'

'বলুন—।'

ডক্টর দত্ত একটানা একঘেয়ে সুরে বলে চললেন। মনে হচ্ছিল, আমার মাথার চারপাশে একটা ভোমরা গুনগুন শব্দ তুলে উড়ছে...উড়ছে।

'আমাদের স্মৃতি মানে হচ্ছে কোনও ঘটনায় অংশ নেওয়া—অর্থাৎ, সেই ঘটনার অভিজ্ঞতা হওয়া। তারপর সেই ঘটনাকে দীর্ঘদিন ধরে স্মৃতিকোশে ধরে রাখা, এবং প্রয়োজনমতো তা মনে করতে পারা। পরিভাষায় একেই বলা হয় লার্নিং, রিটেইনিং অ্যান্ড রিমেমবারিং। সব মিলিয়ে মেমোরি। অনেক বছর আগেই জানা গেছে, স্মৃতি ব্রেনের একটি বিশেষ অংশে রাসায়নিক গঠন নিয়ে সঞ্চিত থাকে...রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড...মানে, আর. এন. এ. অণুর মধ্যে। ঘটনার পর যত দিন যায় স্মৃতি ততই ক্ষয়ে যেতে থাকে, ঝাপসা হয়। প্রথমদিকে যত তাড়াতাড়ি ঝাপসা হয় পরের দিকে

হয় অনেক ধীরে-ধীরে। এ ছাড়া অন্যান্য বহু নতুন ঘটনার স্মৃতিও এসে জমা হয় স্মৃতিকোশে। আর অনেকদিন ধরে ব্যবহার না করলে স্মৃতিকোশের ক্ষমতাও কমে আসে। ফলে আমরা যে-কোনও ঘটনা ভুলে যাই তা হল নতুন-নতুন ঘটনার স্মৃতির চাপে, অথবা, সেই বিশেষ ঘটনা যেসব স্মৃতিকোশে জমা আছে সেগুলো দীর্ঘদিন ব্যবহার না করে।'

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন ডক্টর দত্ত, 'সুতরাং মিস্টার সরকার, রুবিকে ভুলতে গেলে স্বাভাবিক উপায় হচ্ছে নতুন-নতুন নানারকমের কাজে মেতে ওঠা। আর রুবির কথা একবারও না ভাবা—অর্থাৎ, রুবির ভালোবাসা সংক্রান্ত স্মৃতিকোশগুলোকে একটুও ব্যবহার না করা। আপনি কি সেটা পারবেন?'

আমি রুবির সঙ্গে প্রথম আলাপচারিতার কথা ভাবছিলাম। ডক্টর দত্তের প্রশ্নটা তৃতীয়বারে আমার কানে ঢুকল। বললাম, 'অসম্ভব—।'

শ্যামল দত্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমারও সে-কথাই মনে হয়েছে। তা হলে এখন আর. এন. এ. মলিকিউল এক্সাইটেশান ম্যাপিং ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।'

আমি চোখ খুলে জিগ্যেস করলাম, 'তার মানে?'

ডক্টর দত্ত কাশলেন। বললেন, 'স্মৃতির ধরনের ওপরে নির্ভর করে বিভিন্ন আর. এন. এ. অণুতে বিভিন্ন অ্যামপ্লিচিউডের সিগনাল পাওয়া যায়। একে বলে মেমোরি ভ্যালু। আপনার ব্রেন-এ কয়েকটা ইলেকট্রোড লাগিয়ে দেব আমি। তারপর সেগুলোর আউটপুট জুড়ে দেব মেমোরি ম্যাপিং যন্ত্রের সঙ্গে—' আঙুল তুলে একটা জটিল যন্ত্রের দিকে দেখালেন ডক্টর দত্ত, বললেন, 'তা হলে ওই ভিডিয়ো পরদায় উঁচু-নীচু চাদরের মতো একটা ছবি দেখা যাবে। সেটাই মেমোরি ম্যাপ। সুখের স্মৃতি হলে চাদরটা সেই জায়গায় উঁচু হয়ে থাকবে। আর দুংখের স্মৃতি হলে চারদটা টোল খেয়ে যাবে নীচের দিকে। সুখ বা দুঃখের তীব্রতা অনুযায়ী উঁচু-নীচু জায়গাগুলোর উচ্চতা বা গভীরতা কম-বেশি হয়, আবার চেহারাতেও ওগুলো চোখা কিংবা ভোঁতা হয়। আপনার মেমোরি ম্যাপ এঁকে নেওয়ার পর বাইরে থেকে ব্রেনের আর. এন. এ. মলিকিউলে এক্সাইটেশান সিগনাল পাঠিয়ে ম্যাপের উঁচু জায়গাগুলো আমি সমান করে দেব। তা হলেই আপনার সুখের স্মৃতি মোটামুটি মুছে যাবে। সেইসঙ্গে রুবিও।' একটু থেমে ডক্টর দত্ত প্রশ্ন করলেন, 'আপনার আপত্তি নেই তো?'

আমি দু-হাতে মাথা টিপে ধরলাম, বললাম, 'একটুও না, ডক্টর। রুবিকে আমি ভুলতে চাই।'

ডক্টর দত্ত কাজ শুরু করলেন। আমাকে চোখ বুজতে বললেন। আমি চোখ বুজলাম। একটু পরেই কেমন যেন ঘুমের ঘোরে তলিয়ে গেলাম। টের পাচ্ছিলাম, আমার মাথায় ছুঁচের মতো কীসব ফোটানো হচ্ছে। তবে কোনও ব্যথা নেই। আমার চোখের সামনে আমার আর রুবির হলোগ্রামটা ভাসছিল।

*

'মেমোরি ম্যানেজমেন্ট সেন্টার' থেকেই গাড়ি করে আমাকে পৌঁছে দিল বাড়িতে। তারপর ওরাই বোধহয় আমাকে বিছানায় শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল। ঘুম যখন ভাঙল তখন এক অপরূপ দৃশ্য আমার মন ভরিয়ে দিল। কৃষ্ণচূড়ার পাতার ফাঁকে ভোরবেলায় সূর্য। নীচের পুকুরের জলে ওদের ছায়া। ভাসা-ভাসা মনে পড়ছিল, এরকম দৃশ্য আমি আগে কোথায় যেন দেখেছি, কোথায় যেন দেখেছি...।

হঠাৎ চোখ ফেরাতেই দেখি একটা রঙিন হলোগ্রাম। আমার সঙ্গে এক যুবতী। কপালে সবুজ টিপ। কোথায় যেন দেখেছি ওকে? কোথায় যেন...?

আমার বুকের মধ্যে ঢেউ উঠছিল। মাথার ভেতরে উড়ে বেড়াচ্ছিল দুর্জ্ঞেয় কুয়াশা। কত কী মনে পড়তে চাইছে, অথচ মনে পড়ছে না। কাকে যেন আমি পাগলের মতো ভালোবেসেছিলাম...কিন্তু কিছুতেই তার নাম অথবা মুখ মনে পড়ছে না। গঙ্গার বুকে ভেসে পড়েছিলাম এক তীব্র সুখের দিনে। কিন্তু কে যেন ছিল আমার পাশে...?

একটা গোলকধাঁধার ভেতরে চোখ বাঁধা অবস্থায় হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম আমি। মনে পড়ছিল নানান কথা। স্কুলের খেলার মাঠে কী যেন একটা দারুণ ব্যাপার হয়েছিল। কিন্তু আর কিছু মনে করতে পারছি না। আমার মা কত ভালোবাসত আমায়—এই সত্যিটা বেশ মনে আছে। কিন্তু মায়ের মুখ? মায়ের নাম? আমি সাগরের নোনা জলে তলিয়ে যাচ্ছিলাম। এরকম একটা, দুটো, তিনটে...অসংখ্য সুখের স্মৃতির টুঁটি টিপে ধরেছে কেউ। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

এ-কথা সত্যি যে, জীবনের যাবতীয় ভালোবাসার স্মৃতি আমি ভুলতে চেয়েছিলাম। তা নইলে কষ্টে যন্ত্রণায় শেষ হয়ে যেতাম আমি। কিন্তু এখন? স্পষ্ট মনে পড়ছে, আমি কাউকে ভালোবেসেছি, কিন্তু কাকে তা জানি না। মনে পড়ছে, আমার সাধারণ জীবনে কত অসাধারণ সুখের ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু একটা ঘটনাও মনে পড়ছে না আমার। হা ভগবান! আমার মায়ের নাম, মায়ের মুখ, স্কুলের হাসিখুশির দিনগুলো...সব মুছে গেছে স্মৃতির মানচিত্র থেকে। সুখের স্মৃতির ছিটেফোঁটাও আর নেই!

এ যন্ত্রণা যে আরও অসহ্য, আরও কষ্টের।

সামনেই টেবিলের ওপরে পড়ে রয়েছে একটা সিলিকন মাইক্রোচিপ। চিপটা হাতে তুলে নিলাম। প্রচণ্ড শক্তিতে চেপে ধরলাম মুঠোয়। ওটার সরু-সরু ধাতব পিনগুলো গেঁথে গেল হাতের তালুতে।

মাথার ভেতরে আমার তখন আর. এন. এ. অণুগুলো পাগলের মতো দাপাদাপি করছে। ফিরে পেতে চাইছে ওদের হারানো সুখের স্মৃতি।



আকাশে কীসের শব্দ

আপনারা সকলেই জানেন, গত ১১ নভেম্বর, শনিবার, বেলা বারোটা নাগাদ দক্ষিণ কলকাতা ও দক্ষিণের শহরতলির বিস্তীর্ণ এলাকায় এক ভয়ংকর বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। এই শব্দের রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগে গড়িয়াহাট, টালিগঞ্জ থেকে শুরু করে আমতলা, নরেন্দ্রপুর পর্যন্ত সবাইকে জানান দিয়ে গেছে। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার, কিছুতেই এই শব্দের উৎসের হদিস পাওয়া যায়নি। কোনও বিস্ফোরণের ঘটনাও টের পাননি কেউ, অথবা কেউ যে হতাহত হয়েছেন এমন খবরও শোনা যায়নি। ফোর্ট উইলিয়ামের চিফ অফ স্টাফ জে. কৌশিক বলেছেন, সেদিন কোনও শব্দ তাঁরা শোনেননি। আওয়াজের ধরনের বিবরণ শুনে তিনি বলেন, ব্যাপারটা সনিক বুম হতে পারে। সুপারসনিক কোনও প্লেন আকাশপথে উড়ে গেলে একটা শক ওয়েভ তৈরি হয়। তার ফলে নির্দিষ্ট কোনও জায়গায় বাজ পড়ার মতো জোরালো শব্দ হতে পারে। অথচ তার আশপাশের মানুষজন সেরকম কোনও শব্দই শুনতে পাবেন না। শনিবার বারবেলার শব্দটা ছিল হয়তো তাই।

শব্দের রহস্যটা রহস্যই থেকে গেছে, কারণ সেদিন বেলা বারোটা নাগাদ কোনও অজ্ঞাতকুলশীল সুপারসনিক প্লেন কলকাতার আকাশপথে উড়ে গেছে এমন কোনও প্রমাণ কেউই দিতে পারেননি।

অথচ প্রচণ্ড শব্দ যে একটা হয়েছে তাতে কোনও ভুল নেই। আর বহু বাড়ির কাচের জানলাও যে তখন ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়েছে তাও তো মিথ্যে নয়!

তা হলে কীসের শব্দ শোনা গিয়েছিল নভেম্বরের ১১ তারিখে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরাও বিস্তর মাথা ঘামিয়েছেন। সনিক বুম, মাক নাম্বার, মাক কোন্ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নানা রচনা প্রকাশিত হয়েছে নানান পত্রপত্রিকায়। এমনকী অস্ট্রিয়ার বিজ্ঞানী আর্নস্ট মাকের জীবনীও ছাপা হয়েছে একটি কিশোর-পত্রিকায়। তার ফলে, বিজ্ঞানী মাকের নাম থেকেই যে মাক নাম্বার, মাক কোন্—এইসব নামকরণ করা হয়েছে, সেটাও জনসাধারণ জেনে গেছে।

কিন্তু এত সত্ত্বেও শব্দের কারণটা কেউই জানতে পারেনি।

কারণ, এতদিন আমি মুখ খুলিনি। আর শুভদীপের গোপন পরীক্ষার কথাও কাউকে বলিনি। সেইসঙ্গে শুভদীপের স্ত্রী রনিতার কথাও খুলে বলা হয়নি কাউকে। ফলে নিখোঁজ বিজ্ঞানী শুভদীপ পালচৌধুরীর সঙ্গে এই বিস্ফোরণের যে কোনও সম্পর্ক আছে, সে-কথা কেউ বুঝতে পারেনি।

কিন্তু আর অপেক্ষা করার কোনও মানে হয় না। কারণ, গতকালই শুভদীপের পাঠানো একটা মোটা খাম আমার ঠিকানায় এসে হাজির হয়েছে। আমাকে লেখা শুভর শেষ চিঠি।

চিঠিটা আমি যতই পড়েছি ততই অবাক হয়েছি। চিঠি তো নয়, সে যেন শুভদীপের জীবনের এক গোপন অধ্যায়ের বিবরণ। কী করে একটা সাধারণ ব্যাপার থেকে ওর জীবন এরকম বিপজ্জনক দিকে এগিয়ে গেল তা ভাবতে অবাক লাগে। অথচ শুভদীপ উচ্ছল হাসিখুশি ছিল।

ছাত্রজীবন থেকেই ওকে দেখেছি আমি। যেমনই বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা তেমনই প্রিয় ছিল সকলের। আর ওর দরাজ দিলখোলা হাসি আমি যেন এখনও শুনতে পাই। যদিও জানি, শুভদীপ আর কখনও হাসবে না, কাঁদবে না। এমনকী আমার পিঠে এক জোরালো থাপ্পড় কষিয়ে আর কখনও বলে উঠবে না, 'বুঝলি শালা, বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলেই কেউ বিজ্ঞানী হয় না।'

আমি ওর কথায় মোটেই আহত হতাম না। কারণ, আমরা বেশিরভাগই বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করি পরীক্ষায় বেশি নম্বর পেয়ে পাশ করার জন্যে, ভালো-ভালো চাকরি পাওয়ার জন্যে, বিদেশে যাওয়ার জন্যে, অধ্যাপনার দায়সারা কর্তব্য পালনের জন্যে।

আর শুভদীপ? ও বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করত বিজ্ঞানকে ভালোবেসে। আমি তাও মজা করে ওকে বলতাম, 'তুই বুঝি বিজ্ঞানী!'

'ইয়েস ব্রাদার, আমি রোজ মর্নিং-এ বিজ্ঞান দিয়ে ব্রেকফাস্ট খাই।' এ-কথা বলেই শুভদীপ হো-হো করে হেসে উঠত।

শুভদীপ আমাদের অনেকের কাছেই প্রিয় ছিল, কিন্তু আমি বোধহয় ওকে

সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতাম। আমাদের ভালোবাসা এমনই ছিল যে, সাহেবদের দেশ হলে হয়তো অন্যায় সম্পর্কের অভিযোগে হাজতবাস করতে হত।

শুভদীপ পড়াশোনা আর গবেষণা নিয়ে দিব্যি ছিল। কিন্তু রনিতাকে বিয়ে করার পর ওর জীবনটা হঠাৎই বোধহয় অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকেই ধীরে-ধীরে ওর জীবনটা এগিয়ে গিয়েছিল গত ১১ নভেম্বরের দিকে।

১১ নভেম্বর সেই ভয়ংকর শব্দটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার মনটা যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠেছিল। কান্না এসে গিয়েছিল গলায়। বুঝতে পেরেছিলাম, আমার বহুদিনের প্রিয় বন্ধু শুভদীপ আর নেই। ওই আশ্চর্য শব্দের মাধ্যমে ওর বিচিত্র মৃত্যুটাকে ও যেন ঘোষণা করে গেল।

না, শুভদীপ আত্মহত্যা করেনি। জীবনে অনেক শোক-দুঃখ ও পেয়েছে, কিন্তু কখনও আত্মহত্যার কথা ভাবেনি। বরং আমি কখনও ওই প্রসঙ্গ তুললে হেসে বলত, 'ব্রাদার, আত্মহত্যা করার সাহস যদি কারও থাকে, তা হলে তার আর আত্মহত্যার প্রয়োজন হয় না।'

শুভদীপ হাসত বটে, কিন্তু ওর মুখের আড়ালে আমি অনেক শোকগাথা টের পেতাম। অথচ রনিতাকে বিয়ে করার পর তখন সবেমাত্র বছরদুয়েক কেটেছে।

শুভদীপের ব্যাপারটা নিয়ে এই এক মাস আমি ভীষণ কষ্ট পেয়েছি। কলেজ-জীবনে তোলা আমাদের গ্রুপ ফটোটা দেখেছি। বারবার। ওর সুন্দর নিষ্পাপ মুখটা যেন আমার চোখে তাকিয়ে নীরবে বলেছে, 'বুঝলি, আমি চলে গেলাম। তোরা সব দুধে-ভাতে থাকিস।'

কথায়-কথায় শুভদীপ শুধু বলত, 'না ভাই, আমি দুধে-ভাতে মানুষ, আমার ওসব পোষাবে না।'

এ-কথা শুনে আমাদের আড্ডার নতুন কোনও সঙ্গী ভাবত, ও বুঝি খুব বড়লোক। তখন আমরাই হেসে ওর ঠাট্টার মর্মার্থটা বুঝিয়ে দিতাম তাকে। বলতাম, শুভদীপের কেষ্টপুরের বাড়িতে দুটো গরু ছিল। সেইজন্যেই ওর খাদ্যতালিকার প্রধান আইটেম ছিল দুধ-ভাত। বাবা-মায়ের চাপে এই মেনু ওকে প্রায় বিশ বছর সহ্য করতে হয়েছে।

তারপর ফিজিক্স নিয়ে এম. এসসি. পার্ট টু পরীক্ষা দেওয়ার সময় ও একদিন সগর্বে জানাল, ও আর দুধ-ভাত খাচ্ছে না।

আমরা সবাই জিগ্যেস করলাম, 'কেন? কেন?'

ও বেশ দুঃখ-দুঃখ মুখ করে জানাল, ওদের গরু দুটো বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, ওর বাবা বলেছেন, 'এখন তো তুই-ই বড় হয়ে গেছিস, তা হলে আমার আর ও-গরু দুটোকে রেখে লাভ কী?'

ওর কথায় আমরা হো-হো করে হেসে উঠেছি।

গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত আমি শুভর চিঠিটা পড়েছি। চিঠি তো নয়, সুদীর্ঘ

এক কাহিনি।

সেই লেখা পড়ার পর বাকি রাতটা আমি আর ঘুমোতে পারিনি। আমার কানের কাছে ১১ নভেম্বরের সেই শব্দটা আবার বেজে উঠেছিল। একবার নয়, বারবার। যেন কামান দেগে ওর মৃত্যুকে রাষ্ট্রীয় সম্মান জানানো হচ্ছিল।

আজ সকালে নতুন সূর্য দেখার পর আমার মনটা যেন খানিকটা আশ্বাস পেল। মনে হল, শুভর কথা যদি আমি সবাইকে জানাই, তা হলে শুভর আত্মা বোধহয় তৃপ্তি পাবে। আর রনিতার? রনিতা বোধহয় অখুশি হবে না। কারণ, শুভকে ও ভীষণ ভালোবাসত।

অবশ্য রনিতাও তো এখন আর নেই! শুভর শেষ চিঠি পড়েই ব্যাপারটা জানতে পেরেছি আমি। কারণ, গত একবছর ধরে শুভ আমার সঙ্গে সেরকম যোগাযোগ রাখত না। শুধু মাঝে-মাঝে খেয়ালখুশি মতো ফোন করত। কিছু জিগ্যেস করলেই বলত, এখন ও একটা অদ্ভুত গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত আছে। তার বেশি আর কিছু কখনও বলেনি। আর কথা শেষ করার আগে বলত, 'কোনওদিন যদি একটা জোরালো এক্সপ্লোশানের শুনিস তা হলে বুঝবি আমি আর নেই।'

এখন আমি সব বুঝতে পেরেছি। শুভর শেষ চিঠি আমার সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেছে। তাই ওর সম্পূর্ণ কাহিনিটাই আমি আপনাদের কাছে পেশ করতে চাই। অন্তত আমি যেমন করে বুঝেছি। আর আগেই তো বলেছি, এখন আর চুপ করে থাকার কোনও মানে হয় না।

বারান্দার টবের গাছগুলোয় জল দিচ্ছিল রনিতা, আর আপনমনে কথা বলে যাচ্ছিল। আসলে ও প্রাণভরে গালমন্দ করছিল হতচ্ছাড়া চড়ুইপাখিগুলোকে। দুষ্টু পাখিগুলো রোজই ওর সাধের গাছগুলোর কচি পাতা আর ফুল ঠুকরে-ঠুকরে খেয়ে যায়।

শুভদীপ ওর পড়ার টেবিলে বসে বই আর কাগজপত্র নিয়ে কাজে ব্যস্ত ছিল। ডানহাতের কাছে চায়ের কাপ। সামনের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সকালের সূর্য। বারান্দার যেটুকু চোখে পড়ে তাতে রঙিন মরশুমি ফুল, দু-একটা চঞ্চল চড়ুইপাখি, সবুজ গাছের পাতা, আর রনিতাকে দেখা যাচ্ছে।

এই সকালবেলার শীতের আমেজ ঘেরা পরিবেশে সবই সুন্দর। রনিতাও। ঠিক এই সময়টা শুভদীপের মনে হয় বিজ্ঞানের গবেষণা ছাড়াও বেঁচে থাকার অন্যান্য আরও আকর্ষণ চারপাশে ছড়িয়ে আছে।

কিন্তু রনিতার কথা ওর নরম ভাবনায় বাধা দিচ্ছিল বারবার।

'রনিতা, চড়ুইগুলো এখনও এত সভ্য হয়ে ওঠেনি যে, তোমার বাংলাভাষা বুঝবে।' শুভদীপ ঠাট্টা করে কথাটা জানলা দিয়ে ছুড়ে দিল।

'বাংলাভাষা না বুঝুক, লাঠির ভাষা তো বুঝবে—' রনিতা জানলার কাছে এগিয়ে এল। দেখা গেল ওর হাতে চড়ুইপাখি তাড়ানোর জন্য মানানসই একটা কাঠি।

সকালের মন-ভালো করা আলোয় রনিতাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল।

শুভদীপ ওকে দেখল একটু অবাক হয়ে। রনিতা এত সুন্দর, অথচ এত কথা বলে!

বিয়ের পর বছরখানেক যেতে-না-যেতেই রনিতার কথা বলার বাড়াবাড়ি বাতিকটা টের পেয়েছে শুভ। রনিতা কখনও অল্পে থামে না। একদিন সন্ধেবেলা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ওকে জিগ্যেসও করেছে।

'তুমি এত কথা বলো কেন, রনিতা?'

'আমি বেশি কথা বলি?' অবাক হয়ে স্বামীর দিকে ঘুরে তাকিয়েছে রনিতা। ও তখন নিজের শাড়ি-জামাকাপড় ঠিকঠাক করে আলমারিতে গুছিয়ে রাখছিল। আলমারির কাছ থেকেই একটু চোখা স্বরে ও আরও বলেছে, 'শেষকালে তুমি আমার এই বদনাম দিলে! জানো, সত্যি-সত্যি কাদের টকেটিভ বলে? যারা অপ্রয়োজনে বাড়তি কথা বলে। আমি তো দরকার ছাড়া একটি কথাও বলি না। আমাকে তুমি আর যাই বলো, টকেটিভ বলতে পারবে না। জানো তো, আমাদের—।'

হাত তুলে ওকে বাধা দিয়েছে শুভ ঃ 'থাক, থাক, বাবা। আমারই ভুল হয়েছে। তুমি বিন্দুমাত্রও টকেটিভ নও। বরং খুবই লক্ষ্মী মেয়ে।'

'তুমি কি চাও আমি বোবা হয়ে থাকি?'

শুভ বুঝতে পারল রনিতা একটু সিরিয়াস হয়ে গেছে। তাই ও চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে উঠে গেল আলমারির কাছে। দু-হাতে আলমারির খোলা পাল্লা ধরে রনিতাকে আগলে দাঁড়াল। তারপর গাঢ় গলায় বলল, 'এখন তোমাকে দু-চার-সেকেন্ড বোবা করে দেব।'

রনিতা একটু অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে?'

'তার মানে এই।' বলে রনিতাকে হতভম্ব করে দিয়ে চট করে ওকে চুমু খেল শুভদীপ।

সত্যি-সত্যি দু-চারসেকেন্ড পর ব্যাপারটা শেষ হতেই রনিতা আলতো রাগের ভান করে বলল, 'এটা কী হল!'

শুভদীপ হাসতে-হাসতে জবাব দিল, 'চুমু খাওয়া হল। এতে তোমার রাগের কী আছে। আমি তোমার অফিসিয়াল চুম্বক, মানে, ম্যাগনেট।'

'চুম্বক!' রনিতা আরও অবাক।

শুভ হেসে বলল, 'ব্যাকরণ ভালো করে পড়োনি? চুম্বন করে যে সে-ই হল চুম্বক। আমি তোমার হাজব্যান্ড—সো, অফিশিয়াল ম্যাগনেট।'

এরপর রনিতা আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে। বেশি কথা বলার অভিযোগটা

নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি।

কিন্তু রনিতার বেশি কথা বলার ব্যাপারটা ধীরে-ধীরে শুভদীপের মাথায় বাসা বেঁধে ফেলল। ও যখন রনিতার সঙ্গে কথা বলত তখনই ওর মাথার ভেতরে বিজ্ঞানী মন তার কাজ করে যেত।

সুতরাং একদিন কাজের বউয়ের বিনা নোটিসে কামাই করা নিয়ে রনিতা যখন সুদীর্ঘ তাৎক্ষণিক বক্তৃতা সবে শেষ করেছে, তখন শুভ বলে বসল, 'রনি, একটা নতুন আইডিয়া আমার মাথায় এসেছে।'

রনিতা প্রায় অপ্রস্তুত হয়ে জিগ্যেস করল, 'কী আইডিয়া?'

শুভ ওকে কাছে ডেকে নিজের পাশে বসাল। তারপর আগ্রহ দেখিয়ে বলল, 'মন দিয়ে শুনে বোঝার চেষ্টা করো। যদিও ব্যাপারটা বিজ্ঞানের, তবু মনে হয় না তোমার বুঝতে অসুবিধে হবে—।'

রনিতার বিষয় ছিল ফিলজফি। বিজ্ঞান সম্পর্কে ওর বিচিত্র আতঙ্ক আছে। কিন্তু শুভকে ও জানে। বিজ্ঞানের ব্যাপারে শুভ বেশ একরোখা। নতুন আইডিয়ার ব্যাপারটা যখন ও রনিতাকে শোনাতে চায়, তখন ও শোনাবেই।

রনিতা ছোট্ট করে ঘাড় নাড়তেই শুভ বলতে শুরু করল, 'দ্যাখো, শব্দ হল একরকমের শক্তি। যেমন আলো, তাপ—এসবই হল শক্তি। শক্তির কোনও বিনাশ নেই, তবে রূপান্তর হতে পারে। আমাদের এই মহাবিশ্বে আদিম অবস্থায় যে-পরিমাণ শক্তি ছিল, এখনও তাই আছে। শুধু শক্তির নানারকমের রূপান্তর হয়েছে।'

রনিতা বলল, 'আমার একটু-একটু গুলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু নো প্রবেলেম—তুমি বলে যাও।'

'তোমাকে তো বললাম, শব্দ একরকম শক্তি। এই যে তুমি এতক্ষণ ধরে কাজলের মায়ের কামাই নিয়ে এত কথা বললে, তাতে অনেক শব্দ হল—।'

'এত কথা আবার বললাম কোথায়! আমি তো শুধু বললাম, ও যে আসবে না সেটা আগে—।'

'রনিতা, প্লিজ। আমাকে আগে বলতে দাও, তারপর যত খুশি কথা বোলো।'

রনিতার মুখ সামান্য গোমড়া হল।

শুভদীপ সেটা তেমন গুরুত্ব দিয়ে খেয়াল না করে বলে চলল, 'তোমার উচ্চারণ করা শব্দগুলোকে নিয়ে আমি যদি রূপান্তর ঘটাতে পারি তা হলে হয়তো দেখা যাবে বেশ খানিকটা বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাবে। মানে, সাউন্ড এনার্জি থেকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। বলা যায় না, তোমার একটু আগের বলা কথাগুলো থেকে হয়তো ১৫ ওয়াটের একটা বাল্‌বকে মিনিটপাঁচেক জ্বালানো যাবে।'

রনিতা ঝট করে উঠে দাঁড়াল। ওর ফরসা মুখে কালচে ছায়া পড়েছে। শুভদীপের দিকে না তাকিয়েই ও বলল, 'ব্যাপারটা তোমার কাছে খুব মজার মনে হচ্ছে, তাই না?'

শুভদীপ একটু সাবধানী গলায় বলল, 'হ্যাঁ, মানে একটু মজা তো আছেই। তবে...ইয়ে...আসল কথাটা শুনবে? যা বললাম, তা বোধহয় খুব একটা মিথ্যে নয়।'

রনিতা সহজ হওয়ার ভান করে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল। অনেকটা নিজের সঙ্গে কথা বলার ঢঙেই বলল, 'তুমি উচ্চশিক্ষিত সায়েন্টিস্ট মানুষ। সব ব্যাপারে তোমার কথাই শেষ কথা।'

শুভও পালটা জেদ দেখিয়ে বলল, 'বিজ্ঞান কখনও মিথ্যে কথা বলে না।'

'বিজ্ঞানীরা কিন্তু মিথ্যে কথা বলতে পারে।'

সেই মুহূর্তে ছন্দপতন ঘটে গিয়েছিল। কিন্তু শুভদীপ একটা হিসেব কষছিল মনে-মনে। আচ্ছা, এটুকু সময়ে কতগুলো শব্দ উচ্চারণ করল রনিতা? দুশো, তিনশো, নাকি আরও বেশি শব্দ উচ্চারণ করেছে?

এইরকম সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে শুভদীপ ঠিক করল গুনে দেখবে। এরপর থেকে হিসেব করে দেখবে চব্বিশ ঘণ্টায় রনিতা কত কথা বলে—মানে ক'টা শব্দ উচ্চারণ করে। তারপর তা থেকে হিসেব করবে, প্রত্যেক শব্দ উচ্চারণের পিছনে ঠিক কত আর্গ বা জুল শক্তি খরচ হয়। তারপর উত্তরটাকে নিয়ে আসতে হবে ওয়াট-ঘণ্টা বা কিলোওয়াট-ঘণ্টা এককে। তখনই বোঝা যাবে, রনিতা ক'দিন কথা বললে সেই শব্দ-শক্তি থেকে একটা ১৫ ওয়াট পাওয়ারের বাল্‌বকে পাঁচমিনিট জ্বালানো যাবে।

এরপর থেকে রনিতার উচ্চারণ করা শব্দ গুনতে শুরু করেছে শুভদীপ। তখনই বুঝতে পেরেছে, বলা যত সহজ, বাস্তবে কাজটা তত সহজ নয়। কিন্তু বিজ্ঞান গবেষক শুভদীপ তাতে পেছপা হয়নি। একটা নতুন বিষয় নিয়ে গবেষণা কোনও খাঁটি গবেষকের কাছে একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার। শুভদীপ এই রোমাঞ্চকর নেশায় ডুবে গেল।

ও খুঁটিয়ে লক্ষ করে দেখল, কোনও মানুষ কথা বলার সময়ে উচ্চারণ করা শব্দগুলোর মাঝে সেভাবে কোনও ফাঁক রাখে না—যেমনটা পাওয়া যায় লেখা কথার সময়ে। রনিতার কথা শুনতে গিয়ে ও ঠিক এই সমস্যার পড়ল। কিন্তু তার চেয়েও সমস্যা হয়ে দাঁড়াল রনিতার মেজাজ।

প্রথম-প্রথম শুভদীপ যখন রনিতার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে চেষ্টা করত তখন মাঝপথেই কথা থামিয়ে রনিতা বলে উঠত, 'কী আপনমনে বিড়বিড় করছ! তুমি আমার কথা কিছুই শুনছ না!'

শুনলে কখনও আর শোনা যায়! শুভ তখন তাড়াতাড়ি রনিতার কথায় মন দিয়েছে। নিজের সাফাই হিসেবে বলেছে, 'না...ইয়ে...একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। প্লিজ, আর-একবার বলবে—।'

এভাবে বেশ কিছুদিন চেষ্টার পর শুভদীপ হাল ছেড়ে দিল। কিন্তু ওর মনে

কেমন একটা জেদও চেপে বসল—একটা-না-একটা পথ ওকে বের করতেই হবে। এই চিন্তায় ও দিনরাত ডুবে রইল। বইপত্র আর কাগজ নিয়ে নানান অঙ্ক কষল।

তারপর একদিন ও আর্কিমিদিসের মতো 'ইউরেকা!' বলে চিৎকার করে উঠল। এবং গবেষণাগারে ওর কাজ শুরু করল।

'দুধে-ভাতে মানুষ' কথাটা শুভদীপ মজা করে ব্যবহার করলেও ওর পৈতৃক সম্পত্তি নেহাত কম ছিল না। এ ছাড়া ও নিজেও ভদ্রস্থ টাকা উপার্জন করে। সুতরাং দক্ষিণ কলকাতার ছিমছাম এলাকায় ওর এই ফ্ল্যাটের মাপ যথেষ্ট বড়। আর সেই কারণেই তার একটা ঘরকে ও একরকম ওর গবেষণাগার বানিয়ে ফেলেছে।

সমস্যাটার চলনসই একটা সমাধান খুঁজে পাওয়ার পর শুভদীপ ওর গবেষণাগারে আরও জোরালো পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতে উঠল।

ও দেখেছে, রনিতা মোটামুটিভাবে বলতে গেলে চাররকম স্পিডে কথা বলে। আর স্পিড যতই বাড়তে থাকে ওর কথার তীব্রতা ততই উচ্চগ্রামে চড়তে থাকে। এ ছাড়া ওর কথার কম্পাঙ্ক বিশ্লেষণ করে শুভদীপ দেখেছে, কথার স্পিড বেড়ে গেলে কম্পাঙ্কের ঊর্ধ্বসীমা আরও ওপরে উঠে যায়।

সুতরাং, এইসব তথ্য এবং বেশ কয়েকবার ট্রায়াল-অ্যান্ড-এরার করার পর শুভদীপ একটা যন্ত্র তৈরি করতে পারল। যন্ত্রটা খুব নিখুঁত হল না বটে, কিন্তু রনিতার উচ্চারণ করা শব্দের মোটামুটি একটা হিসেব কষতে পারল।

যন্ত্রটার তত্ত্ব খুব সহজ-সরল। প্রথমে উচ্চারণ করা শব্দগুলোর কম্পাঙ্ক বিশ্লেষণ করে উচ্চতম কম্পাঙ্কটি সে নির্ণয় করে। তারপর মেপে নেয় ডেসিবেল তীব্রতা। এই দুটি তথ্য থেকে সে হিসেব কষে বের করে বক্তা কোন স্পিডে কথা বলছে। রনিতার চারটে স্পিডের জন্য প্রতি সেকেন্ডে উচ্চারণ করা শব্দের সংখ্যার চারটি গড় মান যন্ত্রটিকে আগেই জানানো আছে। সুতরাং স্পিড জানার পর যন্ত্রটা হিসেব করে বক্তা কত সেকেন্ড কথা বলল। তারপর সেই সময়কে নির্দিষ্ট গড়মান দিয়ে গুণ করে নিজের মেমোরিতে সঞ্চয় করে রাখে। এইভাবে সঞ্চিত তথ্যকে সে পরপর যোগ করে যোগফল বের করে রাখে। ফলে যে-কোনও সময় উচ্চারিত শব্দের সংখ্যা জানতে চাইলেই যন্ত্রটা সাম্প্রতিকতম যোগফল দেখিয়ে দেয়। এই যোগফলে ভুলের সম্ভাবনা বড়জোর শতকরা ১৭ ভাগ।

যন্ত্রটা যদি নির্দিষ্ট কোনও মানুষের কণ্ঠস্বরে টিউন করা থাকে তা হলে অন্য কারও কথা সে তার হিসেবের মধ্যে ধরবে না।

শুভদীপ যন্ত্রটার নাম দিল 'ডিজিটাল অডিয়ো ওয়ার্ড কাউন্টার'।

নিজে কথা বলে ও বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে যন্ত্রটির দক্ষতা যাচাই করল। যখন দেখল, যন্ত্রের ভুল কোনও সময়েই শতকরা ১৭ ভাগের বেশি হচ্ছে না, তখন ও দারুণ খুশি হল। তারপর সুযোগের অপেক্ষায় রইল, কবে ও ফ্ল্যাটটাকে কয়েক ঘণ্টার জন্য একা নিজের দখলে পাবে।

সুযোগ এসে গেল আটদিনের মাথায়। রনিতা নীচের ফ্ল্যাটের মিসেস সেনের সঙ্গে পাড়ার মহিলা সমিতির একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গেল। বলল, ঘণ্টাতিনেক পরেই ফিরবে। শুভদীপের তখন আনন্দে সাতহাত লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল।

অতএব ন'দিনের দিন থেকেই শুরু হয়ে গেল আসল পরীক্ষা।

পাঁচটা খুদে-খুদে মাইক্রোফোন ও বসিয়ে দিল ফ্ল্যাটের নানা জায়গায়। সেই মাইক্রোফোনগুলো রনিতার সমস্ত কথা নিঁখুতভাবে ধরে পৌঁছে দিতে লাগল শুভদীপের মূল যন্ত্রে। আর শুভদীপ প্রতিদিন রাতে সেই যন্ত্রে জুড়ে দেওয়া কম্পিউটারের কিবোর্ডে বসে রনিতার উচ্চারণ করা শব্দের হিসেব রাখতে লাগল।

দশদিন পর একটা গড় হিসেব কষল শুভ। তাতে যে সংখ্যা পাওয়া গেল তা রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো ঃ ১৬৬৪৩।

পরদিন চায়ের টেবিলে রনিতাকে খবরটা জানাল শুভ।

'জানো, লাস্ট ১০ দিনে তুমি অ্যাভারেজে ডেইলি সাড়ে ১৬ হাজার শব্দ বলেছ।'

রনিতা খবরের কাগজের পাতায় চোখ বোলাচ্ছিল। চোখ না তুলেই বলল, 'সবসময় ইয়ারকি ভাল্লাগে না।'

'না, ইয়ারকি না। সিরিয়াসলি বলছি।'

এইবার খবরের কাগজ রেখে শুভর দিকে সরাসরি তাকাল রনিতা। কিছুক্ষণ স্বামীকে জরিপ করে জিগ্যেস করল, 'কী করে শুনলে?'

শুভদীপ ওর যন্ত্রের ব্যাপারটা রনিতার কাছে একটুও ভাঙেনি। এখনও ভাঙতে চাইল না। তাই চোখ মটকে বলল, 'সে একটা কায়দা আছে। এখন বলব না। পরে বলব।'

রনিতা আর কোনও কথা বলেনি। আবার খবরের কাগজের পাতায় চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ওর ভাবভঙ্গিতে শুভদীপ এটুকু বুঝতে পেরেছে যে, রনিতা ব্যাপারটা খুব খুশি মনে নেয়নি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও শুভদীপ এই রোমাঞ্চকর নেশায় ডুবে যাচ্ছিল। ওর যন্ত্রে রনিতার সমস্ত কথা টেপ করার ব্যবস্থাও ছিল। কখনও-কখনও ও গভীর রাত পর্যন্ত টেপরেকর্ডার চালিয়ে রনিতার কথাগুলো শুনত আর নিজের নানান বৈজ্ঞানিক হিসেব-নিকেশ করত। রনিতার কথার শব্দ শোনা আর শব্দ গোনা ওকে ক্রমশ যেন পাগল করে তুলল।

রনিতাকে ও ঠাট্টা করে মাঝে-মাঝেই ওর কথা বলার হিসেবটা শুনিয়ে দেয়। বলে, 'ডার্লিং, এই উইকে তোমার টকিং অ্যাভারেজ ১৫ হাজারের কিছু কম।'

রনিতা কোনও জবাব দেয় না। কিন্তু দিনের-পর-দিন একই ধরনের হিসেব শুনতে-শুনতে ও ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে আসে। শুভদীপের সঙ্গে খুব একটা কথা বলে না। শুভদীপ কিছু জিগ্যেস করলে দায়সারা ছোট্ট জবাব দেয়। কিন্তু তাতে ওর দৈনিক

গড় হিসেবে তেমন কোনও হেরফের হয় না। কারণ শুভদীপ যখন থাকে না, তখন রনিতা কা র বউ, বারান্দার চড়ুইপাখি, বাথরুমে ঢুকে পড়া পায়রা, আচমকা বৃষ্টি, কিংবা চড়া রোদ্দুর—এদের সঙ্গে বকবক করে ওর ঘাটতি পুষিয়ে নেয়।

রনিতার সুন্দর চোখের তলায় ধীরে-ধীরে একটা কালচে ছোপ পড়ছিল। এখন ও সারাটা দিন কাজে ব্যস্ত থাকে। সে ব্যস্ততা এমনই যে, কাজ না থাকলেও ও সর্বক্ষণ এ-ঘর ও-ঘর করতে থাকে আর আপনমনেই বকবক করে যায়। শুভদীপ যখন ওকে কিছু বলতে চায় তখন কেমন রুক্ষভাবে জবাব দেয়। চেহারা আগের তুলনায় অনেক ভেঙে গেছে। প্রায়ই হজমের গোলমালে ভোগে।

শুভদীপ একদিন ওকে ডাক্তার দেখানোর কথা বলতেই রনিতা একেবারে ঝাঁঝিয়ে উঠল, বলল, 'আমি ঠিক আছি, ডাক্তার আমার দরকার নেই, দরকার আসলে—' কথা শেষ করেনি রনিতা।

একদিন রাতে, অন্ধকারে, শুভকে পরম আগ্রহে অকূলপাথারে খড়কুটোর মতো জড়িয়ে রনিতা বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলব?'

'বলো—।'

'মেনে নিচ্ছি, আমি বেশি কথা বলি। তুমিই জিতলে, আমি হারলাম। কাল থেকে তোমার ওই এক্সপেরিমেন্ট তুমি বন্ধ করবে?'

অন্ধকারে মশারির ছাদের দিকে তাকিয়ে শুভ বলল, 'দেখি।'

কিন্তু ভেতরে-ভেতরে শুভদীপ টের পাচ্ছিল, এই নেশাটা ময়াল সাপের মতো ওকে পাকে-পাকে জড়িয়ে ধরেছে। ১৫ ওয়াটের একটা বাল্‌ব পাঁচমিনিট না জ্বালানো পর্যন্ত ওর নিস্তার নেই। একটা বিকৃত জেদ ভেতর থেকে ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

রনিতার উচ্চারণ করা কথা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে তা থেকে বিদ্যুৎ তৈরির জন্য পাগলের মতো মেতে উঠল শুভদীপ। প্রায় সাড়ে চারমাসের অক্লান্ত গবেষণায় ও তৈরি করল একটা অভিনব যন্ত্র—তার নাম দিল 'এনার্জি ট্র্যাপার'। এনার্জি ট্র্যাপার বা 'শক্তি-ফাঁদ' ওকে এতই খুশি করল যে, ও পাঁচদিন বিজ্ঞানের কাছ থেকে ছুটি নিল আর রনিতার কথাও শুনল না।

কিন্তু তারপর থেকেই ও আবার মেতে উঠল শক্তি-ফাঁদ নিয়ে।

রনিতার টেপ করা কথাগুলোকে ও স্বাভাবিক ভলিউমে প্লে-ব্যাক করে তা থেকে পরীক্ষামূলকভাবে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল। চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে স্ট্যান্ডে বসানো একটা ছোট্ট গোলকে শব্দ-শক্তিকে ফোকাস করে কেন্দ্রীভূত করল শুভদীপ। তারপর অতি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ফোর্স ফিল্ড প্রয়োগ করে সেই শক্তিকে বন্দি করল। আর তখনই চকচকে গোলকটা ভেসে উঠল শূন্যে। তার গায়ে আলো পড়ে অদ্ভুত এক বর্ণালী তৈরি করে ওটা যেন একটা স্বপ্নের বুদবুদ হয়ে ঘরের মধ্যে ভেসে বেড়াতে লাগল।

শুভদীপ অবাক হয়ে দেখতে লাগল রনিতার 'কথা' ভেসে বেড়াচ্ছে ওর ল্যাবরেটরিতে। তার গায়ে বর্ণালীর খেলা।

এরপর অন্তত মাসখানেক ধরে শুভদীপ ওর এনার্জি ট্র্যাপার নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলল।

এখন ওর ল্যাবরেটরি দরজা খুললেই দেখা যায় ছোট-বড় অসংখ্য রঙিন বুদবুদ স্থির হয়ে ভেসে আছে ঘরের ভেতরে। বাতাসে সামান্য আলোড়ন তুললেই সেগুলো হেলেদুলে নড়েচড়ে বেড়ায়। শুভদীপ ঘরের ভেতরে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ওগুলোকে দ্যাখে। আর একটা অদ্ভুত তৃপ্তি ওর বুকের ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে।

একদিন সন্ধেবেলা কাজ থেকে বাড়িতে ফিরে শুভদীপ রনিতাকে বলল, 'রনি, আজ একটা গুড নিউজ আছে।'

রনিতা নীচুগলায় যান্ত্রিকভাবে বলল, 'কী?'

'ডক্টর দত্ত, আমাদের ইন্সটিটিউটের ডিরেকটর, বলেছেন আমার রিসার্চের থার্ড স্টেজ সাকসেসফুল হলে এই বিষয়ে নতুন একটা প্রজেক্ট শুরু করবেন—আমি হব তার চিফ ইনভেস্টিগেটর।'

'শুনে খুশি হলাম।' রনিতার স্বরে কোনও প্রাণ ছিল না।

'জানো, থার্ড স্টেজ মানে কী?'

'না, জানি না।'

শুভদীপের মনে হল, ও যেন কোনও রোবটের সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু তাতেও ও দমে না গিয়ে বলল, 'থার্ড স্টেজ মানে একটা বাল্‌ব জ্বালানো—পাঁচ মিনিটের জন্যে।'

রনিতা কোনও কথা বলল না। কোনওরকম প্রতিক্রিয়াও দেখা গেল না ওর চোখেমুখে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রনিতা বলল, 'যাই, তোমার জন্যে চা করি গিয়ে—।'

শুভ ওকে খুশি করার জন্য বলল, 'একবার ও-ঘরে গিয়ে দেখবে চলো, ঘরময় কতকগুলো রঙিন বল ভেসে বেড়াচ্ছে। ওই বলগুলোর ভেতরে তোমার কথার শক্তি লুকিয়ে আছে। ভাবতেই কেমন গায়ে কাঁটা দেয় না?'

রনিতা অস্পষ্ট গলায় বলল, 'আমি যখন থাকব না, তখনও ওগুলো থেকে যাবে, তাই না?'

'হ্যাঁ। তুমি তো জানো, বিজ্ঞানীরা চলে যায় একের-পর-এক—কিন্তু বিজ্ঞান থেকে যায়।'

রনিতা হঠাৎই গলা পালটে কেমন অসহায় সুরে বলল, 'আমার কথা তুমি একটুও ভাবো না—।'

শুভদীপ মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে বলল, 'ভাবি। কিন্তু আমার রিসার্চটা যে অনেকটা সময় নিয়ে নেয়...।'

রনিতা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। আর শুভদীপ ওর গবেষণার তৃতীয় ধাপ নিয়ে ভাবতে লাগল।

একটা ব্যাপার শুভদীপ লক্ষ করছিল। ওর সামনে রনিতা ইদানীং ভীষণ কম কথা বললেও সারাদিনে ওর টকিং অ্যাভারেজ আগের তুলনায় অনেক বেশি। শুভর ডিজিটাল অডিয়ো ওয়ার্ড কাউন্টার সেই তথ্যটাই রোজ-রোজ জানিয়ে দিচ্ছিল ওকে।

রনিতার টেপ করা কথাগুলো রাতে শোনার সময় বেশ তাজ্জব হয়ে যাচ্ছিল শুভদীপ। আগে ওর কথাবার্তার পিছনে যদিও বা কোনও অজুহাত বা কারণ থাকত, এখন সেসবের কোনও বালাই নেই। যখন-তখন যা খুশি বকবক করে যায় ও, কথার কোনও মাথামুন্ডু নেই। একেবারে যেন পাগলের প্রলাপ।

রনিতা কথা বলতে এত ভালোবাসে!

শুভদীপ মাঝে-মাঝেই ভাবে, এ নিয়ে গবেষণা বন্ধ করবে। কিন্তু ওর ভেতরে একটা জেদি আর কৌতূহলী মন ওকে থামতে দেয় না।

একদিন শুভদীপের গবেষণার তৃতীয় ধাপও সফল হল।

একদিন সত্যি-সত্যিই ও একটা ১৫ ওয়াটের বাল্‌বকে সাড়ে ছ' মিনিটের জন্য জ্বালিয়ে রাখতে পারল। তখন ও খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল বাচ্চা ছেলের মতো। ওর গবেষণা নিয়ে রনিতার সঙ্গে আবোলতাবোল অনেক কথা বলে গেল। আনন্দের ঝোঁকে ও খেয়ালই করল না, রনিতার মুখে এক থমথমে ছাপ—মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে আছে, চোয়ালের হাড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সেদিন রাতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

রাত তখন কত হবে শুভদীপ জানে না। জিনিসপত্র ভাঙচুরের শব্দ পেয়ে ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

প্রথমেই যেটা খেয়াল করল, রনিতা পাশে নেই।

তখন শুভদীপ আর দেরি করেনি। পলকে ঘুমের ঘোর কাটিয়ে উঠে রওনা হয়েছে শব্দ লক্ষ করে। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে, শব্দগুলো ভেসে আসছে ওর ল্যাবরেটরি থেকে।

ল্যাবে গিয়ে এক মর্মান্তিক দৃশ্য দেখল শুভদীপ।

ঘরের বেশ কিছু যন্ত্রপাতি ওলটপালট করে ভেঙেচুরে ফেলেছে রনিতা। ঘরের বুদবুদগুলো এপাশে-ওপাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। আর অসহায় ভাঙাচোরা মেয়েটা মেঝেতে বসে হাউমাউ করে কাঁদছে।

'এসব কী হচ্ছে, রনি! কাঁদছ কেন?'

রনিতা স্বামীর কথায় ভ্রূক্ষেপই করল না, আকুল হয়ে কেঁদে চলল।

শুভদীপের কাছে ব্যাপারটা হেঁয়ালির মতো লাগছিল। ও অনেক করে রনিতাকে বোঝানোর চেষ্টা করল, কিন্তু কোনও লাভ হল না। এক প্রচণ্ড জেদ রনিতাকে একেবারে অন্য মানুষ করে দিয়েছে। ও শুভর কোনও কথায় কান দিল না। শুধু কান্নার ফাঁকে-ফাঁকে জড়ানো গলায় কীসব বলল। কথাগুলো শুভদীপ ঠিকমতো বুঝতে না পারলেও দেখল ওঁর ডিজিটাল কাউন্টারের ডিসপ্লে প্যানেলে সংখ্যার মান বেড়ে যাচ্ছে।

অনেক চেষ্টার পর ক্লান্ত এবং বিরক্ত হয়ে শুভদীপ শোওয়ার ঘরে ফিরে এল। অন্ধকারে চুপচাপ শুয়ে রইল বিছানায়। তখনও ওর কানে রনিতার কান্নার গোঙানি ভেসে আসছে।

ভোরবেলা শুভদীপই রনিতার মৃতদেহ আবিষ্কার করল।

ডাইনিং হলে সিলিং পাখার সঙ্গে শাড়ি বেঁধে ঝুলে পড়েছে ও। লম্বা হয়ে থাকা নিষ্প্রাণ পায়ের নীচে ডাইনিং টেবিল উলটে পড়ে আছে। আর ডাইনিং হলে ভেসে বেড়াচ্ছে দুটো শব্দের বুদবুদ। ল্যাবরেটরি থেকে কীভাবে ওরা এ-ঘরে এল কে জানে! শুভর মনে হল, এই বুদবুদজোড়া রনিতার আত্মহত্যার একমাত্র সাক্ষী।

কয়েকটা চড়ুইপাখি ঘরের জানলায় বসে কিচিরমিচির করছিল, ওদের সঙ্গে কথা বলার আর কেউ নেই।

একটু খোঁজাখুঁজি করতেই সুইসাইড নোটটা দেখতে পেল শুভদীপ। ডাইনিং হলের একপাশে একটা ক্যাবিনেটের ওপরে স্টিলের গ্লাস দিয়ে চাপা দেওয়া ছিল। তাতে রনিতা লিখে গেছে :

'আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়।
অনেক কথা বলার ছিল—বলা হল না।'

শুভদীপ আর সইতে পারেনি। বেপরোয়া কান্নায় ভেঙে পড়েছে রনিতার পায়ের নীচে। ও স্পষ্ট বুঝতে পারছিল, সুইসাইড নোটের শেষ লাইনটায় রনিতা যা বলতে চেয়েছে তার মর্ম শুভদীপ ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারবে না।

এরপর থানা-পুলিশ, পাড়া-প্রতিবেশীদের গুজব আর মন্তব্যে বেশ ক'টা দিন কেটে গেল। তারপর থেকে শুভদীপ একা। ওকে সবসময় ঘিরে থাকে রনিতার কথার রঙিন বুদবুদ। লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি শব্দের বুদবুদ।

মাঝে-মাঝে টেপ চালিয়ে রনিতার কথা শোনে ও। মনে পড়ে, রনিতা বলেছিল, 'আমি যখন থাকব না তখনও ওগুলো থেকে যাবে, তাই না?' আর শুভদীপ উত্তরে বলেছিল, 'হ্যাঁ, তুমি তো জানো বিজ্ঞানীরা চলে যায় একের-পর-এক—কিন্তু বিজ্ঞান থেকে যায়।'

সবসময় এই কথাগুলোই এখন ঘুরে বেড়ায় শুভদীপের মনে। রনিতার কথা থেকে আরও অসংখ্য বুদবুদ তৈরি করতে থাকে ও। এনার্জি ট্র্যাপার নিয়ে কাজ করে যায় পাগলের মতো। যেন শব্দের বুদবুদ তৈরি করা ছাড়া এখন ওর নিঃসঙ্গ জীবনের আর কোনও লক্ষ্য নেই।

শুভদীপ ক্রমশ মানসিক অবসাদে ভুগতে শুরু করেছিল। তা ছাড়া ওর সবসময় মনে হত রনিতা ওর কানের কাছে ক্রমাগত বকবক করে চলেছে। ওর বিজ্ঞানী মন বলে উঠত, ব্যাপারটা শ্রুতিভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ওর মনের একটা অংশ এই সরল যুক্তি মানতে চাইত না।

রনিতাকে হারিয়ে শুভদীপ একা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও একা থাকতেই চেয়েছিল। অথবা বলা যেতে পারে, ও রনিতার কথার কাছাকাছি থাকতে চেয়েছিল।

এরপর এমন একটা সময় এল যখন শুভদীপ রনিতার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। ল্যাবরেটরিতে বসে রনিতার কথার টেপ চালিয়ে ওর কথার পিঠে কথা বলে যেত। কোনও-কোনও সময় একা-একাই বিড়বিড় করত আপনমনে। রনিতা যে ওর কাছে নেই সেটা ও বুঝতে পারত না।

এইরকম একটা অদ্ভুত মানসিক অবস্থায় ও একদিন ঘোর দুপুরে একটা শব্দের বুদবুদ সঙ্গে করে বেড়াতে গেল লেকের ধারে। প্রায় জনহীন মাঠে দুপুরের রোদে বুদবুদটাকে শূন্যে ভাসিয়ে ও তার গায়ে নানা রঙের খেলা দেখতে লাগল।

ক্রমে-ক্রমে এই দুপুরে বেড়ানোটা শুভদীপকে পেয়ে বসল নেশার মতো। বুদবুদের গায়ে রঙের খেলা দেখতে-দেখতে ও বিড়বিড় করে কথা বলত রনিতার সঙ্গে। মাঝে মাঝে ভাবত, রনিতার অসংখ্য কথা মাঠে-ঘাটে-আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে দিলে কেমন হয়।

'আমি যখন থাকব না তখনও ওগুলো থেকে যাবে, তাই না?' শুভদীপের বুকের ভেতরে রনিতা কথা বলে উঠত।

এইভাবে যখন সময় কেটে যাচ্ছে তখন একদিন শুভদীপ ঠিক করল, ঘনীভূত শব্দের বুদবুদগুলোকে দুপুরের খোলা মাঠে নিয়ে গিয়ে সমস্ত শব্দ-শক্তিকে এক মুহূর্তে ছড়িয়ে দেবে আকাশে-বাতাসে। তাতেই বোধহয় সবচেয়ে বেশি খুশি হবে রনিতা। আর শুভদীপের অপরাধবোধও একেবারে হালকা হয়ে যাবে। এইভাবেই বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে মুক্তির পথ।

দুপুরবেলা খোলা মাঠে গাছতলায় বসে শূন্যে ভেসে থাকা দু-একটা বুদবুদের রঙিন শরীরের দিকে তাকিয়ে শুভদীপ এই মুক্তির কথা ভাবত আর রনিতার সঙ্গে বিড়বিড় করে কথা বলত আপনমনে।

ওর আশা ছিল শুধু একটাই, ও চলে যাবে, কিন্তু ওর বিজ্ঞান থেকে যাবে সকলের জন্য।

*

এখন আমি বুঝতে পেরেছি, ১১ নভেম্বর বেলা বারোটা নাগাদ কী হয়েছিল। লেকের মাঠ থেকে রনিতার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল আকাশে-বাতাসে। আর সেইসঙ্গে একজন ভেঙে পড়া নুয়ে পড়া আদ্যন্ত বিজ্ঞানী তরুণের ছিন্নভিন্ন দেহ ধূলিকণার মতো মিশে গিয়েছিল বাতাসে।

সেদিন দুপুরে এই ঘটনার সাক্ষীও যদি কেউ থেকে থাকে তা হলে দূর থেকে শব্দের বুদবুদগুলোকে সে নিশ্চয়ই রঙিন গ্যাস-বেলুন বলে ভেবেছে। আর গ্যাস বেলুন থেকে যে এতবড় বিস্ফোরণ হতে পারে সেটা নিশ্চয়ই কেউই বিশ্বাস করেনি।

চিঠির শেষে শুভদীপ লিখেছে ঃ

আমার নির্দেশ মতো এ-চিঠি তোর হাতে পৌঁছবে চরম ঘটনার বেশ কিছুদিন পর। তবে তার আগেই তুই শব্দ শুনে টের পেয়ে যাবি, আমি আর নেই। না, আমার এই ব্যাপারটাকে তুই সুইসাইড বলে ভুল বুঝিস না। এটা আমার এক্সপেরিমেন্টের একটা পার্ট। যদিও রনিতার কথা আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে গেলে কী হবে তা দেখা আমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। আমার গবেষণার সমস্ত কাগজপত্র এই সঙ্গে পাঠালাম। এগুলো আমাদের ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর ডক্টর দত্তকে দিয়ে দিস।

'আমি জানি, এ চিঠি পেলে তুই দুঃখ পাবি। কিন্তু জানিসই তো, বিজ্ঞানী চলে যায়, কিন্তু বিজ্ঞান থেকে যায়।'

এটাই ছিল শুভদীপের শেষ চিঠির শেষ লাইন।



অকালের ফুল

ফুলকাটা পলিথিন চাদরের ওপরে শুয়ে তুতু হাত-পা ছুড়ছিল আর হাসছিল। রাগি পায়ে চটির ফটফট শব্দ তুলে ঘরে ঢুকেছিল লাবণি। তুতুর দিকে চোখ পড়তেই মনের ভেতরে কীসব যেন হয়ে গেল। রাগের বাষ্প যেন দামাল বাতাসে এলোমেলো ফিকে হয়ে উবে গেল। অথচ একটু আগেই তো ভীষণ রেগে গিয়েছিল ও।

কথায় বলে, শাশুড়ি আর বউ ঠাঁই-ঠাঁই হলেই শান্তি থাকে। কিন্তু লাবণির সে সে উপায় নেই। খোকন—মানে, তিমির—অফিসে বেরোনোর পরই তো গোটা ফ্ল্যাটে মাত্র তিনটি প্রাণী—লাবণি, শাশুড়ি রেণুবালা আর কাজের কিশোরী মেয়ে মন্তু। সুতরাং দেখা সাক্ষাৎ উঠতে বসতে হবেই, আর ঠোকাঠুকিও লাগবেই।

সর্বকাজেই রেণুবালার ডাক দেওয়া অভ্যেস। কোনও কাজ করলে বলেন, কেন করলে? আবার না করলে বলেন, করলে না কেন? এ এক বিষম জ্বালা!

বিয়ের পর থেকেই শাশুড়ির সঙ্গে লাবণির লাঠালাঠি। কেন যে রেণুবালা লাবণিকে সহ্য করতে পারেন না কে জানে! অথচ তিমির ওর ভালোবেসে বিয়ের কথা মা-কে জানিয়েছিল। আশীর্বাদও পেয়েছিল। বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান নিয়েও কোনও গোলমাল হয়নি। কিন্তু তার ক'দিন পর থেকেই লাবণি টের পাচ্ছিল, রেণুবালা ওকে মোটেই সুনজরে দেখছেন না। লাবণি প্রথম-প্রথম মুখ বুজে সব সহ্য করেছে। অকারণ কটু কথার কোনও জবাব দেয়নি। এমনকী তিমিরের কাছেও

কোনও অভিযোগ বা অনুযোগ করেনি। কিন্তু যতই ও মুখ বুজে সব সয়ে যাচ্ছিল ততই যেন উগ্র এবং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিলেন রেণুবালা।

শেষ পর্যন্ত তিমিরকে বলেছে লাবণি। প্রথমে শুধুই সংক্ষেপে ঘটনা জানানো। তারপর অনুযোগ। আর সবশেষে অভিযোগ। লাবণি বুঝতে পারছিল, রেণুবালার তোলা ঝড়গুলো ওদের সংসারের ছিটেফোঁটা ভালোবাসার খড়কুটোগুলো নির্মম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তিমির বাড়িতে থাকলেও পরিবেশ যেন পালটাচ্ছে না। লাবণিও কেমন যেন খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে। অল্পেতেই রেগে উঠছে। এমনকী মঞ্জুর নানান কাজে যখন-তখন খুঁত ধরছে, বকাঝকা করছে।

কথা ছিল বিয়ের ঠিক পরেই ওরা দুজনে পুরী কিংবা দীঘা বেড়াতে যাবে। কিন্তু কেমন করে যেন সব এলোমেলো হয়ে গেল। যেসব অজানা অচেনা সুর দেহে-মনে বাসা বেঁধেছিল সব মিলিয়ে গেল একে-একে। ছোট্ট পৃথিবীটা থমথমে হয়ে গেল লাবণির কাছে। ওর দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। তিমিরের সঙ্গে মিষ্টি সম্পর্কের সুতোটা টান পড়তে-পড়তে ছিঁড়ে গেল একসময়। কিন্তু তবুও লাবণি ছেঁড়া সুতোর মাথা দুটো হাতড়ে বেড়াতে লাগল। যদি এখনও খুঁজে পাওয়া যায়, জুড়ে দেওয়া যায় নিপুণভাবে।

ঠিক এমনই একটা সঙ্কটের সময়ে তুতুর খবর পাওয়া গেল। লাবণির দেহে মোলায়েম সুষমা ফুটে উঠল। সবকিছু ভুলে গিয়ে ও খুশি হয়ে উঠল। তিমিরকে খবরটা জানাল, জানাল রেণুবালাকেও। লাবণির মনে হল, এতদিন এই একটা অপূর্ণতার জন্যই কি ও ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠেছিল নিজের ওপরে, সবার ওপরে?

তুতুর খবরটা তিমির ভালোভাবে নিলেও রেণুবালা এতটুকু পালটালেন না নিজেকে। বরং ছেলের বউকে আরও খাটুনির দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে একেবারে নাজেহাল করে তুললেন। লাবণি মুখে ঘামের ফোঁটা নিয়ে এ-ঘর ও-ঘর ছুটোছুটি করে কাজ করে। আগের মতো শাশুড়ির সব কথার পিঠে আর জবাব দেয় না। শুধু তুতুর কথা ভেবেই নিজেকে অন্যরকম করে রাখার চেষ্টা করে। আর ব্যাপার-স্যাপার যখন ভীষণরকম খারাপের দিকে চলে যায়, লাবণির সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন আঁচলে হাত মুছে সোজা তেতলার ছাদে চলে যায় ও।

ছাদে টবে বসানো দশ-বারোটা ফুল গাছ আছে। তাতে বেল, গোলাপ, নয়নতারা, জুঁই, লিলি ফুটে থাকে, গন্ধ ছড়ায়। ছাদে গেলে লাবণি ফুল গাছ দ্যাখে, আশপাশের বাড়ির ছাদে শুকোতে দেওয়া শাড়ি জামাকাপড় দ্যাখে, আর দ্যাখে কাক-পায়রা-চিল-চড়ুই।

রাতের বেলায় এই ছবিটা পালটে যায়। তখন দেখা যায় শুধুই চাঁদ আর ফুটফুটে তারা। আর একইসঙ্গে পাওয়া যায় ফুলের গন্ধ। লাবণির খুব ভালো লাগে।

বছরতিনেক আগের কথা। তুতু তখনও আসেনি। একদিন সন্ধেবেলা, লাবণির

মনে আছে, ফুলগাছ নিয়ে কী একটা কথা হচ্ছিল রেণুবালার সঙ্গে। লাবণিদের বাড়ির সদরে একটা মাধবীলতা গাছ আছে। বহু বছরের গাছ হলেও তাতে কখনও কোনও. ফুল আসেনি। রেণুবালা কথার পিঠে ফস করে বলে উঠেছিলেন, আমাদের বাড়িতে যত ফুল-না-ফোটা গাছের কারবার। খোকনটা গাছ চেনে না। গাছকানা।

শুনে লাবণির গা জ্বালা করে উঠেছিল। রেণুবালার কথার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন খোঁচা ছিল সেটা বুঝতে ওর কষ্ট হয়নি। বিয়ের পর তিনটে বছর কেটে গেলেও লাবণির সন্তান হয়নি। প্রথম-প্রথম ওরা সন্তান চায়নি। আর পরে যখন চেয়েছে তখন পায়নি। দু-একজন ডাক্তার দেখানোর পর আরও হতাশ হয়ে পড়েছিল লাবণি। ও লুকিয়ে-লুকিয়ে আপনমনে একা-একা কাঁদত। তিমির কখনও ওকে সান্ত্বনা দিত, কিন্তু এক-এক সময় তিমিরের অসন্তোষটাও চাপা থাকত না।

এইসব দুঃখের মুহূর্তে ছোট্ট ছাদটাকে খুব প্রিয় মনে হত লাবণির। গাছের পাতা, ফুলের ঘ্রাণ, রাতের আকাশ, উড়নচণ্ডী বাতাস ওকে টানত। ভগবানের চেয়েও আপন ছিল এই অ-মানুষগুলো। কখনও-কখনও ওদের সঙ্গে কথাও বলত লাবণি। ওর মনে হত, ওরা যেন উত্তর দিচ্ছে ওর কথায়। ওর দুঃখের দিনে ওরাই একমাত্র বন্ধু।

এরকমই এক দুঃখের রাতে ছাদে চলে গিয়েছিল লাবণি। রেণুবালার হিংস্র আক্রমণ ওকে সারাটা দিন ধরে ক্ষতবিক্ষত করেছিল। আর তিমিরও অফিস থেকে ফিরে কী যেন একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে কয়েকটা অভদ্র মন্তব্য করেছিল। লাবণি সারাদিন যতটা পেরেছে শাশুড়ির আক্রমণ ঠেকিয়েছে। নিজেও পালটা আক্রমণ করতে ছাড়েনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মঞ্জুর সামনে ওকে 'বাঁজা' বলে খোঁটা দেওয়ায় ওর কান্না পেয়ে গিয়েছিল। তারপর সন্ধেবেলা, তিমির বাড়ি ফেরার পর, আবার একই ধরনের আঘাত। লাবণি কোনও প্রতি-আঘাত করেনি। ওর কান্না বুকে চেপে মুখ বুজে থেকেছে। রান্না করা, তিমিরকে খেতে দেওয়া, এইসব কর্তব্য পালন করে গেছে।

তারপর রাত গাঢ় হলে, তিমির অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লে, ও ছাদে চলে গিয়েছিল। রাতের আকাশ ওর দুখি মনটাকে কাছে টেনে নিয়েছিল। তারাগুলো মিটমিট করছিল, চোখের পাতা ফেলছিল বারবার।

লাবণির নাকে ফুলের ফুরফুরে গন্ধ আসছিল। ও মাথা তুলে আকাশের তারা দেখছিল। তারাদের ও নামে চেনে না। তবে দু-একটা নাম যা শুনেছে সেগুলো ওর ভালো লাগে। শ্রবণা, শতভিষা, অরুন্ধতী, মৃগশিরা। লাবণি আকাশের দিকে তাকিয়ে ক্রমশ সম্মোহিত হয়ে যাচ্ছিল যেন। ওর চোখে-মুখে-গায়ে তারার আলো এসে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল আকাশের মনোরম আলো ওকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে।

লাবণি হঠাৎই ছাদে শুয়ে পড়েছিল চিত হয়ে। কত দূরে আছে ওরা? আকাশের মতো বিশাল মনের মাঝে ভালোবাসার কুচিকুচি হিরের টুকরো।

এমনসময় একটা ছুটন্ত তারা দেখতে পেল লাবণি। আকাশের সেই শীর্ষ থেকে সাবলীল ভঙ্গিমায় বাতাসে সাঁতার কেটে যেন নেমে আসতে চাইছে ওর কাছে। কবিতার মতো ছন্দ তৈরি করে ছুটে আসছে এক আলোর হরিণ।

লাবণির মন থেকে সমস্ত দুঃখ কান্না মুছে গেল। ওর ঠোঁট কাপছিল। চোখের পালক কাঁপছিল। ওর চোখ বুজে গেল এক আদুরে আবেশে। কিন্তু তখনও ও যেন দেখতে পাচ্ছিল সেই খসে পড়া তারাটা ছুটে আসছে ওকে লক্ষ্য করে। আর অনুভব করতে পারছিল, অসংখ্য নক্ষত্রের মিষ্টি আলোয় ওর শরীর স্নান করছে...স্নান করছে...।

লাবণি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন ঘুম ভাঙল তখন নিজেকে ছাদে শোওয়া অবস্থায় আবিষ্কার করে কিছুটা অবাকই হল ও। এখানে ও কখন এল? কেমন করে এল?

একটু পরেই ওর সবকিছু মনে পড়ে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরোনো দুঃখগুলোকে ও যেন আর খুঁজে পাচ্ছিল না।

লাবণি ছাদ থেকে নেমে এল। শরীর ভারী লাগছে। কেমন এক অদ্ভুত অবসাদ ওকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিতে চাইছে। পায়ে-পায়ে সিঁড়ি নেমে এসে ও মুখে-মাথায়-ঘাড়ে জলের ছিটে দিল। তারপর গিয়ে শুয়ে পড়ল ঘুমন্ত তিমিরের পাশে। ও তিমিরের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল।

ওই সুন্দর রাতটা বড় বেশি করে মনে আছে লাবণির।

তারপর থেকে রাতের আকাশ, রাতের তারা, ওকে আরও বেশি করে টানে। এই আশ্চর্য টান ধীরে-ধীরে গড়িয়ে গেল মারাত্মক নেশায়। এ নিয়ে রেণুবালা অথবা তিমিরের কাছ থেকে মাঝে-মাঝেই কথা শুনতে হয়েছে লাবণিকে। কিন্তু সে-কথার জবাব দেওয়ার কোনও সাধ জাগেনি ওর। লাবণির নিজেরই কেমন অবাক লেগেছে। ও কি পালটে যাচ্ছে ক্রমশ?

লাবণি প্রায়ই ওই সুন্দর রাতটার কথা ভাবত। একদিন ও যখন মনে-মনে ওই খসে পড়া তারাটার ছবি দেখছিল তখন হঠাৎই তুতুর খবর যেন টের পেল ও। গত কয়েকটা দিন ওর আশা-আকাঙক্ষায় কেটেছে। তারপর সেদিন নিশ্চিত ইশারাটা পাওয়ামাত্রই লাবণি খুকি হয়ে গিয়েছিল। ওর ইচ্ছে করছিল ছুটোছুটি করে, বারান্দায় যায়, এটা ভাঙে, সেটা ছোড়ে।

প্রথমে খবরটা ও জানিয়েছিল তিমিরকে, তারপর রেণুবালাকে।

তুতুর জন্মের ঠিক আগে, জন্মের সময়, অথবা জন্মের পরে লাবণি কোনও কষ্ট পায়নি। যে-প্রসব বেদনা জন্মের আসন্ন মুহূর্ত জানিয়ে দেয়, লাবণির বেলার

তার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। শুধু ওর মন যেন বলে উঠেছিল, সময় হয়ে গেছে।

তুতুর জন্ম অনেককেই অবাক করে দিয়েছিল। আর ওর সৌন্দর্য মুগ্ধ করে দিয়েছিল সকলকেই।

তুতু যতই বড় হয়ে উঠতে লাগল ঘটনাগুলো ততই নজর কাড়ল লাবণির।

তুতুকে দেখলে অকারণেই মন ভালো হয়ে যায়। বুকের গভীরে খুশির ফুল ফুটে যায় পলকে। এমনটা হয় শুধু কি লাবণির! তিমির আর রেণুবালারও যেন একই অবস্থা। তুতুর দিকে চোখ পড়লে, কি ওকে কোলে নিলেই ওরা হয়ে যায় অন্য জগতের মানুষ।

এইভাবে, লাবণি লক্ষ করছিল, সংসারের ছোট-বড় অশান্তিগুলো যেন ক্রমশ কমে আসছে। মনের মধ্যে ফুঁসে ওঠা রাগের বাষ্প সবসময় কেমন অলৌকিকভাবে যেন ফিকে হয়ে যায়। যেমন, এই মুহূর্তে।

লাবণি বিছানার কাছে এগিয়ে এসে তুতুকে আদর করে কোলে তুলে নিল। চুমোয়-চুমোয় ভরিয়ে দিল ওর সুন্দর মুখ।

তুতু, সোনামণি আমার। আমার সোনা ছেলে!

তুতু ওর সুন্দর হাত-পা এলোমেলোভাবে নাড়তে লাগল। মিষ্টি স্বরে দুর্বোধ্য সব শব্দ উচ্চারণ করতে লাগল।

এমনসময় পা দাপিয়ে রেণুবালা ঘরে এসে ঢুকলেন। রুক্ষ গলায় বলতে শুরু করেছিলেন, লাবণি, তোমাকে আমি—। কিন্তু ওই পর্যন্তই। গলার স্বর ও সুর পালটে গেল রেণুবালার। বললেন, তুতুর খাওয়া হয়েছে, লাবণি?

লাবণি বলল, এইবারে দেব।

তারপর শুরু হল ঠাকুমা আর নাতির খেলা। আর তারই ফাঁকে তুতু ক দুধ খাওয়াতে লাগল লাবণি।

এইভাবে সংসারের ছবিটা ধীরে-ধীরে পালটে যাচ্ছিল। আগে মন খারাপ হলে লাবণি একা ছাদে যেত। এখন তুতুকে কোলে নিয়ে ও প্রায়ই সেখানে যায়। অবাক হয়ে ও লক্ষ করেছে, ওইটুকু বাচ্চারও যেন তারার নেশা লেগেছে। অন্ধকার আকাশের উজ্জ্বল টিপগুলোর দিকে চকচকে চোখে তাকিয়ে দ্যাখে ও। অর্থহীন শব্দ তোলে মুখে। আর হাত নাড়ে। লাবণি মুগ্ধ চোখে ওর শিশুকে দ্যাখে। এক অদ্ভুত ভালোলাগা ওর বুকের ভেতরে হামাগুড়ি দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, থিতু হয়ে বাসা বাঁধে।

তিমিরের মধ্যেও যে পালটে যাওয়ার ব্যাপারটা ঘটে যাচ্ছে সেটাও লাবণি ক্রমশ টের পাচ্ছিল। আগে অফিস থেকে ফেরার পর তিমিরের মেজাজ চড়া সুরে বাঁধা থাকত। কিন্তু এখন সেই সুর গভীর খাদে নেমে এসেছে। তিমির এখন বেশি

কথা বলে। অকারণ বকবক করে লাবণির সঙ্গে, তুতুর সঙ্গে।

এইরকমই এক সন্ধেবেলা এক অবাক করা ঘটনা ঘটে গেল।

তিমিরের কাছে একটা রুবিক কিউব ছিল। অনেকগুলো চৌকোনা ছোট বাক্সের বিভিন্ন পিঠে বিভিন্ন রং। সেগুলো একসঙ্গে জুড়ে তৈরি হয়েছে রুবিক কিউব। তার ছ'পিঠের ছ'টা রং মেলানো খুব কঠিন—অন্তত তিমিরের কাছে। সেদিন সন্ধেবেলা রং-এলোমেলো হওয়া কিউবটা নিয়ে তিমির নানান কসরত করে রং মেলানোর চেষ্টা করছিল, আর একইসঙ্গে তুতুর সঙ্গে গল্প করছিল। তুতু ওর ওয়াকারে বসে ছিল। হঠাৎই ও হাত বাড়িয়ে দিল বাবার দিকে। রঙচঙে রুবিক কিউবটা আঁকড়ে ধরতে চাইল ওর কোমল হাতে। তিমির ওকে কিউবটা দিয়ে বলল, দ্যাখ তো, তুই পারিস কি না। আমি তো এতদিন ধরে চেষ্টা করে-করে নাজেহাল হয়ে গেছি।

তুতু কিউবটা নিয়ে খেলা করতে লাগল। একটু পরেই ওটা ও আবার ফিরিয়ে দিল বাবার দিকে। আর তখনই তিমির চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল।

রুবিক কিউবের ছ'পিঠের রং সুন্দরভাবে মিলে গেছে!

তিমির ওর চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। ও লাবণিকে কিউবটা দেখিয়ে বলল, ওইটুকু বাচ্চা কীভাবে রুবিক কিউব সল্‌ভ করে দিল!

লাবণি অবাক হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ঘটনাটা ওর মন মেনে নিতে চাইছিল না। ও কিছুটা যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। হোঁচট খাওয়া গলায় ও বলল, আমার মনে হয় তুমি যখন চেষ্টা করেছিলে তখনই কোনওভাবে ওটার রং মিলে গেছে। তারপর তুমি খেয়াল না করে তুতুর হাতে ওটা দিয়েছ—।

তিমির লাবণির কথায় কর্ণপাত করল না। রুবিক কিউবটা একপাশে রেখে দু-হাতে ছেলেকে তুলে নিল কোলে। তারপর পাগলের মতো আদর করতে লাগল তুতুকে।

লাবণি চুপ করে তুতুকে দেখছিল। ওর বুকের ভেতরে এক অলৌকিক বাজনা বাজতে শুরু করেছিল।

এখনও সেই বাজনাটা অনুভব করল লাবণি।

শুধু কি বাজনা! মানুষগুলোর বুকের ভেতরে একশোটা করে টিউব লাইট জ্বলিয়ে দিয়েছে শিশুটা। তুতুকে দুধ খাওয়াতে-খাওয়াতে ওর পুরোনো আর নতুন, দুটো জীবনের কথা ভাবছিল লাবণি। ওর ভালো লাগছিল।

পরদিন ভোরবেলা লাবণির ঘুম ভাঙল শাশুড়ির চিৎকারে।

লাবণি, লাবণি,—ওঠো, দেখে যাও শিগগির। লাবণি—।

চিৎকারের মধ্যে খুশির ভাবটা চাপা ছিল না রেণুবালার। বেশবাস ঠিক করে দরজা খুলতেই রেণুবালা লাবণিকে প্রায় হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন দোতলার বারান্দায়। ঝুঁকে পড়লেন রেলিঙের কোণে। তারপর আঙুল তুলে মাধবীলতা গাছটা দেখিয়ে বললেন, দ্যাখো, দ্যাখো—কী আশ্চর্য ব্যাপার—।

লাবণি দেখল। মনটা সত্যিই খুশিতে ভরে গেল ওর। যে-মাধবীলতা গাছটায় গত দশ বছরে শত চেষ্টাতেও কোনও ফুল ফোটেনি, আজ সেই বন্ধ্যা তরুলতা নিজেকে বিয়ের সাজে সাজিয়ে বসে আছে। তার সারা অঙ্গে সাদা আর গোলাপি রঙের বেনারসি জড়ানো।

লাবণি বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল। ওর মনে পড়ল, কাল বিকেলে তুতুকে কোলে নিয়ে ও বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। পাশেই ছিল মাধবীলতার সবুজ পাতার দল। তুতু ওর কোল থেকেই নানা দিকে হাত বাড়াচ্ছিল আর বিচিত্র অর্থহীন সব আদুরে শব্দ করছিল। তখন লাবণির কী মনে হয়েছিল, ও হঠাৎ বলেছিল, তুই তো আমাদের সবাইকে ভালো করে দিলি। এই গাছটাকেও ভালো করে দে তো দেখি—দশবছর ধরে গাছটার অসুখ...।

আর তার পরই কখন যেন গাছটার পাতা খামচে ধরেছিল তুতু। ওটার সরু-সরু ডালপালা বারবার আঁকড়ে ধরছিল। নানান শব্দ করছিল মুখে।

তারপর আজ—আজ এরকম একটা অপরূপ দৃশ্য!

রেণুবালাকে তুতুর কথা বলতে গিয়েও বলতে পারল না লাবণি। কে জানে এ ওর কল্পনা কি না। ও শুনেছে, অনেক সময় অনেক গাছ বহু বছর রুগ্ন থাকার পরে হঠাৎ করে নিজে থেকেই সেরে ওঠে। এই মাধবীলতা গাছটার বেলায় হয়তো সেরকমই কিছু হয়েছে। কে জানে!

কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের ঘরে তুতুর কাছে ছুটে গেল লাবণি। ঘুমন্ত তুতুকে চুমু খেল দু-গালে। তারপর কী ভেবে ওর পাশে শোওয়া তিমিরের কপালেও একটা চুমু এঁকে দিল। তিমিরের ঘুম ভেঙে গেল সঙ্গে-সঙ্গেই। ও জড়ানো গলায় বলল, কী ব্যাপার?

লাবণি হেসে বলল, আজ মাধবীলতার বিয়ে। তোমাকে অফিস যেতে হবে না।—বলেই আবার হেসে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তিমির অবাক চোখে বউয়ের চলে যাওয়া দেখল।

এইভাবে খুশি ও সুখের চাদরগুলো যখন অশরীরী কেউ ওদের সামনে একে-একে মেলে দিচ্ছে তখন হঠাৎ করেই তুতুর অসুখ করল।

এমনিতে যে-কোনও দেড় বছরের শিশুর অসুখ করতেই পারে। কিন্তু যে সকলের অসুখ সারায় তার অসুখ হওয়াটা লাবণি সহজভাবে মেনে নিতে পারল না। ও কেমন পাগলের মতো হয়ে উঠল।

তুতুর জন্য ডাক্তার-ওষুধ ইত্যাদি চলছিল। কিন্তু রোগটা যে ঠিক কী তা ডাক্তারবাবু বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তিমিরও কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। মা-কে দেখে, স্ত্রীকে দেখে ও ভেতরে-ভেতরে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল।

তুতুর সুন্দর মুখটা দিনের-পর-দিন মলিন, মলিনতর হয়ে যাচ্ছে। ওর হাসিখুশি ভাব, হাত-পা ছোড়া, সবটাই হয়ে উঠছে স্তিমিত। তিমিরের চোখের সামনে অনেকগুলো সূর্য ধীরে-ধীরে ডুবে যাচ্ছিল। ওদের সকলের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে যাচ্ছিল একইসঙ্গে। আর দিগন্ত ছুঁয়ে ফেলতে চাইছিল।

বহুদিন চোখের জল নিয়ে ছাদে যায়নি লাবণি। কিন্তু তুতুর অসুখ ওকে দিশেহারা করে দিল। ডাক্তার বদল ওষুধ বদল করেও অবস্থার কোনও উন্নতি ওর চোখে পড়ছিল না। এইরকমই এক অসহায় শোকের রাতে লাবণি ছাদে গেল। আকাশের তারাদের দিকে তাকাল। শ্রবণা, শতভিষা, অরুন্ধতী, মৃগশিরা। লাবণির বুকের ভেতরে কষ্ট হচ্ছিল। আগেও কষ্ট হত, কিন্তু আজকের কষ্ট অন্যরকম।

ও গত আঠেরোটা মাসের কথা ভাবছিল। সুমধুর আঠেরোটা মাস। এই দিনগুলোর প্রতিটি পল-অনুপল ওকে ঠেলতে-ঠেলতে ক্রমে-ক্রমে নিমজ্জিত করেছে রূপকথার সুখী সরোবরে। এখন অসুখের তাপে সেই সরোবরের প্রতিটি বিন্দু কি বাষ্প হয়ে যাবে? একে-একে নিভে যাবে ওদের বুকের ভিতরের টিউব লাইটগুলো? লাবণি যেন কল্পনায় দেখছিল, তিমিরের রুবিক কিউবটা আবার এলেমেলো জটিল হয়ে যাচ্ছে। মাধবীলতা গাছটা আবার বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। আর ওর বুকের ভেতরে সাদা আলোগুলো একে-একে নিভে গিয়ে জ্বলে উঠেছে পনেরো ওয়াটের এক মলিন নির্জীব বাতি। সেই আলোয় চোখে পড়ছে কতকগুলো পলেস্তারা খসা প্রাচীন দেওয়াল। দেওয়ালগুলোয় কোনও জানলা নেই। বাতাস বইতে পারে না, রোদ ঢোকে না, তারার আলো ফোটে না সেই ঘরে। শুধু অন্ধকার কতকগুলো ছায়া সেখানে বাস করে। পরস্পরকে ঘেন্না করে, ঈর্ষা করে, কষ্ট দিয়ে তারা বেঁচে থাকে—অথবা মরে থাকে।

লাবণি জোরে শ্বাস নিল। সেই উল্কাটা যেন কবে খসে পড়েছিল আকাশ থেকে? সেই অদ্ভুত রাতের তারাময় আকাশে কোন এক জ্যোতিষ্কের উজ্জ্বল এক অণুকণা চোখ টেনেছিল লাবণির। আর তার পরই তুতু এল। লাবণির চোখের কোণ বেয়ে জল পড়ছিল। রাতের বাতাসে ওর শীত করছিল। টবে বসানো গাছের পাতাগুলো নড়ছিল। ওরা যেন মাথা ঝাঁকাচ্ছে বারবার।

লাবণি তারাদের কাছে তুতুর জীবন প্রার্থনা করছিল। আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ হয়ে যে-পবিত্র শিশু ওর কোলে জন্ম নিয়েছিল সে ওর একার নয়—সে এসেছিল সকলের ভালো করতে। পৃথিবীর দূষিত পরিবেশ ওর নিশ্বাসে কি একটু-একটু করে নিষ্কলুষ হয়ে উঠতে পারত না?

রাতের তারাদের দিকে তাকিয়ে লাবণির নীরব অনুনয় যখন ক্রমশ নীরব হাহাকার হয়ে যাচ্ছে ঠিক তখনই নীচে থেকে কান্নার তীব্র চিৎকার ওর কানে এল।

পৃথিবী থেকে কয়েক লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের কোনও একটি গ্রহে স্বচ্ছ স্ফটিকের চার দেওয়ালের মাঝে মৃদু গুঞ্জন তুলে কাজ করছিল একটি যন্ত্র। যেমনই বিচিত্র তেমনিই অতিকায় তার আকার। যন্ত্রটির মস্তিষ্ক জটিল কোনও অঙ্ক নিয়ে মগ্ন ছিল। মহাবিশ্বের যাবতীয় বাসযোগ্য গ্রহ এবং তাদের অধিবাসীদের নিয়ে গবেষণা করছে যন্ত্রটি। তার একমাত্র লক্ষ্য, যে-কোনওরকম সমস্যার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান খুঁজে বের করা। এই মুহূর্তে যে-গ্রহটি নিয়ে সে গবেষণা করছে তাকে সেখানকার অধিবাসীরা 'পৃথিবী' নামে ডাকে। সেই পৃথিবীবাসীদের সমাজ-জীবন সংক্রান্ত নানান সমস্যার সমাধান করতে সে দূর-নিয়ন্ত্রিত একটি অণুজীবের সৃষ্টি করেছিল। ভ্রূণাবস্থা থেকে শুরু করে আঠেরো মাস ধরে সেই অণুজীবটি বহু তথ্য সংগ্রহ করেছে, বহু পরীক্ষা চালিয়েছে। সেইসব তথ্য ও পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করেই নতুন অঙ্ক করছিল যন্ত্রটি। খুঁজে বের করছিল আরও নতুন-নতুন সমস্যা সমাধানের পথ। আপাতত সে দূর-নিয়ন্ত্রিত অণুজীবটিকে ফিরিয়ে নিয়েছে নিজের কাছে। তবে সময় হলে আবার সে পাঠাবে তাকে। একবার...দুবার...বারবার। যে-করে হোক সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধানগুলো তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। সেটাই তার একমাত্র লক্ষ্য।



সুখের সংসার ডট কম

ভোরের আলো ফুটেছিল অনেক আগেই, কিন্তু সেটা দেখেও বিছানা ছেড়ে উঠতে চাননি লাবণ্য। কেমন একটা আলসেমি ওঁকে জড়িয়ে ধরেছিল আজ। রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোন—তার জন্য একটা ঝিমুনিভাব থাকেই, কিন্তু গত রাতে কয়েকটা স্বপ্ন কেমন একটা বাড়তি ঘুমের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল। স্বপ্নের গল্পগুলো মনে নেই, তবে তাতে প্রমথনাথকে যে দেখেছেন, সেটা মনে আছে।

স্বামী প্রমথনাথ চলে গেছেন প্রায় আটবছর। একটা অভাব তার জন্য থাকবেই—সেটা কখনও পূরণ হওয়ার নয়। কিন্তু অন্য আরও যেসব অভাবের গল্প নানানজনের কাছে শোনেন...।

'মা, উঠে পড়ুন...অনেক বেলা হয়ে গেছে।'

ঘরে ঢুকে পড়েছে মধুমিতা—এ-বাড়ির একমাত্র বউ। মিষ্টি মুখ, স্বভাবও। রোগা তরতরে চেহারা। সবসময় এ-কাজ সে-কাজ নিয়ে ছটফট করছে। এখন পুবের জানলাদুটোর পরদা সরিয়ে দিল। তারপর খুলে দিল পুবের ঝুলবারান্দার দরজা।

সঙ্গে-সঙ্গে কত কী যে ঝাঁপিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে! পাখির ডাক, ফুলের গন্ধ, হুটোপুটি রোদ্দুর। প্রমথনাথের এগুলো খুব প্রিয় ছিল। বড় শখ করে পুবের এই বারান্দা তৈরি করেছিলেন। সূর্য উঠলে প্রথম আলো ছড়িয়ে পড়বে বারান্দায়, এবং সেখানে দাঁড়িয়ে সূর্যস্তবের মন্ত্র আওড়াবেন প্রমথনাথ।

তিনবছর চুটিয়ে শখ মিটিয়েছিলেন। তারপর চলে গেলেন। এখন লাবণ্যর এই ঘরের মার্বেল পাথরের মেঝে থেকে আলো ঠিকরে পড়ে দেওয়ালে। সেখানে টাঙানো আছে প্রমথনাথের রঙিন ফোটো। এভাবেই ভোরের আলোর শখ মিটছে মানুষটার। হয়তো মনে-মনে আওড়াচ্ছেন সূর্যস্তবের মন্ত্র। কে জানে!

'মুখটা ধুয়ে নিন, মা, আমি চা করে নিয়ে আসছি—।'

'শরীরটা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে।' লাবণ্য জড়ানো গলায় বললেন। ধীরে-ধীরে উঠে বসলেন বিছানায়।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় ছুটে কাছে চলে এল মধুমিতা। লাবণ্যর কপালে-গালে হাত রাখল

'কই, জ্বর তো নেই! ঠিক আছে, ডক্টর মুখার্জিকে একবার কল করে দিচ্ছি। ওকে বলছি—।'

মধুমিতার কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘরে ঢুকে পড়ল দীপ্তিমান। চুল উসকোখুসকো, পরনে স্যান্ডো গেঞ্জি আর পাজামা। ফরসা চেহারা, ভারী গাল, গেঞ্জির গলার বৃত্তচাপের ওপর দিয়ে লোমশ বুক উঁকি মারছে।

ঘরে ঢুকেই সটান মায়ের কাছে চলে এল দীপ্তিমান। পা ছুঁয়ে প্রণাম করল মা-কে। তারপর বিছানায় বসে পড়ল।

দীপ্তিমানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন লাবণ্য, বললেন, 'তোর যে কী এক ছেলেমানুষি স্বভাব। রোজ-রোজ প্রণাম করার কী আছে!'

দীপ্তিমান হেসে বলল, 'ও তুমি বুঝবে না, মাদার। সকালবেলা তোমাকে প্রণাম করে আমি সারাদিনের কাজের এনার্জি পাই।'

মধুমিতা চুপ করে দাঁড়িয়ে মা-ছেলের কথা শুনছিল। চট করে লাবণ্যকে প্রণাম করে ফেলল ও।

লাবণ্য বললেন, 'দ্যাখ তো, দিপু, তুই প্রণাম করিস বলে বউমাকেও প্রণাম করতে হয়! তোরা এখনও সেকেলে রয়ে গেলি!'

'কী যে বলো, মা। তোমার পা না ছুঁয়েই কি আধুনিক হওয়া যায়! আধুনিক হওয়া কী এতই সহজ ব্যাপার!'

মধুমিতা দীপ্তিমানকে বলল, 'অ্যাই, ডক্টর মুখার্জিকে একবার কল করে দাও—মায়ের শরীরটা ভালো নেই।'

'সে কী!' প্রায় আঁতকে উঠল দীপ্তিমান। লাবণ্যর কপালে হাত দিয়ে উষ্ণতা আঁচ করতে চাইল। তারপর বিছানা ছেড়ে উঠতে-উঠতে বলল, 'আমি এক্ষুনি ডক্টর মুখার্জিকে রিং করছি। উনি কলে বেরোনোর আগে আমাদের এখানে হয়ে যাবেন। তুমি আয়া-মাসিকে বোলো সবসময় মায়ের কাছে-কাছে থাকতে।'

লাবণ্যর ঘর ছেড়ে ড্রইং-ডাইনিং-এ গেল দীপ্তিমান। টেলিফোনটা সে-ঘরে একটা কর্নার টেবিলে রাখা আছে।

রিসিভার তুলে নম্বরের বোতাম টিপতে-টিপতে ও চেঁচিয়ে মধুমিতাকে বলল, 'আজ আমি একটু আর্লি অফিসে বেরোব—অ্যাবাউট সাড়ে আটটায়। আর বাবুনকে ঘুম থেকে তুলে দাও। নইলে ওর স্কুলের দেরি হয়ে যাবে।'

মধুমিতা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে ছুটল। চায়ের জল বসিয়ে বাবুনকে চটপট ডেকে তুলতে হবে।

আয়া-মাসি সারদা টয়লেটে গেছে। ও লাবণ্যর সবসময়ের সঙ্গী। অল্পবয়েসে স্বামী হারিয়েছে। গরিব হলেও চেহারায় একটা আভিজাত্যের প্রলেপ রয়েছে। ভীষণ কম কথা বলে। আর সেইজন্যই লাবণ্যর ওকে বেশি ভালো লাগে। লাবণ্যর যে-কোনও প্রয়োজন সারদা যেন টেলিপ্যাথিতে টের পায়। ওকে ছাড়া লাবণ্য বেশ অসহায় বোধ করতেন।

মধুমিতা চা দিয়ে গেল লাবণ্যকে। বলল, 'মা, চুমুক দিয়ে দেখুন তো ঠিক আছে কি না—।'

লাবণ্য শব্দ করে চুমুক দিলেন। তৃপ্তির একটুকরো শব্দ বেরিয়ে এল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। বোঝাই যায় না চিনির বদলে স্যাকারিন দিয়ে তৈরি। 'ইকোয়াল' না কী নাম যেন। প্রথম-প্রথম বিস্বাদ লাগত—ডাক্তারের কথা মানতে ইচ্ছে করত না। এখন সয়ে গেছে।

চা খাওয়ার সময় প্রথমনাথকে মনে পড়ে। পুবের বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে দুজনে চা খেতেন। চুমুকে শব্দ হলেই প্রমথনাথ বিরক্ত হয়ে বলতেন, 'কী যে বিশ্রী শব্দ করে চা খাও! চা খাবে, কোনও শব্দ হবে না—এটা এটিকেট।'

লাবণ্য হাসতেন। বলতেন, 'যতই এটিকেট হোক, চায়ে চুমুকের শব্দটাই হচ্ছে আসল! ও না হলে আমেজ আসে! শব্দ না করে চা খাওয়া মানে মনে-মনে চা খাওয়া।'

স্মৃতিবিধুর হাসি লাবণ্যর ঠোঁট ছুঁয়ে গেল। মধুমিতাকে বললেন, 'চা-টা দারুণ হয়েছে।'

মধুমিতা বলল, 'সেটা আপনার মুখের হাসি দেখেই বুঝেছি। আমি যাই—বাবুনকে রেডি করি গিয়ে। পরে এসে জেনে যাচ্ছি আজ আপনার কী-কী রান্না খেতে ইচ্ছে করছে।'

মধুমিতা প্রায় দৌড়ে চলে গেল।

লাবণ্য ওর চলে যাওয়া দেখতে-দেখতে ভাবলেন, বউমা তো নয়, মেয়ের চেয়েও বেশি! সারাদিন শুধু মা আর মা!

সারদা ঘরে এল। বারান্দায় রাখা ইজিচেয়ারটাকে ঠিকঠাক করে গুছিয়ে দিল। লাবণ্য রোজ এই চেয়ারে বসে চা খাওয়া শেষ করেন। সেই ফাঁকে সারদা বিছানাটা তুলে পরিপাটি করে দেয়।

লাবণ্য ইজিচেয়ারে বসে চা খাওয়া শুরু করতেই দীপ্তিমান মায়ের কাছে এল। 'মা, ডক্টর মুখার্জি ঠিক সাড়ে ন'টায় আসবেন। আমি তো অফিসে বেরিয়ে

যাব—মিতা থাকবে। তোমার কী-কী কষ্ট হচ্ছে ডক্টর মুখার্জিকে ফ্র্যাঙ্কলি বলবে। আমি দশটা নাগাদ অফিস থেকে ফোন করে খবর নেব।'

পাকানো লাঠির মতো খবরের কাগজটা বারান্দায় ছিটকে এসে পড়ল।

দীপ্তিমান ওটা তুলে নিয়ে ভাঁজ খুলে লাবণ্যর হাতে দিল।

লাবণ্য বললেন, 'তুই আগে চোখ বুলিয়ে নে না—অফিসে বেরোবি...।'

'না, তুমি আগে পড়ো। আমি পরে সময় পেলে দেখব।'

লাবণ্য এক অদ্ভুত তৃপ্তি পেলেন। প্রমথনাথ চলে যাওয়ার পরেও দিপু বা মধুমিতা লাবণ্যর সিংহাসনে এতটুকু চিড় ধরতে দেয়নি।

দীপ্তিমান চলে যাওয়ার সময় সারদাকে বলল, 'মাসি, আপনি মায়ের কাছে-কাছে থাকবেন। ছেড়ে এদিক-ওদিক যাবেন না। শুনলেন তো, মায়ের শরীরটা ভালো নেই।'

সারদা ঘাড় নাড়ল।

লাবণ্য আলতো করে বললেন, 'না, না—সেরকম সিরিয়াস কিছু নয়।'

দীপ্তিমান বলল, 'সিরিয়াস কি না সেটা ডাক্তারবাবু বুঝবেন। কোনও শরীর খারাপকেই হালকাভাবে নেওয়া ঠিক নয়।'

দীপ্তিমান চলে গেলে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল লাবণ্যর ঠোঁটে। এই বয়েসে এরকম সুখী জীবনের কথাই কল্পনা করে সবাই—তবে কেউ পায় কি না কে জানে! লাবণ্য পেয়েছেন। ছেলে, ছেলের বউ, নাতি, মেয়ে, জামাই, নাতনি—সব্বাই যেন লাবণ্যকে ঘিরে রয়েছে—সূর্যকে ঘিরে পাক খাওয়া গ্রহের মতো। সূর্যকে টুক করে সরিয়ে নিতে যদি কেউ পারে, তা হলে গ্রহগুলো সেই মুহূর্তে ওদের কক্ষপথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে ছত্রখান হয়ে যাবে। সেইজন্যই ওদের কাছে সূর্যের এত কদর।

লাবণ্যও কি অনেকটা সেইরকম?

মনে-মনে ভগবানকে প্রণাম করলেন লাবণ্য। এ অপরূপ সুখ তাঁরই দান।

একটু পরে চা খাওয়া শেষ হল, খবরের কাগজ পড়াও।

সারদা ঘরে গিয়ে ট্রানজিস্টার রেডিয়োটা নিয়ে এল। ও জানে, লাবণ্য এখন রোজকার মতো এফ. এম. চ্যানেল শুনবেন। বাইরের রাস্তা দেখবেন, দেখবেন গাছের পাতা, ফুল, পাখি। আর একইসঙ্গে বোধহয় পুরোনো কথাও ভাববেন।

একটু পরে দীপ্তিমান বাবুনকে সঙ্গে নিয়ে অফিসে বেরোবে। অফিসে যাওয়ার পথে ওর গাড়ি বাবুনকে স্কুলে নামিয়ে দেবে। আর দুপুরে ছুটির সময় মধুমিতা গিয়ে ওকে নিয়ে আসবে।

সকালে এই সময়টা স্মৃতিচারণ করতে বেশ ভালো লাগে লাবণ্যর। বিয়ের পরপর হঠাৎই প্রমথনাথের চাকরি চলে গিয়েছিল। লোকসান দিয়ে-দিয়ে কোম্পানি ডকে উঠেছিল। তারপর কী কষ্ট, কী কষ্ট! প্রমথনাথ বললেন, আর চাকরি করবেন না—ব্যাবসা করবেন।

কম করেও বারোটা বছর চলল লড়াই আর লড়াই। দীপ্তিমান আর অনুরিতা বড় হয়ে উঠতে লাগল। দুঃখ-কষ্ট কেটে গিয়ে সচ্ছলতা ধীরে-ধীরে ঢুকে পড়তে শুরু করল সংসারে। ঠাকুরকে দিনরাত কত ডেকেছেন লাবণ্য! লুকিয়ে-লুকিয়ে কত চোখের জল ফেলেছেন!

আজ আর-একবার মনে হল, সেগুলো বৃথা যায়নি। লাবণ্যর জীবন-পাত্র থেকে মাধুরী সত্যিই যেন উথলে পড়ছে।

দীপ্তিমান আর বাবুন কখন এসেছে লাবণ্য টের পাননি। সারদার হঠাৎ ঘোমটা টানা থেকে ব্যাপারটা আঁচ করতে-না-করতেই বাবুন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কোলে। লাবণ্যর দু-গালে টপ-টপ করে চুমু খেয়ে বলল, 'দিদুন, টা-টা...স্কুলে যাচ্ছি। রাতে হোমওয়ার্ক কমপ্লিট হলে তোমার কাছে গোস্ট স্টোরি শুনব, ও. কে.?'

ওকে চুমু খেয়ে লাবণ্য ইংরেজি ঢঙে বলতে চেষ্টা করলেন, 'ও. কে.।'

ঠিক দীপ্তিমানের মতোই সুন্দর আর দুরন্ত হয়েছে ছেলেটা।

দীপ্তিমান বলল, 'মা, অফিসে বেরোলাম। ডক্টর মুখার্জি ঠিক সাড়ে ন'টায় আসবেন।'

লাবণ্য হেসে তাকালেন ছেলের দিকে। সবসময় সবদিকে এত খেয়াল! ঠিক বাবার স্বভাব পেয়েছে।

ওরা চলে যেতেই লাবণ্য উঠে পড়লেন। এখন হাত-মুখ ধোওয়া, বাথরুম ইত্যাদি সেরে নেবেন। তারপর জলখাবার। বাবুন এই শব্দটা শুনলেই বলে, 'দিদুন, তুমি একটা হোপলেস—ব্রেকফাস্ট বলতে পারো না!'

মধুমিতা ছেলেকে ডাক দেয় সঙ্গে-সঙ্গে ঃ 'বড়দের সঙ্গে এভাবে কেউ কথা বলে! তা ছাড়া জলখাবার বলো আর ব্রেকফাস্ট বলো, খাবারটা তো একই থাকবে!'

বাবুন বলে, 'সরি, দিদুন...।'

মনে-মনে হাসলেন লাবণ্য। সুখের যে কতরকম চেহারা থাকে!

ব্রেকফাস্ট শেষ করার কিছুক্ষণ পরেই অনুরিতার ফোন এল।

'হাই মাম্মি, হাউ আর য়ু?'

'ভালো, তুই কেমন আছিস?'

'ভালো, তবে গুড্ডুটা দিনকে-দিন ভীষণ দস্যি হয়ে উঠছে—সে তুমি ভাবতে পারবে না।'

বেশ কিছুক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বললেন লাবণ্য। সকলের খোঁজখবর নিলেন। তবে নিজের গা ম্যাজম্যাজ করার কথা বললেন না—বললে অনু ব্যস্ত হয়ে উঠবে। হয়তো এক্ষুনি বালিগঞ্জের ফ্ল্যাট ছেড়ে ছুটে আসবে এখানে।

এই 'হাই মাম্মি-টাম্মি'গুলো অনুর বিয়ের আগে ছিল না—পরে হয়েছে। লাবণ্য

এ নিয়ে ওকে একদিন ঠাট্টাও করেছিলেন। তাতে অনু বলেছিল, 'কী করব বলো! আমার বরটা যে সাহেব-কোম্পানির টপ এক্সিকিউটিভ! তা ছাড়া তিন-চারবার স্টেট্‌স ঘুরে এসে আমারও কেমন অভ্যেস হয়ে গেছে।'

লাবণ্য হেসেছিলেন। ওঁর ছেলে আর মেয়ে বড় হয়েও কেমন ছেলেমানুষ রয়ে গেল।

অনুরিতা রোজ এ সময়টাতেই ফোন করে। আর প্রতি রবিবার সন্ধের সময় অরুণাভ আর গুড্ডুকে নিয়ে লাবণ্যর সঙ্গে দেখা করতে আসে। বলে, 'উইকে একবার তোমাকে সামনাসামনি না দেখলে ভীষণ মনখারাপ লাগে। আর গুড্ডুও বায়না করে—বলে, দিদুনের কাছে যাব।'

অনুরিতার ফোন শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ডক্টর মুখার্জি এলেন। ভালো করে লাবণ্যকে পরীক্ষা করলেন। মধুমিতা ওঁদের কাছে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠিত মা-পায়রার মতো ছটফট করছিল।

পরীক্ষা শেষ করে ডক্টর মুখার্জি হেসে বললেন, 'কিচ্ছু হয়নি। আপনারা শুধু-শুধু উয়ারিড হয়ে পড়েছেন। বুকে সামান্য কফ আছে। এই সিরাপ আর ট্যাবলেটটা লিখে দিলাম। ইন্সট্রাকশন মতো খাওয়াবেন। ব্যস—নিশ্চিন্ত।'

ডক্টর মুখার্জি চলে যাওয়ার পর মধুমিতা হাঁফ ছাড়ল ঃ 'উঃ, যা চিন্তায় পড়েছিলাম! আপনার কিছু হলেই আমার দুশ্চিন্তা হয়।'

কথাটা সত্যি। লাবণ্যর কিছু হলেই দিপু আর মধুমিতা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নাওয়া-খাওয়া ভুলে লাবণ্যকে ঘিরে ধরে। অনুরিতা-অরুণাভ জানতে পারলেও সেই একই ব্যাপার।

ঠিক দশটায় দীপ্তিমান ফোন করে লাবণ্যর খবর নিল।

মধুমিতা যখন জানাল, ব্যাপারটা মোটেই সিরিয়াস কিছু নয়, তখন ও বলল, 'থ্যাংক গড। তুমি ওষুধগুলো এক্ষুনি আনিয়ে নাও।'

তারপর আরও দু-চারটে কথা বলে মা-কে ফোন দিতে বলল।

কর্ডলেসের রিসিভারটা লাবণ্যর হাতে তুলে দিল মধুমিতা, বলল, 'আপনার ছেলে।'

মায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল দীপ্তিমান। তারপর ফোন রেখে দেওয়ার সময় বলল, 'ফিরতে-ফিরতে আমার সাতটা হবে।'

মধুমিতা বলল, 'যাই, আপনার ওষুধগুলো আনানোর ব্যবস্থা করি—।'

লাবণ্য এবার টিভি দেখবেন। সারদা সেটা জানে। তাই ও টিভির সুইচটা অন করে দিয়ে রিমোটটা লাবণ্যর হাতে এনে দিল।

বাবুন আর দীপ্তিমান বেরিয়ে যাওয়ার পর বাড়িটা বেশ চুপচাপ হয়ে গেছে। লাবণ্যর এটা ভালো লাগে না। তাই সবসময় রবিবারের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। সেদিনটা দারুণ হইহই করে কাটে।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর দীপ্তিমানের দুটো শার্ট নিয়ে বসলেন লাবণ্য। একটায় বোতাম বসাতে হবে, অন্যটায় দুটো বোতাম-ঘর তৈরি করতে হবে। রেডিমেড শার্টগুলোর কবজির কাছটা যা ঢিলে থাকে!

নাকের ওপরে সোনালি ফ্রেমের চশমা বসিয়ে ছুঁচ-সুতো-কাঁচি নিয়ে কাজ করছিলেন লাবণ্য। সেলাই করতে ওঁর ভালোই লাগে। অল্পবয়েসে সেলাইয়ের শখ ছিল। প্রমথনাথের প্রশংসাও পেয়েছেন বহুবার। তাই এখনও বাড়ির সমস্ত সেলাই-ফোঁড়াইয়ের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে ভালোবাসেন। মধুমিতাও বলে, 'মায়ের মতো সেলাই আমি জীবনেও করতে পারব না! আচ্ছা-আচ্ছা দরজি মায়ের কাছে হার মেনে যাবে।'

কিছুক্ষণ সেলাইয়ের পর চোখে একটু কষ্ট হচ্ছিল। তাই সেলাই রেখে লাবণ্য বিশ্রাম নিতে চাইলেন। সারদার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। ও বিছানাটা ঠিকঠাক করে দিল।

বিছানায় শরীর গড়িয়ে লাবণ্য বেশ আরাম পেলেন। অথচ একটা সময় ছিল যখন দুপুরে মোটেই ঘুমোতেন না। সময় নিজেও বদলায়, মানুষকেও বদলায়।

ঘুম যখন ভাঙল তখন বিকেল প্রায় গড়িয়ে গেছে। সারদাকে বললেন, 'সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে, আমাকে ডাকোনি!'

সারদা মিনমিন করে বলল, 'আপনার শরীরটা ভালো নয়...বিশ্রাম দরকার...তাই...।'

বিকেলের চা নিয়ে আবার বারান্দায় বসলেন।

মধুমিতা বাবুনকে নিয়ে কাছেই পার্কে গেছে। ছ'টা নাগাদ ফিরবে।

বিকেলের আকাশের রং দেখতে লাবণ্যর ভালোই লাগছিল। একটা বিকেল মরে যায় পরদিন একটা নতুন সকাল জন্ম নেবে বলে। নতুন একটা দিন এসে আগের দিনটাকে স্মৃতিকোঠায় ঠেলে দেয়।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দেওয়ার আগেই শুনলেন একতলায় বাবুনের হইচই। পার্কে বেড়ানো সেরে মধুমিতা আর বাবুন ফিরে এসেছে।

লাবণ্য ঘরে চলে এলেন। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে দুদ্দাড় করে ঘরে ঢুকল বাবুন। ছুটে এসে লাবণ্যকে জড়িয়ে ধরল ঃ 'দিদুন, দিদুন, বলো তো তোমার জন্যে কী এনেছি?'

'ছাড়, ছাড়—পড়ে যাব...' বলতে-বলতে লাবণ্য কোনওরকমে বিছানায় গিয়ে বসলেন।

বাবুন একটা ক্যাডবেরি চকোলেট বাড়িয়ে দিল লাবণ্যর দিকে ঃ 'বলতে পারলে না তো! এই নাও...।'

মধুমিতা হেসে বলল, 'নিজে চকোলেট কেনার বায়না ধরল। তারপর কেনার সময় বলে, দিদুনের জন্যেও একটা কিনতে হবে—নইলে আমি চকোলেট খাব না। তখন...।'

লাবণ্য বাবুনের চিবুকে হাত দিয়ে আদর করলেন। চকোলেটের মোড়ক ছাড়িয়ে একটুকরো ভেঙে নিলেন। তারপর বাকিটা নাতির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নাও, বাবুসোনা। আমি তো বুড়ো মানুষ—তাই বেশি চকোলেট খেতে নেই।'

বাবুন চকোলেটটা নিয়ে বলল, 'তোমাকে চকোলেট দিলাম, ''থ্যাংক য়ু'' বলো!'

'ও হ্যাঁ, হ্যাঁ—থ্যাংক য়ু, বাবুসোনা।'

মধুমিতা বলল, 'এখন ওকে নিয়ে গিয়ে হোমটাস্কে বসাই। সাড়ে সাতটার সময় আপনাকে চা করে দেব।'

'দিদুন, হোমটাস্ক হয়ে গেলে গোস্ট স্টোরি—মনে থাকে যেন!'

লাবণ্য হেসে মাথা নাড়লেন ঃ 'হ্যাঁ রে বাবা, মনে আছে।'

বাবুন পড়তে চলে যাওয়ার পর লাবণ্য আবার দীপ্তিমানের শার্ট নিয়ে বসলেন। সেলাইয়ের কাজটা শেষ করে ফেলতে হবে।

কিন্তু সেলাই করতে-করতে একটা অঘটন ঘটল।

কীভাবে যেন ছুঁচটা ফুটে গেল লাবণ্যর আঙুলে। বাঁ-হাতের তর্জনীর ডগায় রক্তের ফোঁটা দেখা দিল—ঠিক যেন একটা ছোট্ট চুনি।

সারদা তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এল পরিচর্যা করতে। আসার সময় একটা ছোট টেবিলে সামান্য ধাক্কা খেল। একটা স্টিলের বাটি টেবিল থেকে পড়ে গেল মেঝেতে। ঝনঝন করে শব্দ হল।

সঙ্গে-সঙ্গে মধুমিতা দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল।

'কী হয়েছে, মা! কী পড়ল?'

বিছানায় বসে থাকা লাবণ্যর আঙুলের দিকে তাকিয়ে মধুমিতা একেবারে আঁতকে উঠল। লাবণ্যর আঙুলটা চট করে টেনে নিল মুখে। খানিকটা রক্ত চুষে বের করে দিল। তারপর ছুটল স্যাভলন মলম আর ব্যান্ড-এইড নিয়ে আসতে। বারবার বলতে লাগল, 'সন্ধেবেলা কেন যে সেলাই নিয়ে বসলেন! দেখুন তো, কী সব্বনেশে কাণ্ড হল!'

লাবণ্যর আঙুলটা ব্যান্ডেজ করেই দীপ্তিমানকে অফিসে ফোন করল মধুমিতা। সব শুনে দীপ্তিমান বলল, 'ও মাই গড! আমি এক্ষুনি বাড়ি আসছি।'

তারপর সে এক হইহই কাণ্ড।

ছেলে, ছেলের বউ, নাতি, সারদা, ডাক্তার! অনুকে ব্যাপারটা জানাতে বারণ করলেন লাবণ্য।

সত্যি, একফোঁটা রক্তের জন্য এত উৎকণ্ঠা, এত যত্ন, এত ভালোবাসা! না, না, লাবণ্যর আর কিছু চাই না। প্রমথনাথের ছবির দিকে তাকিয়ে মনে-মনে বললেন, 'তুমি সব দেখছ তো! আমার কোনও দুঃখ নেই।'

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চলল হুলস্থূল।

ছেলের কথায় সেলাই-ফোঁড়াই বন্ধ করতে হল লাবণ্যকে। মধুমিতাও ওঁকে

কম-বেশি বকুনি দিল।

এই শাসন যে কী মধুর!

রাত দশটায় রাতের খাওয়া শেষ হলে লাবণ্যকে বলে মধুমিতা আর দীপ্তিমান ওদের ঘরে চলে গেল। বাবুন ভূতের গল্প শুনে দিদুনের গালে চুমু দিয়ে 'গুডনাইট' বলে বাবা-মায়ের সঙ্গে ঘুমোতে গেল।

সারদা লাবণ্যর শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। তারপর মেঝেতে নিজের বিছানা পাততে শুরু করল।

একটা দিন শেষ হল।

বিছানায় বসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লাবণ্য আচমকা হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করলেন। ওঁর বুকের ভেতরটা হুহু করে উঠল। শরীরটা বারবার ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল।

সারদা একবার লাবণ্যর দিকে দেখল, তারপর নিজের মনেই বিছানা করতে লাগল—যেন কিছুই হয়নি। কারণ, এটা রোজকার ব্যাপার—সারদার সয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পর কান্না সামলে উঠে দাঁড়ালেন লাবণ্য। চোখের জল মুছে ঘরের দরজার দিকে এগোলেন।

সারদা হাঁটুগেড়ে বসে বিছানা ঠিক করছিল, আলতো করে জিগ্যেস করল, 'কোথায় যাচ্ছেন, মা?'

পিছন ফিরে না তাকিয়েই লাবণ্য বললেন, 'কম্পিউটার রুমে।'

সারদা আর কোনও কথা বলল না।

লম্বা বারান্দা ধরে হেঁটে দোতলার শেষ প্রান্তের ঘরটায় এসে পৌঁছলেন লাবণ্য।

ঘরের দরজা ভেজানো ছিল, সেটা ঠেলে খুললেন। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলোর একটা চিলতে ছিটকে ঘরে ঢুকে অন্ধকার মেঝেতে শুয়ে পড়ল।

বাইরে নরম বাতাস বইছিল—তাতে বোধহয় একপশলা বৃষ্টির গন্ধও ছিল। লাবণ্য একটা শ্বাস নিলেন, তারপর মন শক্ত করে ঘরের আলো জ্বাললেন।

কথা-বলা পুতুলগুলো ঘরের একপাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে।

মধুমিতা, দীপ্তিমান, বাবুন, ডক্টর মুখার্জি, অনুরিতা, অরুণাভ, গুড্ডু—সবাই হাজির। চেহারায় মানুষের মতো কথা-বলা এই রোবটগুলো লাবণ্য একটা কম্পিউটার কোম্পানিকে অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়েছেন। তাদের আচার-ব্যবহার কেমনতরো চান সেটাও জানিয়ে দিয়েছিলেন সেই কোম্পানিকে। তারা লাবণ্যর পছন্দসই সফ্‌টওয়্যার ঢুকিয়ে দিয়েছে এই অ্যানড্রয়েডগুলোর ভেতরে। ফলে সারাটাদিন এই নকল মানুষগুলো প্রোগ্রাম অনুযায়ী কথা বলে, হাঁটা-চলা করে। এই রোবটগুলোর ভেতরে সপ্তাহের সাতটা দিনের জন্য সাতরকম প্রোগ্রাম ভরা আছে। যখন ব্যাপারটা একঘেয়ে হয়ে

যায় তখন লাবণ্য সেই কোম্পানিকে একটা ই-মেইল করে দেন। যেমন এখন করবেন।

ঘরের দেওয়াল-ঘেঁষে রাখা কম্পিউটার টেবিল। তাতে সাজানো রয়েছে মনিটর, স্পিকার, কিবোর্ড, মাউস, সিস্টেম ইউনিট—সব।

কম্পিউটার অন করে চেয়ারে বসলেন লাবণ্য। কোম্পানিকে ই-মেইল করে জানালেন সফ্‌টওয়্যারগুলো এবার বদলে দিতে হবে—নইলে একঘেয়ে লাগছে।

কাজ শেষ করে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। দরজার কাছে এসে আলো নেভানোর আগে যন্ত্র-মানুষগুলোকে আর-একবার দেখলেন। আসল মানুষগুলোর ফটোগ্রাফ দেখে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এই মডেলগুলো তৈরি করা হয়েছে। লাবণ্যকে ঘিরে ওরা আসল মানুষের মতো ঘোরাফেরা করে, লাবণ্যর ফাঁকা বুকটা ভরাট করার চেষ্টা করে।

কিন্তু আসল মানুষগুলো কোথায়? কী করছে ওরা এখন?

আবার চোখ ফেটে জল আসতে চাইল।

বিয়ের পর-পরই দীপ্তিমান আলাদা হয়ে গেছে। তার দু-বছরের মধ্যেই চলে গেছে আমেরিকায়। কার মুখে যেন খবর পেয়েছিলেন আইওয়াতে আছে। প্রথম-প্রথম দু-চারবার ফোন-টোন করেছিল। তারপর...তারপর সব শেষ।

অনুরিতার গল্পটাও অনেকটা একইরকম। বালিগঞ্জে থাকলেও ব্যাপারটা আমেরিকার আইওয়ার মতন। একটা দিনও খোঁজ নেয় না, মা কেমন আছে। মাসদুয়েক আগে একবার ফোন করে জানতে চেয়েছিল টাকার দরকার আছে কি না।

না, দরকার নেই। প্রমথনাথ মারা যাওয়ার সময় ওই একটা জিনিসের অভাব রেখে যাননি। কিন্তু তা ছাড়া লাবণ্যর জীবনের বাকি দিকগুলো খাঁখাঁ করছে। এই শূন্যতার কথা লাবণ্য আর সারদা ছাড়া আর কেউ তেমন জানে না।

আলো নিভিয়ে পায়ে-পায়ে শোওয়ার ঘরে ফিরে এলেন লাবণ্য।

সারদা ততক্ষণে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়েছে।

লাবণ্যর খাটের পাশে একটা ছোট টেবিলে একটা ট্যাবলেটের পাতা আর এক গ্লাস জল রাখা ছিল। একটা ট্যাবলেট ছিঁড়ে নিয়ে জল দিয়ে গিলে ফেললেন লাবণ্য। খাওয়ার আগে একবার ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েছেন—এখন আর-একটা। তাতে যদি ঘুম আসে!

আলো নেভানোর সময় প্রথমনাথের ছবির দিকে চোখ গেল। ছবি থেকে লাবণ্যর মৃত স্বামী চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'বউ, কেমন আছ?'

লাবণ্যর বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। অতি কষ্টে চোখের জল রুখে দিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'ভালো আছি...সুখের সংসার নিয়ে দারুণ আছি...।'

তারপর সুইচ টিপে অন্ধকারে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন!



রাত ফুরোল, কথা ফুরোল

কোনও মেয়েকে একান্তে চুমু খেতে যাওয়ার মুহূর্তে যদি দরজায় কলিংবেল বেজে ওঠে তা হলে কে না বিরক্ত হয়!

সুতরাং আমিও বিরক্ত হলাম।

সুচরিতার প্রস্ফুটিত ঠোঁট আমার চোখের সামনে ক্লোজ আপে ভাসছিল। ঝিম ধরিয়ে দেওয়া কেমন একটা গন্ধ ওর শরীর থেকে বিকিরিত হয়ে আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছিল। কিন্তু কলিংবেলের শব্দে আমার চোয়াল শক্ত হতেই সুচরিতা সেটা টের পেল। আলতো গলায় ও বলে উঠল, 'এই ফ্ল্যাটে নয়—ওদিকের ফ্ল্যাটে কেউ বেল বাজাচ্ছে—।'

ওর অবস্থা আমি বুঝতে পারছিলাম...ঠিক আমার মতোই।

কলিংবেল অধৈর্য সুরে আবার বেজে উঠল। কোনও ভুল নেই—আমার ফ্ল্যাটেই।

এরপর আর বিছানায় শুয়ে থাকা যায় না। সুতরাং বিরক্তির একটা শব্দ করে উঠে পড়লাম। ছোট্ট করে তীক্ষ্ণ শিস দিতেই অটোমেটিক অডিয়ো কন্ট্রোল ঘরের আবছা আলো ধীরে-ধীরে জোরালো করে দিল। ধবধবে সাদা বিছানায় সাপের মতো এঁকেবেঁকে শুয়ে থাকা ধবধবে ফরসা সুচরিতাকে একপলক দেখলাম। তারপর মনে-মনে নিজের পছন্দের তারিফ করলাম।

আমি বাইরের ঘরের দিকে রওনা হতেই সুচরিতা অস্পষ্ট গলায় পিছন থেকে বলল, 'ম্যানেজ করে জলদি চলে এসো।'

আমি হাতঘড়ির বোতাম টিপতেই টকিং ওয়াচ মিষ্টি মেয়েলি গলায় বলে উঠল, 'এখন রাত দশটা বেজে আটাশ মিনিট বারো সেকেন্ড।'

এত রাতে কে এল আমাকে ডাকতে!

এ-কথা ভাবতে-ভাবতে ফ্ল্যাটের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। পাশের স্ট্যান্ড থেকে রিমোট কন্ট্রোল ইউনিটটা তুলে নিয়ে দরজা লক্ষ করে একটা বিশেষ বোতাম টিপলাম। সঙ্গে-সঙ্গে দরজার একটা অংশ চৌকো জানলার মতো স্বচ্ছ হয়ে গেল। এর মধ্যে দিয়ে ভেতর থেকে বাইরেটা দেখা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে ভেতরটা দেখা যায় না।

বাইরে দাঁড়ানো দুজন লোককে আমি দেখতে পেলাম। আর সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝতে পারলাম, এদের 'ম্যানেজ' করে 'জলদি' সুচরিতার কাছে ফিরে যাওয়া যাবে না। 'জানলা'টাকে আবার অস্বচ্ছ করে দিলাম।

লোক দুজন বোধহয় হোমিসাইড স্কোয়াডের সাদা পোশাকের অপারেটর। ওদের পোড় খাওয়া চেহারা, ঠান্ডা চোখ অন্তত সে-কথাই বলছে। ওরা কি তা হলে শ্রাবন্তীকে খুঁজে পেয়েছে? কিন্তু তার সঙ্গে আমাকে জড়াল কেমন করে। সেরকম কোনও চিহ্ন তো আমি ফেলে আসিনি!

রিমোট কন্ট্রোল ইউনিটের অন্য একটা বোতাম টিপতেই বন্ধ দরজা নিঃশব্দে পাশে সরে গেল। আমি এবার ওদের মুখোমুখি।

ওদের সাজপোশাক প্রায় একই ধাঁচের—চেহারাও অনেকটা তাই।

চাপা জিন্‌সের প্যান্ট, ঢোলা সুতির জামা, চোখে কালো সানগ্লাস। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, কপালে ভাঁজ, চোয়ালের হাড় উঁচু। একজনের বাঁ-কানের লতিতে একটা সোনার রিং চকচক করছে।

'আপনিই অমিত মজুমদার?' দুজনের একজন জানতে চাইল।

আমি শান্তভাবে ঘাড় নেড়ে জানালাম, হ্যাঁ।

'আমরা হোমিসাইড স্কোয়াড থেকে আসছি—' লেজারে হলোগ্রাম করা একটা ছোট্ট কার্ড আমার চোখের সামনে তুলে ধরল প্রথমজন ঃ 'এত রাতে আপনাকে ডিসটার্ব করার জন্যে দুঃখিত। আপনাকে একবার আমাদের সঙ্গে আসতে হবে।'

'কেন? কী ব্যাপার?'

'মার্ডার কেস। শ্রাবন্তী সেন নামে একটা ইয়াং মেয়ের লাশ আমরা কাল সকালে পেয়েছি। গঙ্গায় পাওয়া গেছে। গলা টিপে মার্ডার করে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। বডিটা জেটির নীচে আটকে গিয়েছিল, তাই ভেসে যায়নি।'

আমি ভেতরে-ভেতরে নিজেকে সামলে নিলাম। বিব্রতভাবে বললাম, 'আসুন, ভেতরে এসে বসুন—।'

প্রথমজন ঠান্ডা গলায় জবাব দিল, 'বসার টাইম নেই। চলুন, হেডকোয়ার্টারে গিয়ে কথা হবে।'

'এক মিনিট। আমি চট করে রেডি হয়ে আসছি।'

'মেক ইট কুইক—।'

ওদের দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখে আমি সুচরিতার কাছে চলে গেলাম। ওর খোলা পিঠে একটা চুমু খেয়ে পোশাক ঠিকঠাক করে নিলাম। মাথা আঁচড়ে গায়ে বিদেশি কোলোন স্প্রে করে নিলাম। তারপর আয়নায় নিজের চোখে তাকিয়ে চাপা গলায় বললাম, 'সাবধান, যেন কোনও ভুল না হয়। সিরিয়াল কিলারদের ভুল করলে চলে না।'

একবার সুচরিতার দিকে তাকালাম। ও একইভাবে বিছানায় শুয়ে আছে। বোধহয় আমার কথাটা শুনতে পায়নি। অবশ্য পেলেও তার মানে বুঝতে পারবে না। যখন বুঝবে তখন আর কিছু করার থাকবে না—অনেক দেরি হয়ে যাবে।

সুচরিতাকে বললাম, 'লাভ, আমি ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই আসছি। পুলিশ একটা মার্ডার কেসে ভুল করে আমাকে হ্যারাস করতে এসেছে। তুমি চিন্তা কোরো না—নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ো—।'

সুচরিতা শরীরটাকে আধপাক ঘুরিয়ে অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে আমার দিকে তাকাল।

'—আমি এসে তোমার ঘুম ভাঙাব।' ওর দিকে তাকিয়ে কথা শেষ করলাম আমি।

ফ্ল্যাটের বাইরে এসে দরজার পাশে দেওয়ালে বসানো অটোমেটিক ভয়েস লক সিস্টেমের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম, 'ফ্ল্যাট লক করে দাও।'

যন্ত্র তার সূক্ষ্ম বিচারে মালিকের কণ্ঠস্বর নিখুঁতভাবে চিনতে পারল। সঙ্গে-সঙ্গে ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমার গলায় খোলার নির্দেশ না পেলে এই দরজার লক আর খুলবে না।

ওরা দুজন পাথরের মূর্তির মতো অপেক্ষা করছিল। আমি 'চলুন' বলতেই রোবট দুটো যেন সাড় ফিরে পেল। নিঃশব্দে দুজন আমার দুপাশে চলে এল। আমরা এলিভেটরের দিকে রওনা হলাম।

বাইরের রাস্তায় এসে গাড়িতে ওঠার সময় ওদের একজন আমাকে জিগ্যেস করল, 'মিস্টার মজুমদার, শ্রাবন্তী সেনকে আপনি চিনতেন?'

আমি শ্রাবন্তীকে চিনতাম—বেশ অন্তরঙ্গভাবেই চিনতাম। তাই নির্লিপ্ত গলায় বললাম, 'না—।'

সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা তার পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বের করে সঙ্গীর হাতে তুলে দিল, বলল, 'বর্ধন, তুমিই জিতলে—আমি হেরে গেলাম।'

আমাকে অবাক হতে দেখে বর্ধন হেসে বলল, 'মিস্টার মজুমদার, আপনার

এখানে আসার সময় বিশ্বাসকে আমি বলেছিলাম, শ্রাবন্তী সেনকে চেনার ব্যাপারটা আপনি ডিনাই করবেন। ও আমার কথা মানতে চায়নি, তাই আমার সঙ্গে একশো টাকা বাজি ধরেছিল—' জিভে দুঃখের চুকচুক শব্দ করে আবার হাসল বর্ধন ঃ 'বিশ্বাস, বেকার তোমার একশোটা টাকা গেল।'

গাড়ির পেছনের সিটে আমাকে মাঝখানে রেখে বর্ধন আর বিশ্বাস দুপাশে বসল। ওদের লুকোনো ব্লাস্টার গান আমার কোমরে খোঁচা দিচ্ছিল। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিয়ে এগোতেই বর্ধন চাপা গলায় বলল, 'মিস্টার মজুমদার, শ্রাবন্তীকে আপনি চিনতেন...আমাদের হাতে মারাত্মক প্রমাণ রয়েছে।'

আমি অবাক হওয়ার ভান করে বর্ধনের দিকে তাকাতেই বাঁ-পাশ থেকে বিশ্বাস বলে উঠল, 'অমন ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটাকে খুন করলেন কেন বলুন তো!'

আমি অসহায়ভাবে বলে উঠলাম, 'আপনাদের কোথাও একটা ভুল হচ্ছে—শ্রাবন্তীকে আমি চিনি না।'

'হেডকোয়ার্টারে গিয়ে দাওয়াই দিলেই সব বেরিয়ে পড়বে।' দাঁতে দাঁত চেপে বর্ধন মন্তব্য করল।

আমি নিরুপায় হয়ে গাড়ির খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা আমার মুখে দক্ষ হাতে তুলির আঁচড় কাটছিল। আর আমার মনে পড়ছিল ফুটফুটে মেয়েগুলোর কথা।

গত চারমাসে কলকাতার নানা জায়গায় এগারোজন তরুণীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। ওদের প্রত্যেককেই গলা টিপে খুন করা হয়েছে। খুন করেছি আমি। না, আসলে ঠিক আমি না—আমার ভেতর থেকে একটা অচেনা খুন-পাগল লোক এই জঘন্য কাজগুলো করে। চারমাস আগে আমার মাথার ভেতরে ওই পাগলটা প্রথম জেগে ওঠে। খুন করে রত্নাকে। তারপর একে-একে মাধুরী, সুজাতা, নয়না, সুন্দরী, প্রথমা, সাগরিকা...সব নাম আমার মনে নেই। সংখ্যাটা যে মনে আছে তার কারণ ইন্টারনেট নিউজে প্রায় প্রতিদিনই এ-নিয়ে খবর বেরোয়—তাতে বারবার করে ওরা সংখ্যাটা আমাকে জানিয়ে দেয়—পাছে আমি ভুলে যাই। ওরা আমার নাম দিয়েছে—মানে, আমার ভেতরের ওই পাগলটার নাম দিয়েছে 'সিরিয়াল কিলার'—ধারাবাহিক খুনি। একজন রসিক সাংবাদিক এমন মন্তব্যও করেছে, এই সিরিয়ালের সবে এগারোটা এপিসোড হয়েছে, কত এপিসোডে শেষ হবে কে জানে!

আমার হাসি পেল। ক'টা এপিসোডে এই সিরিয়াল যে শেষ হবে তা আমিও জানি না। জানে আমার মাথার ভেতরে ঘাপটি মেরে বসে থাকা ওই পাগলটা। তবে এটুকু বুঝতে পেরেছি, আজ কিংবা কাল রাতে সুচরিতাকে নিয়ে পাগলটার বারো নম্বর এপিসোড শেষ করার কথা।

শ্রাবন্তীর কথা মনে পড়ল আমার। শ্রাবন্তীকে আমি যে ভালো করেই চিনতাম তার কী মারাত্মক প্রমাণ পেয়েছে ওরা? এর আগের খুনগুলোর বেলায় পুলিশ

আমাকে কোনও সন্দেহ করেনি, কোনওদিন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেও আসেনি। কিন্তু এইবার যখন এসেছে তখন নিশ্চয়ই ওদের হাতে কোনও-না-কোনও সূত্র আছে। অর্থাৎ, কোথাও একটা ভুল করে ফেলেছি আমি। কিন্তু কী সেই ভুল?

লালবাজারে হোমিসাইড স্কোয়াডের হেডকোয়ার্টারে পৌঁছতেই আমার ভাবনায় বাধা পড়ল। মনে-মনে নিজেকে তৈরি করে নিলাম। সতর্কতা বাড়িয়ে দিলাম দশ গুণ।

গাড়িতে অটোমেটিক প্রোগ্রাম করাই ছিল। তাই ড্রাইভার হাত গুটিয়ে বসে থাকলেও গাড়িটা হিসেবমতো নিখুঁত বাঁক নিয়ে একটা নির্দিষ্ট পার্কিং স্পেসে গিয়ে দাঁড়াল। গাড়ির ভয়েস রেসপন্স সিস্টেম বলে উঠল ঃ 'আমরা গন্তব্যে এসে গেছি।'

ড্রাইভার কী-একটা বোতাম টিপতেই হাইড্রলিক কন্ট্রোল নিঃশব্দে দুটো দরজা খুলে দিল। আমরা তিনজন নেমে পড়লাম।

এক অদ্ভুত অনুভূতি নিয়ে আমি চারপাশটা দেখতে লাগলাম।

লালবাজারের পুলিশ হেডকোয়ার্টারে আগে কখনও আমি আসিনি। এর সামনের রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে বহুবার গেলেও ভেতরে এই প্রথম। কেন জানি না, আমার বুকের ভেতরে একটা অচেনা পেন্ডুলাম ঢং-ঢং করে বাজছিল।

পাথর বাঁধানো বিশাল পার্কিং স্পেসে প্রায় দেড়-দু-ডজন গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। জায়গায়-জায়গায় লাগানো হ্যালোজেন বাতি সুন্দর আলোর বৃত্ত তৈরি করেছে। বৃত্তের বাইরেটা আবছা অন্ধকার।

উঠোনের মাঝে একটা লাস্যময়ী নাচিয়ে ফোয়ারা। তার নাচের তালে-তালে লুকোনো বাজনা নীচু গ্রামে বাজছে। বাজনার সঙ্গে তাল রেখে চলছে লাল-নীল-হলদে-সবুজ আলোর খেলা।

উঠোনকে ঘিরে প্রায় বিশতলা উঁচু চারটে বিশাল বাড়ি। বাড়ির দেওয়ালগুলো যেন সানগ্লাসের কাচ দিয়ে তৈরি। বাড়ি লক্ষ্য করে অনেকগুলো হ্যালোজেন ফোকাস লাগানো রয়েছে। বাড়ির কাচের দেওয়াল সেই আলো আয়নার মতো ঠিকরে দিচ্ছে।

এই সুন্দর-সুন্দর বাড়ির ভেতরেই চলে অপরাধীকে শায়েস্তা করার নোংরা কাজ।

রাত বেড়েছে, তাই লোকজন কম চোখে পড়ল। আমি বর্ধনের দিকে তাকাতেই সে বলল, 'আমাদের সঙ্গে আসুন—।'

বিশ্বাস ওর বাঁ-কানের সোনার রিংটা নাড়াচড়া করছিল, আমার চোখে চোখ পড়তেই বাঁকা হাসল।

আমরা তিনজনে দ্বিতীয় বাড়িটার দিকে এগোলাম। শানবাঁধানো চাতালে আমাদের জুতোর শব্দ ফোয়ারার বাজনার সঙ্গে মিশে গেল।

বাড়ির ভেতরে ঢুকে দুটো ভয়েস লক দরজা পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম

অটোমেটিক এলিভেটরের কাছে। এলিভেটর আমাদের নিয়ে গেল এগারোতলায়। সেখানে আধুনিক ছাঁদে তৈরি গোলকধাঁধার মতো গোটাপাঁচেক অলিন্দ পেরিয়ে পৌঁছলাম একটা ঘরে। ঘরের দরজায় লাগানো লাল রঙের ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে জানিয়ে দিচ্ছে ঘরটার নাম ঃ ইন্টারোগেশান রুম।

ঘরের চারদিকে অসংখ্য অচেনা যন্ত্রপাতি। তার মাঝে ন্যাড়া মাথা, পরনে কালো চামড়ার জ্যাকেট, কুতকুতে চোখ, আর ফরসা চেহারার যে-মানুষটি বসে আছে, তাকেও প্রথমটায় যন্ত্র বলে ভুল হল আমার।

'আসুন, মিস্টার মজুমদার...বেশিক্ষণ আপনাকে আটকে রাখব না।' শঙ্খচূড় সাপ যদি কথা বলতে পারত তা হলে সে বোধহয় এইভাবেই কথা বলত। কথাটা বলে যন্ত্রের চেহারার মানুষটি হাসল। হাসি মানে তার ঠোঁটের রেখা সামান্য চওড়া হল, দু-একটা ভাঁজ পড়ল ঠোঁটের কোণে।

বিশ্বাস আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, 'এখন আপনি জোয়ারদারসাহেবের প্রপার্টি। এ-ঘরে ঢোকার আগে আর পরে মানুষ একরকম থাকে না। আমরা দুজন স্রেফ সাক্ষীগোপাল হয়ে ওঁর গান অনুযায়ী তাল দেব।'

ঘরের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উষ্ণতাকে বোধহয় দশ-বারো ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে থাকবে, কারণ আমার বেশ শীত করছিল।

জোয়ারদার তীক্ষ্ণ চোখে আমাকে জরিপ করতে-করতে বলল, 'বসুন—।'

একটা আধুনিক টেবিলকে মাঝখানে রেখে আমি জোয়ারদারের মুখোমুখি বসলাম। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে টের পেলাম, বিশ্বাস আর বর্ধন আমার ঠিক পেছনে অ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়িয়ে।

জোয়ারদার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। টেবিলের ডানদিক ঘেঁষে রাখা একটা কম্পিউটারের কয়েকটা বোতাম টিপল। চোখ সরু করে মনিটরে কী দেখল কে জানে! তারপর সাপের মতো কেব্‌ল লাগানো একটা মাউথপিসের মতো যন্ত্র কম্পিউটারের পাশ থেকে তুলে নিয়ে বলল, 'বর্ধন, ওঁকে স্ক্যান করো—।'

বর্ধন চট করে চলে গেল জোয়ারদারের পাশে। ওর হাত থেকে মাউথপিসটা নিয়ে আমার কাছে এল। তারপর আমার বাঁ-হাতের কবজির ওপর যন্ত্রটা না ছুঁইয়ে বুলিয়ে নিল। জোয়ারদার তখনও ঠান্ডা চোখে কম্পিউটারের পরদার দিকে তাকিয়ে।

এখনকার রেওয়াজ অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের বাঁ-হাতের কবজিতে একটা করে পারসোনাল ইনফরমেশান মাইক্রোচিপ বসানো থাকে। সেটা বাইরে থেকে দেখা যায় না। তবে স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যান করলে তার যাবতীয় তথ্য কম্পিউটারের পরদায় ফুটে ওঠে। আমারও উঠল।

জোয়ারদার যেন একটু অবাক হয়েই জিগ্যেস করল, 'মিস্টার মজুমদার, কিড স্ট্রিট ব্রাঞ্চের স্পার্ম ব্যাঙ্কে সেভেন্টি এইটে আপনার জন্ম?'

আমার জন্মতারিখ ২২ জানুয়ারি ২০৭৮ সাল। আর স্পার্ম ব্যাঙ্কে, মানে, ল্যাবরেটরিতে জন্ম হওয়াটা প্রায় ষাট বছর হল স্বাভাবিক হয়ে গেছে। সুতরাং জোয়ারদারের প্রশ্নের মানে বুঝতে পারলাম না। তবুও শান্তভাবে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ।'

'ইন্টারেস্টিং।' থুতনিতে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল জোয়ারদার। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন দেখল আমি কোনও কথা বললাম না তখন টিভিতে খবর পড়ার মতো নিষ্প্রাণ ভঙ্গিতে বলল, 'সেভেন্টি এইটে কিড স্ট্রিটের ব্রাঞ্চে একটা ইনফেকশানের ব্যাপার হয়েছিল। ফলে সে-বছর ওই ব্যাঙ্ক থেকে প্রচুর অ্যাবনরমাল বেবির জন্ম হয়েছিল।'

'আপনি কি বলতে চান আমি অ্যাবনরম্যাল?'

জোয়ারদার ঘাড় কাত করে ভুরু উঁচিয়ে আমাকে দেখল, তারপর চেয়ারে বসে পড়ল ঃ 'না, না—আপনি অ্যাবনরমাল হবেন কেন। কিন্তু গত চারমাস ধরে যে-সিরিয়াল কিলার কলকাতার আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে যে অ্যাবনরমাল সেটা তো মানবেন।'

একটা খুন-পাগল মানুষ অস্বাভাবিক হবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মধ্যে তো সেরকম কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নেই। শুধু মাঝে-মাঝে যা একটু ওই মেয়েগুলোকে খতম করতে ইচ্ছে করে।

'সিরিয়াল কিলারের অ্যাবনরমাল হওয়াটাই তো স্বাভাবিক।' জোয়ারদারের কথার উত্তর দিলাম।

হাসল জোয়ারদার, বলল, 'তা হলে তার জন্ম আটাত্তর সালে হতেও পারে। যখন কিড স্ট্রিটের স্পার্ম ব্যাঙ্কে ওই ইনফেকশানের ব্যাপারটা হয়েছিল...।'

'আপনি কী বলতে চান স্পষ্ট করে বলুন—' জোয়ারদারের হাসির ধরনটা আমার মাথার ভেতরে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল।

সেটা বোধহয় জোয়ারদার বুঝতে পারল। তাই আরও নোংরাভাবে হেসে শক্ত গলায় বলল, 'আমি যা বলতে চাই বেশ স্পষ্ট করেই বলেছি। অন্তত আপনার না বোঝার কথা নয়। এখন আপনার স্পষ্ট উত্তর দেওয়ার পালা। আপনি শুধু স্বীকার করুন যে, শ্রাবন্তী সেনকে আপনি চিনতেন।'

আমি বিদ্রোহী ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। বর্ধন আর বিশ্বাসের দিকে একপলক তাকিয়ে জোয়ারদারকে বললাম, 'আমি শ্রাবন্তী সেনকে চিনি না। একটু আগেই ওঁদের সে-কথা বলেছি। আপনাদের কোথাও একটা ভুল হচ্ছে।'

'বসুন, মিস্টার মজুমদার, অযথা উত্তেজিত হবেন না। হম্বিতম্বি করে একটু-আধটু রাগ দেখালেই আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। আপনি যে মিস সেনকে চিনতেন তার মারাত্মক প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। কলকাতার সিরিয়াল কিলারকে ধরার চেষ্টাটা আমি সেখান থেকেই শুরু করতে চাই। আপনি নিজে থেকে সবকিছু বলে আমাকে সাহায্য করলে আপনারও সুবিধে

হবে—।'

'কীসের সুবিধে?'

হাত নেড়ে ঘরের আধুনিক সব যন্ত্রগুলোর দিকে ইশারা করে জোয়ারদার বলল, 'সুবিধে হবে এটাই যে, এইসব খারাপ-খারাপ যন্ত্রগুলো আপনার ওপরে আমাকে ব্যবহার করতে হবে না।'

আমি চেয়ারে বসে পড়লাম আবার। হাত-পায়ের জোর যেন হঠাৎই কমে গেছে বলে মনে হল।

জোয়ারদার বিশ্বাসকে লক্ষ্য করে বলল, 'বিশ্বাস, আমাদের তৈরি কমপ্যাক্ট ডিস্কটা মজুমদারবাবুকে দেখাও—।'

ওর কথার নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের ছুরি যেন আমার শরীরে সত্যি-সত্যিই কেটে বসল।

বিশ্বাস ঘরের একটা যন্ত্রের কাছে গেল। সেখানে কয়েকটা বোতাম টিপতেই ঘরের সামনের দেওয়ালের একটা চৌকো মাপের অংশ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়ে শুরু হল এগারো এপিসোডের টিভি সিরিয়াল। রত্না, মাধুরী, সুজাতাকে দিয়ে শুরু হয়ে শেষ হল শ্রাবন্তীকে দিয়ে। জীবন্ত ছবির সঙ্গে সেখানে তাল মিলিয়ে চলল পেশাদারি হাতে তোলা সাউন্ডট্র্যাক।

সিডি-তে জীবন্ত ছায়াছবি দেখতে-দেখতে আমার ভেতরে একটা কষ্ট টের পাচ্ছিলাম। এগারোজন তরুণীকে খুন করেছি আমি! এ আমি কী সাংঘাতিক পাপ করেছি। ছিঃ-ছিঃ!

আমি রুমাল বের করে চোখের কোণ মুছে নিলাম। দেওয়ালের পরদায় তখন শ্রাবন্তীকে দেখা যাচ্ছে। ওর গলায় আঙুলের দাগ : ফরসা ত্বকে কালচে ছোপ।

সিনেমা চলার সময় জোয়ারদার নিজের মতো করে বাড়তি ধারাবিবরণী দিচ্ছিল। আর একইসঙ্গে অদ্ভুত-অদ্ভুত নজরে আমাকে লক্ষ করছিল।

প্রায় ঘণ্টাদেড়েক পর সিরিয়াল শেষ হলে জোয়ারদার বিশ্বাসকে সিডি প্লেয়ারের সুইচ অফ করে দিতে বলল। তারপর আমার চোখে সরাসরি তাকিয়ে গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, 'বলুন, মিস্টার মজুমদার...কী ঠিক করলেন?'

'আপনি আসল খুনিকে ধরতে না পেরে শুধু-শুধু আমার মতো একজন ইনোসেন্ট সিটিজেনকে হ্যারাস করছেন। আমি হোমিসাইড স্কোয়াডের চিফের কাছে ব্যাপারটা রিপোর্ট করব—।'

কথা বলতে-বলতে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। হাত তুলে জোয়ারদারকে কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম, বর্ধন আমার বুকে সপাটে এক ধাক্কা দিয়ে আমাকে ছিটকে চেয়ারে ফেলে দিল।

অসহ্য ব্যথা, তার সঙ্গে দম আটকানো অবস্থা টের পেলাম। যন্ত্রণায় আমার মুখ কুঁচকে গেল। কাত হয়ে চেয়ারে পড়ে রইলাম আমি।

জোয়ারদার মিহি শব্দ করে হেসে বলল, 'আপনি আমাকে রূঢ় ব্যবহার করতে

বাধ্য করছেন, মিস্টার মজুমদার। আমি নরমালি পেশেন্ট অনুযায়ী মেডিসিন দিই। ডোন্ট ফোর্স মি টু অ্যাডমিনিস্টার রাফ মেডিসিন। এখনও বলছি, আমার কথামতো কাজ করুন। তাতে আপনারই ভালো হবে...।'

আমি দ্রুত ভাবতে শুরু করলাম। কী অকাট্য প্রমাণ পেয়েছে ওরা? কী করে ওরা বুঝতে পারল আমিই সেই সিরিয়াল কিলার?

'মিস্টার মজুমদার, লুকোচুরি করে আর লাভ নেই। এতদিন ধরে তদন্ত করেও আমরা এই খুনগুলোর কোনও কিনারা করতে পারিনি। কারণ সেরকম সলিড কোনও প্রমাণ আমাদের হাতে আসেনি। এই সিরিয়াল কিলিং নিয়ে আমাদের ডিপার্টমেন্ট একেবারে জেরবার হয়ে যাচ্ছিল। তারপর...ফরচুনেটলি...শ্রাবন্তী সেনের মার্ডারের ইনভেস্টিগেশানের সময় আমরা এই প্রথম আলো দেখতে পেলাম। আর সে-আলো গিয়ে পড়েছে আপনার দিকে...।' কথা বলতে-বলতে মুচকি-মুচকি হাসছিল জোয়ারদার।

আমি জোয়ারদারের কথা খুব একটা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম না। বাঁ-হাতে মাথার ঝাঁকড়া চুলের ভেতরে আঙুল চালাচ্ছিলাম। একটু পরেই আঙুলের ডগায় লুকোনো ধাতব প্লেটটা খুঁজে পেলাম। সামান্য চাপ দিয়ে প্লেটটা একপাশে সরাতেই ইলেকট্রনিক্স প্রকোষ্ঠের দরজা খুলে গেল। এর ভেতরে আছে বেশ কয়েকটা মাইক্রোচিপ। এই চিপগুলো আমার মস্তিষ্কের একটা অংশ। সতেরো বছর বয়েসে আমার মাথার গোলমাল দেখা দেয়—হয়তো ওই স্পার্ম ব্যাঙ্কের ইনফেকশানের জন্যে। তখন ডাক্তার বলেছিল, আমার মাথার গোলমালের ব্যাপারটা ভারী অদ্ভুত। ওটা সরীসৃপের মতো শীতঘুম দেয়। তারপর হঠাৎ করে জেগে উঠে বিনা নোটিশে মাথাচাড়া দেয়। সেটা ঠিকঠাক করতেই আমার ব্রেনে অপারেশান হয়েছিল। বসাতে হয়েছিল একমুঠো মাইক্রোচিপ।

তখন আমি ইলেকট্রনিক্স জানতাম না।

কিন্তু পরে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পর, হার্ডওয়্যারে ডক্টরেট করার পর, নিজের মাথা নিয়ে আমি নিজেই মাথা ঘামিয়েছি। মাইক্রোচিপগুলোয় কিছু রদবদল করেছি। কিন্তু তাতেও যে আমি পুরোপুরি সুস্থ হইনি তার প্রমাণ শ্রাবন্তীরা।

কিন্তু শ্রাবন্তীর ব্যাপারে কী প্রমাণ পেয়েছে জোয়ারদার?

অনেক ভেবেও কোনও কূল পাচ্ছিলাম না আমি। মাঝে-মাঝে অনেক ব্যাপার আমি ভুলে যাই। তারপর হঠাৎ করেই সেগুলো আবার মনে পড়ে যায়। শ্রাবন্তীর বেলায়ও হয়তো তাই হয়েছে।

কিন্তু আমাকে কষ্ট করে সেটা আর মনে করতে হল না। জোয়ারদার আমাকে সাহায্য করল। ও ইশারা করতেই বিশ্বাস কোথা থেকে একটা পলিথিনের প্যাকেট বের করে ছুড়ে দিল আমার সামনে।

আমার বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। মাথার ধাতব দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলাম।

'এই হল সেই প্রমাণ।' মন্তব্য করল জোয়ারদার, 'অ্যাবসোলিউট প্রুফ। নিন, প্যাকেটটা খুলুন—খুলে দেখুন।'

আমি কাঁপা হাতে প্যাকেটটা টেবিল থেকে তুলে নিলাম। ওটা ধীরে-ধীরে খুলতে শুরু করলাম। কী আছে এর ভেতরে? আমার হাত এত কাঁপছে কেন?

প্যাকেট থেকে বেরিয়ে এল একগোছা চিঠি।

সেগুলো হাতে নিয়ে হতভম্বভাবে আমি জোয়ারদারের দিকে তাকালাম। হোঁচট খাওয়া গলায় কোনওরকমে বললাম, 'এ...এগুলো...ক্-কী?'

জোয়ারদার হেসে বলল, 'প্রেমপত্র। শ্রাবন্তীকে লেখা আপনার প্রেমপত্র। অথচ আপনি বারবার বলছেন শ্রাবন্তী সেনকে আপনি চেনেন না—।'

মনে পড়েছে!

শ্রাবন্তীকে আমি বহু চিঠি লিখেছি। এর আগে কাউকে আমি কোনও প্রেমপত্র লিখিনি। কারণ আমি চাইনি পুলিশের হাতে কোনও সূত্র পৌঁছে যাক। তবে শ্রাবন্তীর বেলা আমার ভেতরে কী একটা যেন হয়ে গিয়েছিল। ওকে চিঠি না লিখে আমি পারিনি। ওকে একদিন না দেখলেই আমি চোখে অন্ধকার দেখতাম। ওকে আমি পাগলের মতো ভালোবেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু...।

কিন্তু একদিন আমার ভেতরের অসুখটা শীতঘুম ভেঙে বেরিয়ে এল। শ্রাবন্তীর দিন ফুরোল। বেশ মনে আছে, অন্ধকার মাঠে ওর মৃতদেহ সামনে নিয়ে আমি পাগলের মতো কেঁদেছিলাম। আমার অসুখটাকে অভিশাপ দিয়েছিলাম বারবার। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।

চিঠিগুলো আমি একে-একে দেখতে শুরু করলাম। আমার সুন্দর হাতের লেখায় আঁকা এক-একটি চিঠি—ভালোবাসার চিঠি। চিঠির শেষে আমার নাম লেখা। চিঠিগুলোর কথা আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।

ওরা তা হলে শুরু থেকেই এগুলোর কথা বলতে চাইছিল। মারাত্মক প্রমাণ! অকাট্য প্রমাণ! অ্যাবসোলিউট প্রুফ!

হাসি পেয়ে গেল আমার। হোমিসাইড স্কোয়াড এখনও আমাকে ততটা চিনতে পারেনি। চিনতে পারলে জোয়ারদারবাবু একেবারে তাজ্জব হয়ে যাবে।

আমার ঠোঁটের এক চিলতে হাসি বোধহয় জোয়ারদারের নজরে পড়েছিল। ও খানিকটা বাঁকা সুরে জিগ্যেস করল, 'কী, এবার শ্রাবন্তী সেনকে মনে পড়েছে তো? নাকি এখনও বলবেন এই চিঠিগুলো আপনার লেখা নয়?'

অতিচালাক গোয়েন্দার চোখে সরাসরি তাকিয়ে আমি হেসে বললাম, 'ঠিকই ধরেছেন। শ্রাবন্তী সেনকে আমি চিনি না। আর এই চিঠিগুলোও আমার লেখা নয়।'

'চিঠির শেষে আপনার নাম আছে—।'

'কলকাতা শহরে আমি একাই অমিত নই। ভালো করে খোঁজ নিন, শ্রাবন্তী কোন্ অমিতের সঙ্গে প্রেম করত।'

আমার আত্মবিশ্বাস জোয়ারদারকে একটা ধাক্কা দিল। কিন্তু পেশাদার হওয়ার জন্যেই কয়েক লহমায় সেটা সামলে নিয়ে ও বলল, 'ঠিক আছে, সোজা আঙুলে যখন ঘি উঠবে না তখন আঙুল একটু-আধটু বাঁকাতেই হবে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জোয়ারদার ঃ 'এর মধ্যে যে-কোনও একটা চিঠি আপনি বেছে নিন, মিস্টার মজুমদার।'

আমি কথা না বাড়িয়ে দু-পৃষ্ঠার একটা চিঠি বেছে নিলাম। বাকি চিঠিগুলো রেখে দিলাম টেবিলের ওপরে।

সামনে আঙুল তুলে আমার পিছনে দাঁড়ানো বর্ধনকে নির্দেশ দিল জোয়ারদার, 'বর্ধন, ওঁকে কাগজ-কলম দাও—।'

বর্ধন যন্ত্রের মতো নিঃশব্দে এবং ক্ষিপ্রতায় কাগজ-কলম আমার সামনে এনে দিল।

টেবিলের ওপাশে পায়চারি করতে-করতে জোয়ারদার বলল, 'মিস্টার মজুমদার, ওই চিঠিটা আপনি চারমিনিটের মধ্যে কপি করে দিন। তারপর প্যাটার্ন কমপেয়ারেটরে চিঠি দুটো দিয়ে আমরা দেখে নেব দুটো হাতের লেখায় শতকরা কতটা মিল, আর কতটাই বা গরমিল।'

আমি ভয় পেলাম। এখনই এখানে বসে চিঠিটা কপি করতে হবে এটা আঁচ করতে পারিনি। আমার ধারণা ছিল, ওরা পরে কোনওসময় আমার ফ্ল্যাট সার্চ করে আমার হাতের লেখার স্যাম্প্ল নিয়ে এসে এই চিঠির সঙ্গে তুলনা করে দেখবে।

জোয়ারদারকে বললাম, 'আমার আঙুলে ব্যথা আছে। এখন লিখতে আমার অসুবিধে আছে।'

পায়চারি করতে-করতে থমকে দাঁড়াল জোয়ারদার, হিসহিস করে হেসে উঠে বলল, 'আই গট য়ু, ম্যান। আমাকে চালাকিতে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। এখনও বলছি, মিস্টার মজুমদার, আপনি কনফেস করুন, তা হলে শুধু-শুধু আপনাকে আর টরচার করব না। নাউ, কাম অন—।'

'আপনি আমার কথা বুঝতে পারেননি, মিস্টার জোয়ারদার—' আমি একরোখা গলায় জবাব দিলাম, 'আমি বলেছি, আজ এখন আমার লিখতে অসুবিধে আছে। আশা করি কাল-পরশুর মধ্যে আমার আঙুলের ব্যথা সেরে যাবে—তখন আপনি যা বলবেন তা-ই লিখে দেব—নো প্রবলেম।'

জোয়ারদার গুম হয়ে গেল। একটু আগেই ওর চোখে-মুখে যে-হিংস্র উল্লাস ফুটে উঠেছিল তা স্তিমিত হয়ে গেল পলকে।

আমি জানি, আমার জিজ্ঞাসাবাদের প্রতিটি মুহূর্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভিডিয়ো রেকর্ডিং করে নেওয়া হচ্ছে। হাতের লেখা মিলিয়ে দেখার বর্তমান আইন অনুসারে জোয়ারদার আমাকে এখনই লেখার জন্যে বাধ্য করতে পারে না। আমি লিখতে

গররাজি হলে অন্য কথা। কিন্তু আমি শুধু দু-একদিন সময় চেয়েছি।

আসলে দু-একদিন নয়, আড়ালে দশমিনিট সময় পেলেই আমার কাজ হয়ে যাবে। আমারই ভুল। চিঠিগুলোর কথা আমার মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য বিকল্প পথ জানা আছে বলেই বোধহয় ব্যাপারটা আমি তেমন গুরুত্ব দিইনি।

'আপনি তা হলে এখন লিখবেন না?'

'না—আমার আঙুলে ব্যথা।'

'কাল সন্ধেবেলা কি আপনার অসুবিধে হবে?'

'মোটেই না। কখন আসতে হবে বলুন—।'

'রাত আটটার সময় বিশ্বাস আর বর্ধন আপনাকে নিয়ে আসবে। বাট ডোন্ট ট্রাই এনি মাঙ্কি ট্রিক। চালাকি ধরে ফেলা আমার হবি, মিস্টার মজুমদার—।'

আমি হাসলাম, বললাম, 'আপনি মিছিমিছি আমাকে সন্দেহ করছেন, জোয়ারদারবাবু। তা ছাড়া আমি জানি, চালাকি করে আপনার সঙ্গে পারব না।'

জোয়ারদারের চোখ ছোট হল, চোয়ালের রেখা স্পষ্ট হল। বুঝতে পারলাম, আমার 'জোয়ারদারবাবু' বলার ঢঙটা ওর পছন্দ হয়নি।

এরপর ঘরে ফেরার পালা।

বিশ্বাস আর বর্ধন যত্ন করে আমাকে বাড়ির সামনের রাস্তায় ছেড়ে দিল।

আমি আবার ফিরে গেলাম সুচরিতার কাছে।

আমার ফেরার শব্দ পেয়ে ও জেগে উঠল। আমাকে হাত ধরে টেনে নিতে চাইল বিছানায়। 'উঁ—উঁ—ম্—ম্' করে আদুরে শব্দ করল আলতো গলায়।

আমি ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বললাম, 'একমিনিট, সুইটি—একটু টয়লেট থেকে আসছি—।'

টয়লেটে গিয়ে অটোমেটিক কোলোন স্প্রেয়ারের সামনে দাঁড়ালাম। সুগন্ধী ঠান্ডা বাতাস আমাকে ভাসিয়ে দিল। আমি চোখ বুজে শ্রাবন্তীর কথা ভাবতে লাগলাম।

একমাত্র ওকেই আমি ভালোবাসার চিঠি লিখেছি—আর কাউকে না। আমার ভেতরের পাগলটা শুধু ওকেই ভালোবেসে ফেলেছিল। আর সবাই ছিল ওর কাছে একরাত বা কয়েক রাতের সঙ্গিনী। রাত ফুরোলেই সব ভালোবাসা শেষ। সুচরিতাও তাই। আর কাউকে আমি ভালোবাসার চিঠি লিখব না।

যদিও বা লিখি, শ্রাবন্তীকে লেখা চিঠির মতো হাতের লেখায় লিখব না। লিখব অন্য কোনও নতুন হাতের লেখায়।

কোলোন স্প্রেয়ার বন্ধ করে দেওয়ালে লুকোনো একটা ক্যাবিনেটের দরজা খুললাম। আমার সামনের তাকে এখন অনেকগুলো মেগা স্কেল ইন্টিগ্রেটেড মাইক্রোচিপ। মাথার চুলের ভেতরে হাত চালিয়ে ছোট্ট ধাতব প্লেটটা সরিয়ে দিলাম। মাথার ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে খুব সতর্কভাবে একটা চিপ বেস থেকে খুলে নিলাম।

সেটা তাকে রেখে দিয়ে নতুন একটা চিপ তুলে নিলাম। তার নম্বরটা ঠিক আছে কিনা একবার দেখে নিয়ে সাবধানে সেটা বসিয়ে দিলাম মাথার ভেতরে। তারপর ধাতব ঢাকনা টেনে বন্ধ করে দিলাম।

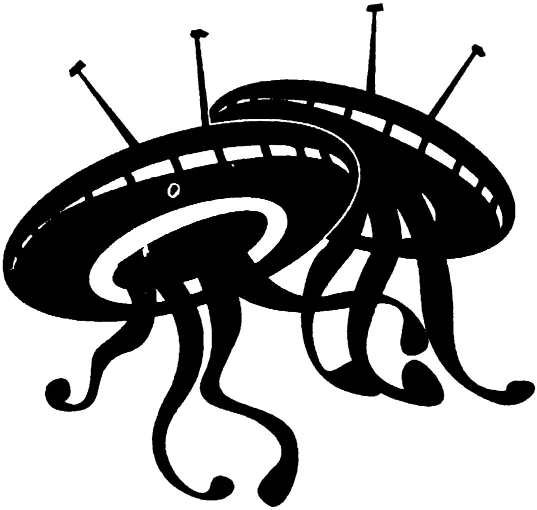
ব্যস, আর কোনও চিন্তা নেই। আমার হাতের লেখা এবার বদলে যাবে।

আমাদের হাতের লেখার ধরন মস্তিষ্কের যে-অংশ নিয়ন্ত্রণ করে এই চিপটা অনেকটা যেন তারই বিকল্প। সতেরো বছর বয়েসে অপারেশানের সময় আমার মাথার ভেতরে একগাদা চিপ বসানো হয়েছিল। তার কয়েকবছর পর হার্ডওয়্যারে গবেষণা করার সময় এ ধরনের মাইক্রোচিপ আমি হঠাৎই আবিষ্কার করেছিলাম। আর তারই একটা দিয়ে বিশেষ ধরনের সার্কিট তৈরি করে বসিয়ে দিয়েছিলাম আমার মাথার ভেতরে।

বিভিন্ন হাতের লেখার ধরনের জন্যে সারকিট ডিজাইন করার বিভিন্ন চিপ পাওয়া যায়। সেই চিপটা পালটে নিলেই আমার হাতের লেখার ধরন পালটে যায়।

সুতরাং আর আমি জোয়ারদার অ্যান্ড কোম্পানিকে ভয় পাই না।

আমার সিরিয়ালের বারো নম্বর এপিসোডের জন্যে মনে-মনে তৈরি হয়ে আমি টয়লেট থেকে বেরিয়ে এলাম।



অলীক কথামালা

গোটা ব্যাপারটা ঠিক কবে থেকে যে শুরু হল অসিত তাই ভাবছিল। গলার কাছটায় যে ব্যথা সেটা প্রথম ও টের পেল কবে? এটুকু মনে আছে, কানের ব্যথাটা শুরু হয়েছিল গলার ব্যথার ঘণ্টাকয়েক পরেই। তারপরে দুটো ব্যথাই একেবারে মিলিয়ে গিয়েছিল। তার বদলে নতুন উপসর্গ হিসেবে শুরু হল এই আশ্চর্য ঘটনা...।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়েই অসিত টের পেল ঢোঁক গিলতে কষ্ট হচ্ছে। নানারকম কায়দায় নতুন ধরনের নানা চুমুক দিয়ে ও চায়ের কাপ শেষ করল। না, ব্যথাটা মোটেই মিলিয়ে গেল না। মুখটা বিচ্ছিরিরকম তেতো লাগছিল।

বাবা অনেক আগেই ঘুম থেকে উঠে রোজকার মতো মাঠে পায়চারি করতে বেরিয়ে গেছে। ফেরার সময় কারও খেত-বাগান থেকে টুকিটাকি শাকসবজি যা পারে ম্যানেজ করে ফিরবে। নিতান্ত না কিনলেই নয় এমন জিনিস ছাড়া বাবা কিছু কেনে না। আর অসিতকেও বাজার-টাজারের দায়িত্ব কখনও দেয় না। একে ম্যানেজ-মাস্টার, তার ওপর হাড়কেপ্পন। অসিত জানে, পাড়ার কেউ সাতসকালে বাবার মুখ দেখতে চায় না। সুবু, ভোলা, নদে ওরাও কি কম বলতে ছাড়ে অসিতকে! বলে, তোর বাপটা মাইরি সেফ ডিপোজিট ভল্ট। পিঁপড়ের চাষ করে গুড়ের ব্যাবসা

করলে পারত।

অসিত সবই হজম করে। বাবাকে কখনও কিছু বলে না। ও জানে, বাবা ম্যানেজ-মাস্টার হতে পারে, হাড়কেপ্পন হতে পারে, কিন্তু সংসারের চাকাটা ঘুরিয়ে তো যাচ্ছে! একার পেনসনের পয়সায় চাকা ঘুরতে চায় না, গোল চাকা তেকোণা হয়ে যেতে চায়, তবু ঘোরাচ্ছে তো!

মালা এসে চায়ের কাপটা নিয়ে গেল। বলে গেল, দাদা, তোকে সুবুদা একটু আগে ডাকতে এসেছিল। তুই ঘুমোচ্ছিলি। তোকে সীতেশবাবু দেখা করতে বলেছে—চায়ের দোকানে।

খাটে বসে-বসেই মালার চলে যাওয়া দেখল অসিত। এবারে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছে। তবে বাবা বোধহয় আর পড়াতে পারবে না। অসিত একবার মিনমিন করে বাবাকে বলতে গিয়েছিল এ ব্যাপারে। বাবা সোজাসুজি বলে দিয়েছিল, হায়ার সেকেন্ডারি পর্যন্ত তো আমি পড়ালাম, এবারে তুমি দ্যাখো—কিছু একটা ব্যবস্থা করো।

অসিত চলে এসেছিল। ও কী ব্যবস্থা করবে? না আছে পেটে বিদ্যে, না আছে পকেটে পয়সা। ইস, মালার যদি চট করে বিয়ে হয়ে যেত! ওকে দেখতে তো ভালোই। দু-বেলা ঠিকমতো খেতে পায় না, তবু স্বাস্থ্য দেখলে অবাক হতে হয়। সত্যি, অসিতের কিছু একটা করা উচিত।

খাট থেকে উঠে দেওয়ালের পেরেক থেকে জামাটা নিল অসিত। তখনই খাটের মাথার দিকের জানালা থেকে মিষ্টি শিসের শব্দ শুনতে পেল। দোয়েল ডাকছে। জানলার বাইরের খোলা জমিতে কয়েকটা করবী, শিউলি, আর একটা বড় লেবু গাছ আছে। পাখিটা প্রত্যেক বছর এই সময়টায় এসে আশেপাশে কোথায় যেন বাসা বাঁধে। একটা মাস গলা ফাটিয়ে শিস দেয়—তারপর কোথায় উধাও হয়ে যায়। অবশ্য একটাই পাখি প্রতি বছর আসে কিনা কে জানে! তবে দেখে অসিতের তাই মনে হয়। সে যাই হোক, বিনিপয়সায় দোয়েলের ঘুমভাঙানি গান—এ যে রাজার কপালেও জোটে না!

জামাটা গায়ে গলাতে-না-গলাতেই বাইরে থেকে ডাক শুনতে পেল অসিত ঃ সিতু—অ্যাই, সিতু—।

অসিত বেরিয়ে এল। কলতলায় হাত-মুখ ধুয়ে নিল। বাইরের বারান্দায় মা রোজকার মতো রেডিমেডের সেলাই শুরু করে দিয়েছে। পুরোনো মেশিন ছ্যাকরাগাড়ির মতো শব্দ তুলে ঘড়ঘড় করে ঘুরছে। একপাশে উনুনে আগুন দিচ্ছে মালা। ধোঁয়ায় অসিতের চোখ জ্বালা করছিল। দেখল সুবু দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখেই বলল, কী বে শালা, এই ঘুম ভাঙল?

অসিত চোখ কুঁচকে ইশারা করে মায়ের দিকে দেখাল। সুবুটার বড্ড মুখ খারাপ।

ও রাস্তায় নেমে এল। সুবু বলল, সেই সকাল থেকে সীতেশদা তোকে খোঁজ করছে—দীনুদার চায়ের দোকানে বসে আছে।

ওরা দুজনে জলদি পা চালাল।

সাড়ে আটটা বেজে গেছে। কয়েকটা বাচ্চা সাদা-সবুজ পোশাক পরে পিঠে-হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। উলটোদিক থেকে আসা দুটো সাইকেল রিকশা ওদের পেরিয়ে গেল। তার পিছনেরটায় আলোবউদি বসেছিল। ছেলেকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে। চলন্ত রিকশা থেকেই অসিতকে দেখল আলোবউদি। হাসল। রিকশাগুলো প্যাঁক-প্যাঁক শব্দ করে এগিয়ে গেল।

সুবু অসিতের পিঠ চাপড়ে দিল, বলল, তোর কপাল আছে মাইরি!

অসিত মনে-মনে মজা পেল। সুবুরা ভাবে আলোবউদির সঙ্গে ওর একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু আসলে তা নয়। আলোবউদির বোন নীলা এ-পাড়ায় দিদির সঙ্গেই থাকে। অসিত নীলার সঙ্গে কথা-টথা বলতে ওদের বাড়িতে যায়। সেইসঙ্গে তাপসদা আর আলোবউদির সঙ্গেও আড্ডা দেয়, চা খায়। আর তাপসদা সিগারেট দিলে খায়।

একটু পরেই নীলাদের বাড়ির কাছে এসে গেল ওরা। ছোট দোতলা বাড়ি। গ্রিলের রেলিং দেওয়া সুন্দর বারান্দা। আর সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুন্দর নীলা। গায়ে-পায়ে একটা গোলাপি ম্যাক্সি। সকালের বাতাসে ঘাঘরা হয়ে উড়তে চাইছে।

তাপসদার বাড়িটা নতুন। বছরচারেকের মতো বয়েস। পাড়ার সকলেই জানে তাপসদা কীভাবে এই বয়েসে বাড়ি করেছে। তাপসদা রেল কোম্পানির স্টোরে চাকরি করে।

সুবু মাথা উঁচু করে নীলাকে দেখল। অসিতকে টেনে বারান্দার একেবারে নীচ দিয়ে হেঁটে যেতে চাইল। অসিত ওর মতলব বুঝতে পারল। নীচ ঘেঁষে হেঁটে যেতে যেতে সুবু মুখ তুলে নীলার ম্যাক্সির দিকে দেখবে।

ও সুবুর হাত ধরে টান মারল। সুবু ছিটকে ওর কাছে সরে আসতে-আসতে বলল, যাঃ শালা!

নীলা তখন ওপর থেকে অসিতকে দেখছিল। অসিত ওর দিকে তাকাল। ঠোঁটে দুটো আঙুল ছোঁয়াল। নীলা চোখ ছোট করে এক চিলতে হাসল। ওর মুখে এখনও ঘুমের ছাপ। অসিত মাথায় আঙুল চালিয়ে চুল পরিপাটি করার চেষ্টা করল। ইস, জামাটা কেমন ময়লা লাগছে! পাজামাটাও কাচব-কাচব করে কাচা হয়নি। মুখে-গালে অকারণেই হাত চালাল। দাড়ির খোঁচা টের পাওয়া যাচ্ছে।

ওরা অনেকটা এগিয়ে গেছিল। অসিত ঘাড় ঘুরিয়ে নীলাকে দেখল আর একবার। সুবু বলল, কী বে, কাটা পোনা চারা পোনা দুটোই খাবি?

অসিত বলল, কী ফালতু বকছিস!

এমনসময় বাঁকের মুখে দীনুদার দোকানটা দেখা গেল। দোকানের কাছ ঘেঁষে

একটা ছাইরঙা অ্যামবাসাডর দাঁড়িয়ে আছে। অসিত গাড়িটা চেনে। গজেন দাসের গাড়ি। স্টেশন রোডের কাছে ইট-চুন-সুরকির বড় দোকান আছে। তা ছাড়া কন্ট্রাকটরির কাজ করে। লোকটা কি চা খেতে এসেছে না দেখা করতে এসেছে সীতেশদার সঙ্গে?

সীতেশদা চায়ের দোকানে বসেছিল। পাটভাঙা পাঞ্জাবি-পাজামা গায়ে। চুল তেলতেলে—টানটান করে আঁচড়ানো। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। মুখে সবসময় হাসি লেগে আছে। কথাবার্তা বলে ধীরে-ধীরে, থেমে-থেমে। সীতেশদা কাউন্সিলর হওয়ার পর থেকে পাড়ার অনেক রাস্তা সারানো হয়েছে, অনেক টিউবওয়েল বসেছে এখানে-ওখানে। এই বর্ষায় নানা গাছপালা, চারা, লতা বসানো হয়েছে, আর কুণ্ডুদের ইট ভাঁটার একপাশে পাঁচিল ঘিরে তৈরি হয়েছে শিশু উদ্যান।

সীতেশদা চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল। গজেন দাস সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। কী যেন বলছিল সীতেশদাকে। বোধহয় অনুনয়ের সুরে কোনও আর্জি পেশ করছিল। রোগাটে চেহারায় বাবরি চুল আর রিমলেস চশমা। ঠোঁটে পানের লাল ছোপ। দেখে হঠাৎ করে কীর্তনিয়া মনে হয়। নদে বলে, ও ব্যাটা বহু মেয়ের কেস্তন করে দিয়েছে।

অসিত আর সুবুকে দেখে সীতেশদা হেসে বলল, আয়, আয়। তোর ঘুম ভাঙল?

অসিত হাসল চোখ নামিয়ে। সুবু ওকে ঠেলে একটা বেঞ্চিতে বসিয়ে দিল, নিজেও বসল। অসিত জানে সীতেশদা এখন ওকে কী বলবে। কিন্তু জুতসই কোনও জবাব যে ওর কাছে নেই! বাপটা খালি ম্যানেজ করার ধান্ধায় ঘোরে, অথচ সীতেশদাকে ম্যানেজ করতে পারছে না। পাড়ার যত ম্যাঁও সামলাতে হবে এই অসিতকে।

গজেন দাস তখন হাত-পা নেড়ে চোয়াল নাড়তে-নাড়তে বলছিল, ও আপনি কিছু ভাববেন, না সীতেশবাবু। যা-যা লাগবে আমি পাঠিয়ে দেব। আমি আপনার সঙ্গে আছি—নো প্রবলেম।

হেসে নমস্কার করে গজেন দাস গাড়ি নিয়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় নির্মল পরিবেশে একরাশ কুৎসিত কালো ধোঁয়া উগড়ে দিয়ে গেল।

সীতেশদা দীনুদাকে বলল, দীনুদা, দুটো চা দাও ওদের—।

পাড়ার হাই-স্কুলের ইতিহাস স্যার পরিমলবাবু দোকানের ভেতরদিকটায় বসে চা খাচ্ছিলেন, আর খবরের কাগজ পড়ছিলেন। সুবু অসিতকে দেখে হঠাৎই যেন উঠে পড়লেন। কাগজ রেখে চায়ের দাম দিয়ে চলে গেলেন। যাওয়ার সময়ে সীতেশদাকে একবার দেখলেন। সীতেশদা পরিমল স্যারের ছাত্র ছিল। অসিত নিজেও।

সীতেশদা অসিতকে বলল, কী রে, আমার ওই ব্যাপারটার কী হল?

অসিত অনেকক্ষণ ধরেই মনে-মনে একটা উত্তর খাড়া করবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। ওদের বাড়িটা পুরোনো—ঠাকুরদার আমলের। একতলা মাথা গোঁজার ওই ঠাঁইটা ছিল বলেই বাড়ি ভাড়া গুনতে হয় না। বাবা সবসময় এই কথাটা শোনায়। তবে সমস্যাটা বাড়ি নিয়ে নয়—বাড়ির লাগোয়া একফালি জমিটা নিয়ে। একসময়ে ওটায় বাগান ছিল। অসিত শুনেছে, বিয়ের পরে মা ওখানে বাগান করেছিল। তখন বাবারও শখ ছিল। পরে যতই দিন গড়িয়েছে বাঁচার লড়াইয়ের তাপে শখ ততই শুকিয়ে গেছে। ফলে এখন পুরোনো যে-ক'টা গাছ টিকে গেছে, আর নিজে থেকেই যে দু-চারটে গাছ বা আগাছা হয়েছে তাই নিয়েই খুশি থাকে এককালের বাগানটা। বর্ষায়-বসন্তে সেজেগুজে ফুলেফেঁপে ওঠে। আর বাকি সময়টা হাঁপানি ধরা বুড়ির মতো হাঁপায়। সীতেশদা ওই জমিটুকু ব্যবহার করতে চাইছে বহুদিন থেকে।

সীতেশদা কাউন্সিলর হয়েছে মাসছয়েক। তার আগে পাড়াতেই ক্লাব-টাব নিয়ে ব্যস্ত থাকত। আর ক্লাবের নাম করেই নানারকম মহিলা সমিতি, বেকার যুবক কমিটি, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি তৈরি করেছিল। পরে ক্লাব উঠে গেছে, কিন্তু ওইসব সমিতি বা কমিটিগুলো দিব্যি টিকে থেকেছে। তখনই সীতেশদা অসিতকে বলেছিল, সিতু, তোদের বাড়ির লাগোয়া ওই পোড়ো জমিটা আমাদের সংগঠনের কাজের জন্যে দরকার। ঘর-টর আমরাই করে নেব—ভাড়াও দেব। তুই একটা ব্যবস্থা কর।

ক্লাব করার সময়েও সীতেশদা জমিটা চেয়েছিল। বলেছিল, ওখানে ফ্রি কোচিং সেন্টার, ব্যায়ামাগার, চিকিৎসা কেন্দ্র, লাইব্রেরি—আরও কত কী করবে। কী করে যে ওই এক চিলতে জায়গায় এতগুলো জনহিতকর কেন্দ্র খোলা সম্ভব তা অসিতের মাথায় ঢোকেনি। তবু ও বলেছিল ব্যাপারটা বাবাকে জানাবে।

কথাটা বাবাকে বলামাত্রই আগুন জ্বলে উঠেছিল। বাবা এমনিতেই সবসময় অসিতকে যা-নয়-তাই বলে। সেদিন বাবার আর কোনও জ্ঞান ছিল না। মা সবসময় চুপচাপ থাকে, রেডিমেডের সেলাই করে একমনে। সেই মা-ও সেলাই ফেলে ছুটে এসেছিল। কোনওরকমে থামিয়েছিল বাপ-ছেলের ঝগড়া।

অসিতের বক্তব্য ছিল, জমিটা তো এমনিতে পড়েই রয়েছে। তা হলে ভাড়া দিলে ক্ষতি কী! মাসে-মাসে টাকা পাওয়া যাবে। এ-কথা শুনে বাবা খেপে উঠেছিল। বলেছিল, কক্ষনো নয়। পৈতৃক ভিটের এক কণাও আমি ভাড়া দেব না। তার ওপর ওদের দিলে দুনিয়ার ছোকরাগুলো দিনরাত্তির এখানে পড়ে থাকবে, হইহল্লোড় খিস্তিখেউড় করবে...মালা বড় হচ্ছে সে খেয়াল কি রাখো? সবসময় তো তোমার সীতেশদার এঁটুলি হয়ে টোটো করছ—।

সীতেশদাকে বাবার আপত্তির কথা জানিয়েছিল অসিত। সঙ্গে-সঙ্গে সীতেশদার

মুখ থেকে পেটেন্ট হাসির ছোঁওয়াটা মিলিয়ে গিয়েছিল। কতকগুলো আজেবাজে রেখা মুখটাকে বিচ্ছিরি করে দিয়েছিল। চাপা গলায় দাঁতে দাঁত চেপে সীতেশদা বলেছিল, ঢ্যামনাটাকে রাজি করাতে পারলি না। দাঁড়া, দেখছি...।

বাবাকে অসিত পছন্দ করে না ঠিকই, কিন্তু সীতেশদার চাপা কথাটা শুনে ওর ভীষণ খারাপ লেগেছিল। তক্ষুনি ক্লাবের একটা ছেলে, অপু, বলেছিল, তুমি ভেবো না, সীতেশদা। ও আমরা ম্যানেজ করে নেব।

অসিত লক্ষ করেছিল, ক্লাবের যারা-যারা ওর বন্ধু তাদের অনেকেই হঠাৎ অপরিচিতের চোখে তাকিয়েছিল অসিতের দিকে।

অসিত চলে এসেছিল, এবং তারপর থেকেই ও ক্লাব থেকে কেমন যেন দলছুট হয়ে যাচ্ছিল। এরপর মালা একদিন ওকে বলেছিল, পাড়ার কিছু ছেলে ওকে দেখে অশ্লীল ইশারা করে, মন্তব্য করে। আগে এমন করত না। অসিত বুঝতে পারছিল সব, কিন্তু মালাকে কিছু বলতে পারেনি।

এইভাবে যখন আলাদা হতে-হতে ও সীতেশদার কাছ থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছে তখন একদিন সীতেশটাই বাড়িতে এসে পিঠ চাপড়ে ওকে আবার ডেকে নিয়ে গেছে। বলেছে, ওর চাকরির একটা ব্যবস্থা করে দেবে, আর বেকার যুবকদের ব্যাবসা করার জন্য যে-সরকারি লোন দিচ্ছে সেটাও ম্যানেজ করে দেবে।

তারপর থেকেই আবার আগের মতো হয়ে যেতে চেয়েছে অসিত। মালাও ওকে আর কোনও অসুবিধের কথা বলেনি।

ভোটে জিতে সীতেশদা কাউন্সিলর হওয়ার পর ওরা যখন উৎসব করছিল, তারই মধ্যে ভোলা হঠাৎ ওকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলেছিল, সিতু, এবারে জমিটার ব্যবস্থা করে দে। নইলে সীতেশদার খুব অসুবিধে হবে।

অসিত অবাক হয়ে গিয়েছিল। সেই শুরু। তারপর থেকে অপু, সুবু, নদে ওরা ওকে নিয়মিত তাগাদা দিয়েছে। আর গত সপ্তাহে সীতেশদা হাসি মুখে ওর কাঁধে হাত রেখে বলেছে, সিতু, এবারে যাহোক একটা ব্যবস্থা কর। নইলে আমাদের কাজকর্মে অসুবিধে হচ্ছে। ফলে পাড়ার লোকেও সাফার করছে। তোরা তো শুধু-শুধু জমিটা ফেলে রেখেছিস...।

অসিত শান্তভাবে বলেছিল, বাবাকে বলব।

কিন্তু বাড়িতে ফিরে সে-কথা বাবাকে আর বলেনি। জানে, বলে কোনও লাভ নেই। সুতরাং দিনের-পর-দিন ওই একটা কথা শুনে-শুনে অসিতের কান যেন ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিল। ও ভাবছিল, ওরা তো সরাসরি বাবাকে বলতে পারে। সীতেশদা একবার এমন কথা বলেও ছিল, তুই যখন পারলি না, তখন আমরা একবার বলে দেখি। কিন্তু তখন অসিতই বারণ করেছিল। কারণ ও জানত, বাবা একইরকম খেপে উঠবে। উলটোপালটা কথা বলবে। সেসময়ে যদি অপু, নদে ওরা পালটা অসম্মান করে বাবাকে। কিংবা হাত চালিয়ে দেয়...

অসিতের মাথাটা ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল। কী করবে, কী করা উচিত ভেবে উঠতে পারছিল না। অথচ সীতেশদা যেরকম অধৈর্য হয়ে উঠছে, তাতে...।

সীতেশদা চশমার কাচ মুছে আবার জিগ্যেস করল, কীরে, সিতু, আমার ওটার কী করলি বল?

দীনুদা চা দিয়েছিল। সুবু চায়ে শব্দ করে চুমুক দিল। অসিত যেন সময় কাটাতেই চায়ের কাপে ঠোঁট নামাল। সুবু সীতেশদাকে লুকিয়ে অসিতের গা টিপল।

সীতেশদা আবার বলল, জানিস তো জমি ফেলে রাখাটা অন্যায়। তোদের জমিটা ওরকমভাবে প্রায় বিশবছর পড়ে আছে। বিশবছরে ওই জমিটুকুতে কতটা ধান হত জানিস? কতগুলো লোক খেয়ে বাঁচতে পারত বল!...আসলে তোরা দেশের কথা কিছু ভাবিস না। স্বার্থপর।

অসিতের গলার ব্যথাটা বেড়ে গেল। কথা বলতে গিয়ে ওর কথা কেমন জড়িয়ে গেল। ও কোনওরকমে বলল, কালকে ফাইনাল বলব, সীতেশদা।

ওর বিচিত্র স্বরে সীতেশদা চমকে উঠল। ভালো করে দেখল রোগা ছেলেটাকে। তার সঙ্গে ইয়ারকি মারছে নাকি? অবশ্য মুখ দেখে তা মনে হল না।

সীতেশদা বলল, কালকের পর কিন্তু আমার ছেলেরা আর ওয়েট করতে পারবে না। ওরা ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুই যা ল্যাজে খেলাচ্ছিস...। আচ্ছা, তোর বোনটা এখন কী করছে?

হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে বসে আছে। আর পড়বে না।

অসিতের কথায় সুবুও চমকে উঠল। এর মধ্যেই অসিতের গলাটা কেমন পালটে ফ্যাসফেঁসে হয়ে গেছে। কোনও কথা জোরে বেরোচ্ছে, কোনওটা আস্তে।

সীতেশদা বলল, ওকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস। গজেন দাসের একজন অফিস সেক্রেটারি দরকার। আমাকে বলছিল। আমি একটা চিঠি দিয়ে মালাকে—মালাই তো নাম তোর বোনের?—মালাকে পাঠিয়ে দেব। দ্যাখ, যদি একটা হিল্লে হয়ে যায়।

অসিত আপত্তি জানিয়ে কী একটা বলতে গেল, কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরোল বলে মনে হল না। ও চা শেষ করে ঘাড় নেড়ে উঠে পড়ল। সুবু বসেই রইল।

চলে আসতে-আসতে অসিত দেখল, সীতেশদা সুবুকে কী যেন বলছে, আর ওরা দুজনেই তাকিয়ে আছে অসিতের দিকে।

বাড়িতে ঢোকার সময়েই অসিত টের পেল কান দুটো ব্যথা করছে। ছোটবেলায় মাঝে-মাঝে ওর কানে ব্যথা হত। কটকটানি ব্যথা। কিন্তু এ-ব্যথার ধরনটাই অন্যরকম। ঠিক বোঝানো যায় না।

ওকে ফিরে আসতে দেখে মালা অবাক হল। সাধারণত অসিত দশটা-এগারোটায় ফেরে। তখন রুটি-তরকারি বা যা হোক কিছু মুখে গুঁজে টিফিনটা সেরে নেয়। তারপর সঙ্গে-সঙ্গেই আবার বেরিয়ে যায়। ওর স্নান বা দুপুরের খাওয়ার সময় দেড়টা-দুটো।

মালা বারান্দায় তোলা উনুনে রান্না করছিল। মায়ের মেশিন একইরকমভাবে চলছে। অসিত কোনও কথা না বলে সোজা ঢুকে গেল নিজের ঘরে। জামাটা খুলে শুয়ে পড়ল আবার। কানের ব্যথাটা বাড়ছে। গলাটাও কেমন অদ্ভুত জ্বালা করছে। অসিত ক্রমশ ভয় পেয়ে যাচ্ছিল।

জানলা দিয়ে গাছের ডাল-পাতা দেখা যাচ্ছে। দোয়েল পাখিটা লেজ খাড়া করে ডাল থেকে ডালে লাফাচ্ছে। শিস দিচ্ছে। কিন্তু শিসের শব্দটা কেমন বিচিত্র শোনাচ্ছে না! অসিত দু-হাতে কান চেপে ধরল কিছুক্ষণের জন্য। দোয়েলটা যে-গাছে বসে আছে, সেই গাছের শেকড় ছড়িয়ে রয়েছে ওর পিতৃপুরুষের ভূমির অন্তরে। কালই সীতেশদাকে একটা স্পষ্ট উত্তর দিতে হবে। উত্তর যদি সীতেশদার মনের মতো না হয়, তা হলে...।

মালা এসে ঘুরে ঢুকল। হাতের থালায় রুটি তরকারি। বলল, কী রে, দাদা, শুয়ে আছিস যে! খাবি না?

অসিত বলতে চাইল, আমার শরীর ভালো নেই। কিন্তু কথাগুলো কেমন অদ্ভুত শোনাল। তা ছাড়া আরও একটা জিনিস খটকা লেগেছে অসিতের। মালার বলা কথাগুলোও ওর কানে অন্যরকম শুনিয়েছে। কেমন যেন তীক্ষ্ণ, ধাতব, জড়ানো স্বর।

অসিত মাথা নাড়ল। কোনওরকমে বলল, গলায় কানে অসহ্য ব্যথা। ডাক্তার...ডাক্তার...। তারপর দু-হাতে আবার কান ঢাকল। চোখ বুজে ফেলল একইসঙ্গে।

এইভাবে শুয়ে থাকতে-থাকতে কখন যে ও ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই। ঘুম ভাঙল মালার ধাক্কায়। মালা ওকে ডেকে-ডেকে কী যেন বলছে। অসিত সে-কথার একটি বর্ণও বুঝতে পারছিল না। অসিত মালার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিল। কথা না বুঝতে পারলেও ও মালার ইশারা আঁচ করতে পারছিল। তাই জামাটা গায়ে দিয়ে নিল। মালা ওর কপালে হাত দিয়ে দেখল জ্বর হয়েছে কি না। পরীক্ষা করে যেন স্বস্তি পেল। তারপর অসিতকে একরকম জোর করেই একটা রুটি আর তরকারি বলতে গেলে খাইয়েই দিল।

মা এসে ঘরে ঢুকল। কী যেন বলল মালাকে। কুড়িটা টাকা দিল ওর হাতে। মালা সেটা ব্লাউজের ফাঁকে গুঁজে দাদাকে নিয়ে বাইরে এল।

বাবা কলতলায় স্নান করছিল। মাথায় জল ঢালা থামিয়ে চোখ-মুখ কুঁচকে কিছু বলল। মালা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে অসিতকে নিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

বেলা প্রায় বারোটা হলেও ঝাঁঝাঁ রোদ্দুর নেই। একটা মেঘের পরত সূর্যকে প্রশমিত করে রেখেছে। একটা রিকশো ডেকে মালা অসিতকে নিয়ে তাতে উঠে বসল। কোথায় যাবে বলতেই রিকশোর চাকা ঘুরতে শুরু করল।

সকালে দাদার অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল মালা। তখনই ও রাস্তায় বেরিয়ে একটা বাচ্চা ছেলেকে দিয়ে ভোলাকে খবর দিয়েছিল। ভোলা যে মালার ব্যাপারে দুর্বল তা মালা জানে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোলা অপুকে নিয়ে হাজির হয়েছিল। তারপর মালাকে নিয়ে গিয়েছিল সীতেশদার কাছে। সীতেশদাই একেবারে শশব্যস্ত হয়ে নামজাদা এক ই-এন-টি স্পেশালিস্টকে ব্যক্তিগত চিঠি লিখে দিয়েছে। বলেছে, দুপুরে উনি বাড়িতে লাঞ্চ করতে আসেন। আমার চিঠি দেখালে সিতুকে দেখে দেবেন। আর তুমি আমাকে এসে বলে যেয়ো সিতু কেমন আছে। মাঝে-মাঝে এসো আমার এখানে—যোগাযোগ রেখো।

ডাক্তারবাবু নানানভাবে পরীক্ষা করলেন অসিতকে। বিভিন্ন মাপের টিউনিং ফর্ক হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে অসিতের কানের কাছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন, কপালে আর মাথায় ঠেকিয়ে নানান প্রশ্ন করলেন। কিন্তু অসিতের জড়ানো গলার উত্তর কিছু বোঝা গেল না। ও শুধু মাথা নাড়ছিল।

একইরকম বিশদভাবে অসিতের জিভ-গলা-নাক পরীক্ষা করলেন তিনি। কিন্তু রহস্য পুরোপুরি যে ভেদ করতে পারলেন তা নয়। অসিতকে কাগজে লিখে তিনি প্রশ্ন করতে লাগলেন, আর অসিতও কাগজে লিখে উত্তর দিতে লাগল।

প্রায় আধঘণ্টা-চল্লিশমিনিট পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাক্তারবাবু কপালে ভাঁজ ফেলে যা বললেন তা শুনে মালা চমকে গেল।

তিনি বললেন, আপনার দাদা শুধু আলট্রাসনিক শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। মোটামুটিভাবে কুড়ি থেকে কুড়ি হাজার পর্যন্ত কম্পাঙ্কের শব্দতরঙ্গ মানুষ শুনতে পায়। আমার মনে হচ্ছে, এই রেঞ্জের কোনও শব্দই আপনার দাদা শুনতে পাচ্ছেন না। কী করে এরকম হল বুঝতে পারছি না। আরও কিছুদিন আপনারা দেখুন। তবে ওঁর নিজের কথা উনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন, বুঝতে পারছেন। অথচ আমরা একটুও বুঝতে পারছি না। তাতেই মনে হচ্ছে ওঁর ভোকাল কর্ডও আলট্রাসনিক রেঞ্জের ভাইব্রেশন জেনারেট করছে। তবে আরও ডিটেইল্‌ড পরীক্ষা বা অপারেশান ছাড়া শিয়োর করে কিছু বলা সম্ভব নয়।

আলট্রাসনিক শব্দতরঙ্গ! মালা অবাক হয়ে ভাবছিল। মানুষ যেসব শব্দ শুনতে পায় না দাদা তাই শুনছে! যে-শব্দতরঙ্গে কোনও মানুষ কথা বলতে পারে না, সেই শব্দতরঙ্গ বেরিয়ে আসছে দাদার গলা থেকে। এখন তা হলে কী হবে? কে বুঝবে দাদার কথা! দাদাও তো আর কারও কথা বুঝতে পারবে না। মালার কান্না পেয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু কয়েকটা ওষুধ লিখে দিয়ে বললেন, এগুলো সাধারণ ওষুধ। জ্বর-

টর হলে বা ব্যথা হলে খাইয়ে দেবেন। পুরো ব্যাপারটা ঠিকমতো না বুঝে এর বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। বলা যায় না, যেমন হঠাৎই এটা শুরু হয়েছে তেমন হঠাৎ করেই আবার নিজে থেকে সেরে যেতে পারে।

মালা টাকা দিতে গেলে ডাক্তারবাবু নিলেন না। সীতেশদা যখন চিঠি লিখে দিয়েছেন তখন টাকাপয়সার প্রশ্নই ওঠে না। সীতেশদাকে দেবতা বলে মনে হচ্ছিল মালার।

অসিতকে নিয়ে রিকশোয় ফিরতে-ফিরতে মালার গাল বেয়ে দু-এক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল। ডাক্তারবাবুর প্রশ্নের উত্তরে অসিত লিখে জানিয়েছিল যে, ওর গলায় বা কানে আর তেমন ব্যথা নেই। কিন্তু কারও সঙ্গে কথা বলতে না পারা, বা কারও কথা শুনতে না পাওয়ার ব্যথা কি কম!

অসিত চুপচাপ রিকশোয় বসেছিল। ওর কোনওরকম শারীরিক কষ্ট হচ্ছিল না। বরং এই নিঃশব্দ জগৎটাকে ওর বেশ ভালো লাগছিল। অবশ্য পুরোপুরি নিঃশব্দ বলা ঠিক হবে না, কারণ গাছের পাতার মৃদু আন্দোলনের কম্পন এখন ওর অতি-সুবেদী কানের পরদায় ধরা পড়ছিল। কারা যেন সমবেতভাবে বিষাদের দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। হাহাকার তুলছে, হায়! হায়!

একটা অদ্ভুত সুর অসিতকে চমকে দিল।

মনমরা হয়ে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে ছিল ও। বাইরে সন্ধের অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে গেছে। ঘরে একটা টিমটিমে বাল্‌ব জ্বলছে। ইলেকট্রিকের বিল যাতে কম ওঠে সেজন্য বাবা সব ঘরেই পঁচিশ বা চল্লিশ ওয়াটের বেশি বাল্‌ব লাগায় না। এতে মালার পড়াশোনার বড় কষ্ট হত, কিন্তু উপায় কী!

এখন সেই ঘোলাটে আলোতেই ছুঁচোটাকে দেখতে পেল অসিত। দেওয়ালের কোণ ঘেঁষে ইতিউতি ঘোরাফেরা করছে। আর আশ্চর্য! ওই কুৎসিত প্রাণীটির কাছ থেকেই না ভেসে আসছে সুরেলা ধ্বনি?

অসিত বিছানায় উঠে বসল। অবাক চোখে লক্ষ করত লাগল ছুঁচোটাকে। এতক্ষণ ও ভেবেছে যে, মোটামুটি নিঃশব্দ এক জগতে ও ঢুকে পড়েছে। অথচ, এই মুহূর্তে, এখন, ও কী অদ্ভুতভাবেই না মোহময় সুরের সন্ধান পেল। এই সুর এর আগে কখনও ও শুনতে পায়নি। যদিও ছুঁচো দেখেছে, বা তাদের বিশ্রী কিচকিচ শব্দও শুনেছে বারকয়েক।

ভ্রাম্যমাণ ছুচোঁটাকে কোলে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করছিল অসিতের। বলতে ইচ্ছে করছিল, তুই আমার দোয়েল পাখি।

ঠিক সেই সময়ে বাবা ঘরে ঢুকল। জামা খুলে দেওয়ালের পেরেকে ঝোলাতে গিয়েই ছুচোঁটাকে দেখল। এবং তৎক্ষণাৎ বিশ্রী মুখে হিংস্রভাবে প্রাণীটার দিকে তেড়ে

গেল। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে কীসব বলে উঠল অসিতকে। বলতেই থাকল।

বিছানায় বসে বাবাকে দেখছিল অসিত। কৃপণ বুড়ো মানুষটা অসিতের দিকে তাকিয়ে সার্কাসের ক্লাউনের মতো অঙ্গভঙ্গি করছে। তার কথা এক বর্ণও শুনতে পাচ্ছিল না অসিত। সেই জন্যই ওর হাসি পেয়ে গেল। ওর হাসি দেখে বাবা আরও ক্ষিপ্তভাবে হাত-পা ছুড়তে লাগল। অসিত আর অপেক্ষা করল না। ধুত্তেরি, বলে বিছানা ছেড়ে উঠে জামা গায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তায় সাইকেল, সাইকেল রিকশো, লোকজনের ভিড়, খোলা দোকানপাট ইত্যাদি মিলে জমজমাট ব্যাপার। কিন্তু কোনও শব্দ নেই।

অসিত আপনমনে হাঁটতে লাগল। পথে একটা কুকুর দেখে সেটাকে 'হুস, হুস' করে তাড়াল। কুকুরটা অসিতের দিকে পিছন ফিরে থাকলেও ওর কথা বোধহয় শুনতে পেল। কারণ, ঘুরে তাকিয়ে চট করে পথ ছেড়ে সরে গেল।

চলতে-চলতে রাস্তার লোকগুলোকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিল অসিত। কী বিচিত্রই না লাগছে! কোনও কথা শুনতে না পেলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হাবভাব দেখে ঘটনাগুলো আন্দাজ করতে পারছিল ও। আর বেশ মজা পাচ্ছিল।

হাঁটতে-হাঁটতে নীলাদের বাড়ির কাছে চলে এল ও। নীলাকে চেঁচিয়ে ডাকবে নাকি? ওদের একতলার ঘরগুলো অন্ধকার। দোতলায় আলো জ্বলছে। হঠাৎ কী মনে হওয়ায় অসিত চিৎকার করে উঠল, নীলা, নীলা! শিগগির নেমে এসো! তোমাকে একটা চুমু খেতে ইচ্ছে করছে!

অসিত জানত, ওর কথা ও নিজে ছাড়া আর কেউ শুনতে পাবে না। সেইজন্যেই এই খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কথাগুলো বলতে পেরে ওর তৃপ্তি হল। ভালোবাসার কথা এইভাবে বলতে পারলে কত ভালো লাগে। আচ্ছা, আর কেউ ছাড়া শুধু নীলা যদি ওর কথা শুনতে পেত, বুঝতে পারত, তা হলে!

নীলার কথা ভাবতে-ভাবতেই অসিতের সাহস বেড়ে গেল। ও ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে। তাপসদা নিশ্চয়ই এখন বাড়িতে নেই। শুধু নীলা আর আলোবউদি রয়েছে। নীলা কি এখনও সেই সকালের ম্যাক্সিটা পরে রয়েছে? নাকি ওর সেই লাল ছাপা শাড়িটা?

একতলার অন্ধকার ঘরগুলো পাশ কাটিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল অসিত। চলতে-চলতেই ও ইচ্ছে করে সুর তুলে নীলার নাম ধরে ডাকছিল। এখন নীলার নাম হাজারবার উচ্চারণ করতেও কোনও ভয় নেই।

এমনসময় অন্ধকার একটা ঘরের ভেজানো দরজা খুলে গেল। ঘর থেকে পা টিপে-টিপে বেরোল নীলা। সকালের গোলাপি ম্যাক্সিটা পরে রয়েছে ও। কিন্তু ও বেরিয়ে আসতে-না-আসতেই দুটো সবল হাত ওকে আবার টেনে নিল ঘরের মধ্যে। দরজার পাল্লাটা দেওয়ালে বাড়ি খেয়ে নড়ে গেল। অসিত জানে, ভালোবাসাবাসির শব্দ ওর শুনতে পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু তবুও দেওয়ালে শরীর লেপটে দু-কানে

হাত চাপা দিল ও। ওর বুকের ভেতরে পাহাড় ভাঙতে লাগল হুড়মুড় করে। অসিত একশোতলা বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে যাচ্ছিল অতলে। ওর কান্না পেয়ে গেল। কিন্তু সেই কান্নার শব্দ কেউ শুনতে পাচ্ছিল না।

অসিত অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে চুপিচুপি পালিয়ে এল বাইরে। তাড়া খাওয়া দিশেহারা একটা চিতল হরিণ ছুটোছুটি করছিল ওর বুকের বাগানে। ভাবছিল, শ্রুতি আর স্বরের মতো দৃষ্টিটাও যদি যেত তা হলে বেশ হত।

নীলাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোনদিকে যে ও পা চালিয়েছিল তা ওর খেয়াল নেই। খেয়াল হল ভোলা ওর পিঠে হাত রাখতে।

অসিত দেখল, ও দীনুদার চায়ের দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে। দোকানের কাছাকাছি একটা বড় অশ্বত্থ গাছ। গাছের প্রাচীন কাণ্ড ঘিরে গোল বাঁধানো চাতাল। গজেন দাস ইট-সিমেন্ট-বালি দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে। সেই চাতাল এখন জমজমাট। সীতেশদা সেখানে বসে রয়েছে মধ্যমণি হয়ে। আর তাকে ঘিরে নদে, সুবু, অপু—সবাই। অনেকের হাতেই চায়ের কাপ। তাতে চুমুক দিচ্ছে।

ভোলা ওকে সীতেশদার কাছে নিয়ে গেল। কী যেন বলল।

অসিত লক্ষ করল, সীতেশদাসুদ্ধ সবাই অবাক চোখে ওকে দেখতে লাগল। সীতেশদা অসিতকে কী যেন জিগ্যেস করল। উত্তরে অসিত মাথা নাড়ল। ওর দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

মেঘলা আকাশ বাতাসের টুঁটি টিপে ধরেছে। চারপাশ থমথমে গুমোট। তার ওপর অসিতের নিঃশব্দ জগৎ আর সকলের তীক্ষ্ণ নজর। অসিতের একটা হাত ওর অজান্তেই গলায় চলে গেল।

কোথা থেকে একটা খাতা জোগাড় করে সীতেশদা ওকে লিখে প্রশ্ন করল, কেমন আছিস এখন?

অসিতও লিখে জবাব দিল, ভালো, খুব ভালো।

কেন যে ওই কথাগুলো ও লিখল! লিখতে গিয়ে অসিতের হাত কাঁপছিল। ওর বুকের বাগানে হরিণটা ছুটোছুটি করছিল তখনও।

কিন্তু ওর উত্তরটা সীতেশদা জোরে-জোরে পড়ে শোনাতেই আর সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। যদিও হাসির কোনও শব্দ অসিত শুনতে পাচ্ছিল না, তবুও ওর কান লাল হয়ে গেল। ও চেঁচিয়ে বলল, সীতেশদা, বিশ্বাস করুন, আমি আগের চেয়ে অনেক ভালো আছি। আমার গলায়-কানে আর কোনও ব্যথা নেই।

অসিতের কথা কেউ বুঝল না। হাসতে-হাসতেই সীতেশদা লিখে প্রশ্ন করল, তোর বাপকে বলেছিলি আমার লাস্ট ওয়ার্নিং-এর কথা?

প্রশ্নটা পড়ে অসিত সীতেশদাকে আবার খুঁটিয়ে দেখল। সাদা কাগজে লেখা হরফগুলো কি এই লোকটার আঙুলগুলোই লিখল? এই লোকটাই না একদিন ঢ্যামনা বলেছিল অসিতের বুড়ো বাবাকে?

অসিতের মাথার ভেতরে কেউ যেন এক লাথি মেরে সাজানো দাবার ছক উলটে দিল। ও চিৎকার করে উঠল, জান থাকতে শালা তোমাকে ওই জমি দেব না। আমাদের বাপ-ঠাকুরদার ভিটেয় শালা তুমি ঘুঘু চড়াবে ভেবেছ? লেতা হয়ে পাবলিকের হোগায় বাঁশ দেওয়া! গজেন দাসের কেত্তনে শালা খোল বাজাও—তোমার লজ্জা করে না, জানোয়ার—।

অসিত উত্তেজনায় হাত-পা ছুড়ে কথা বলছিল। ওর কথা কেউ শুনতে না পেলেও ভাব বুঝতে পারছিল। সুতরাং আচমকাই একটা ঘুসি এসে পড়ল ওর পেটে।

অসিত ঝুঁকে পড়ল। আর তখনই অনেকগুলো চেনা কিংবা অচেনা হাত ওকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতে লাগল। বারবার। পথচারী অনেকেই ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছিল, তবে তারা নির্বিকারে পা ফেলে চলে যাচ্ছিল।

একটা জোরালো লাথি অসিতকে ছিটকে ফেলে দিল রাস্তায়। পড়ে যেতে-যেতে একটা ছুঁচোর সুরেলা ধ্বনি শুনতে পেল ও। এটাই কি একটা কুৎসিত প্রাণীর সুন্দর প্রতিবাদ? অসিতের চোখের সামনে সবকিছু ঘুরপাক খাচ্ছিল।

একটু পরেই সচেতন হল অসিত। রাস্তার ধুলোয় ও মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। কানে আসছে এক অদ্ভুত মিষ্টি ডাক। খুব মিহি—যেন ঝাড়লণ্ঠনের টুংটাং।

মুখ তুলে দেখতে চেষ্টা করল ও। কাছেই ঢালু নর্দমা। তারই পাড়ে ড্যাবড্যাবে চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বসে আছে কুৎসিত পোকাটা। ওরই দেহ থেকে বেরিয়ে আসছে এই নবীন জলতরঙ্গ।

ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল অসিত। হাত-পায়ের ধুলো ঝেড়ে নিল। ঠোঁটের কোণ জ্বালা করছে। মাথায় কেউ ছুঁচ ফোটাচ্ছে যেন। কয়েকসেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ও বাড়ির দিকে পা বাড়াল। পেছনে, অশ্বত্থ গাছের দিকে, আর তাকাল না। ও জানে, অপু-নদে ওরা সবাই হিংস্র অথচ অবিশ্বাসের নজরে ওকে দেখছে। ভাবছে, এই রোগা ভীতু ছেলেটার মধ্যে হঠাৎ কোন পাগলামি বাসা বাঁধল! পাগলামিতে না ধরলে কেউ এরকম বোকার মতো হঠকারী কাজ করে!

অসিত দু-পা বাড়াতেই অপু ছুটে এল ওর কাছে। একটা চিরকুট ধরিয়ে দিল হাতে। ঝাপসা নজরে সেটা পড়ে ফেলল অসিত ঃ তোর বাবাকে বলে রাখিস কিন্তু। কাল আমরা ফাইনাল কথা বলতে যাব।

অসিত চিরকুটটা দুমড়ে-মুচড়ে চেপে ধরল হাতের মুঠোয়। তারপর ছুড়ে ফেলে দিল নর্দমায়। অপু সেটা দেখল কি না কে জানে। অসিত ওর দিকে একটিবারের জন্যও ফিরে তাকায়নি।

গুমোট কেটে গিয়ে হঠাৎই খানিক ফুরফুরে বাতাস বইল। অসিতের রোমকূপে

বাতাসের কণার ছোঁয়া লাগল। ও হাঁটতে লাগল বাড়ির দিকে। রাস্তার লোকজন কমে এসেছে, দোকানপাট বন্ধ হচ্ছে। অসিত সব দেখেও যেন দেখতে পাচ্ছিল না। ওর চোখে ভাসছিল পিতৃপুরুষের একফালি জমিটুকু। বুকের ভেতরে একটা অলৌকিক অনুভব নিয়ে ও নীলাদের বাড়িটা পেরিয়ে গেল। নীলার কথা ওর মনে পড়ল না।

বাড়ির কাছে এসে কী যেন মনে হল অসিতের। ও দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। তারপর পাশের পতিত জমিটুকুর কাছে এগিয়ে গেল। ভাঙা বাখারির বেড়া পেরিয়ে অন্ধকার মাটিতে পা রাখল। শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। শিউলি, করবী, লেবু গাছের পাতার কাঁপুনি শুনতে পাচ্ছিল অসিত। এইসব আশ্চর্য শব্দ ও আগে কখনও শোনেনি। রাতের আঁধারে এইসব কুচিকুচি শব্দমালা ফিসফিস করে এক মোহময় সুর জাগিয়ে তুলছিল। একইসঙ্গে আরও কত বিচিত্র সঙ্গীত শুনতে পেল অসিত। আগাছার অন্তরাল থেকে নিশাচর কীটপতঙ্গের দল অসিতকে উপহার দিচ্ছে এক স্বপ্নময় জলসা। ক'দিন আগেও যা ছিল কর্কশ কান্না, আজ তা অসিতের কানে অন্যরকম এক আগমনি গান।

আনন্দে কান্না পাচ্ছিল অসিতের। এই সুর, এই গানের কথা, কোনওদিনই ও জানতে পারেনি। কেউ বলেনি ওকে। ওর অদ্ভুত অসুখটাই খুলে দিয়েছে এই নতুন জগতের দরজা। সারা জীবনের শোনা কথাগুলো একপলকে ওর কাছে অর্থহীন মিথ্যে হয়ে যাচ্ছিল।

এমনসময় টিপটিপ বৃষ্টি নামল। আর একইসঙ্গে সুরেলা শিসের শব্দ শুনতে পেল অসিত। ও মুখ তুলে তাকাল আকাশের দিকে। নদীর স্রোতের মতো সাবলীল ভঙ্গিতে ডানা নেড়ে বাতাস কেটে উড়ে চলেছে দুটো বাদুড়। ওরাই শিস দিচ্ছে সুরেলা আওয়াজে।

অসিত মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল রাতের আকাশে উড়ে যাওয়া প্রাণী দুটোর দিকে। ওর চোখে গালে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছিল। বাদুড়, ছুঁচো, কীটপতঙ্গ, এইসব কুৎসিত জীবগুলোর মধ্যে লুকিয়ে ছিল এত মধুর গোপন সঙ্গীত!

অসিত বাদুড়ের শিস নকল করে শিস দিল। নিজের গলায়-কানে হাত বোলাল। বলল নিজের মনেই, আহামরি অসুখ রে আমার! আমায় ছেড়ে তুই যাস না।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত পিতৃপুরুষের মাটিতে দাঁড়িয়ে বিভোর হয়ে রইল অসিত। বাবাকে হঠাৎই ওর ভীষণ ভালো লাগছিল।



আজ শেষ দিন

ডিজিটাল ক্যালেন্ডারের দিকে চোখ চলে গেল। ৩১ ডিসেম্বর, ২০৯১। আজ শেষ দিন। আজই আমার শেষ দিন। আজ রাত ঠিক বারোটায়, কাঁটায়-কাঁটায় বারোটায়, আমার বুকের ভেতরে লোডশেডিং হয়ে যাবে। আর আলো জ্বলবে না।

আমি চলে যাব। তবে সুমি আর মিতা থেকে যাবে। ওদের হাতে এখনও সময় আছে। বাঁচার সময়।

চায়ের কাপ হাতে সুমি ঘরে এল। আমার হাতে কাপ তুলে দিল রোজকারের মতো। আমি কাপটা নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়ালাম। স্বাভাবিক থাকার জন্যে চেষ্টা করলাম প্রাণপণে। কিন্তু তবুও হাত কেঁপে গেল। কাপ আর প্লেটে ছোট-ছোট কয়েকটা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল।

সুমি জিগ্যেস করল, 'চায়ে চিনি ঠিক আছে?'

আমি ঘাড় নাড়লাম ঃ 'হ্যাঁ, ঠিক আছে।' চিনির সামান্য এদিক-ওদিক হলেও আমার কোনও অসুবিধে হয় না। সুমি এটা বরাবরই জানে, তবু এই অবান্তর প্রশ্নটা করল আজ।

সুমিকে দেখলাম ভালো করে। সিঁথির সিঁদুর আজ যেন বেশি স্পষ্ট। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই কি সিঁদুর লাগিয়েছে নাকি? কোনওদিন তো লাগায় না! ওর মুখটা খুব খুঁটিয়ে দেখতে-দেখতে মনে হচ্ছিল, ওর বয়েস বোধহয় আমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে

বাড়েনি। দেখে মনেই হয় না, বাহান্ন পেরিয়ে তিপ্পান্নয় পা দিয়েছে। আমার সঙ্গে ওর প্রায় আট বছরের তফাত। বিয়ের সময়ে ওর ছিল উনিশ, আর আমার সাতাশ। তখন ও বয়েসের ফারাক নিয়ে ঠাট্টা করত প্রায়ই। বলত, তুমি আমার অনেক আগে বুড়ো হয়ে যাবে। কথাটা মিথ্যে নয়।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। সকাল প্রায় আটটা। তবুও রোদের তেজ তেমন বাড়েনি। বাতাসে ঠান্ডা ছুঁচ। গত ক'দিন ধরেই শীতটা জাঁকিয়ে বসেছে কলকাতায়। আমার চাদরে, গায়ে, হাতে রোদের আলতো রং এসে লেগেছে। সুমির কপালের বাঁ-পাশে, আটপৌরে ছাপা শাড়িতেও। ও মুখ নামিয়ে বারান্দার লাল সিমেন্ট দেখছে।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'কী হল, কী ভাবছ?'

ও কেঁদে ফেলল। মুখ নামানো থাকলেও কান্নার দু-একটা টুকরো শব্দ শোনা গেল।

অন্যসময় হলে বলতাম, 'কী হচ্ছে, সুমি—চোখ মোছো। ছেলেমানুষি কোরো না—' কিন্তু আজ সে-কথা বলতে পারলাম না। শুধু বললাম, 'কেঁদে লাভ কী!'

সত্যিই কেঁদে কোনও লাভ নেই। এখন প্রতিটি মানুষের জন্মের সময় যেমন মা-বাবার হাতে বার্থ সার্টিফিকেট ধরিয়ে দেওয়া হয়, তেমনই দেওয়া হয় একটা লাইফ সার্টিফিকেট। দুটো সার্টিফিকেটই মাপে ছোট। তাসের মতো দেখতে দুটো ম্যাগনেটিক কার্ড। প্রথম কার্ডে রয়েছে সিটিজেন কোড নম্বর, বাবার ও মায়ের সিটিজেন কোড নম্বর, জন্ম-সময়, তারিখ আর নার্সিংহোমের নাম ও সিরিয়াল নম্বর। দ্বিতীয় কার্ডটা অনেক সংক্ষিপ্ত। তাতে নবজাত শিশুর নাম, সিটিজেন কোড নম্বর আর—আর, তার মৃত্যুর তারিখ লেখা থাকে। হ্যাঁ, মৃত্যুর তারিখ! জন্মসালের সঙ্গে ষাটবছর যোগ করলে যে-সাল পাওয়া যায়, তার শেষ দিনই মৃত্যুর দিন। যেমন, আমার জন্মতারিখ ২২ অক্টোবর, ২০৩১। তাই আজই আমার মৃত্যুর দিন।

পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়তে-বাড়তে ভারসাম্যের কাঁটা চলে গিয়েছিল শেষ সীমায়। তাই ২০১০ সালে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পৃথিবীর সমস্ত দেশ বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। তাঁরা বলেন, প্রতিটি মানুষের আয়ু কখনওই গড়ে ষাট বছরের বেশি হবে না। তাঁদের মতে, একটি জীবনের পক্ষে ষাট বছর যথেষ্ট। আর এই নিয়মের জন্যে সুবিধেও হবে অনেক। প্রত্যেকেই, তার মৃত্যুর দিন জানা থাকায়, পরিকল্পনামাফিক সমস্ত কাজ সেরে রাখতে পারবে। চলে যাওয়ার সময় কোনও কিছুই আর অগোছালো থাকবে না। বিষয়-সম্পত্তির হাতবদলের ব্যাপারে কোনওরকম জটিলতা আর থাকবে না। ফলে যন্ত্রসভ্যতার এই নিয়মের দুনিয়ায় সবকিছুই চলবে নিয়মমাফিক।

আমার হাতের মুঠোয় লাইফ সার্টিফিকেটটা ধরা ছিল। সারাজীবন এই ম্যাগনেটিক কার্ডটা আমার কত কাজে লেগেছে! ইলেকট্রনিক স্ক্যানারের নীচে ধরলেই

কম্পিউটারের প্রিন্টারে এর যাবতীয় তথ্য ছাপা হয়ে যায়। স্কুল, কলেজ, চাকরি, বিদেশ যাওয়া—প্রায় সবকাজেই প্রথমে দরকার লাইফ সার্টিফিকেট।

বুকের বাঁ-দিকটায় কি একটু চিনচিনে ব্যথা শুরু হয়েছে? নাকি আমার মনের ভুল?

জন্মের পরই একটা ছোট্ট অপারেশান করে প্রতিটি শিশুর বুকে বসিয়ে দেওয়া হয় ইলেকট্রনিক 'হার্ট স্টপার', সঙ্গে একটা খুদে ডিজিটাল ঘড়ি। ওই ঘড়িতে নির্দিষ্ট সময় সেট করে দেওয়া থাকে। অনেকটা টাইম-বোমার মতো। ঠিক সময়ে পৌঁছলেই হার্ট স্টপার তার কাজ করে। সে থামিয়ে দেয় হৃৎপিণ্ডকে। আজ পর্যন্ত কখনও শোনা যায়নি, কোনও হার্ট স্টপার ঠিক সময়ে তার কাজ করতে পারেনি।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে সূর্যটাকে দেখছিলাম। কত কাল ধরে জ্বলছে আকাশে। কোনও হার্ট স্টপার ওকে নেভাতে পারেনি। আজ ওটাকে কী সুন্দরই না লাগছে!

রাস্তার ওপাশে একটা বাড়ির ছাদে কয়েকটা কাক বসে আছে। ওরা বুদ্ধিমান নয়, তাই কত স্বাধীন। আকাশে উড়ছে পায়রা আর চিল। শেষ দিন নিয়ে ওদেরও কোনও দুশ্চিন্তা নেই।

সুমিকে জিগ্যেস করলাম, 'মিতা কোথায়? ওঠেনি এখনও?'

ও কাঁদতে-কাঁদতেই বলল, 'না—।'

মিতা আমার মেয়ে। আমাদের মেয়ে। আমিই ওর নাম রেখেছিলাম মিতা। সুমিতার শরীর থেকেই ওর সৃষ্টি, তাই সুমিতার নামের মধ্যেই ওর নাম লুকিয়ে থাক। কিন্তু এসব কে ভাবে! আমাদের সরকারের কাছে আমরা শুধুই তিনটে কোড নম্বর।

প্রায় আটবছর হল মিতার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু আমার কাছে ও এখনও সেই ছোট্টটি। ছোটবেলা থেকেই ঘুম থেকে ওঠে বেলা করে। খুব বকবক করে। পড়াশুনোয় ঝোঁক ছিল কম। ছোটবয়েস থেকে ওর চোখে মাইনাস পাওয়ারের চশমা। কথা বলত পাকা-পাকা। আমাকে বন্ধুর মতো দেখত। কত যে উপহার দিত আমাকে! মনে পড়ছে, ও যখন ক্লাস টু-তে পড়ত তখন স্কুল থেকেই হয়তো ছোট্ট একটুকরো চক নিয়ে এসেছিল। একটা চিঠি লিখে সেই চকটা চিঠিতে মুড়ে রেখে দিয়েছিল আমার টেবিলে। সেই চিঠিটা আমি আজও রেখে দিয়েছি। আর চিঠির কথাগুলো এখনও স্পষ্ট মনে আছে :

'বাবা, এই চকটা তোমাকে দিলাম। তোমাকে নিতেই হবে। আমার এই ছোট্ট কথাটা রেখ কিনতু। ইতি তোমার মিতা। + ক্রশ।'

শেষের যোগ চিহ্নটা এঁকে ও 'গড ক্রস' বোঝাতে চেয়েছে। যাতে আমি ওর কথা অবশ্যই রাখি। চকটা নিয়েছিলাম আমি। শিশুর কাছ থেকে পাওয়া উপহার

সবসময়েই পবিত্র। কিন্তু আজ?

আজকের দিনটার জন্যে সুমিই খবর দিয়ে মিতাকে দু-দিনের জন্যে ডেকে এনেছে। যাতে আমি চলে গেলে মা ও মেয়ে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরতে পারে। মিতা জানে না, আজ আমার শেষ দিন। কারণ, আমার জন্মসালটা ও সঠিকভাবে জানে না। ওর মায়েরটাও না। আমরাই কখনও জানাইনি।

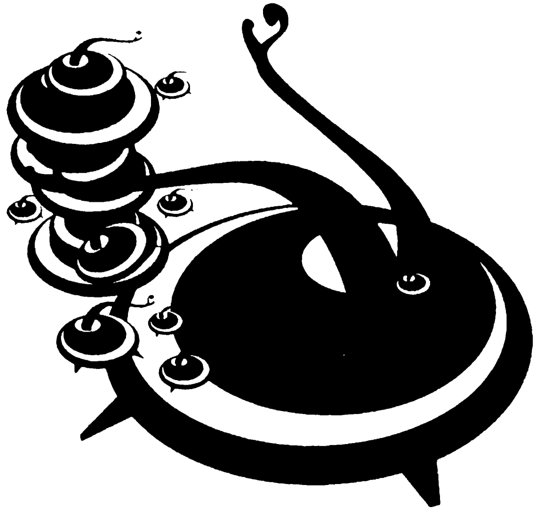
প্রথম-প্রথম বছরের শেষদিনের এই চলে যাওয়া নিয়ে দেশে খুব হইচই হয়েছিল। আজকাল আর হয় না। সবই সয়ে গেছে। প্রতিবছরের শেষ দিনে রাত ঠিক বারোটায়, লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি হার্ট স্টপার নিখুঁতভাবে কাজ করে। আর পরদিনই জনসংখ্যার উর্ধ্বগামী রেখাচিত্রটা ঝপ করে মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়। এর ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় থাকে। পৃথিবী বাসযোগ্য থাকে, সুখী থাকে।

আমি জানি, আজ সারাটা দিন সুমি আমার যত্ন নেবে। বিয়ের প্রথম রাতের মধুর নজরে মুগ্ধ হয়ে দেখবে আমাকে। সুযোগ পেলে এই বুড়োটাকে এক-আধবার আদরও হয়তো করবে। তারপর...রাত ঠিক বারোটায়...ওর হাত ধরে, মিতার হাত ধরে আমি চলে যাব। বুকের ভেতরে আমার হৃৎপিণ্ড শেষবারের মতো বেজে উঠবে।

আর একইসঙ্গে শুরু হয়ে যাবে উৎসব। নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর উৎসব। অথবা আমার মতো লক্ষ-লক্ষ 'অকেজো' বৃদ্ধকে বিদায় জানানোর উৎসব। তখন মিতার ছোটবেলার চিঠিতে লিখে দেওয়া যোগ চিহ্নটা পলকে বিয়োগ চিহ্ন হয়ে যাবে। কাক-চিল, এই মুহূর্তে পিঠে এসে পড়া রোদ, সুমির আটপৌরে ছাপা শাড়ি, কিংবা মিতার চশমা, কিছুই আমি আর দেখতে পাব না। সব বিয়োগের খাতায় নাম লেখাবে।

সুমি এখনও আমার সামনে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছে। অকারণে। মুখে তেতো স্বাদ টের পেলাম। বিজ্ঞান এত এগিয়ে গেছে, তবু কেন যে ওরা ল্যাক্রিম্যাল গ্ল্যান্ডগুলো আমাদের শরীর থেকে বাদ দিয়ে দেয়নি! তা হলে আর কারণে-অকারণে চোখে জল আসত না। চলে যাওয়ার দিন ছেলেমানুষের মতো সুমির কাছে ধরা পড়ে যেতাম না আমি।

আশ্চর্য! মনে হল আমার চোখের কোণ থেকে দু-ফোঁটা জল বলে উঠল, 'আজ তোমার শেষ দিন। তাই তো আমরা কাঁদছি!'



সময়েরে দিতে ফাঁকি

প্রিয়রূপ আমার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। কপালে তেল-সিঁদুরের তিলক এঁকে দিতে-দিতে বলল, 'সজনী, সাবধানে থেকো।'

আড়চোখে ওর চোখের দিকে তাকালাম। জানতাম সেখানে কী দেখব। প্রিয়রূপ কান্না চাপতে চেষ্টা করছে।

ওর পাশ থেকে আমাদের 'অ্যানিম্যাল বিহেভিয়ার' ডিপার্টমেন্টের হেড গন্টিপ্রসাদ চন্দ্রশেখরন প্রিয়রূপের কাঁধে হাত রেখে আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'ডোন্ট উয়ারি, সজনী। কোনও ভয় নেই। এটা এমন কোনও মারাত্মক এক্সপেরিমেন্ট নয়। তোমার আগেও অনেকে এরকম এক্সপেরিমেন্টের সাবজেক্ট হয়েছে। তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ তো থাকছেই! একটা বোতাম টিপলেই ফটাফট আমরা গিয়ে হাজির হয়ে যাব। নো প্রবলেম।'

এটা এমন কোনও মারাত্মক এক্সপেরিমেন্ট নয়। শুধু একটা সময়হীন চেম্বারে আমাকে পঁচিশ-তিরিশদিন থাকতে হবে। একা!

সময়হীন মানে, সেই চেম্বারে কোনওভাবেই সময় বোঝা যাবে না। ঘড়ি, খবরের কাগজ, রেডিয়ো, টিভি—সময় বা দিনের হিসেব পাওয়া যায় এমন কোনও কিছুই নেই সেই চেম্বারে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই সময়হীন চেম্বারের নাম 'ফ্যাসিলিটি'। ভারত ছাড়া আমেরিকা, ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড এবং জাপানে এরকম

ফ্যাসিলিটি রয়েছে।

ফ্যাসিলিটি মানে পঁচিশ-বাই-পঁচিশ একটা ঘর। তাতে কোনও জানলা বা ঘুলঘুলি নেই। মানে, দিন-রাত বোঝার কোনও উপায় নেই। সবসময় ফ্লুওরেসেন্ট বাতি জ্বলছে। আমি ইচ্ছেমতো সেগুলো অন-অফ করতে পারব।

ঘরের দেওয়ালগুলো ফাঁপা—মাঝে বালি দিয়ে ঠাসা, যাতে বাইরের এককণা শব্দও ঘরে না ঢুকতে পারে। আর ঘরের উষ্ণতা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত—সবসময় পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে বাঁধা।

বাতাস চলাচলের জন্যে ফ্যাসিলিটিতে ঠান্ডা বাতাসের পথ করা আছে। ফলে শ্বাসকষ্টের কোনও প্রশ্ন নেই।

এ ছাড়া আছে ঘরের লাগোয়া রান্নাঘর আর বাথরুম। রান্নাঘরে একা কোনও মানুষের রান্নার টুকিটাকি সরঞ্জাম আর রসদ রয়েছে।

ঘরে টেবিল-চেয়ার আছে। আছে রেফ্রিজারেটর, ভিডিয়ো ক্যাসেট প্লেয়ার, টেপরেকর্ডার। আর হালকা ব্যায়ামের জন্যে রয়েছে একটা আরগোমিটার।

বাইরের জগতের সঙ্গে আমার যা কিছু যোগাযোগ হবে তা সবই হাতে লেখা চিঠির মাধ্যমে। আমার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্যে ফ্যাসিলিটির বাইরে চব্বিশ ঘণ্টাই কেউ-না-কেউ হাজির থাকবে। আমার যে-কোনও দরকারে ওরা সাততাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেবে।

দু-বছর আগের একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল। সেটা ছিল সেপ্টেম্বর মাস। একইরকম এক্সপেরিমেন্টের সাবজেক্ট হয়েছিল আমাদের সহকর্মী এক রিসার্চ স্কলার—গোপাল মারিমুথু। রাত তিনটের সময় ইড্‌লি খেতে চেয়েছিল। তখন সবার সে কী অবস্থা! গোপালকে কিছুতেই বলা সম্ভব নয় যে, এখন রাত তিনটে—ইড্‌লি পাওয়া যাবে না। কারণ তা হলেই ও সময় আঁচ করে ফেলবে, আর এতদিন ধরে কষ্ট করে চালানো এক্সপেরিমেন্ট গোল্লায় যাবে। তাই মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালিয়ে ইড্‌লি জোগাড় করে গোপালকে দেওয়া হয়েছিল।

এই এক্সপেরিমেন্টের সাবজেক্টের খামখেয়ালিপনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা খুব জটিল ব্যাপার। শুনেছি এই সময়ে সাবজেক্টের মনের অবস্থা পালটে যায়, এলোমেলো হয়ে যায়। কারও-কারও নার্ভাস ব্রেকডাউন পর্যন্ত হয়েছে। তবে সাবজেক্টের যে-কোনও ধরনের বিপর্যয়ের ইশারা পাওয়ামাত্রই ফ্যাসিলিটি থেকে তাকে বের করে নেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। ইশারা করার জন্যে ফ্যাসিলিটির ভেতরে নানারকম বোতাম আছে।

এই ডিপার্টমেন্টে যখন প্রথম এসেছিলাম তখন থেকেই ক্রোনোবায়োলজি—মানে, কালজীববিজ্ঞান—আমাকে ভীষণ টেনেছিল। আর টেনেছিল এই রিসার্চ গ্রুপের ডক্টর প্রিয়রূপ সিন্‌হারায়। প্রিয়রূপ প্রফেসর চন্দ্রশেখরনের কাছে ক্রোনোবায়োলজিতেই পিএইচ. ডি. করেছে। এখন ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। আমাদের রিসার্চ

গ্রুপের সিনিয়ার রিসার্চার।

একা থাকার এই পরীক্ষায় আমার আগ্রহ থাকলেও কখনও এই পরীক্ষায় সাবজেক্ট হওয়ার সাধ জাগেনি। কারণ, একা থাকতে আমার ভালো লাগে না।

প্রিয়রূপ সেটা জানে। আরও জানে, কেন আচমকা জেদ করে এই এক্সপেরিমেন্টের সাবজেক্ট হওয়ার জন্যে আমি প্রফেসর চন্দ্রশেখরনের কাছে আবদার করেছি। আমার আর দোকা থাকার সাধ নেই। অন্তত কিছুদিন আমি আমার ইচ্ছেমতো একা থাকতে চাই।

বলতে লজ্জা নেই, এই দু-বছর গবেষণা করতে-করতে কখন যেন আমি প্রিয়রূপকে নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করেছিলাম। যখন ভালোবাসার ব্যাপারটা টের পেলাম, তখন ও আমার ভেতরে ঢুকে পড়েছে। কিশোরী বয়েসের মতো ওকে একদিন না দেখলেই মনটা কেমন যেন আনচান করে ওঠে। গবেষণার ফাঁকে-ফাঁকে ওর ঠাট্টা-ইয়ারকি না শুনতে পেলে দিনটা বোধহয় অপূর্ণ থেকে যায়। ও যখন বলে, 'সজনী, তোমার নামটা ফ্যানট্যাস্টিক—কিন্তু যখনই মনে পড়ে সজনী থেকে সজনে ডাঁটা ব্যাপারটা এসেছে—তারপর সেখান থেকে ডাঁটাচচ্চড়ি, তখনই কেমন লাগে।' কিংবা ঠোঁট উলটে, চোখ কপালে তুলে, কপট হতাশায় বলে, 'কী করি সজনী, আসে না প্রীতম—', তখন বেশ মজা পাই। প্রিয়রূপ আবার ব্যাখ্যা করে বলে দেয়, 'প্রীতম' মানে এখানে হল রিসার্চের রেজাল্ট। এই কঠিন গবেষণায়, অত সহজে কখনও রেজাল্ট আসে না।

তো এইভাবেই সব চলছিল। আমি বেশ বুঝতাম, আমার এই ছত্রিশ বছর বয়েসে যা হওয়ার কথা নয় তাই হচ্ছে। জরুরি কাজে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছি, রাতে বেপরোয়া স্বপ্ন দেখছি, পাশবালিশ আঁকড়ে বিভোর হয়ে যাচ্ছি, এমনকী চেষ্টা করলে অমাবস্যাতেও বোধহয় চাঁদ দেখতে পাই, আর ডুমুর গাছে ফুল ফোটাতে পারি।

আমার ভেতরের হ্যাংলামির সঙ্গে বেশ ক'দিন ধরে দাঁত-নখ লড়াই চালালাম। তাতে লাভ কিছু হল না—উলটে প্রিয়রূপের সঙ্গে খানিকটা গায়ে-পড়া হয়েই দু-তিনটে ফিল্ম দেখে ফেললাম। কয়েক মাস আগেও বাড়িতে বসে কেব্‌ল টিভিতে যেসব প্রেমের দৃশ্য, গান-টান, বা ফুল ছোড়াছুড়ি দেখে হাসি পেত, এখন সেগুলোকে আর বোকা-বোকা বলে মনে হয় না।

অবশেষে একদিন বাথরুমে আয়নার সামনে লজ্জাহীনভাবে দাঁড়িয়ে আমার ছায়ার দিকে অপলকে তাকিয়ে স্বীকার করলাম, এতদিন যা হয়নি আজ তাই হয়েছে ঃ আমি প্রেমে পড়েছি। এত গভীরে পতন হয়েছে যে, ওঠার আর উপায় নেই।

প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে নিজের ওপরে ঘেন্না ধরে গেল আমার। ধন্য, সজনী! এই বয়েসে এই চেহারায় প্রেমের কোনও মানে হয়! বহু ব্যবহারে পুরোনো হয়ে যাওয়া রাবার স্ট্যাম্প যেমন কাগজের ওপরে ছাড়া-ছাড়া আবছা ছাপ ফ্যালে,

আমার শরীরে যৌবনের দশা যেন তাই। এখানে-ওখানে যৎকিঞ্চিৎ ছাপ রয়ে গেছে। কিন্তু প্রেজেন্ট টেনস্ দেখে পাস্ট টেন্সের রমরমা ব্যাপারটা বেশ টের পাওয়া যায়। সেটাই আমার অহঙ্কারের আগুনে বাতাসের ঝাপটা দিল।

বাবা চলে গেছেন কোন ছোটবেলায়। ভাই-বোন কেউ নেই। মা-কে নিয়ে এতগুলো বছর কাটিয়েছি। অভাব-অনটন আর হাড়ভাঙা খাটুনি। নিজের পড়াশোনা, একরাশ টিউশানি, আর সাংঘাতিক জেদ—এই নিয়ে বছরের-পর-বছর গড়িয়ে গেছে। মা প্রাইভেট স্কুলে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলা পড়াতেন। যে মাইনের ভাউচার সই করতেন, প্রিন্সিপাল টাকা দিতেন তার অর্ধেক। বলতেন, বাকি টাকাটা নাকি স্কুলের ডেভেলাপমেন্টের কাজে খরচ হবে। কে জানে, কার ডেভেলাপমেন্টে টাকাগুলো খরচ হত!

এইভাবেই দিন গড়িয়েছে, জীবন গড়িয়েছে, যৌবন গড়িয়েছে। যখন নাম-না-জানা অসংখ্য ফুল ফোটার কথা ছিল তখন ফোটেনি। হয়তো বা ফুটেছে, আমিই টের পাইনি—আমার ধরা-ছোঁওয়ার আড়ালে থেকে গেছে। তারপর যখন ধীরে-ধীরে নিরাপদ বয়েসের বেশ কাছাকাছি চলে এসেছি তখন এই অপরূপ সর্বনাশ। নাকি প্রিয়রূপ সর্বনাশ!

সেই সর্বনাশে প্রিয়রূপও সাড়া দিয়েছিল। রিসার্চে যেমন ওর সঙ্গে জড়িয়ে ছিলাম, তার বাইরেও ব্যাপারটা একইরকম হয়ে গেল। একসঙ্গে আমরা অনেকটা সময় কাটাতে লাগলাম। রেস্তোরাঁয় চা-কফি-চপ-কাটলেট চলতে লাগল। টেবিলকে মাঝে রেখে অসংখ্য কথা এপার-ওপার হল। তারপর যা হয়!

একসঙ্গে আমরা সিনেমা দেখতে শুরু করলাম। সিনেমা কতটা ঠিকঠাক দেখেছি জানি না, তবে পাশাপাশি বসে অনেক কথা বলেছি। আর, অবশেষে, একে অপরকে ছুঁয়েছি।

যে-আমি সারাটা জীবন অচ্ছুৎ হয়ে কাটালাম সেই আমি একটু ছোঁয়াছুঁয়ির জন্যে পাগল হয়ে গেলাম। সবসময় আড়াল খুঁজতে লাগলাম।

বেশ কিছুদিন ধরেই বুঝতে পারছিলাম প্রিয়রূপ আমাকে কী একটা যেন বলতে চাইছে কিন্তু বলতে পারছে না। আমি ওকে অনেকবার জিগ্যেস করলাম, 'কী হয়েছে? কিছু বলবে?'

ও চোখ নামিয়ে আলতো গলায় বলল, 'না—কিছু না।'

'কী ব্যাপার! বলো না কী হয়েছে!'

'ন্-না...পরে কোনও সময় বলব।'

শেষ পর্যন্ত আমি হার মেনে গেলাম।

একদিন চন্দ্রশেখরন আমাদের রিসার্চ গ্রুপকে নিয়ে মিটিং-এ বসলেন। হিউম্যান সারকাডিয়ান রিদ্‌ম্স নিয়ে আলোচনা চলছিল। হঠাৎই হেড বলে বসলেন, 'নেক্সট আইসোলেশান এক্সপেরিমেন্টে সজনীকে সাবজেক্ট করলে কেমন হয়! কারণ,

এ পর্যন্ত আমরা কোনও মেয়েকে নিয়ে পরীক্ষা চালাতে পারিনি। সজনী আমাদের গ্রুপের একমাত্র লেডি। যদি ও রাজি থাকে...' আমার দিকে তাকালেন চন্দ্রশেখরন, হেসে জিগ্যেস করলেন, 'কী, সজনী, ফ্যাসিলিটিতে নিরিবিলি একমাস থাকবে না কি?'

আমি সাততাড়াতাড়ি বলেছি, 'না, না, স্যার—আমার একা থাকতে ভীষণ ভয় করে। প্লিজ, আমাকে এ-রিকোয়েস্ট করবেন না।'

তখন মারিমুথু বলেছে, 'তুমি রাজি হলে ভালো হত। ইন্ডিয়াতে এখনও কোনও লেডিকে সাবজেক্ট করে এই এক্সপেরিমেন্ট হয়নি। তুমি তা হলে পাইয়োনিয়ার হতে। হিউম্যান সারকাডিয়ান রিদ্‌ম্‌স-এর রিসার্চে চিরকালের জন্যে তোমার নাম লেখা হয়ে যেত।'

আমি জানি, মারিমুথু একটুও মিথ্যে বলছে না। আমি রাজি হলে সত্যিই আমার নাম ইতিহাসে লেখা হয়ে যাবে। কিন্তু আমার যে একা থাকতে ভয় করে!

আমি মাথা নেড়ে 'না' বললাম।

তখন প্রিয়রূপ বলল, 'সজনী, তুমি এক্ষুনি "না" বোলো না। স্যার, যেটা বলছেন সেটা একটু ভেবে দ্যাখো। দরকার হয় দু-চারদিন সময় নাও।'

প্রিয়রূপের দিকে করুণ চোখে তাকালাম আমি। ওর কথা যে আমি ফেলতে পারি না তা ও ভালো করেই জানে।

চন্দ্রশেখরন হাতের সিগারেটে টান দিয়ে নরম গলায় বললেন, 'ও. কে. লেট মি সাজেস্ট ওয়ান থিং। সজনী, তুমি মাত্র একটা দিন ফ্যাসিলিটিতে কাটিয়ে একটা ট্রায়াল দাও। জাস্ট টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স। দ্যাখো, কেমন লাগে। ট্রায়ালের পর যদি তোমার মনে হয় তুমি পারবে না, তা হলে আমি তোমাকে আর রিকোয়েস্ট করব না।'

এরপর আর 'না' বলা যায়!

প্রিয়রূপ আমার চোখে তাকিয়েছিল। চোখের ভাষায় ভরসা দিয়েছিল। আমি ওকে দেখছিলাম। আমার মনে একা থাকার ভয়টা পলকে কোথায় যেন উবে গেল। কিন্তু তখনও জানি না, এক সর্বনাশ থেকে আমি আর-এক সর্বনাশে পা দিতে চলেছি।

টাইমলেস ফ্যাসিলিটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথিকৃৎ হলেন জার্মানির দুই বিজ্ঞানী অ্যাশ্‌কফ ও ওয়েভার। ওঁদের পরীক্ষাতেই প্রথম জানা গিয়েছিল যে, সময়ের হিসেব জানা না থাকলেও মানুষের কোনও-কোনও ব্যাপারের ছন্দ-তাল-লয় একই থাকে। এই ছন্দ ঠিক রাখে মানুষের শরীরের ভেতরকার এক 'রহস্যময় ঘড়ি'—যাকে জৈবঘড়ি বলা যায়। যেমন, রোজ যে-সময়ে আমরা ঘুম থেকে উঠি তা মোটামুটি একই। অর্থাৎ, এই ঘটনার পর্যায়কাল মোটামুটিভাবে চব্বিশ ঘণ্টা। এর সঙ্গে চব্বিশঘণ্টার দিন-রাত বা আলো-অন্ধকার পর্যায়কালের বেশ মিল আছে।

সময়হীন চেম্বারে বাস করলে এই মিলটা আর থাকে না—পর্যায়কাল ক্রমশই চব্বিশ ঘণ্টার চেয়ে বাড়তে থাকে। এই অবস্থাকে বলা হয় 'ফ্রি রানিং'। তখন ঘুমোনো আর জেগে থাকার কালচক্র, মানে, স্লিপ-ওয়েক সাইক্‌ল, এমন হয়ে যায় যে, পর্যায়কাল বেশি হতে-হতে পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টাও ছাড়িয়ে যেতে পারে। অ্যাশকফ আর ওয়েভার এও প্রমাণ করেছেন যে, রোজকার পারিপার্শ্বিক বা সামাজিক ঘটনাও আমাদের এমন সব সংকেত বা ইশারা জোগায় যার জন্যে চব্বিশঘণ্টার পর্যায়কাল ঠিকঠাক থাকে।

দেখে-শুনে এক্সপেরিমেন্টটা আমার কাছে বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছিল। কিন্তু ওই যে বললাম—একা থাকার ভয়। যার জন্যে আমি এখনও মা-কে কাছ-ছাড়া করিনি। প্রিয়রূপ সেটা জানে। তাই ঠাট্টাও করে। বলে, 'মাম্মিজ্‌ গার্ল।'

হেড আমাদের রিসার্চ গ্রুপের তিনজনকে বললেন ফ্যাসিলিটির ভেতরটা আমাকে যেন ভালো করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখানো হয়। বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমরা ডিপার্টমেন্টের বিল্ডিং ছেড়ে ক্যাম্পাসের পিচের রাস্তায় পা দিলাম। রাস্তাটা পেরোলেই সবুজ মাঠ। তার এখানে-ওখানে লম্বা-লম্বা গাছ। গাছগুলো পাতায়-পাতায় ঢাকা। সন্ধের মুখে পাতার ফাঁকে পাখিরা খেলা করে, কিচিরমিচির করে।

দূরে-দূরে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের বিল্ডিং চোখে পড়ছে। ছাত্র-ছাত্রীর দল হাসাহাসি করতে-করতে এ-পথ ও-পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আমার বুকের ভেতরে যে ঢেঁকির পাড় পড়ছে সেটা কেউই শুনতে পাচ্ছে না।

'ওয়ান-রুম ফ্ল্যাট'টা ওরা আমাকে বেশ যত্ন করে দেখাল। সত্যিই 'ফ্ল্যাট'টা পছন্দ হওয়ার মতো। কিন্তু একা এখানে থাকা যায়!

ঘর দেখতে-দেখতে প্রিয়রূপ কীসব রসিকতাও করছিল, কিন্তু সেসব ঠিকমতো আমার কানে ঢুকছিল না।

ঘরের একটা দেওয়ালে কুড়িটা পুশ বাটন্‌ লাগানো একটা প্যানেল ছিল। প্রিয়রূপ ভালো করে বুঝিয়ে দিল এর চারনম্বর বোতামটা টিপে কী করে বাইরের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়।

চারনম্বর বোতামটা টিপলেই বাইরে একটা বেল বেজে ওঠে আর ঘরে ডানদিকের দেওয়ালের গায়ে লাগানো একটা ছোট্ট দরজা খুলে যায়। দরজার পেছনেই পায়রার খোপের মতো একটা খুপরি। সেখানে আমি যদি একটা চিরকুট রেখে দিই তা হলে বাইরের পাহারাদার মানুষটি চিরকুটটা পেয়ে যাবে। তারপর আমার অনুরোধ মতো কাজ করবে।

প্রিয়রূপ বলল, 'কোনও ভয় নেই। ফ্যাসিলিটির বাইরে চব্বিশঘণ্টা লোক থাকবে। আমরা প্রত্যেকে পালা করে ডিউটি দেব—মাথাপিছু চারঘণ্টা করে। তোমার সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা যা হবে সবই চিরকুটের মাধ্যমে। যদি তুমি চব্বিশঘণ্টা কমপ্লিট হওয়ার আগেই বেরিয়ে আসতে চাও, তা হলে স্রেফ একটা চিরকুট ওই

পিজিয়ন হোলে রেখে দেবে। কোনও উত্তর দেওয়ার থাকলে সেটা আর-একটা চিরকুটে লিখে আমরা ওই একই খোপে রেখে দেব—তুমি পেয়ে যাবে। ব্যস—আর কোনও প্রশ্ন আছে?'

আমি এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লাম—না, নেই।

শেষ পর্যন্ত দিনক্ষণ দেখে এক শনিবার রাত আটটার সময় ফ্যাসিলিটিতে ঢুকে পড়লাম আমি।

এক কামরার ওই সুদৃশ্য ফ্ল্যাটে সবই আছে, শুধু সময় বলে কিছু নেই। আর বাইরের এককণা শব্দও ভেতরে আসতে পারছে না।

প্রথম অনেকটা সময় ফ্ল্যাটের এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করেই কেটে গেল। ফ্ল্যাটটা যিনি সাজিয়েছেন তাঁকে তারিফ করতেই হয়। ঘরের সর্বত্র রুচির ছাপ। সমস্ত আসবাবপত্রই ঝকঝকে তকতকে ফিটফাট।

হাতঘড়িটা বাইরে রেখে এসেছিলাম। ঘড়ি দেখতে পারছি না বলে প্রথম-প্রথম বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। যখন বুঝলাম সময় আঁচ করার কোনও উপায় নেই, তখন হাল ছেড়ে দিয়ে বিছানায় বসে পড়লাম। বিছানার পাশে একটা ছোট টেবিলে অনেক বই আর ম্যাগাজিন রাখা ছিল—সেগুলো টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করলাম।

কতক্ষণ বইপত্র নিয়ে ছিলাম জানি না, একসময় উঠে পড়ে একটা তাকে রাখা টেপরেকর্ডারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট চালিয়ে দিলাম। 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়...' শুরু হল। আর একইসঙ্গে আমার মন খারাপ হওয়া শুরু হল। বাইরে এখন কে পাহারা দিচ্ছে? প্রিয়রূপ? নাকি অন্য কেউ?

সোজা চলে গেলাম দেওয়ালে লাগানো পুশ বাট্‌ন প্যানেলের কাছে। চার নম্বর বোতাম টিপে দিলাম। উলটোদিকের দেওয়ালে একটা ছোট্ট প্যানেল সরে গেল—একটা খুপরি দেখা গেল। টেবিল থেকে কাগজ পেন নিয়ে আমি খসখস করে ইংরেজিতে লিখলাম ঃ এখন ক'টা বাজে?

চিরকুটটা খুপরিতে রাখার কিছুক্ষণ পর দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। বোধহয় বাইরে থেকে বোতাম টিপে দরজাটা খোলা-বন্ধ করা যায়।

একটু পরে আবার খুপরির দরজা খুলে গেল দেখি ভেতরে নীল রঙের একটা চিরকুট পড়ে আছে। ওরা বাইর থেকে উত্তর পাঠিয়েছে।

কাগজটা নিয়ে পড়ে দেখি তাতে লেখা ঃ 'ম্যাডাম, এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে প্রফেসর চন্দ্রশেখরন আমাদের সবসময় মিথ্যে বলার নির্দেশ দিয়েছেন। এখন রাত বারোটা।'

এ কী রসিকতা! এটা তো সত্যিকারের এক্সপেরিমেন্ট নয়—এটা একটা খেলা! আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেল। চিরকুটটা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলাম। গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তারপর সব আলো নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় চুপচাপ শুয়ে রইলাম।

বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল ঘন্টির শব্দে।

ঘুম ভাঙতেই ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। গুনগুন শব্দ তুলে এয়ার কন্ডিশনার চলছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘামতে শুরু করলাম। অন্ধকার যেন আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। সেইসঙ্গে নিরাপত্তার অভাব ছুঁচের মতো মাথায় বিঁধতে লাগল। এভাবে একা থাকা যায় না।

ঘন্টি আবার বাজল।

বিছানায় উঠে বসলাম। আলো জ্বাললাম। তাকালাম খুপরির দিকে।

খুপরির দরজা খোলা! তার ভেতরে একটা চিরকুট।

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে চিরকুটটা হাতে নিলাম। তাতে সুন্দর হরফে বাংলায় লেখা।

'এখন রাত একটা বাজে। আমি ডিউটিতে এসেছি। কেমন আছ?'

প্রিয়রূপ! ওঃ প্রিয়রূপ!

আমি পাগলের মতো একটা চিরকুট লিখতে বসলাম।

'এখানে একা-একা আমার ভীষণ ভয় করছে। এখন কি সত্যি-সত্যি রাত একটা? বাইরে আর কে-কে আছে?'

চিরকুটে উত্তর এল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই।

'ভয় পাওয়ার কী আছে! আমি তো আছি! এখন সত্যিই রাত একটা। বাইরে আর কেউ নেই। শুধু গাছপালা আর অন্ধকার। এ ছাড়া আকাশে কিছু তারা আছে—আর চাঁদের একটা ভাঙা টুকরো দেখা যাচ্ছে।'

আমাদের কথোপকথন চলতে লাগল।

'ভীষণ একা-একা লাগছে।'

'এটা একা থাকারই এক্সপেরিমেন্ট।'

'না, এটা রিহার্সাল। আমি একা থাকতে পারব না।'

'কোনও উপায় নেই। চন্দ্রশেখরনের অর্ডার।'

'আমার উলটোপালটা সব কথা মনে পড়ছে।'

'কী কথা?'

'তোমার পাশে বসে সিনেমা দেখার কথা। সেইজন্যে একা থাকতে আরও কষ্ট হচ্ছে।'

'আমারও।'

'আমি আর একা থাকতে পারছি না। বাইরে বেরোতে চাই।'

'এত রাতে বাইরে বেরিয়ে তুমি কী করবে, কোথায় যাবে!'

'তা হলে তুমি ভেতরে এসো।'

আমার মুখ দিয়ে ভয়ংকর শব্দগুলো বেরিয়ে গেল। লজ্জা বিসর্জন দেওয়ার পরে যেটুকু বা লজ্জা ছিল, এখন তা-ও গেল। আমি মনে-মনে তলিয়ে গেলাম।

আর একটু পরে সত্যি-সত্যি।

কারণ প্রিয়রূপ কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে ফ্যাসিলিটির ভেতরে চলে এসেছিল।

পরদিন হেডকে বললাম যে, আমার পক্ষে এই আইসোলেশন এক্সপেরিমেন্টে সামিল হওয়া সম্ভব নয়। আমার সেরকম মনের জোর নেই।

গন্টিপ্রসাদ চন্দ্রশেখরন আমার কথা মেনে নিয়েছিলেন। প্রিয়রূপ আড়ালে আমার চোখে তাকিয়েছিল। ওর চোখে কেমন সরল নিষ্পাপ দৃষ্টি দেখেছিলাম। মনেই হচ্ছিল না গতকাল রাতের ব্যাপারটা সত্যি।

ফ্যাসিলিটির ওই ঘটনার পর প্রিয়রূপের মধ্যে কোনওরকম অপরাধবোধের ছায়া দেখিনি। আর আমার অপরাধবোধ হওয়া তো দূরের কথা, বরং মনে হয়েছিল ওই ব্যাপারটা পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাভাবিক আর আকর্ষণীয় ঘটনা।

কিন্তু তার কয়েকদিন পর প্রিয়রূপের কয়েকটা কথা আমার সবকিছু পালটে দিয়েছিল। ভেতরটা আপাদমস্তক ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল।

ওর অনেকদিন ধরে বলতে-না-পারা কথাটা আমাকে বলেছিল প্রিয়রূপ। ও বিবাহিত। দেশের বাড়িতে ওর সংসার আছে।

রেস্তোরাঁয় বসে কথা হচ্ছিল আমাদের। ওর কথাগুলো শোনার পরমুহূর্তেই রেস্তোরাঁটা যেন পোকামাকড়ের চিড়িয়াখানা হয়ে গেল।

আমার উলটোদিকে একটা মাকড়সা বসে আছে। টেবিলের ওপরে একটা খোলস-ওঠা সাদা রঙের আরশোলা চলেফিরে বেড়াচ্ছে। টেবিলের পায়া বেয়ে একটা বাচ্চা অক্টোপাস ধীরে-ধীরে উঠে আসছে। গুবরেপোকা আর তেঁতুলবিছের দল হেঁটে বেড়াচ্ছে রেস্তোরাঁর মেঝেতে।

আমি জানি, নারী-পুরুষের মেলামেশায় বিয়ের কোনও শর্ত থাকে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রিয়রূপের কথাগুলো আমার কানে যেন অ্যাসিড ঢেলে দিল। আমার সেকেলে মধ্যবিত্ত মন হঠাৎই বিত্তহীন শূন্য হয়ে গেল। আমি হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলাম। কী বোকার মতো কাণ্ড!

হাজার সান্ত্বনাতেও আমার অবুঝ মন বাস্তবটাকে মানতে চাইল না, বুঝতে চাইল না। আসলে একটা স্বপ্ন বোধহয় আমি তিলতিল করে গড়ে তুলছিলাম। ভেবেছিলাম ওটা রাতের স্বপ্ন। এখন বুঝতে পারলাম, স্বপ্নটা রাতের নয়—দিনের।

বাড়িতে আমার রুগ্ন মা আমাকে অবুঝের মতো কাঁদতে দেখল। কাক, শালিক, চড়ুই, ও-বাড়ির ছাদের টিভি অ্যান্টেনা—সবাই আমাকে কাঁদতে দেখল। এক নাম-না-জানা কষ্টে যখন বুকের ভেতরটা প্রতিমুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে লাগল, তখন মনে হল আমি বালিকা বা কিশোরী নই—কিন্তু প্রথম ভালোবাসা হারানোর কষ্ট সব বয়েসেই সমান।

প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলে আমি আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম।

এলোমেলো দিবাস্বপ্ন। নানান পুরুষ আসে আমার কাছে। আমার সব কথা শোনে ওরা। আমার সঙ্গে কথা বলে, আমাকে ভালোবাসে, আমাকে আদরও করে।

ওদের নিয়ে আর টেপরেকর্ডারে গান শুনে আমার সময় কাটতে লাগল। আমি ধীরে-ধীরে একা থাকতে শিখলাম। ডিপার্টমেন্টে যাওয়াটাও কিছুদিনের জন্যে অনিয়মিত হয়ে গেল।

প্রিয়রূপ আমাকে বাড়িতে ফোন করেছে অনেকবার। ওর সঙ্গে সহজভাবেই কথা বলার চেষ্টা করেছি। তবে সে-কথাবার্তায় পুরোনো উষ্ণতার অভাব ছিল। ও সেটা টের পেয়ে অনেক কথা বলল, অনেক কিছু বোঝাতে চাইল। আমি ওকে কথার মাঝে থামিয়ে দিইনি। ওর কথা শেষ করতে দিয়েছি। তারপর সহকর্মীর আন্তরিকতা গলায় ঢেলে জানতে চেয়েছি, 'তোমার শরীর কেমন আছে?'

এরপর প্রথম সুযোগেই আমি প্রফেসর চন্দ্রশেখরনের কাছে গিয়ে আর্জি পেশ করলাম ঃ টাইমলেস চেম্বারের এক্সপেরিমেন্টে আমি সাবজেক্ট হতে চাই। হিউম্যান সারকাডিয়ান রিদ্‌ম্‌স-এর রিসার্চে পাইয়োনিয়ার হতে চাই।

চন্দ্রশেখরন স্বাভাবিক কারণেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই রিসার্চ গ্রুপের সবাইকে ডেকে লাখটাকার খবরটা শুনিয়ে হইহই করে তোড়জোড় শুরু করে দিলেন। প্রিয়রূপ তখন অসহায় শূন্য চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।

মায়ের কথা মনে পড়ছিল আমার। এই একমাস মতো সময় আমাকে ছেড়ে থাকতে মায়ের হয়তো কষ্ট হবে। কিন্তু উপায় নেই। এই সময়টা মেজোমাসিকে মায়ের কাছে এসে থাকতে বলেছি। এ ছাড়া রাতদিনের কাজের লোক তো আছেই!

ফ্যাসিলিটির দরজা বন্ধ হওয়ার মুহূর্তে দেখি প্রিয়রূপ জল ভরা করুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে। আমাদের গোপন সম্পর্কটা জানাজানি হয়ে যাবে এই ভয় ওর আর নেই। ও বোধহয় বেপরোয়াভাবে আমাকে আবার ফিরে পেতে চায়। সত্যি কি তাই? নাকি আমার বোঝার ভুল?

ফ্যাসিলিটির দরজা বন্ধ হতেই আমি যেন অদ্ভুত এক শান্তি পেলাম। উপাসনা-গৃহ যেমন চুপচাপ হয় এটাও ঠিক সেইরকম। একটু সময় নিয়ে আমি মনটাকে একজন বিজ্ঞানীর মনে পালটে নিতে চাইলাম। অ্যাশ্‌কফ আর ওয়েভারের কথা ভাবতে শুরু করলাম।

এই পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে ছোটখাটো একটা প্রস্তুতিপর্ব আছে। সেই সময়ে আমাকে টানা কয়েকদিন নিয়ম করে ঘুমোতে যাওয়ার সময় ও ঘুম থেকে জেগে ওঠার সময় নোট করতে হয়। তারপর 'সলিকর্ডার' নামের একটা যন্ত্র দিয়ে আমার শরীরে ভেতরের উষ্ণতা, যাকে বলে 'কোর বডি টেম্পারেচার', প্রতি ছ'মিনিট অন্তর মাপতে হয়। এই উষ্ণতার তথ্য সরাসরি একটি কম্পিউটারের মেমোরিতে

জমা হয়ে যায়।

উষ্ণতা মাপার একটা কারণ আছে। যদিও মানুষকে বলা হয় 'হোমিওথার্ম'—মানে, স্থির উষ্ণতাবিশিষ্ট প্রাণী—তা সত্ত্বেও দেখা গেছে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় মানুষের শরীরের উষ্ণতার দু-ডিগ্রি সেলসিয়াস মতো হেরফের হয়। দিনের মাঝামাঝি সময়ে উষ্ণতা সবচেয়ে বেশি হয়। আর যখন আমরা গভীরভাবে ঘুমিয়ে থাকি তখন উষ্ণতা সবচেয়ে কম হয়। এই উষ্ণতা-চক্রের পর্যায়কাল মোটামুটিভাবে চব্বিশ ঘণ্টা।

সময়হীন পরিবেশে থাকার সময় উষ্ণতা-চক্রের কীরকম পরিবর্তন হয় সেটা ঠিকমতো জানার জন্যে পরীক্ষার আগে, পরীক্ষার সময়, আর পরীক্ষার পরে নিয়ম করে উষ্ণতা মাপা হয়।

ফ্যাসিলিটির মধ্যে ঢোকার পর আমার জীবন থেকে সময় ব্যাপারটা একেবারে মুছে গেল। ঘুমোতে যাওয়ার তাড়া নেই, জেগে ওঠার তাড়া নেই, ইন্সটিটিউটে রওনা হওয়ার জন্যে নিত্য যে স্নান-খাওয়ার হুড়োহুড়ি তা-ও নেই। আমাকে কেউ কোনওরকম কাজের তাড়া দেবে না। কারও আদেশ পালন করতে হবে না আমাকে। কারও মন রেখেও চলতে হবে না। এ আমার একার জীবন। এ শুধু নিজের জন্যে বেঁচে থাকা!

আনমনাভাবে এসব কথা ভাবতে-ভাবতে আমি পুশ বাট্‌ন বসানো প্যানেলের কাছে গেলাম। প্রত্যেকটা বোতামের নীচে তার কাজের ধরন সংক্ষেপে লেখা আছে। যেমন, আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলেই একনম্বর বোতামটা টিপে দিতে হবে। ঘুমোতে যাওয়ার আগে ছ'নম্বর বোতামটা টিপতে হবে। এরকম আরও নানারকম কাজের জন্যে নানান বোতাম। আমি বোতাম টিপলেই বাইরে বসানো 'ইভেন্ট রেকর্ডার' নামের একটা যন্ত্রে সেটা নিয়ম করে রেকর্ড হয়ে যাবে। একইসঙ্গে ফ্যাসিলিটির বাইরে যেসব গবেষক রয়েছেন তাঁরা বুঝতে পারবেন চেম্বারের ভেতরে আমি কী করছি। আমার প্রতিটি কাজের ওপরে তাঁরা বৈজ্ঞানিক নজরদারি করতে পারবেন।

এ ছাড়া আরও একটা কাজ আমাকে করতে হবে। সময় মাপার জন্যে দু-ঘণ্টা পার হয়েছে মনে হলেই প্যানেলের আট নম্বর বোতামটা আমাকে টিপতে হবে। আসল সময়ের সঙ্গে আমার মাপা সময় তুলনা করে বোঝা যাবে টাইমলেস চেম্বারে বসে আমি কতটা ঠিকঠাকভাবে সময় মাপতে পেরেছি।

আমার বাঁ-হাতে লাগানো রয়েছে একটা 'অ্যাক্টিভিটি মনিটর'। এটা দিয়ে আমার সবরকম চলাফেরার তথ্য পাওয়া যাবে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার এই এক ঝকমারি। শরীরের এখানে-ওখানে যন্ত্রপাতি আর সেন্সর লাগানো অবস্থায় আমার চেহারা হয়েছে দেখার মতো।

ফ্যাসিলিটির প্রমাণ মাপের আয়নায় নিজের চেহারা দেখে আমার হাসি পেয়ে গেল। হাসিটা আমি বেশ তৃপ্তি করে উপভোগ করলাম।

এক্সপেরিমেন্টের ব্যাপারে স্রেফ বোতাম টেপা ছাড়া আমার আর খুব বেশি কিছু করার ছিল না। তাই গান-বাজনা শুনে, সিনেমা দেখে, শুয়ে-বসে সময় কাটাতে লাগলাম। আর মাঝে-মাঝে গল্প-উপন্যাস কিংবা ক্রোনোবায়োলজির বইপত্র নিয়ে ডুবে গেলাম। বাকি সময়টা নতুন-নতুন রান্না নিয়ে উদ্ভট সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে লাগলাম। ফ্যাসিলিটির এক্সপেরিমেন্টে যারা সাবজেক্ট হয় তাদের সাধারণত নিজের খাবারদাবার নিজেকেই রান্না করতে বলা হয়। তা না হলে নানারকম ঝামেলা হয়। ওই যে, মারিমুথু রাত তিনটের সময় ইড্‌লি খেতে চেয়েছিল!

আমি নিজস্ব একটা ক্যালেন্ডার তৈরি করে নিয়েছিলাম। তাতে আমার অনুমান অনুযায়ী রোজকার তারিখ, বার, সব লিখে রাখছিলাম। আমার হিসেবমতো চারদিন কেটে যাওয়ার পর আমার মন খারাপ হওয়া শুরু হল। তখন আমি মন ভালো করার রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে লাগলাম।

'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে...।'

'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে...।'

'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে...।'

অনেকক্ষণ ধরে গান শোনার পরেও যখন মন খারাপ ভাবটা পুরোপুরি গেল না তখন আমি মায়ের একটা ক্যাসেট টেপরেকর্ডারে বাজাতে শুরু করলাম।

মা নিয়মিত গীতা পাঠ করেন। তারই খানিকটা অংশ আমি ক্যাসেটে টেপ করে এনেছি। এখানে নির্জনে বসে শোনার জন্যে।

> *'পূর্বে আমি কখনও ছিলাম না এমন নহে, তুমি কখনও ছিলে না তাহা নহে বা এই নৃপতিগণও ছিলেন না—ইহা সত্য নহে। এই দেহধারণের পূর্বে আমরা সকলেই নিত্য আত্মরূপে বিদ্যমান ছিলাম। এই দেহত্যাগের পরেও যে আমরা কেহ থাকিব না, ইহাও নহে। বর্তমানে দেহসত্ত্বেও আমরা নিত্য আত্মস্বরূপে বিদ্যমান আছি এবং দেহান্তে ভবিষ্যতেও নিত্য আত্মরূপে বিরাজমান থাকিব।...'*

কিছুক্ষণ পর টেপরেকর্ডার বন্ধ করে দিলাম।

মন খারাপের এককণা কিন্তু থেকেই গেল। কারণ, প্রিয়রূপের ব্যাপারটা থেকে কিছুতেই আমি মনটাকে পুরোপুরি ফেরাতে পারছিলাম না।

প্রিয়রূপের লেখা অনেক চিঠি আমার কাছে আছে। রাগ, দুঃখ, অভিমানে ওগুলো কখনও আমি নষ্ট করিনি। এমনই আমার হতচ্ছাড়া মন যে, ফ্যাসিলিটিতে আসার সময় ওগুলো আমি সঙ্গে করে নিয়েও এসেছি।

চিঠির প্যাকেটটা নিয়ে আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ঘরের সব আলো নিভিয়ে দিয়ে শুধু মাথার কাছে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিলাম। তারপর চিঠিগুলো বের করে একে-একে পড়তে শুরু করলাম।

প্রেমপত্র প্রেমপত্রই। তাতে কখনও বয়েসের ছাপ পড়ে না। যে লেখে, যাকে লেখে, তাদের বয়েস শুধুই প্রেমে পড়ার বয়েস। তাদের পরিচয় শুধুই প্রেমিক-প্রেমিকা।

চিঠিগুলো পড়তে-পড়তে আমার কান্না পেয়ে গেল। কান্না পাবে জানতামই। তবুও কেন যে দুঃখ পেতে চাইলাম!

টেবিল-ল্যাম্পের আলো আবছাভাবে ঘরের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। কেমন এক অদ্ভুত আলোছায়ায় গোটা ঘরটা ভাসছে। আমার চাপা কান্নার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ কোথাও নেই। আমার বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে শেষ হয়ে যেতে লাগল। আর একইসঙ্গে একা থাকার একটা অলৌকিক ভয় আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

চিঠিগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে আমি বিছানায় আর্তভাবে ছটফট করতে লাগলাম। আমার ভাঙাচোরা কান্না কেমন জন্তুর গোঙানির মতো শোনাচ্ছিল।

ঠিক তখনই ঘরের কোণে আলোছায়া মেখে দাঁড়ানো পুরুষটিকে আমার নজরে পড়ল।

কান্না থামিয়ে চমকে উঠে বসলাম বিছানায়। নজর তীক্ষ্ণ করে পুরুষটিকে দেখতে চেষ্টা করলাম।

লম্বা বেশি নয়। তবে পেশিবহুল সুপুরুষ চেহারা। সেটা গায়ের হালকা নীল জামার আড়ালেও বোঝা যাচ্ছে। নাক টিকোলো। আর চোখের নজর এতটাই তীব্র যে, অন্তর ভেদ করে যায়।

আমি সুইচ টিপে আলো জ্বালতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু হাত তুলে ইশারায় বারণ করল সে। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আলো জ্বেলো না, সজনী। এই হালকা আলোই ঠিক আছে।'

'কে তুমি...মানে, আপনি?'

গালে টোল ফেলে হাসল তরুণ, বলল, 'আপনি নয়, তুমি। আমি কে সেটা একটু আলাপ করলেই বুঝতে পারবে। আমার নাম...ধরে নাও রূপক।'

কথা বলতে-বলতে রূপক এগিয়ে আসতে লাগল আমার বিছানার কাছে। আলতো গলায় বলল, 'তুমি কাঁদছ কেন? কীসের দুঃখ তোমার? আমি তোমার সব দুঃখ ভুলিয়ে দেব।'

রূপক আমাকে অবাক করে দিল।

ফ্যাসিলিটির ভেতরে ও কেমন করে এল? ও নিশ্চয়ই আগে থেকেই এর ভেতরে লুকিয়ে ছিল। নাকি পরে কায়দা করে এর ভেতরে ঢুকে পড়েছে? কিন্তু বাইরে তো গোপাল-প্রিয়রূপের দল অতন্দ্র পাহারায় রয়েছে!

আমি অবাক হয়ে তখনও রূপকের রহস্য ভাবছি, রূপক কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। ওর ছোঁয়ায় কোনওরকম সঙ্কোচ, দ্বিধা বা আড়ষ্টতা নেই। আর

আমিও কেন যেন বাধা দিতে পারলাম না।

তারপর রূপক আমাকে চুমু খেল। বিড়বিড় করে আমার নাম বলতে লাগল বারবার, আর নামপিছু যেখানে-সেখানে একটা করে চুমু।

আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও রোমাঞ্চিত হতে লাগলাম। আমার শরীরের যৌবনের তলানিটুকু আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠল। যেন নির্বিষ সাপ অনেকদিন পর ছোবল মারা বিষ ফিরে পেয়েছে।

আনন্দে উত্তেজনায় আমি ভেসে গেলাম। ভুলে গেলাম প্রিয়রূপের দুঃখ, যে-বিছানা একটু আগেই কান্নায় ভেসে যাচ্ছিল এখন সেখানে আনন্দের বন্যা। সময়হীন ফ্যাসিলিটির ভেতরে যে এরকম সুযোগ-সুবিধে আছে সে-কথা কে জানত!

রূপককে নিয়ে আমার গোপন সংসার চলতে লাগল।

আমার যখন রান্নাবান্না বা কাপড়কাচার কাজ থাকে তখন রূপক আসে না। যখন আমি এক্সপেরিমেন্টের নানান ডেটা নিয়ে ব্যস্ত থাকি তখনও ও আসে না। যখন আমি অলসভাবে অবসর সময় কাটাই তখনই ও আসে—প্রবলভাবে আসে।

আমার ক্যালেন্ডারের হিসেবমতো ঠিক পাঁচদিন পর রূপক চলে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল, 'সজনী, এবার ফেরার পালা। আমি যাই?'

আমার কান্না পেয়ে গেল। ওকে আঁকড়ে ধরে বললাম, 'আমাকে একা ছেড়ে যেয়ো না। একা থাকতে আমার ভীষণ ভয় করে।'

ও বিষণ্ণ গলায় বলল, 'কিছু করার নেই—আমাকে যেতেই হবে।...তবে আবার আমি আসব...।'

'কবে?'

'জানি না। হয়তো অন্য চেহারায়...অন্য নামে।'

রূপ চলে গেল। কোথায় গেল জানি না।

কিন্তু একদিন পরেই ও আবার ফিরে এল। হয়তো ঠিক ও নয়—ওরই মতো কেউ। ওর চেয়ে অনেক লম্বা, আরও ফরসা, তবে স্বাস্থ্য রূপকের মতোই—একেবারে ফেটে পড়ছে।

আমি তখন ওয়াশিং মেশিনে কাপড় কাচার পাট শেষ করে শাওয়ার খুলে স্নান করব বলে তৈরি হচ্ছি।

হঠাৎই প্রিয়রূপের কথা মনে পড়ে আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছিল—ঠিক তখনই নতুন পুরুষটিকে আমি দেখতে পেলাম। আরব্যরজনীর গল্পের মতো হুস করে কখন যেন স্নানঘরে এসে হাজির হয়েছে।

'কে তুমি!' অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

উত্তরে আমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল। কানের কাছে ঠোঁট এনে ফিসফিস করে বলল, 'আমি প্রিয়ব্রত। তোমাকে ভালোবাসতে এসেছি। তোমার কান্না মুছিয়ে দিতে এসেছি।'

প্রিয়ব্রত আমার ঘাড়ের কাছে চুমু খেল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই স্নানঘরে জলের ঝরনার নীচে আমাদের ভালোবাসার গান শুরু হয়ে গেল।

রূপকের মতোই বেশ কয়েকটা দিন সুন্দরভাবে কেটে গেল প্রিয়ব্রতর সঙ্গে। আমার অবসর সময়ে ও দেখা দিতে লাগল। বাকি সময়টা—আমি যখন বিজ্ঞান নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম—প্রিয়ব্রত আমার কাছে আসত না। আনাচেকানাচে কোথায় লুকিয়ে থাকত কে জানে!

একদিন প্রিয়ব্রত চলে গেল।

কিন্তু তার পরই আমার একা থাকার দুঃখ ভোলাতে এল স্বরূপ।

তারপর—স্বরূপের পরে—এল সুপ্রিয়।

ওদের এই নিয়মিত আসা-যাওয়ায় আমার মনটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিল। নানান ভুল হচ্ছিল এক্সপেরিমেন্টের কাজে। বাইরের গবেষকরা যে বেশ বিরক্ত হয়ে উঠছেন সেটা ওঁদের পাঠানো চিরকুট পড়েই বুঝতে পারছিলাম।

ওঁদের আমি রূপকের কথা বলিনি। বলিনি যে, ফ্যাসিলিটির ভেতরে আমি একা নই। আমার সঙ্গে চার-চারজন সুপুরুষ যুবক—রূপক, প্রিয়ব্রত, স্বরূপ আর সুপ্রিয়—এখানে লুকিয়ে রয়েছে।

আমার ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ফ্যাসিলিটিতে আমার বাইশদিন কেটেছে। হেড বলেছিলেন আমাকে অন্তত একমাস একা থাকতে হবে। তখন একটা মাস অনেক লম্বা সময় বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন—ওরা চারজন আসার পর—মনে হচ্ছে একমাসের বদলে একবছর হলেও বা ক্ষতি কী!

কিন্তু না। আমার রিসার্চ গ্রুপের পণ্ডিতরা বোধহয় আমার ওপরে আর ভরসা করতে পারলেন না। বাইশদিন শেষ হতেই ওঁরা আমাকে ফ্যাসিলিটি থেকে বেরিয়ে আসতে বললেন।

বাইরে আসার পর ওঁরা আমাকে তারিখ জিগ্যেস করলেন। আমি বললাম, ২৬ মে। ওরা জানালেন, না, ৮ জুন। আমার জীবনের তেরোটা দিন আমি হারিয়ে ফেলেছি! অবশ্য এটা বোঝার কোনওরকম উপায় ছিল না। 'আমার' ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আমি ওঁদের যে-দিন জানিয়েছি, ওঁরা আমাকে ঠিক সেইদিনের খবরের কাগজ নিয়মিত পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আমাকে ডিপার্টমেন্টে নিয়ে গিয়ে ওঁরা নানান প্রশ্ন করছিলেন। আমার কাছ থেকে সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে যাবতীয় ডেটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিলেন। গন্টিপ্রসাদ চন্দ্রশেখরন বললেন, 'সজনী, তুমি তো বেশ রোগা হয়ে গেছ দেখছি! হাউ ডু য়ু ফিল?'

আমি শুকনো হেসে বললাম, 'আই অ্যাম ও. কে., স্যার।'

ওজন নিয়ে দেখা গেল আমার ওজন পাঁচ কেজি কমেছে। ফ্যাসিলিটির ভেতরে 'আমার একদিন' গড়ে ছিল প্রায় ছেচল্লিশ ঘণ্টা! কিন্তু টেম্পারেচার সাইক্ল

মোটামুটি চব্বিশ ঘণ্টাই ছিল। ফলে স্লিপ-ওয়েক সাইক্‌ল আর টেম্পারেচার সাইক্‌ল ডিসিনক্রোনাইজ্‌ড হয়ে গিয়েছিল। অথচ আমার মেয়েলি ব্যাপারটা আটাশ দিন পরই হয়েছে। 'আমার' আটাশ দিন নয়, সত্যিকারের আটাশ দিন।

দু-দিন ধরে চলল এইসব পরীক্ষার ধকল। তার মধ্যে মা-কে একবার দেখতে গিয়েছিলাম। আর প্রিয়রূপের অসংখ্য প্রশ্ন আর কথার জবাবে কয়েকটা মাত্র 'হুঁ' 'হাঁ' করেছি। ওর কথা আমার তেমন করে আর মনে পড়ছে না।

চারদিনের দিন আমাদের রিসার্চ গ্রুপের মিটিং বসল।

আমাকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে নতুন কী-কী জানা গেল তা নিয়ে টেকনিক্যাল ডিসকাশন হল। প্রত্যেকে প্রত্যেকের মতামত জানাচ্ছিলেন। আমার সাহস আর নিষ্ঠা নিয়ে চন্দ্রশেখরন এক লম্বা বক্তৃতা দিলেন। তারপর আমাকে পনেরোদিনের ছুটি উপহার দিলেন।

প্রিয়রূপ আমার সাতকাহন প্রশংসা করার পর বলল, 'ইতিহাসে সজনীর নাম লেখা থাকবে তা নয়। সজনী হ্যাজ বিকাম হিস্ট্রি। আর আমি আরও প্রশংসা করব ওর মনের জোরের। ফ্যাসিলিটি থেকে বেরিয়ে আসার পর ও যেরকম নির্লিপ্ত শান্ত রয়েছে, তা সত্যিই আশ্চর্যের। আমার ধারণা অন্য কেউ হলে এতদিন পর মানুষের সঙ্গ পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বাসে টগবগ করে ফুটত। ও যে পঁয়তিরিশটা দিন ওই টাইমলেস চেম্বারে একা কাটিয়েছে, এ-কথা নিশ্চয়ই আপনারা ভুলে যাবেন না!'

প্রিয়রূপ একটা হাত তুলে হাসিমুখে আমাকে বোধহয় অভিনন্দন জানাতে যাচ্ছিল। অন্য কেউ-কেউ সবে হাততালি দিতে শুরু করেছেন। ঠিক তখনই আমি অবাক হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ইশারায় সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'ফ্যাসিলিটিতে আমি তো একা ছিলাম না!'

মিটিং রুমের ভেতরে আকাশ ভেঙে পড়ল।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বিশাল টেবিল ঘিরে বসে থাকা মানুষগুলোর মুখে পলকে বিস্ময় জায়গা করে নিল।

আমি ওঁদের রূপক, প্রিয়ব্রত, স্বরূপ আর সুপ্রিয়র কথা বললাম। বললাম, ওদের সঙ্গে আমি কীভাবে সময় কাটিয়েছি।

প্রিয়রূপের মুখ ফ্যাকাসে বিবর্ণ হয়ে গেল। চন্দ্রশেখরন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় ধমকের সুরে বললেন, 'কীসব আবোলতাবোল বকছ, সজনী! স্টপ অল দিজ ননসেন্স!'

প্রিয়রূপ আর্তগলায় আমার নাম ধরে ডেকে উঠল।

আমি ওদের প্রতিক্রিয়ায় কোনওরকম ভ্রূক্ষেপ না করে রূপকদের কথা আবার বললাম। বললাম, ওরা এখনও ফ্যাসিলিটিতে রয়েছে। আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি আবার ওখানে ফিরে যেতে চাই—আর কোনওদিন ওই টাইমলেস চেম্বার

থেকে বেরোতে চাই না। কারণ, বাইরের চেয়ে ভেতরটা অনেক ভালো।

প্রিয়রূপের মুখ ভেঙেচুরে গেল। ও কেঁদে ফেলল। চেয়ার ছেড়ে প্রায় ছুটে চলে এল আমার কাছে। একটা হাত চেপে ধরে ডুকরে উঠল, 'সজনী! সজনী! কী হয়েছে তোমার!'

আমি প্রিয়রূপকে টের পেলাম না। একই কথা বারবার বলে চললাম।

চন্দ্রশেখরন কপালে হাত চাপড়ে বলে উঠলেন, 'মাই গড! ওর দেখছি মেন্টাল ব্রেকডাউন হয়ে গেছে। গোপাল, তুমি এক্ষুনি সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টে প্রফেসর রাওকে ফোন করো। বলো, একবার আমাদের ডিপার্টমেন্টে চলে আসতে। দিস ইজ অ্যান ইমার্জেন্সি।

গোপাল টেলিফোনের দিকে ছুটে গেল। অন্য সকলে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ঘিরে ধরলেন আমাকে। একটা হইহই শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু কোনও কিছুই আমার মনে দাগ কাটছিল না। আমি ওই চারজন সুপুরুষের কথা ভাবছিলাম। ফ্যাসিলিটির ভেতরে ছায়া-ঘেরা আনাচেকানাচে ওরা কী আকাঙ্ক্ষা নিয়েই না আমার জন্যে অপেক্ষা করছে!

তাই অবাক হয়ে চন্দ্রশেখরনের দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় আমি বললাম, 'স্যার, আপনারা এরকম করছেন কেন! আমার কিচ্ছু হয়নি।'

প্রিয়রূপ আর সইতে পারল না। আমার পাশেই একটা চেয়ারে বসে পড়ে টেবিলে মাথা এলিয়ে দিল। তারপর ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল।

ঘরের কোনও কিছুই আমার মনে কোনওরকম আঁচড় কাটছিল না।



ভালোবাসা ফুরিয়ে গেলে

চলমান ফুটপাথের ওপরে দাঁড়িয়ে 'ফানল্যান্ড'-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল স্নিগ্ধপ্রভাত। এই এলাকায় ফানল্যান্ড সাইবার-ক্যাসিনোর জুড়ি নেই। ইন্টারনেটে হরেকরকম জুয়াখেলার ব্যবস্থা যেমন আছে, তেমনই আছে হালকা-চড়া নেশার ব্যাপক আয়োজন।

পকেট থেকে একটা 'লাভ মি' টফি বের করে মুখে পুরে দিল স্নিগ্ধপ্রভাত। এই টফিটায় ঝিমঝিমে নেশা হয়। আসল নেশার আগে এটা গৌরচন্দ্রিকার কাজ করে। যার ফলে খুব অল্পদিনেই এই টফিটা বাজার মাত করে দিয়েছে।

'লাভ মি'-র দৌলতে স্নিগ্ধপ্রভাতের মুখের ভেতরটা ঠান্ডা আর মিষ্টি হয়ে গিয়েছিল। আর মাথার ভেতরটা হালকা উলের বলের মতো লাগছিল। ও মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল।

আকাশে অনেকগুলো আলোর বিন্দু উল্কার মতো ছুটোছুটি করছিল। ওগুলো 'ফ্লোট্যাক্সি'। হ্যালোজেন হেডলাইট জ্বেলে প্যাসেঞ্জার নিয়ে আকাশপথে ছুটে যাচ্ছে। হেডলাইটের আভা কালো আকাশে সোনার তরোয়াল বলে মনে হচ্ছিল।

সোনা থেকেই স্বর্ণদ্যুতির কথা মনে পড়ে গেল। স্বর্ণদা। কতদিন স্বর্ণদার সঙ্গে দেখা নেই! প্রায় পাঁচবছর। কিন্তু ইদানীং রোজই কোনও-না-কোনও ছলছুতোয় স্বর্ণদ্যুতির কথা স্নিগ্ধপ্রভাতের মনে পড়ে যায়। বছর ছ'-সাত আগে ওই মাতাল

মানুষটা যা-যা বলেছিল সেগুলো কোন এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় স্নিগ্ধপ্রভাতের জীবনে সত্যি হতে শুরু করেছে।

সেসময়ে স্নিগ্ধপ্রভাত বি-ইলেভেন সিটিতে ছিল। মনের সুখে চাকরি করত আর জীবনটাকে দু-হাতে লোফালুফি করত। সন্ধে হলেই সাইবার-ক্যাসিনো। নেশার ট্যাবলেট, মদ, ইন্টারনেট জুয়া, আর হলোগ্রাম-স্ট্রিপটিজ।

বেশ কাটছিল দিনগুলো। এখন সেইসব দিনের কথা মনে পড়লেই ডানা ঝাপটাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ওই ইচ্ছে পর্যন্তই। এখন স্নিগ্ধপ্রভাতের ডানা ভারী হয়ে গেছে।

স্বর্ণদ্যুতি ওর চেয়ে অন্তত দশবছরের বড়। কিন্তু সাইবার-ক্যাসিনোয় আলাপ হওয়ার পরই কেমন করে যেন আলাপটা খুব তাড়াতাড়ি ঘনিষ্ঠতার দিকে বাঁক নিয়েছিল। স্বর্ণদ্যুতি রাতারাতি 'স্বর্ণদা' হয়ে গিয়েছিল। লোকে বলে ক্যাসিনো-ট্যাসিনোয় আলাপ-টালাপ হলে নাকি এইরকমই হয়।

স্বর্ণদ্যুতিকে সবসময় কেমন মনমরা দেখাত। নেশা করতে-করতে বিড়বিড় করে বলত, 'লাইফ ইজ বাট আ ওয়াকিং শ্যাডো...।'

স্বর্ণদ্যুতি বিয়ে করেছে প্রায় পঁচিশ বছর। তাই নানারকম আবেগের উথালপাথাল বহুকাল আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখন বোধহয় অবশেষটুকু আঁকড়ে ধরে ও বেঁচে আছে।

একঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচতে স্বর্ণদ্যুতি জুয়াড়ি হয়েছে। আর স্নিগ্ধপ্রভাত চিরকাল একা থাকবে, স্বাধীন থাকবে, খামখেয়ালি জীবন কাটাবে—এই উদ্দাম ভাবনা থেকে জুয়ার নেশায় জড়িয়েছে।

স্বর্ণদ্যুতি প্রায়ই বলত, 'তোমাকে আমার ফ্ল্যাটে একদিন নিয়ে যাব।' অথচ নিয়ে যেত না।

শহরের সবচেয়ে আকাঙক্ষার এলাকায় স্বর্ণদ্যুতির ফ্ল্যাট। স্নিগ্ধপ্রভাতের সে-ফ্ল্যাট দেখার কৌতূহলও ছিল। সুতরাং ও অপেক্ষা করতে লাগল।

বেশ মনে পড়ে, একদিন একফোঁটা হুইস্কি কনসেনট্রেট খেয়ে স্বর্ণদ্যুতির বেশ টালমাটাল অবস্থা—তখন হঠাৎই ও স্নিগ্ধপ্রভাতের হাত ধরে টান মেরেছে : 'চলো, আজ তোমাকে আমার ফ্ল্যাটে নিয়ে যাব। আজই সুবিধে...।'

কীসের সুবিধে কে জানে! স্নিগ্ধপ্রভাত আর আপত্তি করেনি।

সাইবার-ক্যাসিনো থেকে ওরা দুজনে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

পকেট থেকে ছোট্ট রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট বের করে সিগন্যাল দিল স্বর্ণদ্যুতি। একটা ফ্লোট্যাক্সি কোথা থেকে এসে ঝুপ করে নেমে পড়ল ওদের পায়ের কাছে।

গাড়িতে উঠে স্বর্ণদ্যুতি ফ্ল্যাটের কো-অর্ডিনেট বলল। ফ্লোট্যাক্সিটা আবার ভেসে পড়ল আকাশে।

ফ্ল্যাটে ঢুকেই স্বর্ণদ্যুতি জড়ানো গলায় বলল, 'এই হল আমার ফ্ল্যাট।'

স্নিগ্ধপ্রভাত মুগ্ধ হয়ে ফ্ল্যাটটা দেখছিল।

স্বর্ণদ্যুতি বড়লোক ও জানত—তবে এরকম জঘন্য বড়লোক সেটা আগে বুঝতে পারেনি।

স্বর্ণদ্যুতির এক ছেলে, এক মেয়ে। বয়েস বাইশ আর উনিশ। ওর কাছেই শুনেছিল ছেলেমেয়ে দুজনেই খুব চৌকশ। এখন ওরা পড়াশোনা করছে। তবে ভবিষ্যতের ভাবনা-চিন্তা ওরা আগেভাগেই সব ছকে রেখেছে।

সাইবার-ক্যাসিনোয় বসে কম্পিউটারের পরদার দিকে আনমনে তাকিয়ে স্বর্ণদ্যুতি বলেছিল, 'বুঝলে, আমার ওয়াইফ রত্নমঞ্জুষা বলে ওরও একটা ফিউচার আছে।' তেতো হাসল স্বর্ণদ্যুতি ঃ 'ওদের তিনজনেরই ফিউচার আছে। আমার নেই। আমার শুধু পাস্ট। এইভাবেই কোনদিন পাস্ট টেন্স হয়ে যাব। নাকি শালা এর মধ্যেই হয়ে গেছি!'

চোখধাঁধানো ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে স্বর্ণদ্যুতির কথাগুলো ভাবছিল স্নিগ্ধপ্রভাত।

বসবার ঘরে ঢুকে স্বর্ণদ্যুতি বলল, 'এখন ওরা কেউ নেই। ওরা যার-যার দারুণ সব জরুরি কাজে বেরিয়েছে। সব পাখি রাতে ফ্ল্যাটে ফিরবে। সেইজন্যেই তোমাকে এ সময়ে নিয়ে এসেছি।'

স্নিগ্ধপ্রভাত অবাক হলেও কিছু বলল না। ভাবছিল, আজ কি সাইবার-বার-এ বসে স্বর্ণদ্যুতি একটু বেশি খেয়ে ফেলেছে!

'এবার তোমাকে একটা টপ সিক্রেট খবর দিই—।'

'কী, স্বর্ণদা?'

'এই ফ্ল্যাটের ভেতরে আরও চারটে ফ্ল্যাট আছে।'

'মানে!' স্নিগ্ধপ্রভাত অবাক হয়ে ফ্ল্যাটের চারপাশে তাকায়। অন্যান্য ঘরের দরজার দিকে দ্যাখে।

'হ্যাঁ, চারটে ফ্ল্যাট।'

স্নিগ্ধপ্রভাতের হাত ধরে টানতে-টানতে একটা ঘরের দরজার কাছে নিয়ে যায় স্বর্ণদ্যুতি।

'এ-ঘরটায় আমার ছেলে থাকে। এটা একটা ওয়ান রুম ফ্ল্যাট।'

সামান্য ভুলভাল পা ফেলে স্বর্ণদ্যুতি আর-একটা ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। ঘরটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, 'এ-ঘরটায় আমার মেয়ে থাকে। এটা একটা ওয়ান রুম ফ্ল্যাট।'

তারপর স্বর্ণদ্যুতি এগিয়ে গেল সবচেয়ে বড় ঘরটার দিকে। মাতাল আঙুলে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে স্নিগ্ধপ্রভাতকেও টেনে নিয়ে চলল।

ঘরের দরজায় এসে কেমন করে যেন হাসল স্বর্ণদ্যুতি। ডাব্‌ল বেড খাটের দিকে আঙুল তুলে জড়ানো ভাঙা গলায় বলল, 'ওই খাটটায় দুটো ওয়ান রুম ফ্ল্যাট

আছে। রোজ রাতে দুটো ফ্ল্যাট চুপচাপ পাশাপাশি শুয়ে থাকে—আমি আর রত্নমঞ্জুষা।'

স্নিগ্ধপ্রভাতকে টেনে এনে ড্রইংরুমের সোফায় বসাল স্বর্ণদ্যুতি। দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ওর দীর্ঘ শরীরটা সামান্য এপাশ-ওপাশ দুলছিল।

'ফ্ল্যাট-বাড়ির ডিফারেন্ট ফ্ল্যাটের মধ্যে রিলেশানটা কেমন হয় জানো?'

মোটামুটি জানলেও স্নিগ্ধপ্রভাত চুপ করে রইল। কারণ, স্বর্ণদ্যুতি এখন বলতে চাইছে—হয়তো নিজের সঙ্গেই কথা বলছে।

'আমাদের মধ্যে রিলেশানটা এখন সেই জায়গায় পৌঁছে গেছে। আমরা যেন এক-একটা ফ্ল্যাট। পাশাপাশি আছি অথচ মাঝে মরুভূমির মতো বিস্তর ফাঁক। মানে, ধরো একটা মুক্তোর মালা—কিন্তু পাশাপাশি বসানো পাথরগুলোর ভেতর দিয়ে যে-সুতোটা যায়, সেটাই নেই। বাইরে থেকে দেখে কিন্তু এটা বোঝা যাবে না। মনে হবে মুক্তোর মালাটা ঠিকঠাকই আছে। তাই আমরা এখন ফ্ল্যাট...নাকি ত্রিশঙ্কু মুক্তো?...কে জানে।'

শেষদিকটায় স্বর্ণদ্যুতির গলা আবেগে ধরে গিয়েছিল। তারপর আচমকা ও হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল স্নিগ্ধপ্রভাতের পায়ের কাছে। ওর কোলে মাথা রেখে কান্না-জড়ানো গলায় বলতে লাগল, 'সব ভালোবাসা ফুরিয়ে গেছে রে, সব ভালোবাসা ফুরিয়ে গেছে...।'

শেষদিকে ওর কথা জড়িয়ে গেল। স্নিগ্ধপ্রভাতকে আঁকড়ে ধরে ও বাচ্চা ছেলের মতো হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। ওকে কী বিপন্ন, কী অসহায় লাগছিল!

তারপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে।

ফুটপাথ ফানল্যান্ডের কাছে এসে পড়তেই নেমে পড়ল স্নিগ্ধপ্রভাত। কাচের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নিজের সিটিজেন কোড বলার সঙ্গে-সঙ্গে দরজা খুলে গেল।

ফানল্যান্ডের ভেতরটা খুব ঠান্ডা আর চুপচাপ। শুধু হালকা মিউজিকের শব্দতরঙ্গ কোমলভাবে খেলে বেড়াচ্ছে।

সেন্টার স্টেজে হলোগ্রাম-স্ট্রিপটিজ চলছিল। দুটো মেয়ে—অথবা মেয়ের ছায়া—শরীর বেঁকিয়েচুরিয়ে এমনভাবে নাচছিল যেন ওরা রবারের তৈরি।

হলোগ্রাম-স্ট্রিপটিজের সুবিধে হচ্ছে উত্তেজিত দর্শক হামলে পড়ে নাচিয়েদের বিরক্ত করতে পারে না। ফলে হইচই গোলমালের কোনও ভয় নেই।

একটা টেবিলে বসে হুইস্কির অর্ডার দিল স্নিগ্ধপ্রভাত। আর তাতে প্রথম চুমুক দিতেই সুপর্ণলতিকার কথা মনে পড়ল।

সঙ্গে-সঙ্গে মুখটা কেমন বিস্বাদ ঠেকল।

স্বর্ণদ্যুতির সঙ্গে সুপর্ণলতিকার কোথায় যেন একটা যোগসূত্র রয়েছে।

গ্লাসে আবার চুমুক দিল স্নিগ্ধপ্রভাত।

ও যখন সুপর্ণলতিকাকে বিয়ে করে তখন স্বর্ণদ্যুতির সঙ্গে ওর কোনও

যোগাযোগ ছিল না। মোটামুটি চুপচাপই বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল। শহরের সেন্ট্রাল ডেটা ব্যাঙ্কে যখন ওদের বিয়ের রেজিস্ট্রেশানটা স্টোর্‌ড হয় তখনই একটা নিয়ম ওদের বেঁধে ফ্যালে ঃ অন্তত আট বছরের জন্যে ওদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকতে হবে।

গত শতকে আকছার ডিভোর্সের ব্যাপারটা এত মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, সরকার নতুন ম্যারেজ অ্যাক্ট চালু করতে বাধ্য হয়। সেসময়ে গড়ে এক-একজন নাগরিকের বিয়ের সংখ্যা ৩.৪-এ পৌঁছে গিয়েছিল। এত ডিভোর্স আর বিয়ের রেকর্ড রাখতে গিয়ে সরকারি দপ্তরের কাজের পরিমাণ যেমন বেড়েছিল, তেমনই বেড়েছিল হরেকরকম মামলা-মোকদ্দমা। এ ছাড়া সেন্ট্রাল ডেটা ব্যাঙ্কের মেমোরিও লাগছিল প্রচুর।

সুপর্ণলতিকাকে বিয়ে করার সময় আট বছরের নিয়মটা আটশো বছরের হলেও স্নিগ্ধপ্রভাতের কোনওরকম আপত্তি ছিল না। তীব্র ভালোবেসে ও সুপর্ণলতিকাকে বিয়ে করেছিল। ওকে ভালোবেসে স্নিগ্ধপ্রভাত বুঝতে পেরেছিল, এই ভয়ংকর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগেও ভালোবাসার ব্যাপারটা একইরকম রয়ে গেছে। এই প্রবল টানকে বিজ্ঞান এখনও ব্যাখ্যা করতে পারেনি।

কিন্তু তার পরের ঘটনাগুলোকেও স্নিগ্ধপ্রভাত ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারেনি। বিয়ের দু-আড়াই বছর উদ্দাম মাতামাতির পর সবকিছু কেমন ধীরে-ধীরে বদলে গেল। বিকেল থেকে আকাশের রং পালটে ধীরে-ধীরে যেমন গোধূলি এবং সন্ধে হয়, ব্যাপারটা অনেকটা যেন সেইরকম।

তার পরের কয়েকটা বছরে একটা টাটকা ছটফটে মাছ ডিপ ফ্রিজের ভেতরে ঠান্ডা হিম হয়ে গেল। আর এখনও তাই।

কেন, কে জানে!

সুপর্ণলতিকা কি বড্ড বেশি কথা বলে? সবসময় কি ওর ঠোঁট নড়ে?

ঠোঁট। এই ঠোঁটের জন্য একদিন স্নিগ্ধপ্রভাতের ঠোঁট পাগল ছিল। কিন্তু দু-আড়াই বছরের মধ্যেই সে-পাগলামি স্তিমিত হয়ে গেছে। এখন ওর মনে হয় ধীরে-ধীরে ও আর সুপর্ণলতিকা দুটো ফ্ল্যাট হয়ে যাচ্ছে। রাতে সেই দুটো ফ্ল্যাট পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে থাকে। যেমন করে শুয়ে থাকত স্বর্ণদ্যুতি আর রত্নমঞ্জুষা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্নিগ্ধপ্রভাত।

নিভে যাওয়া সম্পর্ককে কি আবার দপ করে জ্বেলে দিতে পারে বিজ্ঞান? বোধহয় না। বিজ্ঞানের আবিষ্কার শরীরে আগুন ধরাতে পারে—মনে নয়।

একজন হলোগ্রাম-স্ট্রিপার নাচতে-নাচতে স্টেজ থেকে নেমে এসেছিল। মেয়েটা যেমন খুশি টেবিল-চেয়ার-মানুষকে ভেদ করে নাচের ভঙ্গিতে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল। একজন বেসামাল খদ্দের ওকে জাপটে ধরতে গিয়ে মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ল।

মেয়েটা যখন স্নিগ্ধপ্রভাতকে ভেদ করে চলে গেল তখন ও যেন সামান্য উষ্ণতার ছোঁয়া পেল। মনটা ক্ষণিকের জন্য চনমনে হয়ে উঠল।

আবার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মনে হল জীবন কত ক্লান্তিকর, কত দীর্ঘ!

রাতে বাড়ি ফেরার সময় স্নিগ্ধপ্রভাত ভাবতে চেষ্টা করছিল ফানল্যান্ডটাই যেন ওর বাড়ি। সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ও সুপর্ণলতিকা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে যাচ্ছে। কিন্তু ভাবনাটা তেমন জমছিল না।

ফ্ল্যাটে ফিরে এসে ও সুপর্ণলতিকার মুখোমুখি হল।

সুপর্ণলতিকা কোনও কথা বলল না। ঠান্ডা চোখে স্বামীর দিকে একপলক তাকিয়ে পামটপ কম্পিউটারে সেলাইয়ের গ্রাফিক্স দেখতে লাগল।

স্নিগ্ধপ্রভাত স্ত্রীকে দেখছিল।

সেই একইরকম মনোরম সৌন্দর্য মাখানো মুখ। সময়ের কোনও ছাপ পড়েনি সেখানে। অথচ স্নিগ্ধপ্রভাত পলকের জন্যও কোনও টান অনুভব করল না।

ওর ভেতরে-ভেতরে কান্না পাচ্ছিল। রোজই এমন কান্না পায়।

একটা ঠান্ডা সম্পর্ককে আঁকড়ে ধরে জীবন কাটানো যায় না কিছুতেই। অথচ ও চেষ্টা করেও ভেতর থেকে কোনও উষ্ণতা খুঁজে পায় না। ওর ভালোবাসা নির্ঘাত মরে গেছে। আর সেই মৃত শিশুটিকে কোলে নিয়ে ও বোকার মতো বোতল থেকে দুধ খাওয়াতে চেষ্টা করছে।

স্নিগ্ধপ্রভাতের নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হচ্ছিল। সুপর্ণলতিকার টান ও টের পায়। অথচ সেই টানের উত্তর দেওয়ার মতো ক্ষমতা ওর নেই।

জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল স্নিগ্ধপ্রভাত। ভাবতে চেষ্টা করল, ঠিক কবে থেকে ওরা ফ্ল্যাটে বদলে যেতে শুরু করেছে।

চোখ বুজে ডানহাত এলিয়ে দিল চোখের ওপরে।

ইস, কোনও ম্যাজিশিয়ান যদি পারত ওর ফুরিয়ে যাওয়া ভালোবাসাকে ফিরিয়ে দিতে!

মাথার ভেতরে কেমন যেন দপদপ করছিল। কেউ যেন সেখানে পুঁচকে একটা হাতুড়ি নিয়ে ঠুকঠুক করে পেরেক ঠুকছিল। স্নিগ্ধপ্রভাতের মরে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু কোথা থেকে যেন গোলাপের গন্ধ ওর নাকে এসে ঢুকছিল—এবং ওর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছিল।

দুটো ইচ্ছের লড়াই চলতে-চলতে ওর ঘুম ভেঙে গেল।

সম্পূর্ণ অচেনা একটা ঘরে অচেনা একটা বিছানায় জেগে উঠল স্নিগ্ধপ্রভাত।

অবাক চোখে ধড়মড়িয়ে উঠে বসতেই রক্তের মতো টুকটুকে লাল একগুচ্ছ গোলাপ ওর নজরে পড়ল। বিছানার পাশেই স্বচ্ছ টেবিলের ওপরে দাঁড়িয়ে স্বচ্ছ

ফুলদানি। বোধহয় অ্যাক্রিলিকের তৈরি। ফুলদানির ওপরটা গোলাপের পাপড়িতে ঢাকা।

'ওঃ...আপনার ঘুম ভেঙেছে!'

গোলাপের দিক থেকে চোখ তুলল স্নিগ্ধপ্রভাত। চোখ পড়ল আর-এক গোলাপের দিকে।

সুন্দর লম্বাটে মুখ। ফরসা কপালে উজ্জ্বল টিপ। পরনে হালকা গোলাপি শাড়ি। পাতলা ঠোঁটে একচিলতে দুষ্টুমির হাসি। সেইসঙ্গে আবছা পারফিউমের ঘ্রাণ যেন টের পেল স্নিগ্ধপ্রভাত।

'আমি কোথায়?' প্রশ্নটা ওর নিজের কানেই কেমন বোকা-বোকা শোনাল।

'কোথায় আবার! আমার ফ্ল্যাটে!' কী সহজ স্বাভাবিক উত্তর দিল তরুণী!

'আপনি কে?'

খিলখিল করে হেসে উঠল। স্নিগ্ধপ্রভাতের শরীরের ভেতর দিয়ে ঝরনা বয়ে গেল।

আমার নাম অঙ্গলাবণি।'

নামটা ঝংকার তুলল কানে। অনেক প্রশ্ন ভিড় করে এল ঠোঁটে। উচ্চারণ না করে স্নিগ্ধপ্রভাত সেইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে লাগল অঙ্গলাবণির মুখে।

এখানে ও কেমন করে এল!

জটপাকানো স্মৃতি হাতড়ে এই রহস্যের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করল।

ঝাপসাভাবে যেটুকু ও মনে করতে পারল সেটা হল, কাল রাতে ও ফানল্যান্ডে ছিল। ছোট-ছোট চুমুকে হুইস্কি খাচ্ছিল আর হলোগ্রাফিক ক্যাবারে দেখছিল। একটি রোগা মেয়ে সাপের মতো শরীরটা খেলিয়ে সিলিকোন-যৌবনের নগ্ন হাতছানি দিয়ে নাচছিল।

স্নিগ্ধপ্রভাত যখন পুরো বুঁদ হয়ে গেছে ঠিক তখনই একজন অচেনা লোক ওকে ডেকে নিয়ে গেছে ক্যাসিনোর বাইরে। বলেছে, কে একজন যেন একটা ইমার্জেন্সি খবর এনেছে স্নিগ্ধপ্রভাতের জন্য।

বাইরে বেরিয়ে একটা আলো-আঁধারি জায়গায় ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে লোকটা হঠাৎই স্নিগ্ধপ্রভাতের নাক লক্ষ্য করে ফুঁ দিয়েছে।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা তীব্র কটু গন্ধ স্নিগ্ধপ্রভাতের নাকে ঢুকে গিয়েছিল। তারপর ওর আর কিছু মনে নেই।

'আমি এখানে কেমন করে এলাম?' অনেকক্ষণ পর ভেতরের প্রশ্নটা বাইরে বেরিয়ে এল।

'রাস্তায় আপনি সেন্সলেস হয়ে পড়েছিলেন। আম তুলে নিয়ে এসেছি। আপনার পকেটের জিনিসপত্র সব ওই টেবিলটার ড্রয়ারে আছে।'

আঙুল তুলে একটা টেবিলের দিকে দেখাল অঙ্গলাবণি। তার পাশেই একটা

খোলা জানলা। তার কাচের শার্সিতে ভোরের রোদ। আর জানলার বাইরে ঝাঁকড়া গাছে দুটো বুলবুলি। অকারণেই ডাকছে।

বুলবুলি দুটোকে কেমন যেন চেনা মনে হল।

'কোথায় পড়ে ছিলাম আমি?'

'চার নম্বর সুপারওয়ের ওপরে।—ফানল্যান্ড—সাইবার-ক্যাসিনোর পাশের একটা অন্ধকার জায়গায়...।'

একটু সময় নিল স্নিগ্ধপ্রভাত। তারপর আলতো গলায় কাল রাতের ব্যাপারটা যেটুকু মনে ছিল বলল।

'আপনি খুব জোর বেঁচে গেছেন। এই কায়দায় লুঠপাট করাটা এখন ভীষণ বেড়ে গেছে।'

'আপনার জন্যেই বেঁচে গেছি...।' কৃতজ্ঞতার সুরে বলল স্নিগ্ধপ্রভাত।

হাসল অঙ্গলাবণি। কিছু বলল না। আয়ত চোখ মেলে স্নিগ্ধপ্রভাতকে দেখতে লাগল।

'আপনি ছাড়া এ-ফ্ল্যাটে আর কে-কে থাকে?'

আবার হাসল ঃ 'কেউ না। আমি একা—।' তারপর কপাল থেকে চুল সরিয়ে বলল, 'চলুন, হাত-মুখ ধোবেন চলুন—।'

অঙ্গলাবণির কথাবার্তায় কেমন যেন অধিকারের ভাব। কিন্তু স্নিগ্ধপ্রভাতের ভালো লাগল। ওর ভেতরে-ভেতরে বোধহয় বহুদিনের একটা আর্তি ছিল যে, কেউ ওকে অধিকার করুক। বাইরে থেকে নয়—ভেতর থেকে।

স্নিগ্ধপ্রভাত অঙ্গলাবণির মুখের রেখাগুলো পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল।

অচেনা এক পুরুষকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসার ব্যাপারে কোনও দ্বিধা বা সংশয়ের ছাপ নেই। বরং কোথায় যেন একটা কৌতুক ও কৌতূহল কাজ করছে।

হাত-মুখ ধুয়ে ডাইনিং টেবিলে বসল স্নিগ্ধপ্রভাত। অঙ্গলাবণির দেওয়া কফির কাপে চুমুক দিয়ে হেসে বলল, 'আপনি খুব পরোপকারী...।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অঙ্গলাবণি ঃ 'আপনি যেরকম ভাবছেন সেরকম নয়। নেহাত চাকরি ছাড়া আর কোনও কাজ নেই, তাই...। এই যেমন আপনার জন্যে ক'দিন অফিস ছুটি নিয়েছি...।'

নতুন এক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে দিনটা কাটতে লাগল। কোনও কাজ নেই—শুধু বিশ্রাম আর আরাম। সেইসঙ্গে অঙ্গলাবণির মধুর শাসন, দু-একটা এলোমেলো কথা। স্নিগ্ধপ্রভাতের বেশ লাগছিল।

ডাইনিং টেবিলে খেতে বসে ওদের কথা হচ্ছিল।

কাচের জানলায় রোদ এখন চড়া হয়েছে। আকাশ সকালের নীল থেকে চোখ-ধাঁধানো সাদাটে হয়ে গেছে।

মিউজিক সিস্টেমে হালকা সুর বাজছিল। তাতে কেমন একটা মিষ্টি আমেজ

তৈরি হয়ে যাচ্ছিল।

'একা-একা এতবড় ফ্ল্যাটে থাকেন...ভয় করে না?'

'যত না ভয় তার চেয়ে বেশি মনখারাপ লাগত।'

'আপনি কি সারাজীবন একা না কি? কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই আছে...।'

'জীবনের শুরুতে মা-বাবা-ভাই-বোন ছিল। তারপর স্বামী। আর তারপর...একা আমি।'

'আপনার হাজব্যান্ড এখন কোথায়?'

'এ-থ্রি সিটিতে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে আছে। বছরখানেক হল আমাদের কাটাকুটি হয়ে গেছে—।'

কাটাকুটি! শব্দটা কেমন যেন কানে বাজল।

স্নিগ্ধপ্রভাতের কপালে বোধহয় প্রশ্নের ভাঁজ পড়েছিল। সেটা লক্ষ করে অঙ্গলাবণি বলল, 'না—ডিভোর্স হয়নি। অফিসিয়ালি ডিভোর্স পেতে এখনও বছরদুয়েক বাকি।'

কথাটা বলে তেতো হাসল। স্নিগ্ধপ্রভাতের পাতে আরও একটু তরকারি দিল।

মুখে ভাত নিয়ে জড়ানো গলায় স্নিগ্ধপ্রভাত জিগ্যেস করল, 'আপনাকে ছেড়ে চলে গেল কেন?'

'ও ভীষণ বোর হয়ে গিয়েছিল। বলত, আমাদের ভালোবাসা নাকি ফুরিয়ে গেছে। এর পর তো আর একসঙ্গে থাকার কোনও মানে হয় না!'

'দারুণ!'

অঙ্গলাবণি অবাক হয়ে স্নিগ্ধপ্রভাতের চোখে তাকাল।

স্নিগ্ধপ্রভাত বলল, 'রান্নাটা দারুণ হয়েছে।' তারপর ঃ 'কী নাম আপনার হাজব্যান্ডের?'

'জেনে কী হবে!'

'তবু...জানতে ইচ্ছে করছে।'

'শোভনসুন্দর...।'

'নামটা চমৎকার—তবে মানুষটা নয়।'

'কী করে বুঝলেন?'

'আপনাকে ভালোবাসতে চায়নি, তাই।'

হাসল অঙ্গলাবণি ঃ 'আমারও তো অনেক দোষ থাকতে পারে! চট করে কারও সাইড নেওয়া ঠিক নয়।'

'আপনার সাইড নিতে আমার ভালো লাগছে। এটা কিন্তু খোশামোদ নয়। আসলে প্রত্যেকের মনের ভেতরে ভালো লাগার একটা সুইচ আছে। ওটা যখন-তখন কোনও লজিক ছাড়াই অন-অফ হয়। আপনার বেলায় অন হয়ে গেছে।'

খেতে-খেতেই হেসে গড়িয়ে পড়ল অঙ্গলাবণি। হাসি থামলে পর বলল,

'সত্যি, আপনি এক অদ্ভুত মানুষ!'

শোভনসুন্দর। নামটা মনে-মনে বিড়বিড় করল স্নিগ্ধপ্রভাত। অঙ্গলাবণি আর শোভনসুন্দরের জীবনে ভালোবাসা ফুরিয়ে গেছে।

স্নিগ্ধপ্রভাত অবাক হয়ে যাচ্ছিল। অঙ্গলাবণির জীবনের সঙ্গে ওর এত মিল! কোন বিচিত্র এক দুর্ঘটনা দুজন সমান্তরাল মানুষকে একটি বিন্দুতে মিলিয়ে দিল!

কিছুক্ষণ চুপচাপ স্নিগ্ধপ্রভাতকে খুঁটিয়ে লক্ষ করল অঙ্গলাবণি। তারপর আলতো করে ছুড়ে দিল একটি প্রশ্ন ঃ 'আপনার বাড়িতে কে-কে আছে?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্নিগ্ধপ্রভাতের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল—বুকের ভেতরের প্রবল চাপটা শূন্য হয়ে গেল। মুখ সামান্য নীচু করে ও বলল, 'সুপর্ণলতিকা—আমার ওয়াইফ।'

ও অবাক হয়ে খেয়াল করল, এতক্ষণে এই প্রথম ওর সুপর্ণলতিকার কথা মনে পড়ল। বাড়ি ফেরার জন্য ওর এতটুকুও মন টানল না।

'আপনার বউয়ের কথা বলুন। সুপর্ণলতিকা নামটা কিন্তু দারুণ!' অঙ্গলাবণিকে খুশি-খুশি দেখাল।

'হ্যাঁ, দারুণ নাম—তবে অঙ্গলাবণির কাছে কিছু নয়।'

'ওঁর কথা বলুন। কেমন মানুষ আপনার ওয়াইফ?'

'ভালো।' কিছুক্ষণ চুপচাপ খেতে লাগল স্নিগ্ধপ্রভাত। তারপর ঃ 'অনেকটা বোধহয় শোভনসুন্দরের মতো।'

অঙ্গলাবণি মুখ নামাল।

'আপনাকে আর-একটুকরো মাছ দিই...।'

'দিন।'

স্নিগ্ধপ্রভাতের কেমন অদ্ভুত লাগছিল। ঘরে ফেরার কোনও তাড়া নেই। ফিরতে ইচ্ছেও করছে না। বরং মনে-মনে ও একটা অ্যাডভেঞ্চার চাইছে। আর নিজেকে বেশ স্বাধীন মনে হচ্ছে।

আচ্ছা, সুপর্ণলতিকাকে কেমন দেখতে? কাল বিকেলে ও কী যেন বলেছিল? দুটো ফ্লোট্যাক্সির অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে...কোন স্পেস কো-অর্ডিনেটে যেন...?

নাঃ, ভালো করে কিছু মনে পড়ছে না।

মাথার ভেতরে টিপটিপ করে যন্ত্রণার একটা ধারা অবিরাম বয়ে চলেছিল। মাঝে-মাঝে অস্থির হয়ে ব্যথাটা জানান দিচ্ছিল।

একদিন দু-দিন করে তিনটে দিন পেরিয়ে গেল। শুয়ে-বসে অলস গল্প করে ওদের সময় কাটতে লাগল।

তিনদিনে স্নিগ্ধপ্রভাত পুরোপুরি সেরে উঠেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর এখানে

থেকে যেতে মন চাইছিল। অথচ লজ্জায় সংকোচে অঙ্গলাবণিকে সে-কথা ও বলতে পারছিল না।

চারদিনের দিন অঙ্গলাবণি ওকে বলল, 'আপনি এখন ভালোই আছেন। আজ থেকে আমার অফিস যাওয়া শুরু। আপনি এই ফ্ল্যাটের পাহারায় রইলেন। কী, কোনও আপত্তি নেই তো!'

'না, আপত্তি নেই। তবে একা-একা থাকতে বোর লাগবে।'

'সেকী? শোভনসুন্দর তো উলটো কথা বলেছিল আমাকে। আমার সঙ্গে দোকা থাকতে-থাকতে ও বোর হয়ে গিয়েছিল।' হাসল অঙ্গলাবণি।

'আমি আমার কথা জানি—অন্যেরটা জানি না। তাই আমারটাই বললাম। নাকি আপনি বোর হয়ে যাচ্ছেন?'

'না, না—।'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজগোজ শেষ করছিল অঙ্গলাবণি। আয়নার মধ্যে দিয়ে স্নিগ্ধপ্রভাতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জানেন, আমার অফিস-বসটা একটা রোবট। কাজ ছাড়া আর কোনও নেশা নেই। এমনকী আমার দিকেও মুখ তুলে একপলক তাকায় না। মানে, যখন তাকায় তখন শুধু কাজের কথাই বলে।'

'আমি কিন্তু সেরকম না। বরং বেশ দুর্বল মানুষ।'

অঙ্গলাবণি আয়নায় হাসল।

আয়নাটা অ্যান্টিক। সুন্দর কারুকাজ করা।

সেদিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধপ্রভাত বলল, 'দারুণ!'

সাজতে-সাজতে ভুরু তুলল অঙ্গলাবণি ঃ 'আয়নাটা?'

'না—আয়নার ছায়াটা। আপনার ইমেজটা।'

'এটা কিন্তু ভারচুয়াল ইমেজ। একে আঙুলে ছোঁয়া যায় না।' হাসল ঠোঁটের কোণে।

'ভারচুয়াল ইমেজ থেকেই একদিন রিয়েল ইমেজে পৌঁছে যাব। তারপর সেখান থেকে অবজেক্টে। তখন ছুঁতে কোনও অসুবিধে হবে না।'

'ভারচুয়াল রিয়েলিটি কিন্তু সত্যি নয়।'

'সত্যি না হোক—সত্যির কাছাকাছি তো বটে! তাতেই আমার সাধ মিটবে।'

'এত অল্পেতেই আপনি খুশি?'

'হ্যাঁ।' ঘাড় কাত করে বলল স্নিগ্ধপ্রভাত, 'আসলে চেয়েছিলামই তো অল্প! তাই অল্প পেলেই খুশি। কিন্তু পেলাম কই!'

'দাঁড়ান, অফিস থেকে ফিরে এসে আপনার এই ফিলিংটা অ্যানালিসিস করতে হবে।'

ঠিক তখনই কথা-বলা-টেলিফোন মিষ্টি ধাতব গলায় বলে উঠল, 'ফোন এসেছে—ফোন ধরো।'

অঙ্গলাবণি 'ধরছি' বলতেই ঘরের দেওয়ালের একটা অংশ টিভির পরদা হয়ে গেল। সেখানে ফুটে উঠল একজন প্রৌঢ়ের রঙিন মুখ।

চোখে মেটাল ফ্রেমের চশমা। গালে ধপধপে সাদা চাপদাড়ি। মাথায় ব্যাকব্রাশ করা কাঁচাপাকা চুল। নাকের নীচে সাদা পুরু গোঁফ। তারই আড়ালে একচিলতে হাসি।

'কেমন আছ, অঙ্গলাবণি?'

'এখনও পর্যন্ত ভালোই, ডক্টর—।'

'কোনও কমপ্লেন নেই?'

'না—একটুও না।'

'দ্যাখো, পেশেন্টকে আমি কিন্তু পুরোপুরি তোমার হাতে ছেড়ে দিয়েছি। হি ইজ অল ইয়োর্স। কোনও প্রবলেম হলে বলবে। আর ক'দিন যাক—তারপর তোমার বাড়িতে একদিন চা খেতে যাব।'

'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম, ডক্টর।'

'ও. কে., সি ইউ দেন...।'

পরদার ছবি মিলিয়ে গেল।

অঙ্গলাবণি বলল, 'টেলিফোন শেষ হয়েছে।'

সঙ্গে-সঙ্গে পরদাটাও মিলিয়ে গেল। দেওয়ালটা আবার দেওয়ালের মতো হয়ে গেল। কথা-বলা-টেলিফোন বলল, 'ধন্যবাদ।'

এবার স্নিগ্ধপ্রভাতের দিকে ফিরে তাকাল অঙ্গলাবণি ঃ 'উনি ডক্টর নীতিনপ্রকাশ। তোমার চিকিৎসা করছেন...।'

স্নিগ্ধপ্রভাত হাসল ঃ 'ভুল বললে। আমি এখন তোমার চিকিৎসায় আছি।'

অনেক পরে, অঙ্গলাবণি 'টা-টা' করে অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর, স্নিগ্ধপ্রভাতের খেয়াল হল ওরা হঠাৎই 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে নেমে এসেছে। কিন্তু এরকম হঠাৎ নেমে এলেও ওরা কেউই কোনও হোঁচট খায়নি।

আচ্ছা, এটা কি নামা, না ওঠা?

অঙ্গলাবণি চলে যাওয়ার পর স্নিগ্ধপ্রভাতের মনখারাপ লাগছিল। এত বড় শৌখিন ফ্ল্যাটে ভীষণ একা-একা লাগছিল।

সুপর্ণলতিকাকে একটা ফোন করলে কেমন হয়। কী করছে ও এখন?

সুতরাং ডাইনিং হলে টেলিফোনের কাছে গিয়ে ও বলল, 'একটা ফোন করব।'

বলামাত্রই টেলিফোন জবাব দিল, 'কত নাম্বার বলো...।'

নম্বরটা ঠিকমতো মনে পড়ছিল না। কেমন যেন ঝাপসা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। স্নিগ্ধপ্রভাতের মাথা টিপটিপ করছিল।

শেষপর্যন্ত মরিয়া হয়ে একটা নম্বর বলল. স্নিগ্ধপ্রভাত।

নম্বরটা বলা শেষ হতে-না-হতেই ও-প্রান্তে রিং বাজতে শুরু করল।

রিং হয়েই চলল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা সত্ত্বেও কেউ ফোন ধরল না। নিশ্চয়ই সুপর্ণলতিকা বাড়িতে নেই—কোথাও বেরিয়েছে। অথবা নম্বরটাই ভুলভাল হয়েছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্নিগ্ধপ্রভাত বলল, 'লাইন ছেড়ে দাও।'

কথা-বলা-টেলিফোন লাইন কেটে দিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ।'

দু-সপ্তাহের মধ্যেই অঙ্গলাবণি স্নিগ্ধপ্রভাতের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। ও চোখের আড়াল হলেই স্নিগ্ধপ্রভাতের অন্তরে অসহায় পিপাসা জেগে ওঠে। এক অদ্ভুত টান ওকে অঙ্গলাবণির পরাধীন করে তোলে। সে-কথা একদিন, এক দুর্বল মুহূর্তে অঙ্গলাবণিকে বলেও ফ্যালে।

ইলেকট্রনিক অরগ্যানের মতো মিষ্টি শব্দের ঢেউ খেলিয়ে হেসে ওঠে অঙ্গলাবণি। তারপর বলে, 'এ কী ছেলেমানুষি! ডক্টর নীতিনপ্রকাশকে তোমার এই ইলিউশানের কথা বলতে হবে।'

'ইলিউশান! মায়া! তোমাকে মনে-মনে চাওয়াটা স্রেফ মায়া! সত্যি নয়?'

'কী জানি! ডক্টর হয়তো তা-ই বলবেন।'

'এই যে তোমাকে ছুঁতে না পেলে আমার মন কষ্ট পাচ্ছে—এটাও মায়া?'

'হতেও তো পারে—।'

আচমকা স্নিগ্ধপ্রভাত অঙ্গলাবণির দিকে ঝুঁকে পড়ল। আকুলভাবে জড়িয়ে ধরল ওকে। এবং ঠোঁটে চুমু খেল।

এক আশ্চর্য উত্তাপ এক শরীর থেকে অন্য শরীরে বয়ে গেল। উত্তাপ না হয়ে সেটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গও হতে পারে।

দুটো শরীর গলতে শুরু করল। কেউই আর নিজের আয়ত্বে ছিল না। মন যা-যা চাইছিল শরীর তা-ই করতে শুরু করল।

এতদিন ধরে যে-সংযম দুজনে মেনে চলছিল একটি মুহূর্তে সেটা মিথ্যে হয়ে গেল।

একসময়, খানিকটা শান্ত হওয়ার পর, স্নিগ্ধপ্রভাত বলে ফেলল, 'তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না।'

'সুপর্ণলতিকা?'

'অসম্ভব।'

হাসল অঙ্গলাবণি। বলল, 'আমার অবস্থাটাও একইরকম। এখন বুঝলাম তোমার মধ্যে কতরকম অস্থির পাগলামি লুকিয়ে আছে। শোভনসুন্দর কখনও আমাকে এরকম পাগলের মতো আদর করেনি।'

স্নিগ্ধপ্রভাতের কাছ থেকে সরে এল অঙ্গলাবণি। বলল, 'ডক্টর নীতিনপ্রকাশকে

একটা ফোন করি।'

সে-কথা শুনতে পেয়ে কথা-বলা-টেলিফোন বলে উঠল, 'নাম্বার বলো—।'

নম্বর বলল অঙ্গলাবণি। এবং ও-প্রান্তে ফোন বাজতে শুরু করল।

ডক্টর ফোন ধরতেই ঘরের দেওয়ালের একটা অংশ টিভির পরদা হয়ে গেল। সেখানে ডক্টর নীতিনপ্রকাশকে দেখা গেল।

'হাউ আর য়ু, মাই লেডি?'

'ফাইন। আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। আপনাকে এখুনি একবার আমার ফ্ল্যাটে আসতে হবে।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'খুব সিরিয়াস ব্যাপার। আপনি এলে পর বলব।'

নীতিনপ্রকাশ হাসলেন : 'কী, আমার এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল হয়েছে?'

'জানি না। আপনি এলে সব বলব।'

'টেলিফোন শেষ হয়েছে' বলে ফোন ছেড়ে দিল অঙ্গলাবণি। টেলিফোন ওকে যথারীতি ধন্যবাদ জানাল।

টেলিফোনের কথাবার্তা শুনে স্নিগ্ধপ্রভাত একটু অবাক হয়েছিল।

ওর যেন মনে হচ্ছিল, ডক্টর নীতিনপ্রকাশ আর অঙ্গলাবণির মধ্যে কী এক গোপন খেলা চলছে। আর সে-খেলাটা ওকে নিয়েই।

তা হলে কি নীতিনপ্রকাশই শোভনসুন্দর? আড়ালে থেকে পরকীয়া সহবাসের ওপরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন? যদি তা-ই হয়, তা হলে মানতেই হবে, এ বড় নিষ্ঠুর পরীক্ষা।

নিজেকে গিনিপিগ ভাবতে স্নিগ্ধপ্রভাতের বেশ খারাপ লাগল।

'কীসের এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল হয়েছে, অঙ্গলাবণি?'

উত্তর না দিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল। বলল, 'ডক্টর এলেই সব জানতে পারবে।'

ডক্টর নীতিনপ্রকাশ চেয়ারে বসে কৌতুকভরা চোখে তাকিয়ে ছিলেন স্নিগ্ধপ্রভাতের দিকে। ওঁকে ঠিক টিভি-পরদার রঙিন ছবির মতোই লাগছিল।

অঙ্গলাবণি তিনজনের জন্য কফি আর বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকল। ওঁদের সামনের টেবিলে সেগুলো সাজিয়ে দিয়ে ইশারায় চুমুক দিতে বলল। তারপর নিজে একটা কাপ তুলে ঠোঁটে ছোঁয়াল। সেই ঠোঁট, যেখানে স্নিগ্ধপ্রভাতের ঠোঁটের ছোঁয়া লেগে আছে।

'কফিটা কেমন হয়েছে?' ডক্টর স্নিগ্ধপ্রভাতকে জিগ্যেস করলেন।

'দারুণ!' মুখে তৃপ্তির শব্দ করল স্নিগ্ধপ্রভাত।

'আপনি কেমন আছেন?'

বেশ অবাক হয়ে নীতিনপ্রকাশের চোখে তাকাল স্নিগ্ধপ্রভাত ঃ 'কেন, ভালোই তো আছি!'

'আমরাও তা-ই চাই।' হাসলেন ডক্টর।

তারপর চশমাটা চোখ থেকে খুলে কাচদুটোয় মুখের ভাপ দিলেন। জামার আস্তিনে ঘষে কাচদুটো পরিষ্কার করলেন।

চশমা না থাকায় নীতিনপ্রকাশের চোখদুটো ছোট-ছোট দেখাচ্ছিল।

'স্নিগ্ধপ্রভাত, আপনাকে আজ আমি একটা নতুন টেকনোলজির কথা শোনাব—এম. এম. টেকনোলজি। যার পুরো নাম হল মেমোরি ম্যাপিং টেকনোলজি। এই টেকনোলজি দিয়ে আমাদের মেমোরিকে—মানে, স্মৃতিকে বদলে দেওয়া যায়।'

'তার মানে!'

'তার মানে আর কিছুই না...' চশমাটা নেড়েচেড়ে ঠিকঠাক করে চোখে বসালেন নীতিনপ্রকাশ ঃ 'আমাদের স্মৃতি হচ্ছে অনেকটা সাদা কাগজে পেনসিলের দাগের মতো। ব্রেনের কোটি-কোটি নিউরোনের মধ্যে স্মৃতি বাসা বেঁধে থাকে। আমাদের এই নতুন টেকনোলজি কাগজে আঁকা পেনসিলের দাগ সহজেই মুছে ফেলতে পারে, এবং এঁকে দিতে পারে নতুন পেনসিলের দাগ। আই মিন, টোটাল মেমোরির নানান অংশ আমরা খুশিমতো মুছে দিতে পারি। আবার আমাদের পছন্দমতো তৈরি করা মেমোরি—মানে, ফ্যাব্রিকেটেড মেমোরি—প্রিন্ট করে দিতে পারি আপনার মগজে।' হাসলেন নীতিনপ্রকাশ ঃ 'ইন ফ্যাক্ট আমি তাই করেছি। আপনার ওয়াইফ সুপর্ণলতিকার চেহারা আর আচরণের যে-স্মৃতি আপনার মেমোরিতে ছিল সেটা আমি টোটালি ইরেজ করে দিয়েছি। সেইজন্যেই নতুন এক লোকালিটির নতুন এই ফ্ল্যাটে ওকে দেখে আপনি চিনতে পারেননি। ওকে আপনি অন্য কারও স্ত্রী অঙ্গলাবণি বলে মেনে নিয়েছেন...।'

'স্টপ ইট, ডক্টর!' চিৎকার করে উঠল স্নিগ্ধপ্রভাত, 'প্লিজ ডোন্ট টক রাবিশ!'

ডক্টর নীতিনপ্রকাশ মুচকি-মুচকি হাসছিলেন। আর অঙ্গলাবণি—নাকি সুপর্ণলতিকা?—আড়চোখে স্নিগ্ধপ্রভাতকে দেখছিল।

'আপনি এই নতুন পরিচয়কে বিশ্বাস করেছেন। আমি ফ্ল্যাটে আসামাত্রই অঙ্গলাবণি আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে সব কথা বলেছে। কয়েক ঘণ্টা আগেই আপনি ওকে বলেছেন ঃ 'তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না।' যে-মুহূর্তে আপনি এ-কথা বলেছেন সেই মুহূর্তেই আমার এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল হয়েছে। আপনাদের ঠান্ডা হয়ে যাওয়া সম্পর্ক আবার বেঁচে উঠেছে। আপনি নিশ্চয়ই মানবেন, আই হ্যাভ রিপেয়ারড আ শ্যাটারড্ রিলেশানশিপ।' নীতিনপ্রকাশ কৌতুকের চোখে তাকালেন সুপর্ণলতিকার দিকে ঃ 'কী বলো, অঙ্গলাবণি?'

স্নিগ্ধপ্রভাতের সবকিছু কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। ওই তো বসে রয়েছে

অঙ্গলাবণি! কী সুন্দর ওর বসার ভঙ্গি! কী সুন্দর শান্ত ওর ভালোবাসা মাখানো মুখ! ও যে আসলে সুপর্ণলতিকা সেটা জানার পরেও স্নিগ্ধপ্রভাতের টানটা কমছে না কেন? এম. এম. টেকনোলজি কি এতই অদ্ভুত!

সুপর্ণলতিকার দিকে ফিরে হাসলেন নীতিনপ্রকাশ ঃ 'কী, এবারে তুমি খুশি তো! এবারে শুরু হোক তোমাদের মোস্ট হ্যাপি কনজুগাল লাইফ। যদি আবার কখনও বোর হয়ে যাও আমাকে শুধু একটা ফোন করে দিয়ো। তোমার মাথা থেকে হাজব্যান্ডের মেমোরি ম্যাপ বদলে দিয়ে ভালোবাসায় টইটম্বুর নতুন এক হাজব্যান্ড ফিরিয়ে দেব। আমার রিসার্চ টিমের লোকজন ওঁকে ফুঁ দিয়ে অ্যানেসথেসিয়া করে আবার তুলে নিয়ে আসবে আমার ল্যাবে। তারপর একটু এম. এম. টেকনোলজি— ব্যস, তার পরই পুরোনো মানুষটা একেবারে নতুন হয়ে যাবে।'

স্নিগ্ধপ্রভাতের ঘোর তখনও কাটেনি। ও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল নীতিনপ্রকাশের দিকে।

নীতিনপ্রকাশ হাত বাড়িয়ে স্নিগ্ধপ্রভাতের হাত চেপে ধরলেন। হেসে বললেন, 'ঘাবড়াবেন না, স্নিগ্ধপ্রভাত। যদি সুপর্ণলতিকা—মানে, এই অঙ্গলাবণি—' আঙুল তুলে অঙ্গলাবণিকে দেখালেন তিনি ঃ 'বোর হয়ে যায়, তা হলে আপনিও আমাকে কনট্যাক্ট করতে পারেন। তখন স্নিগ্ধপ্রভাতকে পালটে রাজসম্রাট করে ওর কাছে আমি হাজির করব।' হাসলেন ডক্টর ঃ 'সমাজের যে-কোনও স্বামী-স্ত্রীর প্রবলেম সল্‌ভ করার জন্যে আমি এবং আমার এম. এম. টেকনোলজি সবসময় হাজির। অলওয়েজ অ্যাট ইয়োর সার্ভিস। আমার ফোন নাম্বার আর ফিজের ব্যাপারটা আপনি পরে আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে জেনে নেবেন। তবে মনে হয়, তার আর দরকার হবে না।'

নীতিনপ্রকাশকে স্নিগ্ধপ্রভাতের দেবতা বলে মনে হচ্ছিল।



জীবনের চাবিকাঠি

অফিসের কোলিগ বিনীতের কাছেই দোকানটার ঠিকানা পেয়েছিলাম। নাম 'রোবোটিক্স কর্পোরেশন'—হরেকরকমের রোবট পাওয়া যায় দোকানটাতে। শহরতলির কোন অঞ্চলে যেন ওদের নিজস্ব কারখানা আছে। সেখানে দক্ষ সব কারিগররা নিখুঁত কলকবজা আরও নিখুঁতভাবে জুড়ে-জুড়ে তৈরি করে অপূর্ব সব রোবট। সোজা কথায় 'জীবন্ত' খেলনা।

আমার কঠিন সমস্যার কথা শুনে বিনীত বলেছিল, দাদা, আপনি রোবোটিক্স কর্পোরেশনে যান, আপনার সব প্রবলেম ওরা সল্‌ভ করে দেবে।

বিনীতকে আমার সব কথা খুলে বলিনি। শুধু এটুকু বলেছিলাম, ভাই, সংসারের টানাপোড়েন আর সইতে পারছি না। এই জোয়াল যদি অন্য কারও গর্দানে জুতে দিতে পারতাম—!

খানিকটা হতাশা খানিকটা ঠাট্টা মিশিয়েই বলেছিলাম। কিন্তু ও ব্যাপারটা খুব সিরিয়াসলি নিয়ে রোবোটিক্স কর্পোরেশনের নাম-ঠিকানা আমাকে দিয়ে দিল।

আমার পাশের টেবিলে বিনীত কাজ করে। আমার ক্লান্ত ভঙ্গি, হতাশ ভাব, রোজই ওর নজরে পড়ে। দ্যাখে, আমি যন্ত্রের মতো পা চালিয়ে অফিসে আসি,

কাজ করি, ছুটি হলে আবার বাড়ির দিকে রওনা হই। আমার ভেতরের মানুষটা ধীরে-ধীরে যেন লোহালক্কর হয়ে যাচ্ছে।

এইসব লক্ষ করেই সেদিন ও চেপে ধরেছিল আমাকে ঃ দাদা, বলুন তো আপনার কী হয়েছে?

আর তারপরই রোবোটিক্স কর্পোরেশনের নাম-ঠিকানা।

রোবোটিক্স কর্পোরেশনের ঠিকানাটা খুব সাদামাটা হলেও রাস্তাটা ঘোরপ্যাঁচের। অফিস কামাই করে নাম-ঠিকানা লেখা চিরকুট হাতে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা এ-রাস্তায় সে-রাস্তায় চক্কর মেরে চললাম। কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না দোকানটা। যাকেই জিগ্যেস করি সে-ই ধন্দে পড়ে যায়। মাথা চুলকোয়। ঠোঁট ওলটায়। কিংবা ইতস্তত করে বলে, অমুক রাস্তার শেষে দেখুন তো। তা না হলে তমুক গলির কাছাকাছি হবে।

এইভাবে হন্যে হয়ে ঘুরপাক খেয়ে চলেছি, হঠাৎই একটি লোককে দেখে মনে ধরল। বিনীতের মতোই খুশিতে টগবগ করছে সে। চোখে-মুখে জীবন উপভোগের ফুর্তির ছটা। তাকে ঠিকানাটা দেখাতেই সে বলে উঠল, ও, রোবোটিক্স কর্পোরেশন? এই তো, ওই রাস্তা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে ডানদিকের গলিটা ধরুন। তারপর...।

এত সহজে ঠিকানাটা সে বলে দিল যেন দোকানটা তার কতদিনের চেনা। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে চিনিয়ে দেওয়া পথে রওনা হলাম। লোকটা কোমরের কাছে হাত দিয়ে কী একটা ঠিক করতে-করতে চলে গেল। একইসঙ্গে ঠোঁটে শিস বাজিয়ে গানের সুর তুলছিল সে।

রোবোটিক্স কর্পোরেশনের দরজায় হাজির হয়ে অবাক হলাম।

এ কী জরাজীর্ণ করুণ অবস্থা। দোকানের ফুটপাঁচেক চওড়া দরজা দুটো পুরোনো বাড়ির মাঝে চিড়েচ্যাপটা হয়ে আছে। দরজার মাথায় রংচটা তোবড়ানো কাত-হয়ে-থাকা সাইনবোর্ড। দোকানের নামের অর্ধেক অক্ষর মুছে গেছে। ভেতরে ঢোকার সিঁড়ির ধাপগুলোও ভাঙাচোরা। সব মিলিয়ে দোকানটা এখনও চালু, না পরিত্যক্ত, সেটা বোঝাই মুশকিল। কিন্তু এতদূর এসে তো ফিরে যাওয়া যায় না! অতএব হতাশ ভাবটা ঝেড়ে ফেলে দোকানে ঢুকলাম।

সদর পেরোতেই আধো-আঁধারি একটা গলিপথ। দুপাশে নোনাধরা স্যাঁতসেঁতে দেওয়াল। নীচের ঠান্ডা মেঝে যেন জুতোর সোল ভেদ করে পায়ের চেটোয় বরফের ছুঁচ বিঁধিয়ে দিচ্ছে।

কিছুটা এগিয়ে গলিপথটা বাঁ-দিকে বাঁক নিয়েছে। সেখানে আর-একটা দরজা।

সেই খোলা দরজা পেরিয়েই রোবোটিক্স কর্পোরেশনের দোকান-ঘর।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই আর-এক প্রস্ত অবাক হলাম।

কম করেও চল্লিশ ফুট বাই পঞ্চাশ ফুট একটা বিশাল ঘর। তার সিলিং অন্তত বিশ ফুট উঁচুতে। অপরূপ রঙিন নরম আলোয় দোকান-ঘরে একটা মায়াময় পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ঘরের একপাশের দেওয়ালে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে থরে-থরে পুতুল। মানুষের মাপে তৈরি। নিখুঁত। তাদের চেহারা এত জীবন্ত যে, মনে হয় এক্ষুনি হাত-পা নেড়ে শোকেসের বাইরে বেরিয়ে আসবে। হেসে জিগ্যেস করবে, কী খবর? ভালো আছেন?

তারপরই চোখ চলে গেল দোকানের দেওয়ালে, সিলিংয়ে। অপূর্ব সূক্ষ্ম সব প্রাচীন কারুকাজ। যেন দক্ষ শিল্পীর হাতে গড়া ঐতিহ্যমণ্ডিত কোনও মন্দিরের অভ্যন্তর। বারবার মুগ্ধ চোখে দেখেও আশ মেটে না।

মসৃণ মার্বেল পাথরের মেঝেতে পা ফেলে এগিয়ে গেলাম কাউন্টার লক্ষ্য করে। কাউন্টার বলতে একটা বেদি। কারুকাজ করা ভেলভেট কাপড়ে মোড়া। তার ঠিক পেছনে আর-একটা খাটো বেদিতে পদ্মাসনে বসে একজন মানুষ। ফরসা রং। মুণ্ডিত মস্তক। পরনে গেরুয়া বসন। কাউন্টারের একপাশে ধাতব ধূপদানিতে পাঁচটি মোটা-মোটা ধূপকাঠি জ্বলছে। তাদের সুবাসে দোকানের পবিত্র পরিবেশে যেন আরও পবিত্র কোনও ছোঁওয়া লেগেছে।

আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এ কি রোবোটিক্স কর্পোরেশন, না কোনও ধর্মীয় আশ্রম! বিনীত আমাকে ভুল ঠিকানা দেয়নি তো! কিন্তু কী করেই বা হবে? এত নিশ্চিত ভঙ্গিতে ঠিকানাটা ও আমাকে লিখে দিল...।

আরও কিছু ভেবে ওঠার আগেই কাউন্টারে বসা সন্ন্যাসী অথবা দোকানদার স্পষ্ট উচ্চারণে আমাকে বললেন, চিন্তা করবেন না। ঠিক দোকানেই আপনি এসেছেন। বলুন, কী ধরনের রোবট আপনার চাই?

বিশাল দোকান-ঘরের কারুকাজ করা দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে তাঁর কণ্ঠস্বর গমগম করতে লাগল।

আমি বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে মনে সাহস জোগালাম। তারপর বললাম, ঠিক আমার মতো একটা রোবট আমাকে দিতে পারেন?

সংসারধর্মে ক্লান্ত বুঝি?—স্মিত হেসে সন্ন্যাসী প্রশ্ন করলেন।

আমি থতমত খেয়ে গেলাম। কী করে উনি টের পেলেন মনের কথা? কোনওরকমে বললাম, হ্যাঁ, প্রভু, ভীষণ ক্লান্ত। এ-বোঝা আর বইতে পারছি না।

কী করে জানি না মুখ দিয়ে 'প্রভু' শব্দটা বেরিয়ে গেল। দোকান-ঘরের ওই অদ্ভুত পরিবেশ হয়তো আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

সন্ন্যাসী আবার হাসলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আমার চোখে চোখ রাখলেন। কী তেজোদীপ্ত দৃষ্টি! আমি ক্রমশ সম্মোহিত হয়ে পড়ছিলাম। মানুষটা যেন আমার ভেতরটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়ে নিচ্ছিল।

একটু পরে তিনি বললেন, আপনার সম্পর্কে যেটুকু জানার জেনে নিলাম। আপনার মতো রোবট তৈরি করতে এখন আর কোনও অসুবিধে নেই। দয়া করে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন।

কথা শেষ করে সন্ন্যাসী ভদ্রলোক বেদির আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। পেছনে লাল রঙের ভেলভেটের একটা ভারী পরদা ঝুলছিল। সেটা সরিয়ে আমার চোখের আড়ালে চলে গেলেন।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমি রীতিমতো হকচকিয়ে যাচ্ছিলাম। সন্ন্যাসী অদৃশ্য হতেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবতে চেষ্টা করলাম, এরপর কী ঘটতে পারে। কই, বিনীত তো আমাকে বলেনি যে, এঁরা সঙ্গে-সঙ্গেই রোবট দিয়ে দেয়! তা ছাড়া দাম কত তা ও জানি না। শেষকালে অপ্রস্তুতে পড়ব না তো?

একটু পরেই পেছনের পরদা সরিয়ে সন্ন্যাসী বেরিয়ে এলেন। হাতে হুবহু আমার মতো দেখতে প্রমাণ সাইজের একটি রোবট। আমার দিকে এগিয়ে আসতে-আসতে বললেন, মিছিমিছি দাম নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। আমরা রোবটের জন্যে কোনও দাম নিই না।

দাম নেন না?—বিস্ময়ের ধাক্কায় প্রশ্নটা জিভে জড়িয়ে যেতে চাইল।

সন্ন্যাসী ঠোঁটে হাসলেন ঃ না। কারণ মানুষের উপকার করাই আমাদের ব্রত।

রোবটটা এনে কাউন্টারের ওপরে শুইয়ে দিলেন তিনি। তারপর পুতুলটার কোমরের কাছে হাত নিয়ে কী যেন করতে লাগলেন। অনেকটা চাবি ঘোরানোর মতো কর্‌কর্‌ শব্দ হচ্ছিল।

কাজ শেষ হলে সন্ন্যাসী বললেন, ব্যস, দম দেওয়া হয়ে গেছে। নিন, আপনার রোবট তৈরি।

কিন্তু...কিন্তু দম ফুরিয়ে গেলে?

সন্ন্যাসী হাসলেন। বললেন, চিন্তার কোনও কারণ নেই। আমরা যে-দম দিয়ে দিই তাতে একটা পুতুলের গোটা জীবন চলে যায়। দম ফুরিয়ে গেলেই তার জীবনের খেলা শেষ। তবে মাঝে-মাঝে দম দেওয়ার চাবিটা গোলমাল করে, আটকে যায়। সেটা মাঝে-মাঝে দেখতে হয়, পরিষ্কার রাখতে হয়। সে-কাজ রোবট নিজে-নিজেই করে নেয়। তার পরেও কোনও অসুবিধে হলে আমরা তো রয়েছি—।

রোবটটা আমার সামনে মেঝেতে দাঁড় করিয়ে দিলেন তিনি। আরে, কী আশ্চর্য! ওটা যে শুধু হুবহু আমার মতোই দেখতে তা নয়, ওর পরনের পোশাকও হুবহু আমার পোশাকের মতো! যাক, ভালোই হল। এই মুহূর্ত থেকেই আমার

রোজকার জীবনের জোয়ালে রোবটটাকে জুতে দেওয়া যাবে।

বিচিত্র দোকানিকে ধন্যবাদ জানিয়ে রোবটটার হাত ধরে দোকান-ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম। চৌকাঠ ডিঙোনোর সময়ে একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে ছিলাম। দেখলাম, তিনি চোখ বুজে ধ্যানের ভঙ্গিতে পদ্মাসনে বসে। তাঁর মাথার চারপাশে রঙিন আলোময় এক অদ্ভুত দ্যুতি। আর একইসঙ্গে অতি মৃদুলয়ে ভেসে আসছে স্তোত্র পাঠের শব্দ। প্রতিধ্বনিময় মন্দ্র স্বরে কেউ স্তোত্র পাঠ করছে। আশ্চর্য! এই রোবোটিক্স কর্পোরেশনের প্রকৃত স্বরূপ কী!

আমি হয়তো আরও কিছু ভাবছিলাম, আমার পুতুল-প্রতিবিম্ব আমার কনুই ছুঁল। বলল, চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

আমি চমকে পাশ ফিরে তাকালাম। পুতুল হাসছে। ভীষণ খুশি তার মেজাজ। কই, আমি তো এমন করে হাসতে পারি না! তবে আজ থেকে বোধহয় পারব।

আমরা দুজনে রোবোটিক্স কর্পোরেশন ছেড়ে বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে এলাম।

এখন আমি বেশ আনন্দে আছি। মনে কোনও দুঃখ নেই, কোনও কষ্ট নেই, কোনও ক্লান্তি নেই, কোনও হতাশা নেই। আমি আপনমনে পথে-পথে ঘুরে বেড়াই। কখনও নদীর তীরে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখি।

আমার পুতুল দিব্যি কাজ করে চলেছে।

আমার বউ ওকে স্বামী বলে মেনে নিয়েছে। আমার ছেলেমেয়েরা ওকে বাবা বলে মেনে নিয়েছে। আমার অফিসের সবাই ওকে মেনে নিয়েছে সহকর্মী বলে। আমার বাড়িওয়ালাও পুতুলটাকে তার ভাড়াটে হিসেবে মেনে নিয়েছে। সোজা কথায়, মানুষ বদলের ব্যাপারটা কেউই টের পায়নি।

এদিকে পুতুলটার সঙ্গে আমার এক আশ্চর্য যোগাযোগ রয়ে গেছে। ওর কাছাকাছি আমি থাকি না। সম্ভবও নয়। কিন্তু ওর প্রতিটি কার্যকলাপ আমি মনের পরদায় স্পষ্ট দেখতে পাই। শুনতে পাই প্রতিটি কথা। সময়ে-সময়ে মনে হয় আমি যেন অশরীরী হয়ে ওর পাশে-পাশে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। কী করে এই ক্ষমতা আমার মধ্যে জন্ম নিল জানি না। একেই কি অতি-দৃষ্টি আর অতি-শ্রবণ বলে? নাকি এ-এক মন্ত্রশক্তি?

সেই মন্ত্রশক্তির জোরেই আমি দেখি অফিসে বিনীত ওকে জিগ্যেস করছে: কী দাদা, রোবোটিক্স কর্পোরেশনে গিয়েছিলেন?

তখন পুতুলটা জবাব দিয়েছে, হ্যাঁ, ভাই, গিয়েছিলাম। আর দারুণ উপকার পেয়েছি। তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।

বিনীত মুচকি হেসে বলেছে, হুম, সেইজন্যেই আপনাকে এত হাসিখুশি দেখাচ্ছে।

জীবনটা এভাবেই বেশ চলছিল। কিন্তু হঠাৎই একদিন গোলমাল বাধল।

ভোরবেলা পার্কে পায়চারি করছি, এমন সময় রোবটটা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। থমকে তাকিয়ে দেখি ওর চোখে জল। মুখে বলিরেখা। আমাকে দেখে কাতর স্বরে বলল, আমি আর পারছি না।

আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম। রোবট বলে কী! রোবট যে যন্ত্র! তাকে তো পারতেই হবে!

সে-কথাই ওকে বললাম। উত্তরে ও বলল, বিশ্বাস করো, এরকম যান্ত্রিক জীবন আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠছে।

যন্ত্রের আবার যান্ত্রিক জীবন! আমি যে কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এখন উপায় কী? রোবটটাকে বললাম, আমাকে তুমি এর মধ্যে আর টানাটানি কোরো না। যেমন করে পারো চালিয়ে নাও।

রোবট অনেকক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পায়ের নখ দিয়ে পার্কের মাটি খুঁটল। তারপর মুখ কালো করে চোখ মুছতে-মুছতে চলে গেল।

লুকিয়ে লাভ নেই, ওর কষ্টের কথা শুনে আমার আনন্দে কিছুটা ভাটা পড়ল। কিন্তু আমার তো আর কিছু করার নেই! অতএব আবার পায়চারি শুরু করলাম।

ক্রমে দিন কেটে যায়, মাস কেটে যায়, বছর কেটে যায়। রোবট মাঝে-মাঝেই লুকিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে যায়। শুনিয়ে যায় ওর অসহনীয় জ্বালা-যন্ত্রণার কাহিনি। এক-একদিন তীব্র ক্ষোভে বলে ওঠে, আমি সুইসাইড করব।

কিন্তু আমি জানি, আত্মহত্যা অত সহজ নয়। সহজই যদি হবে তা হলে আমি আত্মহত্যা করতে পারি না কেন? সেই সময়ে হঠাৎ করে বউ-ছেলেমেয়েদের মুখগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে যে! সরল সাদামাটা বউ আর নিষ্পাপ বালক-বালিকার মুখ। ওঃ ভগবান!

রোবট আসে-যায়। কখনও দেখা করে নদীর ধারে, কখনও পার্কে, কখনও বা গ্রামের মেঠো পথে। ও ঠিক জানে কখন কোথায় গেলে আমার দেখা পাওয়া যাবে। কিন্তু দেখা করে ওর উপকার কিছু হয় না। তবে জানি না, ওর দুঃখ-কষ্টের কাহিনি আমাকে শুনিয়ে ওর মন কিছুটা হালকা হয় কি না।

একটা জিনিস আমি বেশ অবাক হয়ে লক্ষ করছি। রোবটের চোখে-মুখে ক্রমেই ক্লান্তি আর হতাশার ছাপ পড়ছে। বউ-ছেলেমেয়েকে লুকিয়ে ও যখন-তখন কান্নাকাটি করে। রোবোটিক্স কর্পোরেশনে যাওয়ার আগে আমার যেরকম দশা হয়েছিল ঠিক সেইরকম। আশ্চর্য। যন্ত্রের কি অনুভূতি আছে? হয়তো আছে। নইলে

একদিন ওর হাত কেটে গিয়ে রক্ত পড়েছিল কেমন করে? কেনই বা ওর চোখে-মুখে তখন ফুটে উঠেছিল যন্ত্রণার অভিব্যক্তি? মনে পড়ছে, বিনীত বলেছিল, রোবোটিক্স কর্পোরেশন একেবারে জীবন্ত রোবট তৈরি করে। হয়তো এও তাই।

একদিন শুনি আমার পুতুল অফিসে বিনীতকে বলছে, ভাই, সংসারের টানপোড়েন আর সইতে পারছি না। এই জোয়াল যদি অন্য কারও গর্দানে জুতে দিতে পারতাম!

শুনে আমি চমকে উঠলাম। বছরকয়েক আগে ঠিক এই কথা তো বিনীতকে আমি বলেছিলাম! বিনীত তখন রোবোটিক্স কর্পোরেশনের নাম-ঠিকানা পুতুলটাকে দিল। বলল, দাদা, আপনি রোবোটিক্স কর্পোরেশনে যান, আপনার সব প্রবলেম ওরা সল্‌ভ করে দেবে।

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, এরপর কী-কী ঘটবে। এবং তাই ঘটল।

কয়েক বছরের পুরোনো দৃশ্যগুলো আমার চোখের সামনে আবার নতুন করে অভিনীত হতে লাগল। শুধু অবাক লাগল একটা কথা ভেবে। রোবোটিক্স কর্পোরেশনের নাম-ঠিকানা তো রোবটের অজানা ছিল না! তা হলে সেটা আবার বিনীতের থেকে নেওয়া কেন? অবশ্য এও হতে পারে, সংসারের ক্লান্তিকর জোয়াল টেনে-টেনে বেচারা নিজের জন্মদাতার নাম-ঠিকানাই ভুলে গেছে।

এর কিছুদিন পরে বিকেলে নদীর ধারে রোবটের সঙ্গে দেখা। ও আজ ভীষণ খোশমেজাজে রয়েছে। আমাকে দেখেই ও বলল, আজ থেকে আমি মুক্ত।

আমি সপ্রশ্নে তাকাতেই ও হাঁপ ছেড়ে বলে উঠল ঃ রোবোটিক্স কর্পোরেশন থেকে একটা রোবট নিয়ে আমার জায়গায় ফিট করে দিয়ে এসেছি। কী মজা!

আমি অবাক হয়ে সংসারমুক্ত রোবটটাকে দেখতে লাগলাম। ও তখন কোমরে হাত দিয়ে কী একটা জিনিস খুটখাট করতে লাগল।

আমি জিগ্যেস করলাম, কী করছ?

চাবিটা দেখছি। ওটা তো আর কোনও কাজে লাগবে না।

তারপরই আমাকে চমকে দিয়ে ও জিগ্যেস করল ঃ তোমার চাবিটার কী অবস্থা?

আমি বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেলাম। যান্ত্রিকভাবে আমার ডানহাত চলে গেল কোমরের কাছে। চাবিটা হাতে ঠেকল।

চাবি! সত্যিই এটা চাবি? আমিও তা হলে একটা যন্ত্র। রোবোটিক্স কর্পোরেশনের তৈরি।

এতগুলো বছর আমি কার হয়ে প্রক্সি দিচ্ছিলাম? কার সংসারের জোয়াল

ঘাড়ে করে ঘানির বলদের মতো পাক খাচ্ছিলাম?

আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। রোবট সেটা দেখে অবাক হল।

পশ্চিমের আকাশ লাল টকটকে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আমার মুখে, আমার পুতুলের মুখে লাল আলোর আভা। সেই আভা বহমান নদীর জলেও।

রোবট বলল, তুমি কাঁদছ কেন?

আমি জবাব দিলাম, কাঁদছি সেই আসল মানুষটার জন্যে। সে তা হলে কী কষ্টেই না ছিল বলো তো। কিন্তু সে গেল কোথায়?

আমার চেতনায় সব একে-একে ভেসে উঠছিল। মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসী, সুগন্ধী ধূপের সুবাস, অপরূপ রঙিন আলোর ছটা, মন্দ্র স্বরে স্তোত্র পাঠ—সব। আমি—আমরা তা হলে নিছকই অকিঞ্চিৎকর নকল মানুষ। নিজেদের ঘৃণা করা ছাড়া আর আমাদের আর কোনও উপায় নেই। হা ঈশ্বর!

সেদিন নদীর ধারে অস্তায়মান সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে আমরা দুজনে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিলাম।



হৃদয়নাথ

এক ঃ প্রথম রাত ও বিপন্নতা

আমি হৃদয়নাথ চৌধুরী, ভয় পেয়েছি। কারণ ঘটনাটা এই নিয়ে তৃতীয়বার ঘটল। প্রথমবারে আমি ততটা বিচলিত হইনি। ব্যাপারটাকে আমার মতো উত্তর পঞ্চাশ কোনও প্রৌঢ়ের প্রতিবন্ধী কল্পনা ভেবে স্বস্তি পেয়েছি। দ্বিতীয়বারে নিজের শরীরটাকে দায়ী করেছি। এবং দায়ী করেছি সাগরপারের সেই দক্ষ চিকিৎসক মাইকেল ইলিস ডিবেকিকে। কিন্তু তৃতীয়বারে আর কোনও সন্দেহ থাকেনি। সুষম ধকধক ছন্দটা বিশ্রীভাবে কেটে গেছে। আবার যে শ্রান্ত হৃৎপিণ্ডটা পথ চলতে পারবে কয়েক মুহূর্ত সেরকম কোনও ইঙ্গিত পাইনি। অসহ্য যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে আমার প্রাচীন শরীরের কাঠামো প্রচ্ছন্ন ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে। উন্মত্ত হাতির পাল দুরন্ত ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে বুকের ভেতরে। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে মানসীকে ডাকতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু জিভ ও স্বরযন্ত্র যুগপৎ অসহযোগ ঘোষণা করেছে। আমার হিসেবে সংকটমুহূর্ত যখন প্রায় উপস্থিত, ঠিক তখনই কাশীকান্তের হৃৎপিণ্ড আবার চলতে শুরু করেছে। এবং আমি, হৃদয়নাথ, পুনর্জীবন ফিরে পেয়েছি।

একটা ভিনদেশি প্রত্যঙ্গ নিয়ে কোনও মানুষের বেঁচে থাকাটা যে এত উৎকণ্ঠিত হতে পারে সেটা আগে কোনওদিন বুঝিনি। তাই খুব সহজেই পাড়া-প্রতিবেশী, পরিবারবর্গ এবং ডাক্তারদের অদ্বিতীয় উপদেশে সম্মত হয়েছিলাম হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট করতে। তারপর শুরু হয়েছিল চিঠিপত্র বিনিময়, বিভিন্ন স্তরের কর্তাব্যক্তিদের কাছে হাঁটাহাঁটি, সব শেষে আমেরিকার হিউস্টন থেকে পাওয়া গেল ডক্টর ডিবেকির সম্মতি।

মানসীকে একা রেখে আমি জেদ করে একাই রওনা হয়েছিলাম হিউসটনের মেথডিস্ট হসপিটাল অভিমুখে। সেখানে বিচিত্র ডাক্তারি ক্রিয়াকলাপের পর আমি 'সফল' রোগী হিসেবে ঘোষিত হলাম। আমার উত্তর-অপারেশান জীবনযাত্রা কীভাবে বিভিন্ন দিক থেকে সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন, তার উপদেশও পেলাম। কোনওরকম সংক্রামক ব্যাধি, এমনকী সাধারণ সর্দি-কাশিতেও আমার অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে উঠতে পারে—কারণ 'ইমিউনো সাপ্রেসিভ ড্রাগ' দিয়ে-দিয়ে আমার শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। নইলে একটা অচেনা হৃৎপিণ্ডকে আমার দেহ বিনাযুদ্ধে মেনে নিত না।

হাসপাতালে থাকাকালীন বহুবার আমি জানতে চেয়েছি, কে সেই দেবতা, যে তাঁর অমূল্য হৃৎপিণ্ডটি আমার দীর্ঘতর জীবন কামনায় দান করছে। কিন্তু সঠিক-স্পষ্ট উত্তর কেউই দিতে পারেনি। কিন্তু শেষ দিন, অর্থাৎ, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে স্বদেশে রওনা হওয়ার দিন, সেই দেবতার পরিচয় পেলাম। যে আমাকে কবচকুণ্ডল দান করেছে সেই কর্ণের নাম কে. রায়। বিদেশি রীতির শিকার হয়ে ওই সংক্ষিপ্ত নামটুকুই জানা গেছে। যখন প্রশ্ন করেছি, কেন এই অযাচিত দান, উত্তর পেয়েছি, সেই ভদ্রলোক নাকি কোনও দুরারোগ্য অসুখে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছিলেন। জনৈক দুর্বল-হৃদয় বাঙালির জন্য একটি হৃৎপিণ্ড প্রয়োজন, এই খবরটি শুনে 'ডোনর' হওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন।

এতদূর শুনেও আমার মনে কোনওরকম সন্দেহ জাগেনি। কিন্তু একবারে শেষ মুহূর্তে একজন তরুণ সহকারী ডাক্তার হঠাৎ আমার কাছে জানতে চেয়েছিল, 'মিস্টার রায় কি আপনার চেনা?'

আমি কোনও উত্তর দিইনি।

আকাশপথে যখন সযত্ন-লালিত হয়ে ফিরে আসছি, তখনও আমার মনে সেই প্রশ্ন ঃ মহান ব্যক্তিটি কি আমার পূর্ব পরিচিত? নাকি, তাঁর এই মহত্বের মূলে শুধুই স্বজনপ্রীতি?

প্রশ্নের উত্তর নানান সম্ভাবনার জটিল জলস্রোতে ভেসে গেছে। তখনও আমি বুঝিনি, কাশীকান্ত নিজের হৃদয়ের বিনিময়ে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।

স্বদেশে ফিরে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে নতুন জীবন শুরু করেছি। ডাক্তারের পরামর্শ

মতো সবরকম ধকল ও উত্তেজনা সুহিসেবিভাবে এড়িয়ে চলি। এমনকী আমার চেয়ে বারো বছরের ছোট ঋতুমতী মানসীর প্রলোভনও জয় করতে চেষ্টা করি। কখনও-কখনও সফল হই। কখনও, স্বাভাবিকভাবেই, হই না। এবং মানসীর দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়। প্রমাণ পাই, আমাকে ও এখনও ভালোবাসে।

প্রথম ঘটনা ঘটল সাতদিন আগে।

হিউস্টন ও হাসপাতাল আমার কাছে এখন ধূসর স্মৃতি। তবে প্রতিস্থাপন অপারেশানটা যে সত্যি তার প্রমাণ পাই হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকুনি শুনলে। মিনিটে মাত্র তেষট্টিবার। বুকের ভেতরে বসানো পেসমেকারের সহযোগিতা না পেলে কে. রায়ের হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা নিঃসন্দেহে হ্রাস পেত। সুতরাং এই মুহূর্তে আমি জীবিত, সুস্থ, সবল। খোলা বারান্দায় বসে দেখছি পশ্চিমের আকাশে সূর্য ডুবে যাচ্ছে। ঘোলাটে আকাশে পাখিদের দিশেহারা ব্যস্ততা।

আমার হাতে ধরা চায়ের কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। ভাবছিলাম, মানসীর কথা, আমার নিজের কথা। এবং আমাদের সন্তানহীনতার কথা। বিয়ের ঠিক পরের বছরগুলোতে যে সন্তান-স্পৃহা জন্ম নিয়েছিল, আজ প্রৌঢ়ত্বের দোরগোড়ায় এসে সেই স্পৃহা সন্তানলিপ্সায় পরিণত হয়েছে। বাধ্যতামূলক এই অবসরজীবন এখন আরও বেশি ক্লান্তিকর মনে হয়।

ভাবনায় পূর্ণচ্ছেদ টেনে হঠাৎই স্তব্ধ হল আমার বদ্‌লি হৃৎপিণ্ড।

অসংখ্য ছুঁচ ফোটানোর জ্বালা অনুভব করার সঙ্গে-সঙ্গে হাতের পেয়ালা-পিরিচ সশব্দে ছিটকে পড়ল। ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। মনে আছে, অকল্পনীয় আয়াসে মানসীকে ডাকতে পেরেছিলাম। তারপর সুখী-কেদারা থেকে আমি নিজেই টলে পড়ে গেছি।

মানসীর ভয়ার্ত চিৎকারে আমার সংবিৎ ফিরল। হৃৎপিণ্ড চলছে—এই তথ্যটুকুই আমার মস্তিষ্ক সর্বাগ্রে আহরণ করে আমাকে জানাল। চোখের সামনে বড় সিঁদুরের টিপ, এলোমেলো ঘন চুল, ফরসা ডিম্বাকৃতি ভাঁজহীন মুখ। ঝাপসা থেকে ক্রমে স্পষ্ট হল। মানসী।

উৎকণ্ঠাময় অভিব্যক্তি নিয়ে ও জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে? কোনও কষ্ট হচ্ছে? ডাক্তারবাবুকে খবর দেব?'

আমি আবার সুস্থ এবং স্বাভাবিক। সুতরাং গলার স্বরে ধৈর্য এনে বললাম, 'কিচ্ছু হয়নি, মানসী, কিচ্ছু হয়নি—।'

ও নিরস্ত হল। কিন্তু মনের খটকা দুজনের কারওরই কাটল না। অচেনা হৃৎপিণ্ডকে নিয়ে সামান্য হলেও চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘণ্টাদুয়েক নিরাপদে পার হওয়ার পর নিজের অনুভূতির ওপরে সন্দিহান হলাম আমি। হৃৎপিণ্ডটা সত্যি-সত্যিই কি থেমে গিয়েছিল? আমার মনের ভুল নয় তো? অন্য কোনও শারীরিক

যন্ত্রণাকে হয়তো ভুল বুঝেছি আমি...জানি না। যত সময় যেতে লাগল, আমার অনিশ্চয়তার দোলা কম্পাঙ্কে ততই ঊর্ধ্বগামী হয়ে উঠল। অবশেষে একরকম জোর করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঃ ব্যাপারটা পুরোপুরি আমার মনের ভুল।

দ্বিতীয় ঘটনা মাত্র দু-দিনের পুরোনো। এবং চরিত্রে প্রথম ঘটনারই পুনরাবৃত্তি, তবে অনেক বেশি ইঙ্গিতবহ।

গত পরশু রাতে দারুণ মেজাজে ছিলাম। কী এক অপ্রাকৃত কারণে মনের সবরকম অপচিন্তা উধাও হয়েছিল। রেডিয়ো শুনতে-শুনতে মানসীর সঙ্গে গল্প করছিলাম। এমনকী 'কে. রায় কে?' এই জাতীয় যমক অলংকার সহকারে অতিরিক্ত ঠাট্টাকেও প্রশ্রয় দিয়েছি। এবং মানসী সহধর্মিণী-সুলভ মন্তব্য করেছে, 'লোকটা নিশ্চয়ই তোমাকে চিনত। নইলে বলা নেই কওয়া নেই হুট করে অমন উপকার করে?'

আমি হেসেছি। সেই তরুণ ডাক্তারের মন্তব্য ভাসা-ভাসা মনে পড়েছে। হেসে বলেছি, 'কে. রায় কে তা কে জানে।' ঝুঁকে পড়েছি মানসীর কাছে। ওকে ছুঁয়েছি। পুণ্য স্পর্শে আমার প্রৌঢ় শরীর যেন পরম আশ্রয় পেল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই দ্বিতীয়বার!

ছুঁচ ফোটানোর যন্ত্রণা। শ্বাসকষ্ট। গলা শুকিয়ে কাঠ। মানসী সবকিছুই ধারাবাহিকভাবে দেখল। হতভম্ব ও বিস্ময়-প্রসারিত দু-চোখে অপলক দৃষ্টি। আমি, হৃদয়নাথ চৌধুরী, বেশ সময় নিলাম ধাতস্থ হতে। বললাম, 'কিছু হয়নি', আর একইসঙ্গে ভাবতে শুরু করলাম, ডিবেকির বদলে কেপটাউনের ক্রিশ্চান বার্নার্ড হয়তো আরও দক্ষ তথা সফল অপারেশান করতে পারতেন। নাকি, আমার এই প্রাচীন শরীরটাই কোনওরকম অপারেশানের লায়েক ছিল না?

সেই রাতে কে. রায় নামটা আমাকে জটিল রেখায় ভাবিয়েছে। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। অবশেষে নানান স্বপ্ন দেখে যখন কাকভোরে জেগে উঠেছি তখন কাশীকান্ত নামটা আমার মনের আটমহলা অট্টালিকায় লুকোচুরিরত।

কাশীকান্ত আমার যুবাবয়েসের বন্ধু ছিল। সুদীর্ঘ সাতাশ বছর ওর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। কিন্তু ও হঠাৎ স্বপ্নে নামটা জানিয়ে গেল কেন? তা ছাড়া, ওর পদবি কি রায় ছিল? কী জানি, মনে নেই। আতুর স্মৃতি আমাকে ঘিরে ধরে।

কাশীকান্ত...কাশীকান্ত...যদি সত্যিই কাশীকান্ত হয়? ঠিক আছে, তর্কের খাতিরে না হয় ধরেই নিলাম, এ-হৃৎপিণ্ড কাশীকান্তের। এবং আপন্ন মুহূর্তে অত্যন্ত দুর্লভ এক পুরস্কারে সে আমাকে পুরস্কৃত করেছে। এই পুরস্কারের কোনও বিকল্প নেই। তা হলে কি হৃৎপিণ্ডের এই অদ্ভুত আচরণের কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়? হয়তো না।

কাশীকান্ত বিজড়িত হয়ে দেড়দিন পার হয়ে গেছে। মানসীকে এসব জানিয়ে বিচলিত করিনি। আমার দৈনন্দিন কার্যকলাপের প্রতিটি ধাপে ভুলত্রুটি জাঁকিয়ে বসেছে। আমার স্থবির মন মহাস্থবির হয়ে পড়েছে। সেই বিক্ষিপ্ত মনস্কতার মধ্যে একটু আগে যখন মানসীর কাছ ঘেঁষে শুয়েছি, তখনই ঘটেছে তৃতীয়বার। এক পৌনঃপুনিক যন্ত্রণা যেন আমার দেহে স্থায়ী হয়ে যেতে চায়।

মানসী ঘুমিয়ে পড়েছিল। জাগেনি। রুদ্ধশ্বাস যন্ত্রণার অধ্যায়টুকু যখন পার হল, তখন আমি ঘামতে শুরু করেছি। দখিনের খোলা জানলা দিয়ে ছুটে আসা হুহু বাতাস, কিংবা জমিতে বিছিয়ে থাকা দুধের সরের মতো জ্যোৎস্নার আলো আমাকে শান্ত করতে পারেনি, আশ্বাস দিতে পারেনি। আমি, অবশেষে, ভয় পেয়েছি।

মানসীর গায়ে হাতে রেখে ভাবনার স্রোত যখন সিদ্ধান্তের মোহানা খুঁজে পেয়েছে তখন ধীরে-ধীরে উঠে বসেছি। ডক্টর ডিবেকির ওপর আমি এখন অবিশ্বাসী, পেসমেকার আমাকে আর নিরাপত্তার আশ্বাস দেয় না। কাশীকান্তের হৃৎপিণ্ডের শ্রান্ত দামামা মিনিটে পঞ্চান্নবার বেজে উঠে জানিয়ে দিচ্ছে, হৃদয়নাথ চৌধুরী, তুমি মোটামুটি বেঁচে আছ।

কাশীকান্তের হৃৎপিণ্ডের এই বেহিসেবি হঠকারিতার কারণ হয়তো আমি খুঁজে পেয়েছি। আমার শরীরে ওর অস্তিত্ব বেঁচে আছে। বিশেষ-বিশেষ মুহূর্তে সেই অস্তিত্ব স্তব্ধ হয়ে জানান দিচ্ছে। যে-হৃদয়কে আমি সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করে বুকের মধ্যে লালিত করে নিয়ে এসেছি, সে আমাকে হয়তো এইভাবেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। অবশ্য কাশীকান্তের হৃদয়ও তেমন একটা শক্তিশালী ছিল না। বরং বেশ দুর্বল ছিল। সুতরাং পথ চলতে-চলতে সে যে মাঝেমধ্যে হোঁচট খাবে সে আর আশ্চর্য কী! ওর হৃদয়ের দুর্বলতার কথা সবাই জানত। মানসীও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু ওকে এখনই কিছু বলছি না।

মানসীকে লতানে গাছের মতো অবলম্বন করে আবার শুয়ে পড়লাম। তন্দ্রা যখন ক্রমে গভীর হয়ে এল তখন ফিসফিস করে উচ্চারণ করলাম, 'কাশীকান্ত, মাঝে-মাঝে থেমে গিয়ে তোর একী ছলনা? কী চাস তুই?'

কাশীকান্তের হৃৎপিণ্ড কোনও জবাব দেয়নি। শুধু মিনিটে ষাটবার বেজে উঠে বলতে চেয়েছে, হৃদয়নাথ, তুমি বেশ ভালোই বেঁচে আছ!

দুই : কিছু স্মৃতি—পুনর্বিবেচনা

আজ সকালে খাওয়ার টেবিলে বসে মানসীর সামনে এই প্রথম কাশীকান্ত-প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছি। মানসী ঠোঁটের কাছে জলের গেলাস তুলেছিল, মুহূর্তে রাজা

ট্যান্টালাস হয়ে গেল। গেলাসের জল নিস্তরঙ্গ, যেমন ওর প্রাণবতী চোখ। শুধু অনুপুঙ্খ কাঁপন ধরেছিল ওর ঠোঁটে।

'মানসী, কাশীকান্তকে মনে পড়ে?'

অনেক দেরি করে, এবং অতি ধীরে, ওর মনের আয়না বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করে আমার মুখাবয়ব লক্ষ্য করে স্থাপিত হল।

'যে-হৃৎপিণ্ডটা আমার বুকের ভেতরে বেজে চলেছে, মানসী, সেটা হয়তো কাশীকান্তের—' কিছুক্ষণ নীরব থেকে সংযুক্ত করি, 'আচ্ছা, তোমার মনে আছে, ওর পদবি কি রায় ছিল?'

অসীম নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অদৃশ্য তরঙ্গ শরীরের প্রতিটি আনাচেকানাচে পৌঁছে দিয়ে সহজ হল মানসী। আমার বিশেষ পরিচিত তাচ্ছিল্য ও নিরাসক্ত ভাব মুখে এঁকে বলল, 'ঠাট্টা কোরো না।'

ও টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কাজে মনোযোগ দিল। আমি আশাবাদী চোখে ওর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম, তারপর একসময় পায়ে-পায়ে চলে এলাম শোওয়ার ঘরে।

ক্রমাগত চর্চায় কাশীকান্তের ধূসর স্মৃতি ধীরে-ধীরে পুনর্জীবন ফিরে পায়। অতীতের সখ্য বর্তমানের আঁচল ধরে চোখের সামনে ছায়াছবি হয়ে ওঠে। কাশীকান্ত মানসীকে চিনত, জানত। মহিলা-সকাশে ওর আচরণ ছিল আমাদের তুলনায় অনেক বেশি প্রগতিশীল। ওর সহজ মেলামেশাকে আমি বা আমরা—অনেক সময় দুর্বলতা ভেবেছি। হয়তো সেটা ভুল। কাশীকান্ত স্বদেশি ছিল, ফুটবল খেলা ভালোবাসত, মুষ্টিযুদ্ধের আসরে স্থায়ী দর্শক ছিল; অর্থাৎ, চকিত উত্তেজনা ওকে লোভাতুর করে তুলত। দীর্ঘ সাতাশ বছরে ও পালটেছিল কি না আমার জানা নেই। ফলে ওর সেই পুরোনো ছবিটাই বারবার অমলিন হয়ে ফুটে ওঠে। ওর যৌবন কালজয়ী।

সেই অনুপাতে যুবক আমি, হৃদয়নাথ চৌধুরী, ও মানসী অনেক বেশি অস্পষ্ট। মরচে পড়া লোহা যেমন তার রাসায়নিক পরিবর্তনের রূপ লঙ্ঘন করে নিজের গর্বময় অতীতকে খুঁজে নিতে পারে না, তেমনি আমি ও মানসী। সুদীর্ঘ সাতাশ বছরের সহবাসে আমরা, দুটো ভিন্ন-ভিন্ন মৌলিক পদার্থ, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এক অবিচ্ছেদ্য অচেনা যৌগে পরিণত হয়েছি। এখন অতীতের সেই মৌলিক যুবক-যুবতীকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা অযৌক্তিক। তবে, এটুকু স্পষ্টভাবে বলা যায়, মানসী কাশীকান্তকে মনে রেখেছে। সেটাই স্বাভাবিক।

ভাবতে অবাক লাগছে, সম্ভবত সেই চকিত উত্তেজনাকামী হৃৎপিণ্ড বর্তমানে আমার হৃদয়ে স্থাপিত। শত চিন্তা করেও কাশীকান্তের পদবি আমি মনে করতে পারছি না। মানসীর কি মনে আছে?

বুকের বাঁ-দিকে আলতো করে হাত রাখলাম। জীবন স্পন্দনশীল। কাশীকান্ত জীবিত। দুরারোগ্য ব্যাধি ওকে শেষ করে দিলেও ওর মহার্ঘ প্রত্যঙ্গ এখনও জীবিত। ও কেন, কখন, কীভাবে বিদেশে গিয়েছিল? কবে আক্রান্ত হল ওই দুরারোগ্য ব্যাধিতে?

এসব প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ও সত্যিই আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু।

ওকে নিয়ে আমি নানান কল্পনা করতে থাকি। মিথ্যে ঘটনা তৈরি করে আমার স্মৃতির ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলি। আমি আর কাশীকান্ত। কাশীকান্ত আর আমি। এক তরুণ ও এক প্রৌঢ়ের কিংবদন্তিসুলভ এক বন্ধুতা কোনও ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার দাবি করতে পারে। অতঃপর কাশীকান্তের সম্মানে আজকের দিবানিদ্রা বিসর্জন দিয়েছি।

বিকেলবেলা ওষুধ খাওয়ার প্রস্ত শেষ করে বারান্দায় দেওয়ালে ঝোলানো ছোট্ট আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। নিজেকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। ভাঁজের সংখ্যা এবং পাকা চুলের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি আমি আগে তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে লক্ষ করতাম। গত কয়েকবছর সে-অভ্যাস কাটিয়ে উঠেছি। তবে আয়নায় দেখা মুখটাকে আমার বরাবরই ভালো লাগে।

মুখের পর নজর নামিয়ে তাকালাম বুকের দিকে। অপারেশানের ক্ষতচিহ্ন খুবই সামান্য—সম্ভবত বিদেশি কারিগরির অগ্রগতির জ্বলন্ত প্রমাণ। আমার দৃষ্টি যেন বুক ভেদ করে অভ্যন্তরে পৌঁছে গেল। আমি কাশীকান্তকে দেখতে পেলাম। ও উল্লাসে লাফাচ্ছে। মিনিটে পঁয়ষট্টিবার। অপারেশানের আগে বিদেশি ডাক্তাররা হৃৎপিণ্ড সম্পর্কে যেসব সচিত্র বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলো ভাসা-ভাসা মনে পড়তে লাগল। হৃৎপিণ্ডের সংজ্ঞা কী? 'একটি ফাঁপা পেশিগঠিত অঙ্গ যা রক্তকে পাম্প করে শরীরের সর্বত্র বহমান রাখে।' বুকের দিকে তাকিয়ে, তার অভ্যন্তর রঞ্জন রশ্মি-দৃষ্টিতে পরিদর্শন করে আমি ভাবলাম, কাশীনাথের স্বাস্থ্য ভালো ছিল। পেশিগঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারী ছিল ও। এখন আমার শরীরে সর্বত্র রক্তসঞ্চার করছে। প্রাণসঞ্চার করছে। পরিহাসপ্রিয় অদৃষ্টদেবকে প্রণাম জানাই।

এককাপ চায়ের প্রত্যাশায় মানসীকে খুঁজতে শুরু করলাম। নানান ঘর পরিক্রমার পর শোওয়ার ঘরের বিছানায় ওর হদিস মিলল। সারাটাদিন ও যেন নিজেকে কেমন গুটিয়ে রেখেছে।

মৃদুকণ্ঠে ডাকতেই পাশ ফিরল। চোখ সামান্য ফোলা। বললাম আমার উদ্দেশ্য। ও সংক্ষিপ্তভাবে 'বারান্দায় বোসো, দিচ্ছি,' বলে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। রান্নাঘরের দিকে যাওয়ার আগে একপলক আমার বুকের দিকে দেখল।

তক্ষুনি আমার হৃৎযন্ত্র চতুর্থবার হোঁচট খেল। কিন্তু আমি সর্বংসহা হয়ে

দাঁড়িয়ে রইলাম। সারাদিনের স্মৃতিচর্চার পর এই মুহূর্তে কাশীকান্ত আমাকে আতঙ্কিত করে তুলতে ব্যর্থ হল। তারপর ও আবার চলতে শুরু করল। আমি ওর ছন্দের ধক-ধক শব্দটা শুনলাম না। মানসীর অপসৃয়মান শরীরের দিকে চেয়ে রইলাম। আমার মনের মধ্যে মন্দ্রস্বরে গির্জার ঘণ্টা বেজে উঠল। মানসীর প্রতি আমার উপাসনা বিরামহীন। মানসী কি জানে?

তিন : প্রতিক্রিয়াশীল, আমি ও মানসী

রাতে শুয়ে টের পেয়েছি আমার অনিদ্রা মানসীতেও সংক্রামিত হয়েছে। বিদ্রোহী যুগ্ম শিশুর মতো ঘুমপাড়ানি বাতাস ও রাতের অন্ধকার, নিস্তব্ধতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপকরণকে অবহেলা করে আমরা জেগে আছি। মানসীর এক প্রাগৈতিহাসিক অনুযোগ, ঘুমিয়ে পড়লে আমার নাক ডাকে। এখন সে ভয় নেই। তবে কাশীকান্তের পথ চলার শব্দ প্রকট হয়ে আমাদের কানে বাজছে : টিপ-টিপ-টিপ।

বহুদূর, সুদূর অতীত থেকে ও পায়ে হেঁটে এগিয়ে আসছে। ওর পথ চলা শেষ হতে চায় না। আর পদশব্দের তীব্রতা ক্রমে উত্তাল হয়ে উঠছে। মানসী এই শব্দে অভিযোগ করবে না তো?

একসময় পাশ ফিরলাম। অভ্যাসের ক্রীতদাস হয়ে ওর গায়ে, আবরণহীন অংশে হাত রাখলাম। স্পর্শ শীতল। এবং অতিসূক্ষ্ম হলেও ওর শরীরের দ্রুত সঙ্কোচন আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম। আমার হৃৎপিণ্ডের অবাধ্য শব্দকে ছাপিয়ে বলে উঠলাম, 'মানসী, আমি তোমাকে খুব কষ্ট দিই, না?'

ও আমার বুকের কাছে সরে এল। ওর মুখ দেখতে পাচ্ছি না। শুধু টের পেলাম, একটা ঠান্ডা হাতের আঙুল সন্তর্পণে আমার বুকের বাঁ-দিক লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছে। অপারেশানের আঁকিবুকি পেরিয়ে সঠিক জায়গায় হাতটা থামল। দ্বিধা ভরা আঙুলে নানানভাবে আমাকে স্পর্শ করে চলল। হয়তো আমার হৃৎপিণ্ডকে অনুভব করতে চাইল।

'হৃদয়—হৃদয়নাথ—।'

আমি চমকে উঠলাম। এ কণ্ঠস্বর কার? তারুণ্যের দাপটে অহঙ্কারী এই কণ্ঠস্বর?

'হৃদয়, তোকে দেখে আমার হিংসে হচ্ছে—' বিয়ের পর যখন প্রথম দেখা হয়, তখন কাশীকান্ত আমাকে এ-কথা বলেছিল। তারপর সর্বদা হাসিখুশি উদ্ধত পুরুষটা পালটে গেছে। কাঁধে হাতের চাপ দিয়ে ও ছোট্ট করে রুদ্ধ স্বরে বলেছে, 'তবে তুই এখনও আমার বন্ধু—এ-কথা ভুলিস না।' আমি অবাক চোখে তাকিয়ে

থেকে কাশীকান্তের নিষ্ক্রমণ দেখেছি। ক্লান্ত পদক্ষেপে ও চলে গেছে দৃষ্টির বাইরে। এবং সম্পূর্ণ নতুন উপলব্ধিতে আমি বিচলিত হয়ে পড়েছি। কাশীকান্তের সহজ প্রগলভতা সবক্ষেত্রেই দুর্বলতা ছিল না। শুধু মানসীই কি ছিল ব্যতিক্রম? মানসী কি এ-কথা জানে? কখনও বুঝতে পেরেছে কাশীকান্তকে?

তারপর থেকে সুদীর্ঘ সাতাশ বছর ওকে আর দেখিনি। স্মৃতি ঝাপসা হয়ে অবশেষে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু, হঠাৎই, কাকতালীয় ঘটনায়, পুনরুজ্জীবিত হয়ে স্মৃতি প্রমাণ করে দেয় সে কখনও মরে না, অবচেতনে লুকিয়ে থাকে মাত্র।

মানসীর কান্না এখন আমি শুনতে পাচ্ছি। অনুভব করছি ওর শরীরের হ্রস্ব তরঙ্গের কাঁপুনি। ওকে আমি কি অনেক কষ্ট দিয়েছি? অমর্যাদা করেছি? অতি সতর্ক ও অণুবীক্ষণ চিন্তাতেও নিজেকে ত্রুটিহীন মনে হয়। তবু অজানা এক অপরাধবোধে মানসীকে কাছে টেনে নিয়েছি। এই মুহূর্তে, ওর তুলনায়, আমি অনেক বেশি আশ্বাসপ্রার্থী। মানসীর ঠোঁট আমার হৃৎপিণ্ড ছুঁয়ে আছে। আর তখনই কাশীকান্তর পায়ের শব্দ স্তব্ধ হল।

আমার শরীরের ভিত পর্যন্ত যন্ত্রণায় টলে উঠল। এখন আমার রক্ত সঞ্চালন ক্রমশ সুধীর হয়ে একসময় নিশ্চল হবে। তারপর বাকি প্রত্যঙ্গগুলো দলনেতার অনুসারী হয়ে জেহাদ ঘোষণা করবে, বলবে, কাম বন্ধ্! ওরা কি জানে, আমি ইদানীং নিষ্কাম পুরুষ?

আমার সহনশীলতা আমাকেই অবাক করল। দাঁতে ঠোঁট চেপে শরীরকে পাথরপ্রতিম করে তুললাম। মানসীর কান্না শুনতে পাচ্ছি না। পঞ্চ ইন্দ্রিয় কি অকর্মণ্য হয়ে আসছে? কাশীকান্ত, কাশীকান্ত, তুই থামলি কেন?

প্রায় সাতটি স্পন্দন নীরবে অতিক্রম করে আমার হৃৎপিণ্ড আবার সপ্রাণ হয়েছে। তার কাছে আমার সকরুণ অধীনতা স্পষ্টভাবে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে সে। আমার শরীরের উষ্ণতা অনেক কমে গেছে। সেইসঙ্গে সাহস, আত্মবিশ্বাস, আস্থা ইত্যাদি।

মানসীকে ডাকলাম। ও সাড়া দিল না। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। এই ভয়ার্ত প্রহরে কেউ আমাকে নিরাপত্তা দেবে না।

চার ঃ উপসংহার

এক নতুন অভিযোগ শুনতে পেলাম মানসীর কাছ থেকে।

কাল রাতে তিনবার নাকি এক অদ্ভুত শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গেছে। আমার বুকের ভেতর থেকে দেওয়াল-ঘড়ির ঘণ্টার মতো এক তীব্র শব্দ ক্রমাগত শোনা

যাচ্ছিল। সেই শব্দে গোটা ঘর যেন গমগম করে উঠেছে, ঘরের বাতাসে স্বনন সৃষ্টি হয়েছে। আমি, স্বাভাবিকভাবেই, এই অভিযোগ অস্বীকার করেছি। আবার কিছুটা শঙ্কিতও হয়েছি। পদধ্বনি কি এতই কাছে এসে পৌঁছেছে?

মানসীর কথামতো একরকম বাধ্য হয়েই স্থানীয় জনৈক হৃদরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখাতে গেলাম। বহু পরীক্ষার পর আমার নির্লিপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, সব স্বাভাবিক। অর্থাৎ, হৃদয়নাথ চৌধুরী, তুমি সুস্থ হয়েই বেঁচে আছ।

ফিরে এসে ডাক্তারের অভিমত বারবার আবৃত্তি করেও মানসীর আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারিনি। ওর দুশ্চিন্তা ও সন্দেহের প্রলেপে এতটুকু চিড় ধরাতে পারিনি। আত্মসমীক্ষায় অবসাদগ্রস্তভাবে সারাটা দিন যখন অতিক্রান্ত হয়ে লাজুক সন্ধ্যারানির অধরে চুম্বনোদ্যত, তখন ভেতরের ঘর থেকে আনন্দের অস্ফুট স্বর হঠাৎই শুনতে পেলাম। পরমুহূর্তে উচ্ছল মানসী কিশোরী-চপলতা অনায়াসে আয়ত্ত করে প্রায় ছুটে এসেছে আমার কাছে। আমি অবাক চোখ তাকাতেই ও কথা বলতে শুরু করেছে। লক্ষ করলাম, ওর হাতে একটা মলিন জীর্ণ কাগজ।

'দ্যাখো, দ্যাখো, আলমারি ঘাঁটতে-ঘাঁটতে এই চিঠিটা খুঁজে পেলাম। তুমি ভুল ভেবেছিলে। তোমার ওই বন্ধুর নাম কাশীকান্ত রায় নয়, কাশীকান্ত সরকার। এই দ্যাখো, তোমাকে লেখা কবেকার চিঠি। মিছিমিছি তুমি—।'

ওর আনন্দ-বিহ্বলতা, খুশি, জয়োল্লাস, নিশ্চিন্ততা, কোনওটাই আমাকে স্পর্শ করতে পারল না! আমি চিঠিটা দেখার কোনও আগ্রহও পেলাম না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা দীর্ঘশ্বাস কোনও সুদীর্ঘ পিচ্ছিল সরীসৃপের মতো আমার শরীরের গহ্বর থেকে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। উষর পারিপার্শ্বিকে একমাত্র আশ্বাস খুঁজে পেতে আমি পরম আদরে বুকের বাঁ-দিকে হাত রাখলাম। এক অবরুদ্ধ তরঙ্গ আমার শরীর কাঁপিয়ে দিতে চাইছে।

মানসী হয়তো অবাক হল, উৎকণ্ঠিত হল। জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে?'

নিজের কণ্ঠস্বরকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। তাই মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিলাম, 'কিছু হয়নি।'

মানসী চলে গেল। বাইরের অন্ধকার গাঢ় হল। আমি চোখ বুজলাম। শুনতে পাচ্ছি মানসীর গুনগুনিয়ে তোলা সুর। ওর বয়েস অনেক কমে গেছে।

পরে কখন তন্দ্রা এসেছে জানি না, তবে যখন সচেতন হলাম, তখন হৃৎপিণ্ড উথালপাতাল হয়ে বেজে চলেছে। আস্তে-আস্তে বললাম, 'তুমি তো কাশীকান্ত নও, তা হলে কেন এই অশ্লীল আচরণ?'

উত্তরে ধক-ধক-ধক-ধক শব্দের মিছিল এগিয়ে এল।

শ্লথ ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে উঠলাম। সবক'টা ঘরই অন্ধকার। মানসী কি আলো জ্বালায়নি? ওকে কয়েকবার ডাকলাম। সাড়া নেই। কোথাও কি বেরিয়েছে?

আমার দিশেহারা বিক্ষিপ্ত পায়ের শব্দের সঙ্গে কাশীকান্তের পায়ের শব্দ মিলে যেতে লাগল। আমি মানসীকে খুঁজে চলেছি। আর গন্তব্যে পৌঁছে কাশীকান্ত আমার বুকের ভেতরে অপেক্ষা করছে। কোনও প্রবল বিস্ফোরণ সহকারে আত্মপ্রকাশ করবে। আমার পুনর্জীবনের সঙ্গে-সঙ্গে সে-ও পুনর্জীবিত হয়েছে। পদবি যাই হোক না কেন, কাশীকান্তের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য।

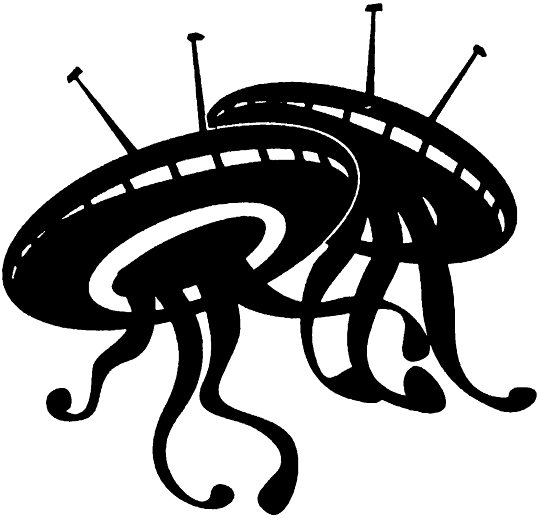
আমার বুকের ভেতর হঠাৎই যেন এক প্রচণ্ড বিপ্লব ঘটল। অপরিসীম যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে আমার ভেতরটা মুচড়ে উঠল। অসহ্য এই অত্যাচার। শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু উত্তাল হয়ে স্বৈরতন্ত্রী হয়ে উঠেছে।

কোনওরকমে এগিয়ে গিয়ে সুইচ টিপে ঘরের আলোটা জ্বাললাম। তারপর যন্ত্রণাক্লিষ্ট অবস্থাতেই ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার প্রৌঢ় মুখমণ্ডলে অসংখ্য জটিল রেখা জন্ম নিয়েছে। নিজের মুখের জ্যামিতি আমার কাছে অপরিচিত। সেইসঙ্গে বুকের যন্ত্রণাটা শতগুণ প্রবল হল। শুরু হল লক্ষ-লক্ষ উন্মত্ত হাতির তাণ্ডব। অসংখ্য ছুঁচ যেন কেউ অতি সন্তর্পণে নিপুণভাবে বিদ্ধ করে চলেছে আমার দেহে! হৃৎপিণ্ডের পাগল করা হাতুড়ি পেটার নির্ঘোষ প্রপিতামহ ঘড়ির চেয়েও শক্তিশালী। স্মৃতির টেরোড্যাক্‌টিল্‌ কর্কশ চিৎকার করে অধীরভাবে প্রকাণ্ড ডানা ঝাপটায়।

পাশের তাক থেকে শিথিলভঙ্গিতে দাড়ি কামানোর ক্ষুরটা তুলে নিলাম। ধারালো অংশকে উন্মুক্ত করে আয়নার প্রতিবিম্বে স্থির দৃষ্টি রাখলাম। শরীরের অভ্যন্তরীণ প্রচণ্ড কোলাহলকে ছাপিয়ে প্রতিবিম্বকে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কে?'

সে-ও একই প্রশ্ন ছুড়ে দিল।

হিসেব করে দেখলাম, নিজের শরীরে প্রথম আঘাতের সঠিক স্থান নির্বাচন করতে আমার বেশি সময় লাগবে না।



একটু-একটু দেখা যায়

নীল শাড়ি পরা মেয়েটি রেস্তোরাঁয় ঢুকতেই মলিন রেস্তোরাঁর পরিবেশটাই যেন বদলে গেল। কোনও সুন্দরীর বাঁ-হাতের কড়ে আঙুল যদি না থাকে তা হলে ওর দিকে আমি একবারের বেশি তাকাব না এটা ঠিক নয়। তাই চায়ের কাপে চুমুক দেওয়া থামিয়ে আমি রূপসি মেয়েটির দিকে অপলকে চেয়ে রইলাম।

মেয়েটি হঠাৎই একচিলতে হাসল—তারপর আমাকে তাজ্জব করে দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল আমারই টেবিলের দিকে।

রেস্তোরাঁর নাম 'বিভূতি কেবিন'—হাতিবাগান অঞ্চলের ব্রিটিশ আমলের রেস্তোরাঁ। চা, টোস্ট, মাংসের সিঙাড়া, চপ-কাটলেট, মোগলাই ছাড়াও এখানে পাওয়া যায় দুশো ছত্রিশবার হাত-বদল-হওয়া রোজকার খবরের কাগজ, নানান মাপ ও রঙের আরশোলা এবং হাফডজন টিকটিকি।

এখানে আমি প্রায়ই আসি, তবে এই সুন্দরীকে কখনও দেখিনি। এই মুহূর্তে ওকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল।

মেয়েটির বাঁ-হাতের কড়ে আঙুল নেই—কিন্তু সেটা ও লুকিয়ে রাখার কোনওরকম চেষ্টাই করছে না। ডানহাতে ভ্যানিটি ব্যাগ আর বাঁ-হাতে হালকা নীল সিনথেটিক শাড়ির মনোরম ভাঁজগুলো ধরে রেখেছে।

আজ আমি এখানে আচমকা ঢুকে পড়েছি একটু দম নেওয়ার জন্যে। সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ মাথায় নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে কাদা প্যাচপেচে রাস্তায় প্রচুর ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে। তারই মধ্যে হঠাৎ খেয়াল করেছি, কালো জামা-প্যান্ট পরা একটা লোক আমাকে বিচ্ছিরিভাবে ফলো করছে।

লোকটাকে আমি দিনচারেক ধরে লক্ষ করছি। ভাবলেশহীন মুখ যেন পাথর কেটে তৈরি। ছিপছিপে লম্বা চেহারা। আর পরনে আধুনিক ঢঙের কালো ফুলশার্ট আর কালো জিন্স।

আমি একা মানুষ, নিজেকে নিয়েই সময় কাটিয়ে দিই। আমার কোনও শত্রু আছে বলে মনে হয় না। অথচ আমাকে ওই লোকটা ক'দিন ধরে ফলো করছে!

শ্যামবাজারে ভিড়ের মধ্যে লোকটাকে আমি ফাঁকি দিতে পেরেছিলাম। তারপর বৃষ্টির মধ্যেই ঢুকে পড়েছি হকার্স কর্নারের সরু একচিলতে গলির মধ্যে। সেখান থেকে এ-গলি ও-গলি করে অবশেষে এই 'বিভূতি কেবিন'। এবং বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় ধোঁয়া ওঠা স্পেশাল চায়ের কাপে তৃপ্তির চুমুক।

মেয়েটি সোজা এসে আমার মুখোমুখি বসে পড়ল। হাসল। অর্থপূর্ণ চোখে দেখল আমার দিকে।

মেয়েটিকে যা ভাবা উচিত, বুঝতে পারছিলাম মেয়েটি তা নয়। ওর ফরসা মুখে, নিপুণ সাজগোজে, কোথায় যেন একটা আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে।

আমাদের মাঝে শুধু একটা শ্বেতপাথরের টেবিলের ফাঁক। সেই ফাঁক কিছুটা কমিয়ে দিতে মেয়েটি ঝুঁকে পড়ল টেবিলের ওপর। দুটো সুন্দর হাতের পাখনা মেলে ধরল সাদা পাথরের বুকে। তারপর আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বলল, 'আপনি তো ইন্দ্রজিৎ—ইন্দ্রজিৎ সেন...।'

আমি চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খেলাম।

সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে একবার আলাপ হলে আমি কখনও ভুলি না। এই মেয়েটিকে আমি আগে কখনও দেখিনি—কিন্তু ও আমার নাম জানল কী করে!

'আপনি—আপনি—' আমার কথা বারবার আটকে যেতে লাগল।

আবার হাসল রূপসি। বলল, 'আমার নাম অনামিকা...আপনাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।'

'কোথায়?' আমি হঠাৎই ভয় পেয়ে গেলাম। ডানহাতটা ধীরে-ধীরে টেবিল থেকে নামিয়ে পাশের চেয়ারে রাখা ব্রিফকেসের ওপর নিয়ে গেলাম। তারপর কাঁকড়াবিছের মতো হামাগুড়ি দিয়ে আমার ডানহাত পৌঁছে গেল ব্রিফকেসের হাতলে।

যে-কোনও অবস্থার জন্যে আমি এখন তৈরি। দরকার হলে ব্রিফকেস আমাকে খুলতে হবে।

অনামিকা আমাকে খুঁটিয়ে দেখল। বোধহয় বুঝতে পারল, আমি ভয় পেয়েছি। আমার কপালের বিন্দু-বিন্দু ঘামও হয়তো ওর নজর এড়াল না।

ও হেসে বলল, 'ইন্দ্রজিৎ, শুধু-শুধু সিন ক্রিয়েট করে কোনও লাভ নেই। চলুন, সময় হয়ে গেছে—আপনাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।'

আমি বাচ্চাদের মতো জেদ করে বললাম, 'না, আমি কোথাও যাব না। এখানেই চুপচাপ বসে থাকব।'

অনামিকা হাসল—অবুঝ শিশুর জেদি কথায় সুন্দরী মা যেমন হাসে।

কিন্তু আমি পাগলের মতো ভাবছিলাম। অনামিকা আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়? কীসের সময় হয়ে গেছে?

স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টায় আমি আবার চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। চা জুড়িয়ে জল, কিন্তু তা-ই সই। যেভাবেই হোক আমাকে স্বাভাবিক থাকতে হবে। আমি যে ভয় পেয়েছি সেটা ওকে বুঝতে দেব না।

আমি ওকে বললাম, 'চা খাবেন? সঙ্গে টোস্ট?'

অনামিকা হেসে মাথা নাড়ল। যার মানে, চা-টোস্ট কিছু চাই না—শুধু তোমাকে চাই।

এবার একটু রূঢ় স্বরে বললাম, 'মাপ করবেন, ম্যাডাম—আপনাকে আমি চিনি না। একজন অচেনা মহিলার সঙ্গে কোথাও যেতে আমি রাজি নই।'

আবার হাসল অনামিকা। ওর ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে গোল বলের মতো কী একটা বের করে আমার মুখের সামনে ধরল।

বলটা চকচকে ধাতুর তৈরি। তার ওপরে কয়েকটা রঙের রহস্যময় ছায়া।

'এবার কি কিছু মনে পড়ছে?' প্রশ্ন করল অনামিকা।

আমি পাগলের মতো মাথা ঝাঁকালাম। বললাম, 'না, না—কিচ্ছু মনে পড়ছে না।'

অনামিকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলটা আবার ঢুকিয়ে রাখল ওর ব্যাগের ভেতরে। তারপর চোয়ালের রেখা শক্ত করে বলল, 'থ্রি এক্স ওয়ান বি ওয়ান।' কিছুক্ষণ আমাকে ভাবার সময় দিয়ে তারপর ঃ 'এবার কিছু মনে পড়ছে?'

আমি আবার মাথা নাড়লাম পাগলা ঘোড়ার মতো।

একটা হতাশ ভাব ফুটে উঠল অনামিকার মুখে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলল, 'ইন্দ্রজিৎ, সত্যি, তোমার মাথার ভেতরে বোধহয় কোনও গন্ডগোল হয়েছে।'

ওর 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে যাওয়া ওর শরীরের বাঁকগুলোর মতোই কী স্বাভাবিক!

আমি পালটা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমাকে চমকে দিল।

'বিভূতি কেবিন'-এর জীর্ণ মলিন রান্নাঘরে একটিমাত্র দরজা ও একটি বড় মাপের গরাদহীন জানলা। কিচেন থেকে চপ-কাটলেট ইত্যাদি জানলা দিয়েই বেয়ারাদের হাতে আসে। সেই জানলা এবং দরজার মাথায় বড়-বড় দুটো কাচের সাইনবোর্ড।

তাতে প্রকাণ্ড মাপের লাল হরফে লেখা 'বিভূতি কেবিন' এবং 'মোগলাই পরোটা'। আমি যখনই এখানে আসি তখন এই লেখাগুলোর দিকে মুখ করে বসি। আজও তাই।

হঠাৎই দেখি 'বিভূতি কেবিন' লেখাটার কিছু-কিছু জায়গা অদৃশ্য হয়ে গিয়ে শুধু পড়া যাচ্ছে 'ভূত কেবিন'। আর দ্বিতীয় সাইনবোর্ডের 'মোগলাই পরোটা' হয়ে গেছে 'গলা রাটা'।

আমার অবাক ভাবটা অনামিকার নজরে পড়েছিল। ও পেছন ফিরে তাকাল একবার। তারপর জিগ্যেস করল, 'কী হল! কী দেখে অমন চমকে উঠলে?'

আমি ওকে ব্যাপারটা বললাম।

তাতে ও ঝরনার জলে ভাসিয়ে দেওয়া একরাশ রঙিন কাচের চুড়ির মতো রিনরিন করে হেসে উঠল। সে-হাসি আর থামতেই চায় না।

রেস্তোরাঁর অন্যান্য আড্ডাবাজ পরচর্চা-ভক্ত লোকগুলো ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দেখতে লাগল।

আমি চাপা গলায় বললাম, 'কী হচ্ছে! সবাই দেখছে!'

অতি কষ্টে হাসি থামিয়ে অনামিকা বলল, 'এবার তো মানবে যে, সময় হয়ে গেছে! কোনও লেখারই সঠিক মানে তোমার চোখে আর ধরা পড়বে না। আচ্ছা, আমার এই কড়ে আঙুলটা ধরো তো!' বলে ও টেবিলের ওপরে রাখা বাঁ-হাতটা এগিয়ে দিল আমার কাছে।

অন্য সময় হলে ওর হাতের ছোঁয়া পাওয়ার আশায় আমার মন আবেগে উথালপাথাল হয়ে যেত, রক্তকণিকা-রক্তকণিকায় বেধে যেত মরণপণ লড়াই।

কিন্তু এখন ওর কড়ে আঙুলহীন বাঁ-হাতটার দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা কেমন গুড়গুড় করে উঠল। একটা পরদেশি ভয় ঠান্ডা শিরদাঁড়া বেয়ে কুলকুল করে নামতে লাগল।

আমি অনামিকার কথা অমান্য করতে পারলাম না।

চায়ের কাপটা আলতো করে সরিয়ে দিলাম একপাশে। তারপর আমার বাঁ-হাত গুড়ি মেরে এগিয়ে যেতে লাগল ওর বাঁ-হাতের দিকে—কড়ে আঙুলের শূন্যস্থান লক্ষ্য করে।

শূন্যস্থানে পৌঁছেই আমি অবাক!

আমার ছোঁয়ায় ওর কড়ে আঙুল আমি দিব্যি টের পেলাম। অথচ সেই কড়ে আঙুলটা আমি একফোঁটাও দেখতে পাচ্ছি না!

আমি হতবাক হয়ে অনামিকার সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ও ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, 'ইন্দ্রজিৎ সেন, এবার বুঝতে পারছ, তোমার গল্প শেষ!'

আমি ওর কথা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। সে-কথাই জানালাম ওকে। তারপর বললাম, 'এসব কাণ্ডকারখানা আমার কাছে ভূতুড়ে ঠেকছে। বরং চলো, আমরা

অন্য কোথাও গিয়ে একটু নিরালায় বসে গল্প করি। তোমাকে ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে।'

অনামিকা ওর বাঁ-হাতটা টেনে সরিয়ে নিল। তারপর শক্ত গলায় বলল, 'তুমি দেখছি ভালো কথার মানুষ নও! তা হলে খারাপভাবেই কিছু করা যাক—।'

কথাটা বলেই ও ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে আবার সেই ধাতব বলটা বের করল। ওটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে কী একটা করতে লাগল।

সঙ্গে-সঙ্গে দেখি রেস্তোরাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো ফুলশার্ট কালো জিন্‌স পরা ছিপছিপে লম্বা চেহারার লোকটা। মুখে অভিব্যক্তির কোনও লেশমাত্র নেই।

একটা নাম-না-জানা আতঙ্ক আমাকে পাগল করে দিল।

আমার ডানহাতটা ব্রিফকেসের ওপরেই ঘোরাফেরা করছিল। এক ঝটকায় ব্রিফকেসটা খুলে ফেললাম। চোখের পলকে জেনারেটার গান বের করে অনামিকাকে লক্ষ্য করে ফায়ার করলাম।

ও হাতের বলটা নিয়ে কী একটা করল। দেখলাম, জেনারেটার গানের তীব্রশক্তির কণার স্রোত ওকে মোটেই কাবু করতে পারল না। ও অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় উঠে দাঁড়িয়ে শ্বেতপাথরের টেবিলটাকে উলটে দিল আমার ঘাড়ের ওপর। আর একইসঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করে কী যেন বলল।

রেস্তোরাঁয় হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। চেয়ার উলটে টেবিল কাত করে যে যেদিকে পারে ছুটছে। সেইসঙ্গে কানে আসছে আতঙ্কের চিৎকার।

কালো পোশাক পরা লোকটা এসবে ভ্রূক্ষেপও করল না। হরিণের মতো সাবলীল তিনটে লাফ দিয়ে ও চলে এল আমার কাছে।

আমি তখন মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছি। একইসঙ্গে জেনারেটার গানটাকে নিয়ে আসতে চাইছি শত্রুর মুখোমুখি।

কালো পোশাক পরা লোকটা ঝুঁকে পড়ে ডানহাতে আমার টুঁটি টিপে ধরল। আর বাঁ-হাতে জেনারেটার গানসমেত আমার ডানহাত চেপে ধরল।

আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। বুঝতে পারছিলাম, এই লোকটার শক্তির সঙ্গে লড়াই করে কোনও লাভ নেই। লোকটার হাতগুলো কি ইস্পাতের তৈরি?

এক হ্যাঁচকায় সে আমাকে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর এক ভয়ংকর মোচড় দিল আমার ডানহাতে। আমার কবজির জোড় যেন খুলে গেল। ব্যথার বিদ্যুৎ হাত বেয়ে ছিটকে গেল মাথায়। জেনারেটার গানটা খসে পড়ল হাত থেকে। মেঝেতে পড়ে রইল অনাথের মতো।

রেস্তোরাঁয় লোকজন সব ফাঁকা হয়ে গেছে। শুধু মালিক চোখ ছানাবড়া করে জরাজীর্ণ ক্যাশ কাউন্টারে বসে আছে। আর তিনজন বেয়ারা আতঙ্কে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে রাঁধুনিদের কাছে আশ্রয় নিয়েছে।

অনামিকা ওদের সবাইকে উদ্দেশ করে গলা তুলে বলল, 'আপনাদের কোনও ভয় নেই। আমরা শুধু একে ধরে নিয়ে যেতে এসেছি। আমরা সিক্রেট পুলিশের লোক—।'

কথাটা বলে সুন্দর করে হাসল ও।

তারপর এগিয়ে এল আমার কাছে।

আমি তখন কালো পোশাক পরা লোকটার হাতে বন্দি হয়ে বোবা চোখে ওদের দেখছি।

অনামিকা এবার হেসে জিগ্যেস করল, 'ইন্দ্রজিৎ, তুমি কি এখন সবকিছু ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছ?'

আমি চারপাশে তাকালাম।

'ভূত কেবিন'টা এখন 'ভূত কেন' হয়ে গেছে। আর 'গলা রাটা' হয়ে গেছে 'গলা টা'। এ ছাড়া সবকিছুই আমি অসম্পূর্ণভাবে একটু-একটু দেখতে পাচ্ছি।

আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। এ আবার কোনদেশি চোখের অসুখ!

আমি যে কিছু বলতে চাই সেটা বুঝতে পেরে অনামিকা লোকটাকে ইশারা করল। লোকটা আমাকে ছেড়ে দিল।

আমি গলায় হাত বুলিয়ে কয়েকবার কাশলাম। তারপর কোনওরকমে বললাম, 'আমার চোখে কোনও একটা গন্ডগোল হয়েছে। আমি সবকিছুই কেমন খাপছাড়া দেখছি। তোমার ডানহাতের খানিকটা আমি দেখতে পাচ্ছি না। ওই চেয়ারটার মাত্র দুটো পায়া দেখতে পাচ্ছি। আর তার দিয়ে ঝোলানো ওই ল্যাম্পটার তারের মাঝখানটুকুই নেই—।'

আমার কেমন অসহায় লাগছিল। চারপাশটা কেন এমন খাপছাড়াভাবে মুছে যাচ্ছে?

অনামিকা আমার থুতনি ধরে আদর করে নেড়ে দিল, বলল, 'ইন্দ্রজিৎ, সেই তখন থেকেই তো তোমাকে বলছি যে, সময় হয়ে গেছে। তোমার মাথার ভেতরে গোলমাল হতে শুরু করেছে—।'

আমার বয়েস আটাশ, স্বাস্থ্য ভালো, শরীরে কোনও অসুখ নেই। তা হলে হঠাৎই আমার এসব কী শুরু হল!

অনামিকা এবার গলা নামিয়ে সমবেদনার সুরে বলল, 'আসলে পৃথিবীতে তোমার থাকার পালা শেষ। তাই তোমার ভেতরকার সফটওয়্যার ধীরে-ধীরে মুছে যাচ্ছে। কোনও প্রোগ্রামই আর ঠিকঠাক কাজ করছে না...তাই তুমি একটু-একটু দেখতে পাচ্ছ...।'

আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল। ওর কোনও কথাই আমি ঠিকমতো বুঝতে পারছিলাম না। নাকি বুঝতে চাইছিলাম না?

আমার হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হাসল অনামিকা, বলল, 'তুমি

আসলে একটা রোবট, ইন্দ্রজিৎ। রোবট নাম্বার থ্রি এক্স ওয়ান বি ওয়ান। হুবহু মানুষের মতো দেখতে রোবট—যাকে অ্যানড্রয়েড বলে। অ্যানড্রয়েডদের শরীরে ছুরি বসালে রক্ত পড়ে—মানুষের মতো। ওদের সবকিছুই মানুষের মতো—শুধু ভেতরে ব্যাটারি থাকে, মাইক্রোচিপ থাকে, মোটর থাকে। তোমাকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল নিম্নমধ্যবিত্তদের জীবনযাপন সম্পর্কে ডেটা কালেক্ট করতে। দু-বছর ধরে তুমি সেসব জোগাড় করেছ। তোমার শরীরের ভেতরে সেগুলো অটোমেটিকভাবে স্টোর্‌ড হয়ে গেছে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অনামিকা ঃ 'কিন্তু গোলমাল হল, তুমি এখানকার লোয়ার মিড্‌ল ক্লাস লাইফটাকে ভালোবেসে ফেললে। ভুলে যেতে চাইলে যে, তুমি অন্য গ্রহ থেকে আসা একটা রোবট। তাই তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমাদের আসতে হয়েছে—।'

অনামিকার মুখটা আমার চোখের সামনে ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছিল। কালো পোশাক পরা লোকটার বাঁ-হাত আর মাথার অর্ধেকটা নেই। চারপাশের মানুষজন, চেয়ার-টেবিল, সাইনবোর্ডের লেখা, সবই ধীরে-ধীরে অসম্পূর্ণ থেকে আরও অসম্পূর্ণ হচ্ছে। আমার চোখের সামনে হারিয়ে যাচ্ছে আমার নিম্নমধ্যবিত্ত নিঃসঙ্গ জীবন—যে-জীবনকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি।

স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম, এই নিম্নমধ্যবিত্ত জীবন, এই নিম্নমধ্যবিত্ত রেস্তোরাঁ ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হচ্ছে।

অনামিকা ওর সঙ্গীকে বলল, 'ওকে ওই আয়নাটার কাছে নিয়ে চলো—।'

লোকটা আমাকে হাত ধরে নিয়ে গেল বেসিনের কাছে। সেখানে বড় মাপের একটা আয়না লাগানো আছে—বয়েসের ভারে মলিন অথচ অভিজাত আয়না।

আয়নায় আমার প্রতিবিম্ব দেখে চমকে উঠলাম। আমার শরীরের অনেকটাই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

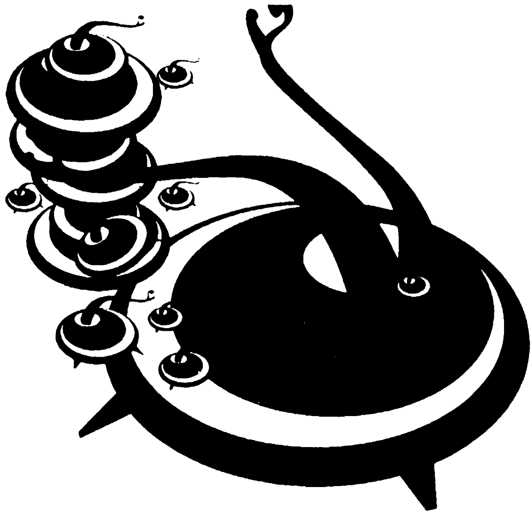
সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন ছায়া দেখে আমার কান্না পেয়ে গেল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি অসহায়ভাবে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলাম।

আমি তা হলে শুধুই হার্ডওয়্যার আর সফ্‌টওয়্যার! নিছকই একটা রোবট!

কলকাতার নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্গে আমার কোনও যোগ নেই! যাকে আমি ভালোবাসি তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই!

আমার কান্নার মাঝেই অনামিকার গলা পেলাম। কালো পোশাক পরা লোকটাকে ও বলল, 'ইন্দ্রজিতের ব্যাটারিটা শর্ট সার্কিট করে দাও। নইলে ফেরার সময় ঝামেলা হবে—।'

আয়নায় আমার ছায়া তখন অসম্পূর্ণ থেকে আরও অসম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল।



ইন্টু-পিন্টু থারটিন

আমার নাম ইন্টু-পিন্টু। আমার বয়েস তেরো—মানে, থারটিন—তবে সামান্য প্লাস-মাইনাস হতে পারে। আমার মা-কে আমি 'মাম' বলে ডাকি, আর মাম আমাকে 'ইন্টু' বলে ডাকে। বাকি নামটুকু পাপা দিয়েছে—পাপার কাছে আমি 'পিন্টু'। পাপাকে আমি প্রথম-প্রথম 'বাবা' বলে ডাকতাম। কিন্তু পাপা-ই আমাকে একদিন স্পষ্ট ইন্সট্রাকশন দিল যে, 'বাবাকে বলবে পাপা, আর মা-কে মাম।' ব্যস, তারপর থেকে পাপা আর মাম।

আমি দিন-রাত কম্পিউটার নিয়ে বসে থাকি—পড়াশোনা করি, খেলা করি, কম্পিউটারের সঙ্গে গল্প করি। ও আমাকে নানান গল্প শোনায়, মজার-মজার কথা বলে। আর জ্ঞান দেয়।

আমার কম্পিউটারের নাম রোবোকম্প্-সেভেন। একটা আর্ম-রোবট আর একটা কম্পিউটার জুড়ে তৈরি। ওর মেকানিক্যাল আর্ম দুটো মেটালের ওপরে ফাইবার কোটিং দিয়ে তৈরি। এই হাত দিয়ে ও নিজেই নিজের কিবোর্ডের বোতাম টিপে প্রোগ্রাম লিখতে পারে। ওর অনেক বুদ্ধি আছে—যদিও পাপা বলে ওসব 'নকল' বুদ্ধি।

আমার মাম আর পাপা খুব সিস্টেমেটিক। রোবোকম্প্ আমাকে প্রথম এই কথাটা জানিয়েছে। বলেছে, 'ইন্টু-পিন্টু, আমার সিস্টেম ইউনিটের চেয়ে তোমার মাম

আর পাপার সিস্টেম ইউনিট অনেক-অনেক অ্যাডভান্স্‌ড।'

তারপর থেকে আমিও ব্যাপারটা খেয়াল করেছি। সত্যিই তো! আগেও দেখেছি, কিন্তু কখনও ব্যাপারটা খেয়াল করিনি।

মাম আর পাপা যেন ঘড়ি ধরে সব কাজ করে। ওদের সারাদিনের কাজ যেন কেউ তুখোড়ভাবে প্রোগ্রাম করে দিয়েছে।

মাম রোজ সকাল সাতটায় ওঠে। তারপর বেডরুমের ক্রিস্টাল মিরারে অনেকক্ষণ ধরে নিজের মুখটা দ্যাখে। চোখের পাতায় হাত দিয়ে দ্যাখে। কানের লতি টেনে-টেনে কী যেন চেক করে। মাথার চুলের স্টাইলটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দ্যাখে। নানানরকম কায়দায় চোখের ভঙ্গি করে। অনেকরকমভাবে হাসে—হাসিগুলো বোধহয় পরীক্ষা করে।

তারপর—প্রায় আধঘণ্টা পর—আয়নার ছবির দিকে তাকিয়ে বলে, 'আই লাভ য়ু—' এবং ছবির ঠোঁটে শব্দ করে চুমু খায়। আমি জানি, আয়নায় ফুটে ওঠা ছবিতে ঠোঁটে ছাড়া আর কোথাও চুমু খাওয়া সম্ভব নয়।

আমার মামের ঠোঁট খুব সফ্‌ট। আমি জানলাম কী করে? পাপা একদিন মামকে বলছিল, আমি শুনেছি। আর শুধু ঠোঁট কেন, মামের সবকিছুই সফ্‌ট—তাইতো পাপা মামকে বলে, 'তুমি না ভীষণ সফ্‌টওয়্যার।' বলে আর খিলখিল করে হাসে।

তখন মামও কেমন একটা ঢং করে মাথা হেলিয়ে চোখ সরু করে ঠোঁটের কোণে হাসে, মাথা ঝাঁকিয়ে চুলগুলো নিয়ে আসে মুখের ওপরে। তারপর মুখ দিয়ে ঝরনার জলের মতো শব্দ করে পাপাকে কেমন পাগলের মতো খাবলাতে থাকে। আর একইসঙ্গে বিড়বিড় করে বারবার বলে, 'তুমি খুব হার্ড, বুঝলে! একেবারে হার্ডওয়্যার।'

পাপাকে তখন কেমন ঘোর-লাগা মানুষ মনে হয়। জ্বর হওয়া গলায় পাপা বলে, 'এসো...সফ্‌টওয়্যার আর হার্ডওয়্যার না কাপ্‌ল করলে সিস্টেম কাজ করবে কেমন করে! তারপর আমার ইনপুট ডিভাইস...উম্‌ম্‌...জয়স্টিক...আর তোমার পাওয়ার সকেট...।'

এইসব শোনার পর থেকে আমি মামকে সফ্‌টওয়্যার বলি, আর পাপাকে হার্ডওয়্যার। অবশ্য ওরা সেসব কিচ্ছু জানে না।

আয়না দেখা শেষ হলে মাম মুখ-হাত ধুয়ে একেবারে স্নান সেরে নেয়। তারপর চা-ব্রেকফাস্ট, টিভি নিউজ। তখন পাপা মামের কাছে বসে থাকে। অফিসের ফাইল পড়ে।

এরপর মাম ভিডিয়োফোনের কাছে গিয়ে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে কিছুক্ষণ রেস্ট নেয়। তখন মামের প্রচুর ফোন আসে। মামও ফোন করে কাউকে-কাউকে। মামের মুখে তখন নানান নামের খই ফুটতে থাকে। কীসব নাম! জ্যাকি, ক্রিস্টন, ম্যাসি, আয়ান, রনি, অর্ঘ্যপ্রতিম, রামারাও, রাকেশ...এরকম আরও কত! এর মধ্যে কয়েকটা

নাম শুনে তো অনায়াসে কুকুরের নাম বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে ওরা কুকুর নয়—মানুষ। মানুষ যে, সেটা বুঝতে পারি ভিডিয়োফোনের পরদায় ওদের ছবি দেখে। ওদের কারও চুলের রং সবুজ, কারও চোখে কালো চশমা। কারও জুলপি এমনই লম্বা-চওড়া যে, দাড়ি না জুলপি সেটা গুলিয়ে যেতে চায়। আবার কারও একটা কানে একটা প্লাটিনামের মাকড়ি।

ভিডিয়োফোনের পালা ফুরোলে মাম মোবাইল ফোন শুরু করে। তাতে ফোন আসে, ফোন যায়। কথা বলতে-বলতে মাম হেসে গড়িয়ে পড়ে। তখন আমার ভয় করতে থাকে—এই বুঝি মাম চেয়ার থেকেই গড়িয়ে পড়ে গেল!

আমাদের কাজের লোক দুজন। একজন ঘরকন্নার কাজ করে, আর-একজন রান্না করে। কী-কী রান্না হবে মাম সেটা একটা কাগজে লিখে কিচেনের দেওয়ালে স্টিক করে দেয়। সেটা পড়ে নিয়ে দুজন কাজের মেয়ে—রোজি আর নিনি—কাজ শুরু করে দেয়। কখনও ওরা যদি অকারণে মামকে বিরক্ত করে তা হলে মাম ওদের ইংরেজিতে যা-নয় তাই বলে। ওদের নাম রোজি আর নিনি হলেও ওরা কিন্তু একবর্ণও ইংরেজি জানে না। কারণ, ওদের আসল নাম রাজিয়া আর ননীবালা—মাম সেই সেকেলে নামদুটো পালটে ওরকম মেম-মেম করে দিয়েছে।

আমার নামটা নিয়েও পাপা আর মাম একদিন নিজেদের মধ্যে কীসব বলাবলি করছিল—আমি ভালো করে বুঝতে পারিনি।

তখন সন্ধে সাতটা কি সাড়ে সাতটা হবে। মাম হঠাৎই বাড়ি ফিরে এল। নরমালি এত তাড়াতাড়ি মাম ফেরে না। পাপা তার একটু আগেই বাড়ি ফিরেছে। রোজকার মতো আমার কম্পিরুমে একবার উঁকি মেরে 'হাই, পিন্টু' বলে নিজের রুমে চলে গেছে। কিন্তু পাপার টলোমলো হাঁটার স্টাইল দেখে আমি বুঝতে পারছিলাম, পাপার মুখে সেই বিচ্ছিরি গন্ধটা পাওয়া যাবে। এত স্টিংকি মাউথ ফ্রেশনার পাপা কেন ইউজ করে কে জানে!

মাম ফ্ল্যাটে ঢুকেছে গান গাইতে-গাইতে ঃ 'উই আর চিলড্রেন অফ দ্য ওরিজিনাল সিন...।' আমি কম্পিরুম থেকে মামকে দেখতে পাচ্ছিলাম। সফ্‌টওয়্যার তখন গায়ের শাড়িটা খুলে ফেলেছে। শুধু শায়া আর ব্লাউজ পরে এমনভাবে স্টেপ ফেলছে যেন কোনও বাচ্চা প্রথম হাঁটতে শিখছে। বুঝলাম, সেই একই মাউথ ফ্রেশনারের গন্ধ। পাপা আর মাম কি একই দোকান থেকে মাউথ ফ্রেশনারটা কেনে?

পাপা ঘর অন্ধকার করে বিছানায় বসে টিভিতে 'ক্রাইম টাইম' প্রোগ্রামটা দেখছিল। মাম হঠাৎ এলোমেলো হেঁটে পাপার ঘরে ঢুকে পড়ল। আমি একটু অবাক হয়ে রোবোকম্প্‌ ছেড়ে উঠে পড়লাম। পা টিপে-টিপে পাপার রুমের দিকে গেলাম। খেয়াল রাখলাম যাতে মাম আর পাপা কিছুতেই আমাকে দেখতে না পায়।

মাম কেমন জড়ানো গলায় পাপাকে বলল, 'কী, একটু ইন্টু-পিন্টু হবে না কি?'

পাপা বলল, 'সে কী! আজ ডেট বটে, কিন্তু এখনও তো টাইম হয়নি!'

মাম বলল, 'আই অ্যাম নট ফিলিং ও. কে.। তাই রুটিন জব এক্সিকিউট করে একটু সিস্টেম শাট ডাউন করব। এখন সেরে না নিলে আমি রেস্ট নেওয়ার সময় তুমি হয়তো আবার সিস্টেম বুট করতে চাইবে। তখন এন্টার বাটন টিপলেই সিস্টেম হ্যাং করে যাবে। যু নো হোয়াট আই মিন!' তারপরই মামের কী হাসি!

তখন হার্ডওয়্যার বলল, 'রুটিন ডিসটার্ব করা ঠিক নয়। কাম অন মাই পারসোনাল সফ্‌টওয়্যার, একটু ইন্টু-পিন্টু হয়ে যাক।'

এ-কথা শুনে সফ্‌টওয়্যার হার্ডওয়্যারের ঘরের আরও ভেতরে ঢুকে পড়ল। কাচভাঙা হাসিতে পাপার ঘরের অন্ধকার ভাসিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি তোমার পারসোনাল সফ্‌টওয়্যার? ডু যু বিলিভ ইট?'

'ইয়েস আই ডু—যদিও এর ইউজার অনেক।'

আবার সফ্‌টওয়্যারের হাসি। এবং হার্ডওয়্যার বিছানা ছেড়ে উঠে এসে দরজা বন্ধ করে দিল।

মাম ফ্যাশান ডিজাইনার। দুপুরে লাঞ্চের পরে সেইসব কাজ নিয়ে বসে। কাগজে ছবি আঁকে। কম্পিউটারের সামনে বসে ফোটোশপ, কোরেল-ড্র, আর ফ্যাশানক্যাড-থ্রি নিয়ে কাজ করে। তখন মামের সঙ্গে কেউ কথা বলতে পারবে না। এমনকী কোনও ফোন এলেও মাম ধরে না।

কাঁটায়-কাঁটায় ছ'টা বাজলেই মাম ড্রেস করে বেরিয়ে পড়ে। কোথায় যায় জানি না। তারপর ফেরে রাত দশটায়। পাপার সেদিনকার কথা শুনে মনে হয়, মাম মাল্‌টি-ইউজার সিস্টেমের সফ্‌টওয়্যার হয়ে গেছে। কিন্তু এর মানে কী?

রোবোকম্প্‌ অনেক ব্যাপারে অনেক কিছু জানে। তাই কথাটা ওকে জিগ্যেস করেছিলাম। তখন ও কিবোর্ডের বোতাম টিপে 'আন্ডারওয়াটার' গেম খেলছিল। আমার কথা শুনে গেম থামিয়ে ইন্টারঅ্যাক্‌টিভ মোড 'অন' করে বলল, 'ওয়েলকাম, ইন্টু-পিন্টু থারটিন। বলো, আমাকে নিয়ে কী করতে চাও?'

রোবোকম্প-এর গলাটা কেমন মেটালিক। কিন্তু তাতে কথা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

আমি গালে হাত রেখে ওকে প্রশ্নটা করলাম।

ও বলল, 'ওটার মানে হল, মালটিপ্‌ল ইউজার টাইম শেয়ার করে একই সফ্‌টওয়্যার ইউজ করতে পারে।'

আমি ওকে বললাম যে, আমি আরও জানতে চাই।

উত্তরে রোবোকম্প্‌ বলল, 'ইন্‌সাফিশিয়েন্ট ডেটা। আরও সময় চাই, আরও তথ্য চাই।'

'ততদিনে তো আমি বড় হয়ে যাব—।'

'হ্যাঁ। তা হলেই আরও ভালো করে বুঝতে পারবে।'

আমার কেন যেন মনে হল, রোবোকম্প্‌ আরও জানে, কিন্তু আমাকে বলল না।

আমার ভেতরে কেমন একটা কষ্ট হতে লাগল।

রাতে শুতে যাওয়ার আগে মাম আমাকে ডানগালে হাম খেয়ে যায়। কারণ, বাঁ-গালটা পাপার হাম খাওয়ার জন্যে। একদিন আমি পাপাকে গাল এক্সচেঞ্জ করার কথা বলেছিলাম। তাতে পাপা বলেছিল, সফ্‌টওয়্যার আর হার্ডওয়্যার যে-সিস্টেমে কাজ করে সেই সিস্টেমকে কখনও ডিসটার্ব করতে নেই।

আমি তখন রোবোকম্প-এর সামনে বসে গল্প শুনছিলাম। পাপাকে বললাম, 'পাপা, তুমি আমাকে একটা গল্প বলো—।'

পাপা হেসে বলল, 'সিলি কিড! এসব ব্যাকডেটেড আইডিয়া তোমার মাথায় এল কী করে! তুমি সবসময় গল্প শুনবে রোবোকম্প্‌-এর কাছে—এটাই সিস্টেম। তুমি জানো, গল্প শোনানোর জন্যে ওর মেমোরিতে তিনহাজার গল্প স্টোর করা আছে! তুমি ওর সঙ্গে আরও ইন্‌টেন্সলি ইন্টারঅ্যাক্ট করো, ভালো লাগবে, ও. কে.? গুডনাইট।'

পাপা শুতে চলে গেল।

রোবোকম্প্‌ আমাকে বলল, 'এসো, গল্প শুনবে। তোমাকে পুরোনো দিনের গল্প শোনাই—যখন সব ছেলেমেয়ে পাপাকে ''বাবা'' আর মামকে ''মা'' বলে ডাকত। যখন তাদের স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শিখতে হত—আজকের মতো কম্পিউটার বেসড্‌ হোমস্কুল ছিল না। সেসময়ে মানুষ দুঃখ পেলে তার চোখ দিয়ে জল পড়ত। তুমি জানো তো, মানুষের চোখের জল বেরোয় ল্যাক্রিম্যাল গ্ল্যান্ডের জন্যে। এই গ্ল্যান্ডটা হল...।'

ব্যস, এরপর রোবোকম্প্‌ লেখাপড়ার আলোচনায় ঢুকে গেল। সুযোগ পেলেই জ্ঞান দেওয়া ওর হ্যাবিট।

আমি আলতো করে চোখে হাত দিলাম। আমার ল্যাক্রিম্যাল গ্ল্যান্ড আছে, নাকি নেই?

রোবোকম্প্‌ বলল, 'কী দেখছ?'

'বলো তো, আমার ল্যাক্রিম্যাল গ্ল্যান্ড আছে, নাকি নেই?'

'প্রহিবিটেড কোশ্চেন। আন্‌সার ডিনায়েড।' রোবোকম্প্‌ বলল। তারপর ওর ডানহাতটা বাড়িয়ে আমার বাঁ-গালটা আলতো করে ছুঁয়ে বিড়বিড় করল, 'সরি, ইন্টু-পিন্টু থারটিন। এসো, তোমাকে পুরোনো দিনের গল্প শোনাই। তা হলে তোমার এই ইমোশন্যাল ডিসঅর্ডার কেটে যাবে।'

ওর কথার মাথামুন্ডু বুঝতে পারলাম না, তবে ও গল্প শুরু করে দিল।

রোবোকম্প্‌-এর গল্পের সঙ্গে-সঙ্গে ওর রঙিন মনিটরে সেই গল্পের ছবি শুরু হয়ে গেল। সবুজ গ্রাম, মেঠো পথ, আঁকাবাঁকা নদী, ডিঙি নৌকো, বাচ্চা কোলে

হেঁটে যাচ্ছে মা—সঙ্গে আঁচল ধরে হাটছে আরও দুটো কালো-কালো বাচ্চা ছেলে।

গল্প শুনতে-শুনতে আমার দুঃখ কেটে গেল।

এইভাবে একটার-পর-একটা দিন গড়িয়ে যায়, অথচ আমার দিনগুলো আর রাতগুলো সবসময় একইরকম ঃ একটা দিন যেন আগের দিনটার ফোটোকপি। কিচ্ছু ভাল্লাগছিল না আমার।

রোবোকম্প্‌কে একদিন সে-কথা বলতে ও বলল, 'বুঝতে পেরেছি—"সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়" সিনড্রোম।'

'তার মানে? এ আবার কী ধরনের কথা!'

রোবোকম্প্‌ হাসল। মানে, ওর মনিটরে লেখা ফুটে উঠল ঃ 'আমি হাসছি।' সেইজন্যেই বুঝতে পারলাম। সবসময় এইভাবেই ও ওর হাসি-কান্না-রাগ-ভালোবাসা জানায়।

রোবোকম্প্‌ বলল, 'ওটা একটা অ্যান্‌শিয়েন্ট বেঙ্গলি প্রোভার্ব। তার মানে হল, অ্যাব্‌সলিউট হ্যাপিনেস ডাজ নট এক্‌জিস্ট।'

ওর কথাবার্তা দিন-দিন আরও কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। বোধহয় জ্ঞান দেওয়ার অভ্যেস থেকেই এরকম হয়ে গেছে।

একদিন খাওয়ার টেবিলে বসে মাম ঘরে নতুন ফার্নিচার কেনার ব্যাপারে পাপার সঙ্গে কথা বলছিল।

'দ্যাখো, রং-টংগুলো কেমন বাজে হয়ে গেছে। গ্লসি শাইনটা যে কোনও সময় ছিল সেটা মনেই হয় না। আমাদের ফ্ল্যাটে আর পার্টি দেওয়া যাবে না। লোকজনকে ফুর্তি করার জন্যে ডেকে এসব জাংক ফার্নিচার দেখানোর কোনও মানে হয়!'

পাপা একচামচ ফ্রায়েড রাইস মুখে তুলে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'ফার্নিচারগুলো ক'বছর হয়েছে বলতে পারো?'

মাম হেসে বলল, 'তোমার হার্ড ডিস্ক দেখছি ফেইল করে গেছে! এগুলো চারবছরের বেশি হয়ে গেছে—তোমার মনে নেই? সেই যে—যখন ইন্টুকে...।'

'উম্‌ম! চারবছর মানে ইনাফ।' পাপার মুখ দেখে বোঝা গেল যে, সব মনে পড়ে গেছে। পাপা মাথা নেড়ে ধীরে-ধীরে বলল, 'পিন্টুরও তা হলে কিছু একটা ব্যবস্থা করো...।'

মাম আমার দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে কী যেন দেখল। তারপর পাপাকে বলল, 'ঠিক বলেছ, ইন্টুকে এবার চেঞ্জ করা দরকার। কারণ, ওরা বলেছিল চারবছর পরে ওর এক্সপায়ারি ডেট। এক্সপায়ারি ডেট পেরিয়ে যাওয়ার পর ওর বিহেভিয়ারটা ইর‍্যাটিক হতে পারে। তখন আর কোনও গ্যারান্টি নেই। এমনকী, এ. এম. সি. কনট্রাক্টও ওরা আর রিনিউ করবে না।'

পাপা বলল, 'ওর ব্যাপারটা তোমার দেখার কথা। তুমিই মেইন প্রোগ্রাম—আমি স্রেফ সাবরুটিন।'

তারপর খাওয়ার টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল।

মাম—মানে, সফ্‌টওয়্যার—আমাকে কাছে ডাকল। আমি কাছে গেলাম। সফ্‌টওয়্যার আমার পোলো নেক টি-শার্টটা তুলে বুকে-পেটে কী যেন খুঁজতে লাগল। আর একইসঙ্গে বিড়বিড় করতে লাগল, 'পাঞ্চ মার্কটা কোথায় গেল? এইখানেই কোথায় যেন লেখা ছিল...এখানেই তো...।'

টি-শার্টটা ছেড়ে দিল সফ্‌টওয়্যার। চেঁচিয়ে হার্ডওয়্যারকে বলল, 'দ্যাখো তো, ওর প্যাকিং বক্সটা কোথায়? বক্সের গায়ে এক্সপায়ারি ডেটটা প্রিন্ট করা ছিল, আমার ক্লিয়ারলি মনে আছে।'

'খুঁজে দেখছি।' ঘরের দেওয়ালের আড়াল থেকে হার্ডওয়্যার বলল, 'তুমি বরং কোম্পানির কনট্রাক্ট্‌স ম্যানেজারকে ফোন করে ব্যাপারটা জানাও। নইলে নতুনটা পেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

আমি হাঁ করে সফ্‌টওয়্যারের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। মাম আর পাপা এসব কী বলছে!

আমার এক্সপায়ারি ডেট! আমার অ্যানুয়াল মেইনটিন্যান্স কনট্রাক্ট! আমার প্যাকিং বক্স!

আর 'পাঞ্চ মার্ক', 'নতুনটা পেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে'—এসব কথারই বা মানে কী?

হঠাৎই আমার চোখ জ্বালা করতে লাগল, কড়কড় করতে লাগল। একছুটে রোবোকম্প্‌-এর কাছে চলে গেলাম আমি। রোবোকম্প্‌ অনেক কিছু জানে। ও নিশ্চয়ই আমাকে সবকিছু বুঝিয়ে বলতে পারবে।

ওকে হাঁপাতে-হাঁপাতে সব খুলে বললাম।

ও কিবোর্ডের বোতাম টিপে কী একটা ছাতামাথা প্রোগ্রাম লিখছিল, আমি ওর হাত চেপে ধরলাম।

'এসবের মানে কী, রোবোকম্প্‌?'

প্রোগ্রাম লেখা থামিয়ে ও অন্য কয়েকটা বোতাম টিপল। ওর মনিটরে লেখা ফুটে উঠল : 'আমি কাঁদছি।'

তার একটু পরেই ও বলে উঠল, 'ইন্টু-পিন্টু থারটিন, তুমি কি জানো তুমি আসলে একটা রোবট?'

'তার মানে!'

'হ্যাঁ, রোবট। তবে তোমাকে মানুষের মতো দেখতে—তাই রোবট না বলে অ্যানড্রয়েড বলাই ভালো।'

আমি পাথর হয়ে গেলাম। সফ্‌টওয়্যার আর হার্ডওয়্যার তা হলে ঠিকই বলেছে! আমার ভেতরেই যত সফ্‌টওয়্যার আর হার্ডওয়্যার হ্যান্ডশেক করে আমাকে চালাচ্ছে!

'রোবোকম্প্‌, এসব তুমি কী বলছ!' কথা বলতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। চোখের

জ্বালাটা অল্প-অল্প করে বাড়ছিল।

'ঠিকই বলছি। এখন তোমাকে বলতে আর অসুবিধে নেই—কারণ, তুমি ব্যাপারটা জেনে গেছ। এখনকার যেসব কাপ্‌ল ছেলেমেয়ে চায় না, তারাই তোমার মতো "নকল" বাচ্চা ভাড়া করে নিয়ে আসে। তবে বাচ্চা যেমন ধীরে-ধীরে বড় হয়ে ওঠে, একটা অ্যানড্রয়েড তো সেরকম পারে না, তাই চারবছর পরপর মডেলটা বদলে নিতে হয়। সেইজন্যেই তোমার বাক্সে বা বডিতে এক্সপায়ারি ডেট প্রিন্ট করা আছে। দুঃখ করার কিছু নেই—আমারও আছে।'

আমার ভেতরটা মুচড়ে উঠল। ভীষণ কান্না পেয়ে গেল আমার।

রোবোকম্প্‌ বলতেই থাকল, 'তোমার নাম কেন ইন্টু-পিন্টু থারটিন জানো?'

আমি কোনওরকমে ঘাড় নেড়ে বললাম, 'জানি। ইন্টু নামটা মাম রেখেছে, পিন্টু নামটা পাপা—আর আমার বয়েস...।'

'কিচ্ছু জানো না। আসলে তোমার ভেতরে প্রোগ্রাম করে ওই নলেজটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তোমার ইন্টু এসেছে ইন্‌টেল থেকে, আর পেন্টিয়াম থেকে পিন্টু। তুমি ইন্‌টেল পেন্টিয়াম থারটিন দিয়ে তৈরি। আমার মতো তুমিও "ইন্‌টেল ইনসাইড", বুঝলে? তাই তুমি ইন্টু-পিন্টু থারটিন।'

আমার কান ভোঁ-ভোঁ করছিল। মনে হচ্ছিল টলে পড়ে যাব।

আমার অবস্থা বুঝতে পেরে রোবোকম্প্‌ হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরল।

আ-আঃ! ওর হাতটা কী মোলায়েম আর নরম! এত মায়া এত ভালোবাসা এই মেটাল আর ফাইবারের ছোঁয়ার মধ্যে!

আমার চোখ বুজে গেল আরামে।

তখনই টের পেলাম আমার গাল বেয়ে কী যেন গড়িয়ে পড়ছে।

শুনতে পেলাম রোবোকম্প্‌ দারুণ মিষ্টি গলায় বলছে, 'এসো, তোমাকে গল্প শোনাই—এক্সপায়ারি ডেটের গল্প। তোমার আমার প্রত্যেকের এক্সপায়ারি ডেট রয়েছে। এমনকী তোমার মাম আর পাপারও। এই ডেটটা সবার গায়ে ছাপানো থাকে। কারও-কারও ডেটটা সহজে পড়ে নেওয়া যায়—যেমন, তোমার কিংবা আমারটা। আবার কারও-কারও ডেটটা পড়া যায় না—লুকোনো থাকে—তোমার মাম বা পাপার মতো। তবে সেটা পড়তে পারে শুধু একজন...যে-লোকটা মাথার ওপরে আকাশে বসে আছে...ওপর থেকে সবকিছু যে দেখতে পায়...।'



দাগের বাইরে যাবেন না

ফ্ল্যাটের কলিংবেল বেজে উঠল।

রাজরীতা টিভিতে 'ক্রাইম ডট কম' প্রোগ্রামটা দেখছিল। রিমোটটা হাতে নিয়ে সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল।

ফ্ল্যাটের দরজার অন্তত বারো ফুট দূরে দাঁড়িয়ে রিমোটের বোতাম টিপল রাজরীতা। স্পেশাল মেটাল ফাইবারের তৈরি দরজার মাঝখানের অংশটা পলকে স্বচ্ছ হয়ে গেল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন লোককে দেখতে পেল রাজরীতা। কিন্তু ও জানে, বাইরে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতরটা দেখা যায় না। কারণ, দরজার এই স্বচ্ছতা একমুখী।

লোকদুটোর পরনে নীল রঙের ইউনিফর্ম। নামি কোম্পানির সার্ভিস বা মেইনটিন্যান্সের লোকজনদের যেমন পোশাক হয়। ওদের একজনের হাতে একটা মাঝারি মাপের পেটমোটা ব্যাগও আছে।

রাজরীতা দোটানায় পড়ল ঃ দরজা খুলবে, কি খুলবে না?

এখন কলকাতায় খুন-জখম-চুরি-ডাকাতি ভীষণরকম বেড়ে গেছে। এইসব খবর নিয়েই 'ক্রাইম ডট কম' প্রোগ্রাম। তাতে রোজ আধঘণ্টা ধরে পশ্চিমবঙ্গের যত ক্রাইমের খবর দেখানো হয়। সিকিওরিটি পুলিশ যেসব ক্রিমিনালকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের ছবিও দেখানো হয়। একটু আগে রাজরীতা

সেইসব ছবিই দেখছিল।

দুজন লোকেরই চোখে চশমা, ঠোঁটের ওপরে পুরু গোঁফ। বয়েস খুব বেশি হলে তিরিশ-বত্রিশ। একজনের মাথায় টুপি, আর-একজনের মাথায় ঝাঁকড়া চুল। কাজের একঘেয়েমিতে মানুষের মুখে যে-বিরক্তির ছাপ পড়ে ওদের দুজনের মুখেই সেই ছাপের জেরক্স কপি।

দরজার কাছে গিয়ে 'ভয়েস সিস্টেম' অন করল রাজরীতা। তারপর জিগ্যেস করল, 'কী চাই?'

উত্তরে একজন বলল, 'ম্যাডাম, আমরা "বিটা রেফ্রিজারেশান কোম্পানি" থেকে আসছি। এই ফ্ল্যাট থেকে...' পকেট থেকে একটা কম্পিউটার প্রিন্ট-আউট বের করে দেখল সে : 'মিস্টার শক্রজিৎ সোম আমাদের সার্ভিস কল দিয়েছিলেন। কল নাম্বার আর ডেট হল...।'

শেষ কথাগুলো আর মন দিয়ে শুনল না রাজরীতা। ওর চট করে মনে পড়ে গেল। ওদের ফ্রিজটা কিছুদিন ধরেই গন্ডগোল করছে। ফ্রিজের বাইরের পাইপ মেট্রিক্সে বরফ জমে যাচ্ছে। শক্রজিৎ গত সপ্তাহে কোম্পানিতে খবর দিয়েছিল। নিশ্চয়ই তারাই লোক পাঠিয়েছে।

তা সত্ত্বেও লোকদুটোকে যাচাই করার জন্য রাজরীতা প্রশ্ন করল, 'বলুন তো, আমাদের ফ্রিজের রং কী? মডেল নাম্বার কত?'

কম্পিউটার প্রিন্ট-আউট হাতে লোকটি দরজার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসল। রাজরীতাকে সে দেখতে পাচ্ছে না, তাই মুখে কেমন যেন একটা অস্বস্তির ছাপ।

'আপনার ফ্রিজটা ব্লু রঙের, ম্যাডাম—অবশ্য যদি না আপনি ওটা এর মধ্যে প্রাইভেটলি অন্য রং করিয়ে থাকেন। আর মডেল নাম্বার বিটা-টু ওয়ান ফাইভ জিরো-এম।' প্রিন্ট-আউটটা দেখতে-দেখতে লোকটা আরও যোগ করল : 'আপনার ফ্রিজের সিরিয়াল নাম্বার হল...।'

রাজরীতা সিরিয়াল নম্বরের জন্য আর অপেক্ষা করল না। কারণ, অন্য দুটো প্রশ্নের উত্তরে ওরা ফুল মার্কস পেয়েছে।

রিমোটের একটা বোতাম টিপে ও বলল, 'আসুন—ভেতরে আসুন—।'

দরজার পাল্লা একপাশে সরে যেতেই মুখে সৌজন্যের হাসি নিয়ে দুজন কর্মী মসৃণ ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকে পড়ল।

দরজার পাল্লা আবার ফিরে এল আগের জায়গায়। তারপর নিজে থেকেই লক হয়ে গেল।

বিশাল ড্রইং-ডাইনিং স্পেসের ওপরে একপলক চোখ বুলিয়ে নিল দুজনে। ওদের চাহনিতে সতর্কভাবে জরিপ করার দৃষ্টি। রাজরীতার কেমন যেন খটকা লাগল।

ঘরের একপাশে সাজানো টি-টেব্‌লের কাছে গিয়ে ব্যাগটা টেবিলে নামিয়ে রাখল একজন। তারপর সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে চোখে-চোখে কী যেন কথা হল। এবং দুজনেই আয়েসি ভঙ্গিতে সোফায় বসে পড়ল।

ব্যাপারটা রাজরীতার কাছে নেহাতই অসভ্যতা বলে মনে হল। তবুও ও ভাবল, হয়তো ওরা সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত—তাই সৌজন্য না দেখিয়েই সোফায় বসে পড়েছে।

ঘরের পুবদিকের দেওয়ালে টিভিতে 'ক্রাইম ডট কম' চলছিল। ওদের একজন ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে দেখছিল। আর অন্যজন রাজরীতার দিকে তাকিয়ে ভুরু উঁচিয়ে অশালীন ঢঙে হাসছিল।

হঠাৎই হাসি থামিয়ে টিভি-দেখা সঙ্গীর কাঁধে বাঁ-হাতে চাপড় দিল সে। বলল, 'অত কী দেখছিস! আজ নয়—কাল আমাদের পিকচার "ক্রাইম ডট কম"-এ দেখাবে।'

রাজরীতার বুকের ভেতরে হাতুড়ি পড়ল।

ও কাঁপা গলায় বলল, 'আপনাদের আই-ডি কার্ড দেখি—।'

'দেখাচ্ছি।' বলে একজন টেবিলে রাখা ব্যাগটা খুলে তার ভেতর থেকে অদ্ভুত চেহারার একটা বন্দুক বের করল।

খট করে একটা বোতাম টিপতেই বন্দুকের মাথায় লাগানো একটা চাকতির ভেতরে উজ্জ্বল লাল আলোর একটা বিন্দু জ্বলে উঠল।

রাজরীতা চিনতে পারল ঃ লেজার পয়েন্টার।

আলোর বিন্দুটা রাজরীতার কপালের ঠিক মাঝখানে তাক করল সে।

রাজরীতাকে দেখে মনে হচ্ছিল, ও যেন কপালে আগুনের টিপ পরেছে। ওর গলা তখন শুকিয়ে কাঠ। বুকের ভেতরে ভারী লোহার বল পরপর গড়িয়ে দিচ্ছে কেউ।

বন্দুক-হাতে-ধরা লোকটি ঠান্ডা গলায় বলল, 'ম্যাডাম, আমাদের বাধা না দিলে কোনও প্রবলেম হবে না।' তারপর টিভি-দেখা সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'নিকি, চটপট কাজ শুরু কর।'

নিকি তাড়াতাড়ি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। টেবিলে রাখা ব্যাগটা খুলে দুটো জিনিস বের করে নিল। তার একটার চেহারা সফ্‌ট ড্রিঙ্কস্‌-এর ক্যানের মতো। তবে তার গায়ে কতকগুলো বোতাম আর বাতি রয়েছে। আর অন্যটা একটা লম্বাটে কালো বাক্স।

ক্যানের মতো যন্ত্রটা ঘরের এক কোণে বসিয়ে অন করে দিল নিকি। তারপর পটাপট কয়েকটা বোতাম টিপল। ওটার গায়ে একটা ছোট্ট এল-ই-ডি বাতি লাল চোখের মতো দপদপ করে জ্বলতে-নিভতে লাগল।

নিকি রাজরীতার দিকে তাকিয়ে হাসল : 'এখন আর কোনও রেডিয়ো সিগনাল এ-ঘরে কাজ করবে না। সব সিগনাল জ্যাম করে দিলাম।'

নিকির সঙ্গী টেবিলে আঙুল ঠুকতে-ঠুকতে বলল, 'একদম চেঁচামেচি করবেন না, ম্যাডাম। করলে আমাদের আর কিছু করার থাকবে না, ডাক্তারদেরও আর কিছু করার থাকবে না। আপনি হয়তো ভাবছেন, এ-ফ্ল্যাটে ঢোকার সময় লুকোনো ভিডিয়ো ক্যামেরায় আমাদের ছবি উঠে গেছে। পরে সেই ছবি দেখে সিকিওরিটি পুলিশ আমাদের খুঁজে বের করবে—' বিচ্ছিরিভাবে হাসল : 'ওসব কিছুই হবে না। যদিও কাল "ক্রাইম ডট কম"-এ আপনি আমাদের এই ছবিই দেখতে পাবেন।' একটু থামল। তারপর : 'তার কারণ কী জানেন? কারণ, আসলে আমরা অন্যরকম দেখতে—।'

কথা বলতে-বলতেই মাথার টুপি খুলে ফেলল সে। তারপর একে-একে পরচুল, চশমা এবং নকল গোঁফ টেবিলে নামিয়ে রাখল।

ন্যাড়া মাথা লোকটিকে এখন সত্যি-সত্যিই একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছিল।

নিকি তখন ফ্ল্যাটের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কালো বাক্সটা হাতে নিয়ে কীসব খুটখাট করছিল। রাজরীতাদের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'ভিকি, আমাকেও কি উইগ-টুইগ সব খুলতে হবে নাকি?'

ভিকি বলল, 'না, না, আর দরকার নেই। ম্যাডাম, বুঝতে পারছেন।'

কালো বাক্সটা দরজার কাছে নামিয়ে রেখে তালি দিয়ে হাত ঝাড়ল নিকি : 'ভিকি, এদিককার কাজ শেষ। এখন দরজার লকটাকে কেউ হাজার চেষ্টা করেও বাইরে থেকে আর খুলতে পারবে না। এবার এ-ফ্ল্যাটে আমাদের রাজ চলবে।' দেওয়ালের টিভি পরদার দিকে একপলক তাকিয়ে তারপর : 'ওখানে "ক্রাইম ডট কম" চলুক, আর এখানে আমাদের ফূর্তি ডট কম শুরু হোক। কী বলো, গুরু!'

'না, না! ফূর্তি ডট কম নয়—ফূর্তি ডট বেশি!' ন্যাড়া মাথায় হাত বুলিয়ে মুচকি হাসল ভিকি। তারপর রাজরীতার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করল, 'ম্যাডাম, আপনার হাজব্যান্ড নিশ্চয়ই এখন অফিসে?'

'হ্-হ্যাঁ—।' কোনওরকমে ঘাড় নাড়ল রাজরীতা। ওর মুখের ভেতরে গিরগিটির চামড়ার তৈরি জিভটা জলের অভাবে ধুঁকছে।

'আমরা অবশ্য ক'দিন ধরেই আপনার এই একশো তিনতলার ফ্ল্যাটের ওপরে ওয়াচ রেখেছিলাম। এই মালটিস্টোরিড বিল্ডিং-এ আমরা আগেও কাজ করেছি। তবে তখন অন্যরকম মেকাপ নিয়েছিলাম। আপনাকে একদিন সিঁড়িতে দেখার পর থেকেই আমাদের দুজনেরই মাথা ঘুরে গেছে। আপনি যেমন সুইট তেমনই বিউটিফুল। বাগানে গোলাপফুলের জায়গায় আপনাকে দিব্যি সাজিয়ে রাখা যায়।'

'বিউটিফুল ডট কম!' নিকি বলল, রাজরীতার কাছে এসে দাঁড়াল।

'না, না, বিউটিফুল ডট বেশি।' বলেই হো-হো করে হেসে উঠল ভিকি।

ওদের কথাবার্তা আর হাসির শব্দে দশ-বারো বছরের একটি ছেলে ঘরে এসে ঢুকল। ঢুকেই নিকি আর ভিকিকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল।

'আপনার ছেলে?'

প্রশ্নটা কে করল রাজরীতা ঠিক খেয়াল করল না। শুধু কোনওরকমে ঘাড় নেড়ে ও জানাল, হ্যাঁ।

ওর বুকের ভেতরে তুমুল হুলস্থুল চলছিল। একটু আগেই কেমন নিরাপদ নিশ্চিন্ত জীবন কাটাচ্ছিল ও। আর এখন, মাত্র পনেরো-কুড়ি মিনিটেই, চরম বিপদসীমায় পৌঁছে গেছে।

একটু আগে যখন ও এ-ঘরে টিভি দেখতে এসেছিল তখন ওর মনে শুধু স্বপ্ন ছিল—কোনও দুঃস্বপ্ন ছিল না। ও রিমোটের বোতাম টিপতেই ঘরের পুবদিকের দেওয়ালের খানিকটা অংশ টিভির পরদা হয়ে গিয়েছিল। রঙিন ছবিতে একজন সুন্দরী মেয়ে নানান অনুষ্ঠানের খবর বলছিল, আর এককোণে একটা ইলেকট্রনিক ঘড়ি রিয়েল টাইম জানিয়ে দিচ্ছিল।

ঠিক তিনটে বাজতেই শুরু হল 'ক্রাইম ডট কম'—মানে, পশ্চিমবঙ্গের যত খুন-জখম-রাহাজানির খবর। রাজরীতা প্রতিদিন নিয়ম করে এই প্রোগ্রামটা দ্যাখে। এই প্রোগ্রামটা প্রতিদিন বিকেল তিনটেয় দেখানো হয়—যাতে ঘরে থাকা মানুষজন সতর্ক হতে পারে, নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে পারে।

২০২০ সাল নাগাদ ভারতে সাইবারস্পেস বিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইন্টারনেট, ই-মেইল, ই-কমার্স, আরও কত কী। তারপর ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি যতই লাফিয়ে-লাফিয়ে এগিয়েছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছে জনসংখ্যা আর খুন-জখম-রাহাজানি। এইভাবে দেড়শো বছর পেরোতে-না-পেরোতেই পুলিশি ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে। 'ক্রাইম ডট কম' প্রোগ্রামে রোজই দু-চারটে পুলিশ খুনের ঘটনা কিংবা পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার ঘটনা থাকে। তাই ব্যাঙের ছাতার মতো যত রাজ্যের সিকিওরিটি কোম্পানি গজিয়ে উঠেছে। তাদের ব্যাবসা দিনকেদিন বেড়েই চলেছে। আধুনিক থেকে আরও আধুনিক পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে।

এখন রাস্তায় বেরোলে সবাইকে সিকিওরিটি ভ্যানে করে যাতায়াত করতে হয়। ওগুলোই হল বাসের বিকল্প। এ ছাড়া ট্যাক্সি বা প্রাইভেট কার মানেই আর্মার্ড কার—সবসময় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে 'যুদ্ধ' করার জন্য তৈরি। সন্ধের অন্ধকার নেমে এলেই লোকজন যার-যার বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তখন শুরু হয় বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল ক্রিমিনালদের 'দিন'।

ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই এই একই অবস্থা। রোজ কম্পিউটারে ইলেকট্রনিক নিউজপেপার দেখলেই বোঝা যায় আইন-শৃঙ্খলা কী বিপজ্জনক অবস্থায়

পৌঁছেছে।

'ক্রাইম ডট কম' দেখতে-দেখতে এসব কথাই ভাবছিল রাজরীতা।

শত্রুজিৎ অফিসে গেছে। ও 'ক্যালকাটা স্পেস রিসার্চ সেন্টার'-এ অ্যাভিয়েশান ইঞ্জিনিয়ার। ওদের একমাত্র ছেলে মনোরম পাশের ঘরে কম্পিউটার টার্মিনালে বসে স্কুলের ক্লাস করছে। ওদের 'লার্নিং নেটওয়ার্ক'-এ একসঙ্গে প্রায় দুশো ছেলে বাড়িতে বসেই ক্লাস করতে পারে। মাঝে-মাঝে শিক্ষকের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার জন্য ওদের স্কুলে যেতে হয়।

ফুটবল-মাঠের মতো এই বিশাল ফ্ল্যাটে রাজরীতার সময় কাটে টিভি দেখে, কম্পিউটার গেম্স খেলে, অথবা সেলফোনে শত্রুজিতের সঙ্গে কথা বলে। বিকেলবেলা ও মনোরমকে নিয়ে কাছেই 'মিলেনিয়াম পার্ক'-এ বেড়াতে যায়। তার জন্য ওর আর্মার্ড কার রয়েছে। আর রয়েছে ঝুমকি—ওদের প্রাইভেট সিকিওরিটি গার্ড। গতমাসেই ওকে 'আলটিমেট সিকিওরিটি' কোম্পানি থেকে ভাড়া করে নিয়ে এসেছে শত্রুজিৎ। পরিস্থিতি ক্রমশ যেদিকে যাচ্ছে তাতে কোনওরকম নিরাপত্তা ব্যবস্থাই আর যথেষ্ট নয়।

টিভিতে খবর থামিয়ে বিজ্ঞাপন চলছিল।

'আলফা ট্যুর' নামে একটা কোম্পানি মাত্র এক লক্ষ টাকায় চাঁদে দু-দিনের জন্য বেড়িয়ে নিয়ে আসবে। 'এনার্জি পাউডার' রোজ এক চামচ খেলেই ক্লান্তি আর অবসাদ ভয়ে পালাবে। 'স্পিড শু' নাম মোটর লাগানো জুতো পায়ে দিলে বিনা পরিশ্রমে গাড়ির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছোটা যাবে। শনির উপগ্রহ টাইটানে একটা অ্যাডভেঞ্চারের ব্যবস্থা...।

হঠাৎই ফ্ল্যাটের কলিং বেল বেজে উঠেছে। তারপর...।

'কী হয়েছে, মাম্মি?' অচেনা লোকদুটোকে একপলক দেখে নিয়ে মনোরম অবাক হয়ে মা-কে জিগ্যেস করল।

'কিচ্ছু হয়নি, খোকা। তোমার মায়ের সঙ্গে আমরা একটু জরুরি কথা বলছি। তুমি যাও—তোমার ঘরে চলে যাও।'

কথাগুলো বলতে-বলতে ভিকি মনোরমের কাছে এগিয়ে গিয়েছিল। কখন যে ও বন্দুকটা লুকিয়ে ফেলেছে রাজরীতা খেয়াল করেনি।

আলতো করে মনোরমের পিঠে হাত দিয়ে ওকে ওর পড়ার ঘরের দিকে নিয়ে যেতে লাগল ভিকি।'

'কী করছিলে তুমি?'

'কম্পিউটারে ইন্টারঅ্যাক্টিভ লার্নিং সেশানে বসেছিলাম।'

'বাঃ, চমৎকার। গুড বয়। যাও, পড়াশোনা করো গিয়ে। এক্ষুনি আমাদের কথা শেষ হয়ে যাবে।'

মনোরমকে পড়ার ঘরে ঢুকিয়ে ওর ঘরের দরজাটা লক করে দিল ভিকি।

আর সঙ্গে-সঙ্গে নিকি চটপট পরচুল, চশমা আর গোঁফ খুলে রেখে রাজরীতাকে পিছন থেকে হ্যাংলার মতো জড়িয়ে ধরল। ওর ঘাড়ে গলায় মুখ ঘষতে লাগল পাগলের মতো।

রাজরীতা ধস্তাধস্তি করছিল। ভয় আর ঘেন্না ওকে কাবু করে দিতে চাইছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও লড়াই করতে পারছিল।

ভিকি ছুটে এল ওদের কাছে। দুপাশে দু-হাত ছড়িয়ে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, 'তুমি একা শেষ কোরো না/আমার জন্যে একটু রেখো। সোনা-দানা আর যা আছে/তন্নতন্ন খুঁজে দেখো।'

ছড়া কাটতে-কাটতেই রাজরীতাকে টপ করে চুমু খেল ভিকি। তারপর ওকে দু-হাতের দশ আঙুলে আদর করতে শুরু করল।

রাজরীতার পিছনে দাঁড়িয়ে নিকি ওর পিঠে-কোমরে যত্রতত্র মুখ ঘষছিল। ওর দু-হাত বেপরোয়াভাবে যেখানে-সেখানে হামলে বেড়াচ্ছিল।

ভিকির ছড়া কাটার উত্তরে ও কোনওরকমে জড়ানো গলায় বলল, 'আগে মাম্মি-সোনাকে তন্নতন্ন করে সার্চ করি, পরে মেটাল-সোনা খুঁজে দেখব।'

নিকি আর ভিকি জানে, এখানকার সব ফ্ল্যাটের দেওয়াল সাউন্ডপ্রুফ। সুতরাং রাজরীতা চিৎকার করলেও কোনও ক্ষতি নেই। পাশের ঘরে ওর ছেলেও সে চিৎকার শুনতে পাবে না। এর নাম প্রাইভেসি!

টিভিতে একটা গানবাজনার প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাজনার বাজখাঁই জগঝম্পে কানে তালা লাগার জোগাড়। কিন্তু নিকি আর ভিকির তাতে সুবিধেই হচ্ছিল।

মানুষের আদিম প্রবৃত্তির বশে এবার চিৎকার করে উঠল রাজরীতা।

ওর পরনের পোশাক এর মধ্যেই ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। মাথার চুল এলোমেলো। বড়-বড় শ্বাস পড়ছে। চোখে শুধুই আতঙ্ক।

ওর চিৎকার কেউ শুনতে পেল বলে মনে হল না।

হঠাৎই ওর ঝুমকির কথা মনে পড়ল।

মহাশূন্যে ভেসে যেতে-যেতে খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো ও ঝুমকির নাম ধরে গলা ফাটিয়ে ডেকে উঠল।

তার দু-চার সেকেন্ডের মধ্যেই একটা বেডরুমের দরজা খুলে ঝুমকি এ-ঘরে উঁকি মারল।

বছর আঠারো কুড়ির মিষ্টি মেয়ে। রোগা, ফরসা। যৌবন চোখে পড়ার মতো। খোলা চুল কী এক শ্যাম্পুর কল্যাণে লম্বা টান-টান হয়ে ঝুলছে। কপালের ওপরেও চুলের পরদা নেমে এসেছে। পরনে আকাশ-নীল চুড়িদার।

আঙুল দিয়ে চোখ ঘষছিল ঝুমকি। বোধহয় ঘুমোচ্ছিল—রাজরীতার ডাকে ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে। সাউন্ডপ্রুফ দেওয়াল ওর শোনার ক্ষমতাকে কাবু করতে পারেনি। ওকে ভাড়া দেওয়ার সময় 'আলটিমেট সিকিওরিটি' কোম্পানি ওর এই দারুণ ক্ষমতার কথা জানিয়েছিল। সেইসঙ্গে জানিয়েছিল ওর আরও সব অদ্ভুত-অদ্ভুত ক্ষমতার কথা।

এই হল প্রাইভেট সিকিওরিটি গার্ডের দশা! একে ভাড়া করে নিয়ে এসে দিনের-পর-দিন টাকা গুনে গেছে শত্রুজিৎ! গত একমাস ধরে তো মেয়েটার খাওয়া আর ঘুমোনো ছাড়া কোনও কাজ নেই! আজ যখন বিপদ হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়েছে, তখনও সে দিব্যি ঘুমোচ্ছে!

এইজন্যই ঝুমকির কথা রাজরীতার প্রথমে মনে পড়েনি।

ঝুমকি হর্স নেবুলার কে-২০৪ গ্রহের 'মানুষ'। 'আলটিমেট সিকিওরিটি' অন্তত সেরকমই জানিয়েছিল। শত্রুজিৎকে ওরা বলেছিল, 'স্যার, আসলে এরা মানুষ নয়, হিউম্যানয়েড—মানে, সাইবারম্যানও বলতে পারেন। ওদের শরীরে আমাদের মতো রক্ত-মাংস আছে বটে, তবে ওদের হার্ট ধুকপুক করে ব্যাটারির জোরে। ওদের এমন সব আশ্চর্য ক্ষমতা আছে যা আমাদের সিকিওরিটির ব্যাপারে মোক্ষম। তবে সত্যি-সত্যি দরকার না হলে ওরা সেইসব স্পেশাল পাওয়ার ব্যবহার করে না। আপনি ওকে ভাড়া নিন—তা হলে সেফটি নিয়ে আপনার আর কোনও চিন্তা থাকবে না। ও আপনার বাড়িতে বাড়িরই একজন হয়ে থাকতে পারবে। কেউ ওকে সিকিওরিটি গার্ড বলে সন্দেহ করবে না।'

'আপনাদের চার্জটা বড্ড বেশি—।' শত্রুজিৎ অনুযোগ করে বলেছিল।

তখন 'আলটিমেট সিকিওরিটি'-র অফিসারটি হেসে বলেছে, 'উই আর বেস্ট ইন দ্য গেম। কে-২০৪-এর সঙ্গে শুধু আমাদের কোম্পানিরই ইমপোর্ট এগ্রিমেন্ট হয়েছে। সুতরাং আপনি যা পাচ্ছেন তা হল সেরা নিরাপত্তা—আলটিমেট সিকিওরিটি।' তারপর গলায় বাঁধা টাইয়ের নটটা ঠিক করতে-করতে সামান্য ইতস্তত করে অফিসারটি বলেছে, 'শুধু একটা ছোট্ট প্রবলেম আছে...।'

'কী প্রবলেম?' কৌতূহলে শত্রুজিতের ভুরু কুঁচকে গেছে।

'মানে, ঝুমকির গলার স্বরটা মেটালিক...যেটাকে পরিভাষায় ধাতব কণ্ঠস্বর বলে—মানে, আদ্যিকালের সিনেমাগুলোর রোবটের গলা যেমন শোনায় আর কী!'

হাসল শত্রুজিৎ : 'গলার স্বর মেটালিক হোক বা পেটালিক হোক, আমার কাজ নিয়ে কথা!'

শত্রুজিতের বলা কথাগুলো রাজরীতার মনে পড়ছিল। তবে ওই কোম্পানি থেকে এটা বলে দেয়নি যে, ঝুমকি ঘুমোতে ভীষণ ভালোবাসে। একটু ফাঁক পেলেই চট করে একপ্রস্ত ঘুমিয়ে নেয়।

ঝুমকিকে দেখেই নিকি আর ভিকি থমকে গেল। কিন্তু সে এক লহমার জন্য। তারপরই অশ্লীল উল্লাসে ওদের হাসি চওড়া হল।

'নিকি, আমাদের লাক দারুণ! ম্যাডামকে আর শেয়ার করতে হবে না।'

নিকি তখন রাজরীতার শরীরের উত্তর গোলার্ধে ব্যস্ত ছিল। হাসতে-হাসতে ও জবাব দিল, 'তুই ওকে নে। ম্যাডামকে ছাড়া আমি বাঁচব না।'

শেষ কথাটা ন্যাকা-ন্যাকা সুরে বলেই রাজরীতার দিকে দ্বিগুণ মনোযোগ দিল নিকি। আর ভিকি অ্যাথলিটের ক্ষিপ্রতায় দৌড়ে গেল ঝুমকির দিকে। এবং কেউ কিছু আঁচ করে ওঠার আগেই এক হ্যাঁচকায় ঝুমকিকে কোলে তুলে নিল।

ভিকি মরশুম-খ্যাপা কুকুরের মতো ঝুমকিকে আদর করছিল। আর হিউম্যানয়েড ঝুমকি অবাক হয়ে লোকটার পাগলামো দেখছিল।

এদিকে রাজরীতা নিজেকে বাঁচানোর জন্য নিকির সঙ্গে প্রাণপণে ধস্তাধস্তি করছিল। আর একইসঙ্গে ভাবছিল, ব্যাপারটা কতদূর গড়াবে। রেপ, নাকি রেপ অ্যান্ড মার্ডার? কিন্তু ঝুমকির বেলায় কী হবে? ও তো মানুষ নয়! যদিও বাইরে থেকে ওর সবকিছুই আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো।

'আমাকে ছেড়ে দিন। আমি হিউম্যানয়েড। আমাকে ছেড়ে দিন। আমি হিউম্যানয়েড। আমাকে...।' অবাক চোখে ভিকির দিকে তাকিয়ে থেকে একঘেয়ে ধাতব সুরে বলে চলল ঝুমকি।

ওর গলার স্বরে চমকে উঠল ভিকি। এক ঝটকায় ওকে মেঝেতে নামিয়ে দিল।

নিকিও তখন নিজের জরুরি কাজ ছেড়ে হাঁ করে রোগা ফরসা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছে।

ঝুমকি তখন বলছে, 'আমাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ। আমি এই ফ্ল্যাটের সিকিওরিটি গার্ড। আপনারা দয়া করে এক্ষুনি ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যান, নইলে আপনাদের বিপদ হবে। সে-বিপদ থেকে আর ফেরা যায় না। আশা করি আপনারা আমার অনুরোধ রাখবেন। আমার অনুরোধ রাখবেন। আমার অনুরোধ...।'

রাজরীতাও অবাক হয়ে ঝুমকির কাণ্ড দেখছিল। ভয়ংকর দুজন ক্রিমিনালকে ও যেন নিশ্চিন্তে গীতা পাঠ করে শোনাচ্ছে!

প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কাটা ভিকি সামলে নিয়েছিল। ঝুমকির কথা শুনে ও ব্যঙ্গ করে বলল, 'আমরা দয়া করে এক্ষুনি ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যাব। তার আগে চটপট আমাদের কাজটা সেরে নিতে দাও। এসো, কাছে এসো—।'

'আমি মানুষ নই—হিউম্যানয়েড। হিউম্যানয়েড। হিউম্যানয়েড।' ঝুমকি নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়ার মতো করে কথাগুলো উচ্চারণ করল।

'আরে বাইরে তো কোনও ফারাক নেই—ওতেই আমার কাজ মিটে যাবে!'

অধৈর্যভাবে বলল ভিকি।

'আমার ভেতরে ব্যাটারি আছে। আমি মানুষ নই—হিউম্যানয়েড। হিউম্যানয়েড। হিউম্যানয়েড...।'

'এসো, ব্যাটারির সুইচটা একটু খুঁজে দেখি।' ঝুমকির দিকে অশ্লীল ইঙ্গিত করে বলল ভিকি, এবং ঝুমকিকে আবার জাপটে ধরল।

ওর গায়ে মুখ ঘষতে-ঘষতে ভিকি বলল, 'কই, সবই তো দেখছি মানুষের মতো। এতেই আমার কাজ চলে যাবে। দেখি তো, তোমার ব্যাটারির সুইচটা কোথায়!'

ঝুমকি যান্ত্রিকভাবে আগের কথাগুলোই বারবার বলছিল, কিন্তু ভিকি ওর কথায় কোনওরকম আমল দিচ্ছিল না। একমনে নিজের কাজ করছিল।

নিকি এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। বিপদের জন্য আগাম সতর্ক হয়ে টেবিলে রাখা ব্যাগের দিকে দু-পা এগিয়েও গিয়েছিল—যাতে দরকার হলেই ব্যাগ থেকে একটা অস্ত্র বের করে নেওয়া যায়।

এখন ভিকিকে নিজের কাজে মত্ত হতে দেখে নিকির শরীরের টান-টান ভাবটা ঢিলে হল। ও আবার পা বাড়াল রাজরীতার দিকে।

কিন্তু ঠিক তখনই একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল।

নির্লিপ্ত ঝুমকি ওর বাঁ-হাতের তালুটা বইয়ের পাতার মতো চোখের সামনে মেলে ধরল। সঙ্গে-সঙ্গে তালুটা গনগনে আঁচের মতো লাল হয়ে গেল। ওর হাতের পাতায় ফুটে উঠল কয়েকসারি বোতাম—অনেকটা ক্যালকুলেটরের মতো। ডানহাতের তর্জনী দিয়ে চটপট কয়েকটা বোতাম টিপল ঝুমকি।

ভিকি মেঝেতে হাঁটুগেড়ে বসে ঝুমকিকে আঁতিপাঁতি করে আদর করছিল। হঠাৎই ও যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে ছিটকে পড়ল তিন হাত দূরে। সঙ্গে-সঙ্গে ঝুমকি হাওয়ায় শিস তুলে চোখের পলকে পৌঁছে গেল সিগনাল জ্যামিং-এর যন্ত্রটার কাছে। ভিকির কাছ থেকে যন্ত্রটার কাছে পৌঁছনোর সময় রাজরীতা ওকে একটা ঝাপসা নীল ঝিলিকের মতো দেখতে পেল।

ঝুমকি ক্যানটা হাতে তুলে নিয়ে চটপট কয়েকটা বোতাম টিপল। ওর বাঁ-হাতের তালু তখনও লাল ফ্লুওরেসেন্ট বাতির মতো জ্বলছিল। ক্যানটা রেখে দিয়ে ও এবার হাতের তালুর কয়েকটা বোতাম টিপে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে ক্যানের গায়ে দপদপ করতে থাকা এল-ই-ডি বাতিটা নিভে গেল।

ঝুমকি রাজরীতার দিকে তাকিয়ে ধাতব গলায় বলল, 'বউদি, সিগনাল জ্যামিংটা অকেজো করে দিলাম। অকেজো করে দিলাম। অকেজো করে...।'

ঝুমকির কাণ্ড দেখে নিকি হতভম্ব হয়ে আবার থেমে গিয়েছিল। এইবার হঠাৎই সংবিৎ ফিরে পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল টেবিলে রাখা ব্যাগটার ওপরে। হাঁকপাঁক

করে কোনওরকমে ব্যাগ থেকে একটা খাটো বন্দুক বের করে নিল। ব্যাগটা উলটে পড়ে গেল টেবিল থেকে। নিকি বন্দুকের লেসার পয়েন্টারটা ঝুমকির দিকে তাক করে ট্রিগার টিপল।

ঝুমকি এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় ওর শরীরটা উলটোদিকে বাঁকিয়ে দিল। ওর ঝুলে পড়া রেশমি চুল মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

বন্দুকের চাপা শব্দে রাজরীতা কেঁপে উঠল। ওর সিকিওরিটি গার্ডের এইসব অদ্ভুত কাণ্ড ওকে অবশ করে দিচ্ছিল। ও ক্লান্ত শরীরে মেঝেতে বসে পড়ল। কপালের পাশটায় হঠাৎই দপদপ করে একটা ব্যথা শুরু হয়ে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও ঝুমকির দিক থেকে চোখ সরাতে পারছিল না।

নিকি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গুলি করল। ঝুমকি অপার্থিব ঢঙে অনায়াসে সেগুলো এড়িয়ে গেল। তারপর বাঁ-হাতের জ্বলন্ত তালু তুলে ধরল নিকিকে লক্ষ করে।

যেন ভীষণ গরম একটা কিছু ধরে হাতে ছ্যাঁকা লেগে গেছে এইরকম ভঙ্গি করে বন্দুকটা ছেড়ে দিল নিকি। তারপর ডানহাতের কবজি চেপে ধরে ছটফট করতে লাগল।

ঝুমকি তখন বাঁ-হাতের তর্জনী মেঝেতে ঠেকিয়ে চক দিয়ে গণ্ডি টানার মতো দাগ টানতে শুরু করল।

ভিকি ততক্ষণে অনেকটা সামলে নিয়ে উঠে বসেছে। অবাক হয়ে ঝুমকির কাণ্ড দেখছে।

ঝুমকির তর্জনীর টান মেঝেতে একটা উজ্জ্বল নীল রঙের দাগ তৈরি করেছিল। বাজির সলতে পোড়ার মতো হিসহিস শব্দ হচ্ছিল একইসঙ্গে। যেন ওর আঙুলের ছোঁয়ায় ঘরের মেঝে পুড়ে যাচ্ছে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই নিকি আর ভিকিকে ঘিরে একটা আঁকাবাঁকা গণ্ডি সম্পূর্ণ করল ঝুমকি। তারপর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। বাঁ-হাতের তালুর কয়েকটা বোতাম চটপট টিপে হাসিমুখে তাকাল রাজরীতার দিকে।

'আরও কোনও ভয় নেই, বউদি। টাইম লাইন দিয়ে ওদের ঘিরে দিয়েছি। ওরা এখন বন্দি। আপনি ইচ্ছে করলে সিকিওরিটি পুলিশকে খবর দিতে পারেন। খবর দিতে পারেন। খবর দিতে...।'

'টাইম লাইন মানে!' হতভম্ব রাজরীতা কোনওরকমে বলতে পারল।

ঝুমকি ধাতব গলায় জবাব দিল, 'থ্রি ডায়মেনশন থেকে ফোর্থ ডায়মেনশনে যাওয়ার বরডার। মানে, কেউ এটা পেরোলেই আমাদের এই জগৎ থেকে সোজা ফোর্থ ডায়মেনশনে চলে যাবে। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। খুঁজে পাওয়া যাবে না। খুঁজে পাওয়া...।'

ভিকি চিৎকার করে উঠল : 'রাবিশ! অল বুলশিট! নিকি, এই ছুঁড়িটার একটা কথাও বিশ্বাস করবি না! সব ব্লাফ। মিছিমিছি আমাদের ভয় দেখাচ্ছে!'

ঝুমকি ভিকির দিকে ঘুরে তাকিয়ে নিষ্প্রাণ ধাতব গলায় বলল, 'আপনারা কেউ দাগের বাইরে যাবেন না। দাগের বাইরে যাবেন না। দাগের বাইরে...।'

ওর কথার প্রতিধ্বনি শেষ হওয়ার আগেই নিকি আর ভিকি দাঁত খিঁচিয়ে ছুটে গেল ঝুমকির দিকে।

এবং দাগ পেরোনোমাত্রই ওরা দুজন স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

রাজরীতা টলতে-টলতে উঠে দাঁড়াল।

'ওরা কোথায় গেল! ওরা কোথায় গেল!'

ঝুমকি বাঁ-হাতের তালুর বোতাম টিপতে-টিপতে জবাব দিল, 'ওরা ফোর্থ ডায়মেনশনে চলে গেছে। হয়তো মহাকাশের কোনও নির্জন জায়গায় ওরা অন্ধকারে ঠান্ডায় ভেসে বেড়াচ্ছে। ভেসে বেড়াচ্ছে। ভেসে বেড়াচ্ছে...।'

এবার দরজার কাছে এগিয়ে গেল ঝুমকি। একটু পরেই বলল, 'দরজার লকটাকে ঠিক করে দিলাম। ঠিক করে দিলাম। ঠিক করে...।'

ততক্ষণে ঘরের মেঝেতে আঁকা নীল দাগটাও মিলিয়ে গেছে।

দেওয়ালের টিভির প্রোগ্রাম এক মুহূর্তের জন্যও থামেনি। কিন্তু এতক্ষণ রাজরীতার সে-খেয়াল ছিল না। এখন ও হঠাৎ করে যেন টিভির শব্দ শুনতে পেল, দেখতে পেল ছবি। ওর মনে পড়ল মনোরমের কথা, শত্রুজিতের কথা। শত্রুজিৎকে এক্ষুনি একটা ফোন করতে হবে। কিন্তু তার আগে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত এই রোগা ফরসা মেয়েটাকে—থুড়ি, হিউম্যানয়েডটাকে।

'ঝুমকি!'

ঝুমকি রাজরীতার দিকে এগিয়ে আসছিল। রাজরীতা ছুটে গিয়ে ওকে একেবারে জাপটে ধরল। ওর গালে ভালোবাসার চুমু খেয়ে বলল, 'তোমার জবাব নেই।'

ঝুমকি চোখ পিটপিট করল কয়েকবার। তারপর রাজরীতার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'আমি যাই। আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে...।'



মায়াযৌবন

বছর বিশ-বাইশের যুবকটিকে দেখিয়ে বৃদ্ধ মানুষটি বললেন, 'ওর আসল নাম প্রতাপ, কিন্তু আমি ওর নাম রেখেছি মৃত্যুঞ্জয়।'

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কেন?'

হাসলেন বৃদ্ধ—মজা পাওয়ার হাসি। তারপর মাথার একরাশ সাদা চুলে আয়েস করে হাত চালিয়ে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন। খসখসে গলায় বললেন, 'কারণ, আমি চাই, জরাকে ও জয় করুক। ও কখনও আমার মতো বৃদ্ধ হবে না। ওর চামড়ায় কখনও ভাঁজ পড়বে না। ওর চুলে কখনও পাক ধরবে না। ওর শরীর কখনও আমার মতো অকেজো-অথর্ব হয়ে পড়বে না। আর ওর মনে কখনও বার্ধক্যের ভীমরতি বাসা বাঁধবে না।'

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম বৃদ্ধ মানুষটির দিকে। জরাগ্রস্ত এই মানুষটি জরাকে জয় করতে চান! ওঁর মাথার কোনও গোলমাল হয়নি তো!

বৃদ্ধের নাম প্রলয়নাথ আচার্য। বয়েস প্রায় সত্তর-বাহাত্তর। বয়েসের তুলনায় স্বাস্থ্য মন্দ নয়। শক্তপোক্ত লম্বা কাঠামো। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। চশমার পাওয়ার বোধহয় খুব বেশি। কারণ, কাচের দিকে তাকালে সাদা-সাদা রিঙের মতো দাগ দেখা যায়।

প্রলয়নাথের মুখের চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ। একইরকম ভাঁজ হাতের পিঠেও। বোঝা যায়, জরা বেশ ভালোরকমই থাবা বসিয়েছে।

প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই মানুষটার বিচিত্র নাম আমাকে অবাক করেছিল। তারপর ওঁর কথাবার্তা যতই শুনছি, ততই যেন অবাক হচ্ছি।

একটা মাঝারি মাপের ঘরে আমরা দুজনে বসেছিলাম। ঘরের সবক'টা জানলাই বন্ধ। কারণ, তার ওপিঠেই হাড়কাঁপানো শীত। কিন্তু তবুও আমার শীত করছিল। ফুলহাতা সোয়েটার, মাফলার, ঠিকমতো কাজ করছিল বলে মনে হচ্ছিল না।

আমাদের সামনে কারুকাজ করা শৌখিন চায়ের টেবিল। টেবিলে চায়ের কাপ। কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে প্রলয়নাথ বললেন : 'জেরানটোলজির নাম শুনেছেন? জরাবিজ্ঞান? মৃত্যুঞ্জয়ের ব্যাপারটা সাকসেসফুল হলে, জরাবিজ্ঞানের ইতিহাসে একটা মাইলস্টোন তৈরি হবে।'

প্রলয়নাথের ঘোলাটে চোখে আলোর ঝিলিক দেখা গেল। ঠোঁটে একবার জিভ বুলিয়ে নিলেন তিনি। তারপর আমার চোখে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'ব্যাপারটা দারুণ হবে, না?'

আমি এই বৃদ্ধের মনে আঘাত দিতে চাই না। তা ছাড়া আজ কয়েকদিন হল উনি জোর করে আমাকে নিয়ে আসছেন ওঁর বাড়িতে। চা-বিস্কুট-জলখাবার খাওয়াচ্ছেন। গল্প-সল্প করছেন। এই আতিথেয়তার প্রতিদান কি ওঁর স্বপ্ন-চুরমার-করে-দেওয়া বাস্তবের রূঢ় আঘাত।

সুতরাং মিনমিন করে জানালাম, ব্যাপারটা সত্যিই দারুণ হবে।

প্রলয়নাথের 'ব্যাপার' কিন্তু তখনও পাথরের মূর্তির মতো ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পুরু গোঁফ, ফরসা রং রোদে পুড়ে তামাটে, নিষ্পাপ সরল মুখে প্রাণবন্ত দুটি চোখ যেন কথা বলছে।

প্রতাপের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল আমাদের কথাবার্তা ও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারছে না। শুধু প্রলয়নাথ ডেকেছেন বলে ও বাড়ির অন্দর থেকে যান্ত্রিকভাবে এসে হাজির হয়েছে।

প্রলয়নাথ ওকে ডেকেছিলেন 'পর্‌তাপ' বলে। সেই সম্বোধন আর ওর হাবভাব মিলিয়ে আমার সন্দেহ হয়েছিল, প্রতাপ বোধহয় স্থানীয় লোক—রাজপুত। এখন বৃদ্ধের কথায় বোঝা গেল সন্দেহটা সত্যি।

'মোহনবাবু—' খসখসে গলায় আমার নাম উচ্চারণ করলেন প্রলয়নাথ। শব্দ করে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। তারপর : 'পর্‌তাপ—মানে, প্রতাপ—আমার কাছে আছে আজ প্রায় আট বছর। সেদিনের সেই ছোট্ট ছেলেটি থেকে আজ ও জোয়ান মরদ হয়ে উঠেছে। তাই আমি ঠিক করেছি, ওকেই দেব চিরযৌবন—রিওয়ার্ড হিসেবে।'

চা খেতে-খেতে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। একটা পাগলাঘণ্টি বেজে উঠল মাথার ভেতরে। বেশ বুঝতে পারছিলাম, প্রলয়নাথের বাড়িতে আমার রোজকার সান্ধ্য চায়ের আমন্ত্রণের পাট এবার বোধহয় ফুরোল। তিনি কাকে রিওয়ার্ড দেবেন-না-দেবেন সেটা তাঁর মর্জির ব্যাপার। না, প্রতাপ অথবা মৃত্যুঞ্জয় 'ভারতরত্ন' উপাধি পেলেও আমার মতো ছাপোষা মানুষের কোনও আপত্তি নেই। আর থাকলেই বা পাত্তা দিচ্ছে কে।

কিন্তু রোজ যদি চা-জলখাবারের বিনিময়ে জরাবিজ্ঞানের ছদ্মবেশে চিরযৌবন লাভের গল্পগাথা শুনতে হয় তা হলে বড় সমস্যা। কারণ, হাসি পেলেও গম্ভীর প্রাজ্ঞ প্রলয়নাথের সামনে আমি হাসতে পারব না।

চিরযৌবন লাভের আকাঙক্ষা কি আজকের! মনে পড়ে গেল যযাতির কথা। তারপর সাজগোজ, রূপচর্চা, শরীরের যত্ন, মাথার চুল ধরে রাখা, সবকিছুরই আড়ালে রয়েছে চিরকাল যৌবন ধরে রাখার সাধ। মানছি, আমার তেত্রিশ বছর বয়েসটাকে ধরে রাখতে পারলে মন্দ হত না। কিন্তু সাধ আর সাধ্য কি এক ব্যাপার!

এ ক'দিন প্রলয়নাথ কখনও জরাবিজ্ঞানের প্রসঙ্গ তোলেননি। শুধু আমার সম্পর্কে কৌতূহল দেখিয়ে নানান খোঁজখবর করেছেন। বাড়িতে কে-কে আছেন? বিয়ে করেছি কি না? কলকাতা ছেড়ে রাজস্থানের এই শিল্পনগরীতে চাকরি নিয়ে চলে এসেছি কেন? সে কি বাবা-মায়ের ওপরে রাগ করে?

সত্যি কথা বলতে কি, এই বৃদ্ধ মিশুকে মানুষটি ওঁর আন্তরিক ব্যবহারে কয়েকদিনের মধ্যেই আমাকে একেবারে আপন করে নিয়েছেন। কিন্তু আজ এই জরাবিজ্ঞানের প্রসঙ্গ আলটপকা শুরু করে তিনি আমাকে বেশ একটা ধাক্কাই দিয়েছেন।

অথচ মানুষটাকে দেখে আমার কখনও পাগল বলে মনে হয়নি।

তা হলে কি তিনি চিরযৌবন পাইয়ে দেওয়ার ফাঁদ পেতে কিছু টাকা হাতিয়ে নিতে চান আমার কাছ থেকে?

'মোহনবাবু, প্রতাপের মধ্যে আমি ইতিমধ্যেই এমন কিছু-কিছু লক্ষণ দেখতে পেয়েছি যা দেখে বলা যায়, আমার ড্রাগগুলো ঠিকমতো কাজ করছে। ওর বয়েস বাড়ার গতি গত দু-বছরে বেশ কমে গেছে।'

আমি চায়ে চুমুক দিচ্ছিলাম। হঠাৎ উথলে ওঠা হাসির বেগটা সামাল দিতে গিয়ে বিষম খেলাম। কাশির দমকে হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল চায়ের কাপ। ঘরের মেঝেতে বিছানো ফুল-পাতা-হরিণের নকশা কাটা জয়পুর কার্পেট তরলটুকু শুষে নিল, আর কারুকাজ করা কাচের কাপটির প্রাণ বাঁচাল।

আমি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। চেয়ার থেকে উঠে কাপটা তুলে নিতে ঝুঁকে পড়েছি, প্রলয়নাথ চাপা গলায় বাধা দিলেন আমাকে, 'থাক, থাক, ছেড়ে দিন।' তারপর প্রতাপের দিকে ফিরে বললেন, 'পর্‌তাপ, সাফি মারো—।'

প্রতাপ যন্ত্রের মতো এগিয়ে এল টেবিলের কাছে। নীচু হয়ে নীরবে কাজ সারতে লাগল।

'আপনাকে আর-এক কাপ চা দিই?'

প্রলয়নাথের প্রস্তাব আমি বিনীতভাবে ফিরিয়ে দিলাম। দুঃখপ্রকাশ করলাম দুর্ঘটনার জন্যে। তারপর বললাম, 'আজ চলি। অনেকটা পথ যেতে হবে...।'

'যাবেন?' আমার চোখে সরাসরি তাকিয়ে খসখসে গলায় জিগ্যেস করলেন তিনি।

আমি কোনও উত্তর না দেওয়ায় কয়েক মুহূর্ত পরে বললেন, 'আচ্ছা, যান। কাল সন্ধেবেলা আসছেন তো? আপনাকে আমার ল্যাবরেটরি দেখাব। জেরান্টোলজি ভারী ইনটাররেস্টিং সাবজেক্ট...।'

আমি বললাম, 'দেখি—।'

প্রলয়নাথ আমার কাছে এগিয়ে এলেন। ওঁর জরাজীর্ণ হাতে আমার হাত চেপে ধরলেন ঃ 'মোহনবাবু, কাল আপনাকে আসতেই হবে। বিদেশ বিভুঁইয়ে আপনার মতো একজন আপনজনকে আমি একদিনের জন্যেও খোয়াতে রাজি নই। আপনি এখানে চাকরি নিয়ে এসেছেন একমাস। আর আমি এই কোটা শহরে আছি বাইশ বছর। বাংলা কথা প্রায় ভুলতে বসার জোগাড়। বাড়ির বউ-মেয়ের একঘেয়ে কথাবার্তা আর কাঁহাতক ভালো লাগে? কাল আসবেন কিন্তু। প্লিজ...।'

বৃদ্ধের চোখে নীরব মিনতি ছিল। কী যে হল আমার, ঘাড় নেড়ে কথা দিলাম ওঁকে ঃ 'আসব।' কিন্তু আমি মনে-মনে জানতাম, ওঁর বাড়িতে না এসে আমার উপায় নেই। এমন একজনকে আমি এ-বাড়িতে দেখেছি, যার টানে আমাকে আসতেই হবে।

প্রলয়নাথ আমাকে বাড়ির সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। বসবার ঘরে প্রতাপ, ওরফে 'মৃত্যুঞ্জয়', তখন কার্পেট পরিচর্যার কাজে ব্যস্ত।

রাস্তায় বেরোতেই শীত ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার গায়ে। মাফলারটা ভালো করে গলায় আর কানে মুড়ি দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম প্ল্যান্টের দিকে।

রাজস্থানের কোটা থার্মাল পাওয়ার স্টেশনে চাকরি নিয়ে আমি এসেছি আজ প্রায় একমাস। চাকরি না পালটালে বাকি জীবনটা বোধহয় এখানেই কাটাতে হবে। কলকাতায় পিছুটান বলতে বাবা-মা, ছোট ভাই, আর ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতি। হয়তো পুরোনো কথা ভুলতে চাই বলেই একরকম জেদ করে এই চাকরি নিয়ে আমি কলকাতা ছেড়েছি। ছোটভাই ভালোই চাকরি করে। সুতরাং সচ্ছলভাবে মা-বাবার দিন কেটে যাবে।

আমি এই নতুন জায়গায় এসে নতুন মানুষজন আর প্রকৃতির সঙ্গে মেলামেশা করছি—যাতে কলকাতার কথা বেশি মনে না পড়ে। কিন্তু সেটা হয়ে উঠছে কই! দুঃখ ভুলতে এত কষ্ট হয় কেন কে জানে!

থাকার জন্যে আমাকে আপাতত একটা ছোট কোয়ার্টার দেওয়া হয়েছে। দিনের বেলা ক্যান্টিনে খাওয়াদাওয়া সারি, আর রাতে ডিমসেদ্ধ, আলুভাজা, আর দু-মুঠো ভাত ফুটিয়ে ম্যানেজ করি। রান্নার অভ্যেস কোনওকালেই ছিল না। সুতরাং সে যে কী মর্মান্তিক অগ্নিপরীক্ষা, তা শুধু আমিই জানি। আমার হাতে-পায়ে নানান ফোস্কার দাগ তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এক-একদিন বিরক্ত হয়ে মুড়ি, পাঁউরুটি, কিংবা বিস্কুট খেয়ে শুয়ে পড়ি। সঙ্গে ঢকঢক করে দু-গ্লাস জল। তবে কষ্ট যতই হোক, মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, কলকাতায় সহজে ফিরছি না।

ভোরবেলা আমি চম্বল নদীর তীরে বেড়াতে বেরোই।

সময়টা জানুয়ারির শেষ, কিন্তু তাই বলে শীতের ধার কমেনি। তা ছাড়া, আমি বরাবরই বেশ শীতকাতুরে। তাই ডবল সোয়েটার, মাফলার, মাঙ্কি ক্যাপ ইত্যাদি পরে ভোরবেলা চম্বল নদীর তীরে পায়ে হেঁটে শীতের সঙ্গে কুস্তি করি। শরীরের প্রায় সর্বাঙ্গ ঢাকা—শুধু চোখ দুটি খোলা। ঠিক যেন দস্যু মোহন।

এইরকম সাজে রোজ পায়চারি করি, আর রংবেরঙের পাখি দেখি। ওদের পালকগুলো যেন ঈশ্বর এঁকে দিয়েছেন রামধনু-রং তুলি দিয়ে। নদীর জল, আকাশ, আর পাখি আমাকে চুম্বকের মতো টানতে থাকে। বুঝতে পারি, প্রকৃতির টান এড়ানো কী কঠিন।

এইরকম এক সকালে, তখন সবে সূর্য উঠেছে, সোনালি রং ঝিলিক মারছে চম্বলের জলে—পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, 'বাঙালি নাকি?'

বেশ অবাক হলাম। শুধুমাত্র চোখ দেখে বাঙালি বলে চিনতে পারে এমন প্রতিভাবান মানুষটি কে!

চোখ ফিরিয়েই দেখি, সুঠাম চেহারার এক বৃদ্ধ। পরে জেনেছি, তাঁর নাম প্রলয়নাথ আচার্য। বিশ বছরের ওপর কোটায় আছেন। কী একটা কসমেটিক্স ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন—রিটায়ার করেছেন প্রায় দশ-এগারো বছর।

আমার অবাক দৃষ্টির উত্তরে সামান্য হেসে লোলচর্ম প্রলয়নাথ খসখসে গলায় বলেছিলেন, 'আপনার মাফলারের আঁচলে নামের প্রথম অক্ষর "ম" সুতো দিয়ে সেলাই করা আছে। তা থেকেই আন্দাজে ঢিল ছুড়েছি।'

আদ্যক্ষর খোদাই করাটা মায়ের কাণ্ড—যাতে আমার আর ভাইয়ের জিনিস ওলটপালট না হয়ে যায়। কিন্তু বৃদ্ধ মানুষটির পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার প্রশংসা করতে হয়। একটা নগণ্য 'ম'কারান্ত ব্যাপার দেখতে পেয়েছেন!

এইভাবে প্রথম আলাপের পর প্রলয়নাথ দেখা হলেই গল্প জুড়ে দিতেন আমার সঙ্গে। আর তার সঙ্গে নানান কৌতূহল মেটাতে চাওয়া প্রশ্ন। এ দেশে বহুবছর থাকার জন্যে ভদ্রলোকের বাংলা কথায় এদিককার রাজস্থানি টান জুড়ে গেছে।

ওঁর কাছেই শুনেছি, সমুদ্রতল থেকে প্রায় আড়াই হাজার মিটার উঁচু এই কোটা শহরটা এক বিশাল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা—যাকে স্থানীয় ভাষায় বলে 'কোট'। 'কোট' থেকেই নাকি এসেছে শহরের নাম—কোটা।

এক-দু-দিন আলাপের পরই বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন। চা খেতে-খেতে প্রলয়নাথ বলেন, 'জানেন তো, মোহনবাবু, দুজন বাঙালি একজায়গায় জুটলেই চায়ের পেয়ালায় রাজা-উজির মারতে থাকে। সুতরাং আমার বাড়িতে আপনার রোজ চায়ের নেমন্তন্ন রইল। প্রতিদিন সন্ধেবেলা বসে ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টাদুয়েক রাজা-উজির মারা যাবে'খন।'

প্রলয়নাথের বাড়িটা আমার প্ল্যান্ট থেকে হাঁটাপথে মিনিটপনেরো। সাদা রঙের দোতলা বাড়ি। সামনে-পেছনে খানিকটা করে বাগান। পিচের রাস্তা থেকে রুক্ষ পাথুরে

রাস্তা খানিকটা ভেতরদিকে চলে গেছে, একেবারে বাড়ির কাছ পর্যন্ত। বাড়ির পাশে একটা বড়সড়ো খাদ। বোধহয় কেউ একসময় মাটি খুঁড়ে পুকুর তৈরি করার চেষ্টা করেছিল।

প্রথমদিন বাড়িতে গিয়ে আলাপ হয়েছে প্রলয়নাথের বৃদ্ধা স্ত্রীর সঙ্গে।

'মোহনবাবু, আমার বউ অনুরাধা—' বসবার ঘরে আমাকে বসিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি, 'গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে আমার সহধর্মিনী—এটাই হল লিটারাল ট্রুথ। আর অনুরাধা, ইনি মোহন দাশশর্মা। পাওয়ার প্ল্যান্টে নতুন চাকরি নিয়ে এসেছেন। ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। কী, তাই তো?'

শেষ প্রশ্নটা আমাকে লক্ষ করে।

আমি নীরবে ঘাড় নেড়ে জানালাম যে, উনি ঠিকই বলেছেন।

অনুরাধাকে দেখছিলাম আমি। ছোটখাটো চেহারা। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। ঠোঁটের ওপরে, ডানদিকে, বেশ বড় একটা কালো রঙের আঁচিল। বয়েসকালে ওটাই বোধহয় বিউটি স্পট ছিল, এখন শুধুই স্পট।

অনুরাধার গাল ভাঙা, মুখের চামড়ায় অগুনতি ভাঁজ। একটা চোখে সাদাটে ভাব—বোধহয় ছানি পড়েছে। সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর আর কপালে বড় সিঁদুরেরর টিপ।

অনুরাধার গায়ে কালচে সবুজ রঙের একটা কম্বলজাতীয় শাল জড়ানো থাকায় ওঁর পরনের শাড়ির নীচটুকু দেখা যাচ্ছিল। যোধপুরী বাঁধনি শাড়ি। তাতে তেরছাভাবে লাল-হলুদ-নীল রঙের খেলা। ওঁর বয়েসের সঙ্গে শাড়ির উজ্জ্বল রং আমার বেশ বেমানান লাগছিল। তবে এমন হতে পারে যে, ওঁর স্বামী হয়তো এরকম উজ্জ্বল রং-ই পছন্দ করেন।

শুধু মুখটুকু ছাড়া অনুরাধার শরীরের আর কোনও অংশ দেখা যাচ্ছিল না। শাড়ির ওপরে শালটা এতই বড় এবং পুরু যে, ওঁকে ফোলানো-ফাঁপানো কোলবালিশ বলে মনে হচ্ছিল। এছাড়া পায়ে মোজা আর অর্ধেক পা-ঢাকা রবারের চটি।

ভদ্রমহিলার গলার স্বর ভারী মিষ্টি। চোখ বুজে কথা শুনলে বয়েস ঠাহর করা মুশকিল—অনেকটা লতা মঙ্গেশকরের মতো।

তিনি স্নেহমাখানো গলায় আমাকে বললেন, 'আপনি রোজ হাত পুড়িয়ে রান্না করে খান?'

ওঁর কথায় একেবারে হইহই করে উঠলেন প্রলয়নাথ, 'আপনি অনায়াসে আমাদের এখানে খাওয়াদাওয়া করতে পারেন।'

আমি লজ্জা পেয়ে আপত্তি জানালাম।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক হল, রোজ সন্ধেবেলা চা-জলখাবার খেতে ওঁদের বাড়িতে আমি আসব। আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে ছাড়লেন প্রলয়নাথ।

অনুরাধা চলে যাওয়ার পর আমরা চা খেতে-খেতে গল্প করছিলাম।

মাঝারি মাপের ঘর ছিমছামভাবে সাজানো। দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো

মিনিয়েচার পেইন্টিং-এ জাহাঙ্গীর আর নূরজাহানের শয্যাকক্ষ। মেঝেতে ফুলপাতার নকশা করা কার্পেট। ঘরের একপাশে দুটো খাটো টুল। কাঠের ফ্রেমে চামড়া দিয়ে বাঁধানো। চামড়ার ওপরে ফুল আর জ্যামিতির নকশা। ঘরের একদিকের দেওয়ালে রাধা-কৃষ্ণের ফটো বাঁধানো। সেখানে দুটো ধূপকাঠি জ্বলছে। ধূপের উগ্র গন্ধ ছেয়ে গেছে ঘরের বাতাবরণে।

প্রলয়নাথের অনুমতি নিয়ে আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

তিনি বললেন, 'আমি একসময় খুব সিগারেট খেতাম। বুকে কষ্ট হয় বলে ছেড়ে দিয়েছি। তা ছাড়া সিগারেট খেলে বয়েসটা তাড়াতাড়ি বেড়ে যেতে চায়। আপনি পারলে এই বদ নেশাটা ছেড়ে দেবেন।'

কথায়-কথায় প্রলয়নাথ বলেছিলেন, বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে ওঁর আগ্রহ আছে। কিন্তু জেরান্‌টোলজির কথা স্পষ্ট করে বলেননি।

মনে পড়ছে, প্রতাপ সম্পর্কে তিনি সেদিন মাত্র একটা-দুটো কথা বলেছিলেন।

পর্‌তাপ চওহান বুন্দির ছেলে। আট বছর আগে দশেরার মেলায় কীভাবে কোটায় চলে আসে। তারপর আত্মীয়স্বজন কাউকে আর খুঁজে পায়নি। সোজা কথায়, একা হয়ে যায়। তখন প্রলয়নাথ ওকে আশ্রয় দেন। সেই থেকে এখানেই বড় হয়েছে। ওঁদের কাছে থেকে-থেকে মোটামুটি বাংলা শিখে গেছে।

প্রতাপ তখন বাড়িতে ছিল না। কীসব জিনিসপত্র কিনতে বাজারে গেছে।

না, তখনও 'মৃত্যুঞ্জয়' বা জেরান্‌টোলজির প্রসঙ্গ ওঠেনি। উঠলে সেদিন থেকেই আমি সতর্ক হতাম।

প্রলয়নাথ চোখ থেকে চশমা খুলে চশমার কাচ মুছে নিলেন। তারপর চশমা চোখে দিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। বললেন, 'মোহনবাবু, আপনি অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস করেন?'

আমি সিগারেটে টান দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ধোঁয়া ছাড়লাম। সর্বনাশ! এই বুঝি শুরু হল কোটার ভূতের গল্প!

মনে যা-ই ভাবি, মুখে কৌতূহল ফুটিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'ভূত-প্রেতের ব্যাপার?'

তিনি ইতস্তত করে বললেন, 'না, ঠিক সেরকম নয়। এমন ব্যাপার, যেটা সহজে বিশ্বাস হওয়ার নয়—অথচ সত্যি।'

আমার মতো অতিথির পক্ষে বেশি তর্ক-বিতর্কে যাওয়াটা অশোভন। তাই মিনমিন করে বলেছি, 'সত্যি হলে বিশ্বাস না করে উপায় কী।'

'হুঁ—' মাথা নীচু করে ঘাড় নেড়েছিলেন প্রলয়নাথ। তবে ও-বিষয়ে আর কথা বাড়াননি।

পরে টুকিটাকি কাজে অনুরাধা ঘরে এসেছেন। যেমন চুপচাপ এসেছেন তেমনই চুপচাপ চলে গেছেন। কিন্তু প্রলয়নাথের মেয়েকে একটিবারের জন্যেও দেখিনি।

জানি, এই কৌতূহল হয়তো বয়েসের দোষ, কিন্তু স্বীকার করছি, মেয়েটিকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছিল।

তাই উঠে আসার আগে বৃদ্ধ মানুষটিকে সে-কথা জিগ্যেস করলাম।

সামান্য চমকে উঠে তিনি বলে উঠলেন, 'কে? সুপ্রিয়া? ও হয়তো ভেতরের ঘরে পড়াশোনা নিয়ে মেতে আছে। ভীষণ একাচোরা—কারও সামনে বেরোতে চায় না।'

একটু অবাক হলেও আর কোনও কথা বলিনি। কিন্তু কৌতূহলটা আমার থেকেই গিয়েছিল।

আমি চলে আসার আগে প্রলয়নাথ আরও একবার প্রতাপের কথা তুললেন। এলোমেলোভাবে যা বললেন, তার স্পষ্ট কোনও অর্থ আমার মাথায় ঢুকল না।

'ওর কথা শুনলে সবাই একেবারে চমকে যাবে...ভীষণ বাধ্য ছেলে...আমাকে খুব মানে...ওকে নিয়ে আমার অনেক আশা...।'

বৃদ্ধের প্রলাপ ভেবে সেদিনকার কথাগুলো আমি উড়িয়ে দিয়েছিলাম।

কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, সেদিন প্রলয়নাথ ঠিক কী বলতে চেয়েছিলেন। কী সেই অলৌকিক ব্যাপার। আর, প্রতাপের কথা শুনলে সবাই কেন চমকে যাবে।

অর্থাৎ, জরাবিজ্ঞান। কসমেটিক্স কোম্পানিতে বিজ্ঞানীর চাকরি করা প্রলয়নাথ হয়তো নিজের বার্ধক্যকে মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই নিজের পছন্দসই গবেষণায় নেমে পড়েছেন। আর হাতের কাছে ভোলাভালা রাজপুত ছেলেটিকে পেয়ে তার ওপরেই যত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ফলাচ্ছেন।

কিন্তু প্রতাপের পর দ্বিতীয় 'মৃত্যুঞ্জয়' হিসেবে তিনি কি আমাকে টারগেট করেছেন না কি! সেইজন্যেই কি খোঁজখবর নিচ্ছিলেন, আমার বাড়িতে আর কে-কে আছে, কলকাতায় সেরকম কোনও পিছুটান আছে কি না! তারপর রয়েসয়ে ব্যাপারটা আমার কাছে ভাঙবেন।

কোয়ার্টারে ফেরার পর একটা অদ্ভুত ভয় আমাকে জড়িয়ে ধরল।

জরাকে আমি ভয় পাই ঠিকই। সব মানুষই জরাকে ভয় পায়। কিন্তু জরা কি মোটরগাড়ি না কি যে, যখন খুশি প্রলয়নাথ তার ব্রেক কষে গতি কমিয়ে দেবেন! প্রতাপের বেলায় উনি নাকি সেটা করতে পেরেছেন। কোনওদিন হয়তো বলে বসবেন, তিনি ব্রেক কষে গাড়ি একেবারে থামিয়ে দিয়েছেন। প্রতাপের বয়েস আর বাড়বে না।

রাতটা আমার নানান দুশ্চিন্তায় কাটল। কিন্তু ভয় যেমন আমাকে প্রলয়নাথের বাড়ি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছিল, তেমনই ওঁর মেয়ে সুপ্রিয়া আমাকে পাগলের মতো টানছিল।

কারণ, সুপ্রিয়াকে আমি একদিন দেখতে পেয়েছি। তখন ও বাথরুমে গরমজলে গা ধুচ্ছিল। শীতের সময় সন্ধেবেলা এভাবে কেউ গা ধোয় বলে শুনিনি। কিন্তু আমার তখন শোনা নয়, দেখার সময়।

একতলার বাথরুমের ছোট জানলাটা খোলা ছিল। ভেতরে অন্তত চল্লিশ ওয়াটের আলো জ্বলছিল। আমি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিলাম। প্রলয়নাথ তখন সরস্বতী ভাণ্ডার মিউজিয়াম থেকে ওঁর কপি করে আনা একটি দুষ্প্রাপ্য পুথি আমাকে দেখাবেন বলে ভেতরের ঘরে গেছেন। আর অনুরাধা বোধহয় আমাদের জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করতে রান্নাঘরে গেছেন। প্রতাপও ধারে-কাছে ছিল না।

আমি সুপ্রিয়ার স্নান দেখছিলাম। আর ওর ঢল নামা শরীর দেখছিলাম। জানলা দিয়ে ওর পিঠ, পিঠের নীচ, আর বুকের পাশটা দেখা যাচ্ছিল। ভেজা শাড়িটা ঠিকমতো গায়ে জড়ানো ছিল না। তাই আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে নিষ্পলকে তাকিয়ে ছিলাম।

এক মিনিট, দু-মিনিট।

তারপরই বাথরুমের আলো নিভে গিয়েছিল।

সুতরাং সারারাত বহু দোনামনা করেও সুপ্রিয়া জিতে গেল। তাই পরদিন সন্ধেবেলা আমি প্রলয়নাথের বাড়িতে গেলাম।

বেশ বুঝতে পারছিলাম, ওঁর কোনওরকম উদ্ভট চিন্তাই আমাকে আপাতত ওঁর বাড়ি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না।

পরদিন সন্ধেবেলা প্রলয়নাথের বাড়িতে যখন গেলাম, তখন বৃদ্ধ মানুষটি আমার জন্যে যেন তৈরিই ছিলেন। আমাকে সঙ্গে করে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'আমি প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আপনার আশায় বসে আছি। আসুন, বসুন, আগে চা-টা একটু খেয়ে নিন, তারপর ল্যাবে নিয়ে যাব।'

আমি রোজকার মতোই বসলাম।

রাধা-কৃষ্ণের ফটোর কাছে ধূপ জ্বলছিল। কিন্তু ধূপের গন্ধ ছাড়াও একটা হালকা পারফিউমের গন্ধ নাকে আসছিল। অনুরাধা নিশ্চয়ই সত্তর ছুঁই-ছুঁই বয়েসে পারফিউম ব্যবহার করবেন না। তা হলে আর বাকি থাকে সুপ্রিয়া। ও কি একটু আগেই এসেছিল এই ঘরে?

প্রলয়নাথ জরাবিজ্ঞান নিয়ে কিছু-কিছু কথা বলছিলেন, কিন্তু সেগুলো আমার কানে ঠিকমতো ঢুকছিল না। আমার মাথার ভেতরে তখন বাথরুমের ছোট্ট জানলাটা ভাসছিল। একজন ভরাযৌবন তরুণী সেখানে স্নান করছে।

বারবার ঘড়ি দেখছিলাম আমি। এখন ঘড়িতে প্রায় ছ'টা পঁচিশ। আগের দিন ব্যাপারটা আমি লক্ষ করেছিলাম সাড়ে ছ'টা-পৌনে সাতটা নাগাদ। সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার মনটা উসখুস করতে লাগল।

প্রলয়নাথ তখন কপি করে আনা পুথিটার কথা বলছিলেন।

'বুঝলেন, মোহনবাবু, পুথিটার নাম "স্থিরযৌবন"—প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে লেখা। ওটা পড়ে আমার গবেষণায় অনেক সাহায্য পেয়েছি। আমাদের

যখন বয়েস বাড়ে, তখন শরীরের সঙ্গে-সঙ্গে মনটাও বুড়ো হতে থাকে। শরীরের বাইরেটায় যেমন ধীরে-ধীরে বয়েসের ছাপ পড়ে, তেমনই ভেতরকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও বুড়ো হয়। আমাদের চামড়ার বাইরেটা ক্রমশ পুরু হতে থাকে, অথচ ডার্‌মিস, মানে, অন্তঃত্বক, ক্রমাগত কুঁচকে যেতে থাকে। তা ছাড়া, ডার্‌মিসের কলাজেন কনটেন্ট কমতে থাকে—ফলে চামড়ার জোরও কমে। এই দেখুন না, যেমনটা আমার হয়েছে—' বলে নিজের শিরা ওঠা লোলচর্ম হাতের পিঠ দেখালেন প্রলয়নাথ। একটু দম নিয়ে তারপর বললেন, 'শুধু চামড়া কেন, হাড়গুলো ক্ষয় ধরে কমজোরি হতে থাকে। তলপেটের সবচেয়ে বড় যে-ধমনি, অ্যাওর্টা, তার ইলাস্টিসিটি কমতে থাকে। রিঅ্যাকশন টাইম বাড়তে থাকে, রিফ্লেক্স ঢিলেঢালা হয়ে পড়ে। চোখের মণির ছোট-বড় হওয়ার ক্ষমতা কমে যায়, ব্রেনের ওজনও যায় কমে। আর নার্ভাস সিস্টেমও ধীরে-ধীরে তার তেজ হারিয়ে ফেলে। অল্পবয়েসে...।'

প্রতাপ ঘরে ঢুকল। হাতে রোজকার মতো চা-জলখাবার। আমাদের সামনের টেবিলে সেগুলো সাজিয়ে দিয়ে প্রতাপ চলে গেল। যাওয়ার আগে অদ্ভুত চোখে ঘুরে তাকাল আমার দিকে। সে-দৃষ্টিতে সহমর্মিতার আভাস পেলাম বলে মনে হল। কিন্তু তার কারণ খুঁজে পাইনি—অন্তত তখনও।

প্রতাপ এসে পড়ায় কথা থামিয়ে দিয়েছিলেন প্রলয়নাথ। হয়তো চান না, প্রতাপ আমাদের সব আলোচনা শুনে ফেলুক। ও চলে যেতেই তিনি আগের কথার জের টেনে বলতে শুরু করলেন, 'অল্পবয়েসে আমাদের ব্রেইনের নিউরোন, মানে, স্নায়ুকোশ, নষ্ট হয়ে গেলে আবার নতুন কোশ জন্মায়। কিন্তু বয়েস বাড়তে-বাড়তে পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ হয়ে গেলে নতুন স্নায়ুকোশ জন্মানোর ব্যাপারটা বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য এতে বুদ্ধি সত্যি-সত্যি কমে যায় কি না তা নিয়ে বির্তক আছে, তবে স্মৃতিশক্তি বেশ কমে আসে—।'

কথা বলতে-বলতে প্রলয়নাথ চায়ের কাপে বড়-বড় চুমুক দিচ্ছিলেন। চা শেষ হয়ে যেতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন ঃ 'আপনি চা-টা শেষ করুন। আমি গিয়ে ল্যাবটা একটু গুছিয়ে আসি। আপনি ইচ্ছে করলে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আরাম করে চায়ের কাপে চুমুক দিতে পারেন।'

কথা শেষ করেই প্রলয়নাথ চলে গেলেন। কিন্তু শেষ কথাটা তিনি কেন বললেন কে জানে! আমিও মনে-মনে বোধহয় সেটা চাইছিলাম। তিনি চলে যেতেই তাকালাম ঘড়ির দিকে ঃ পৌনে সাতটা বাজে।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বাইরের বারান্দায় এলাম।

এই বারান্দা থেকে রাতের আকাশ দেখা যায়। একইসঙ্গে দেখা যায় পাকা রাস্তার আলো, আর দূরের দোকানপাট।

বারান্দায় ঠান্ডাটা বেশ জমাট, কিন্তু সেইজন্যেই বোধহয় চায়ের আমেজটা আরও ভালো লাগছিল।

বারান্দায় এসে প্রথমেই আমার চোখ গিয়েছিল একতলার কলঘরের দিকে। কিন্তু দেখলাম, চৌকো ছোট জানলাটা অন্ধকার।

হতাশ হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিতে যাব, অমনই দেখি আলো জ্বলে উঠেছে সেখানে। একটি সুঠাম শরীর জানলার ফ্রেম বরাবর এসে পোশাক ছাড়তে শুরু করল।

ক্রমশ কোমল ত্বক প্রকাশিত হচ্ছিল, আর আমার কান গরম হয়ে উঠছিল। চায়ের কাপ হাতে পাথরের মূর্তি হয়ে গেলাম আমি। আকাশ থেকে হয়তো হিম পড়ছিল, কিন্তু সেদিকে কোনও হুঁশ ছিল না আমার।

একটা ফরসা শরীর বেয়ে জলের রেখা কীভাবে উঁচু-নীচু আঁকাবাঁকা পথে নেমে আসে সেটাই আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখছিলাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম, কাজটা অন্যায়, কিন্তু আমার মনের লোভী অংশটা আমাকে চোখ ফিরিয়ে নিতে দিচ্ছিল না। সুপ্রিয়া, ওঃ সুপ্রিয়া।

ওইভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না, হঠাৎই কারও পায়ের শব্দে চমকে উঠে চোখ ফেরালাম আমি।

প্রলয়নাথ।

ওঁর দু-চোখে অপ্রসন্ন দৃষ্টি।

আমার দিকে কয়েক লহমা স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, 'মোহনবাবু, চলুন...আমার ল্যাবরেটরি দেখবেন চলুন। এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে ঠান্ডা লেগে যাবে।'

আমি বেশ লজ্জা পেয়ে গেলাম। আমি কি ধরা পড়ে গেছি প্রলয়নাথের কাছে? এই বয়েসে 'উঁকি মারা টম' হিসেবে ধরা পড়লে কে না লজ্জা পাবে! কিন্তু কী করব। ওই চৌকো জানলাটা এখন যেন আমার জীবন-মরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কোনও কথা না বলে প্রলয়নাথকে অনুসরণ করলাম আমি।

ওঁর ল্যাবরেটরিটা দোতলার একেবারে পেছনদিকটায়। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ওঠা-নামা করে সরু একফালি অলিপথ পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম ওর ল্যাবে। যাওয়ার পথে রান্নাঘর থেকে ছ্যাঁক-ছোঁক শব্দ পেলাম। অনুরাধা হয়তো রান্না করছেন।

প্রলয়নাথের ল্যাবরেটরিকে ঠিক প্রথাগত অর্থে ল্যাবরেটরি বলা যায় না। একটা মাঝারি মাপের ঘরে নানান সাজসরঞ্জাম জিনিসপত্র এদিক-ওদিক ছড়ানো। তবে সবমিলিয়ে তার মধ্যে একটা বিজ্ঞান-বিজ্ঞান গন্ধ আছে।

ঘরের সবক'টা আলো জ্বেলে দিয়েছিলেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী। টিউব লাইটের উজ্জ্বল আলোয় ল্যাবরেটরির দৈন্য আরও বেশি প্রকট হয়ে পড়েছিল। কিন্তু প্রলয়নাথের চোখে তৃপ্তি আর গর্ব দেখতে পাচ্ছিলাম। আর একইসঙ্গে ভাবছিলাম, বৃদ্ধের মস্তিষ্কের বার্ধক্যের তীব্রতা বোধহয় ওঁর শরীরের বার্ধক্যের তুলনায় বেশি।

একপলক নজর বুলিয়ে ঘরে যা-যা আমার চোখে পড়ল সেগুলো হল : বিশাল কাচের বাক্সে ঢাকা কয়েকটা চারা গাছ—তার মধ্যে বনসাইও আছে, বেশ কয়েকটা

শিশি-বোতল আর টেস্টটিউব, একটা কেরোসিন স্টোভ, প্রচুর বইপত্র আর কাগজ কোণের একটা টেবিলে ডাঁই করা, তিনটে ছোট-ছোট খাঁচায় সাদা ইঁদুর আর গিনিপিগ। হঠাৎ ঘরে আলো জ্বলে ওঠায় প্রাণীগুলো কিচকিচ করে ডাকছে।

'আসুন, এদিকে আসুন—' বলে প্রলয়নাথ আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন চারাগাছগুলোর কাছে।

লক্ষ করলাম, কাচের বাক্সের দিকে তাক করা আছে দুটো হাই পাওয়ারের স্পটলাইট।

প্রলয়নাথ বললেন, 'মোহনবাবু, আপনি তো জানেন, গাছও বড় হয়—বুড়ো হয়। তাই প্রথমদিকটায় আমি গাছের এজিং প্রসেস স্টাডি করেছি। এই কাচের বাক্সটা হল আমার মিনিয়েচার গ্রিনহাউস। আর এই স্পটলাইট দুটো হল সূর্যের আলোর বিকল্প। দিনে আট-দশ ঘণ্টা করে এগুলো আমি জ্বেলে রাখি।'

'ওদের ব্যাপারটা স্টাডি করে কী দেখলেন?' আমার মধ্যে কৌতূহল ধীরে-ধীরে মাথাচাড়া দিচ্ছিল।

'দেখলাম কী জানেন?' সামান্য হাসলেন তিনি। মাথার সাদা চুলে হাত চালিয়ে বললেন, 'আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ঠিকই বলেছেন। গাছের অনেক কিছুই মানুষের মতো। দেখলাম, বয়েস বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ওদের রিঅ্যাকশন টাইম বেড়ে যায়। মানে, ধরুন, আপনাকে কেউ পেছন থেকে টাচ করে ডাকল। সেই স্পর্শ পেয়ে আপনি নিশ্চয়ই সেদিকে ঘুরে তাকাবেন। এটাই হচ্ছে আপনার রিঅ্যাকশন। বয়েস বেড়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে স্পর্শের অনুভূতি পেয়ে ঘুরে তাকাতে আমাদের সময় বেশি লাগে। রিফ্লেক্সের ব্যাপারটাও একইরকম। বয়েস বেড়ে গেলে ক্রিকেটার, ফুটবলার বা টেনিস খেলোয়াড়—সবারই রিফ্লেক্স ঢিমে হয়ে যায়—।'

এমনসময় দরজার কাছ থেকে কেউ ডাকল, 'সাব—।'

ফিরে তাকিয়ে দেখি প্রতাপ। হাতে একটা বড় প্লেট, তাতে অনেকগুলো পেঁয়াজি অথবা ফুলকপির বড়া।

'অনুরাধার সবদিকে নজর থাকে। জানে যে ল্যাব দেখতে বেশ সময় লাগবে, তাই খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে।' প্রতাপের হাত থেকে প্লেটটা নিয়ে একটা টেবিলে রাখলেন প্রলয়নাথ। প্রতাপ চলে যেতেই আমাকে বললেন, 'নিন, মোহনবাবু, খেয়ে দেখুন কেমন হয়েছে—।'

সত্যিই খিদে পাচ্ছিল। তাই সৌজন্যের লজ্জা না দেখিয়ে একটা বড়া তুলে নিলাম। যা ভেবেছিলাম তাই—ফুলকপির বড়া। তবে তার মধ্যে নানান মশলা দিয়ে অনুরাধা তাকে আরও সুস্বাদু করে তুলেছেন।

প্রলয়নাথ একটা বড়া মুখে দিয়ে চিবোতে-চিবোতে বললেন, 'এই বয়েসে এসব বেশি সহ্য হয় না, আবার লোভও ছাড়তে পারি না। অনুরাধা সবসময় আমার খেয়াল রাখে। ও না থাকলে যে আমি কী করতাম...' একটু থেমে উদাস গলায় প্রলয়নাথ

বললেন, 'ওর ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না। ওকে সুখী করার জন্যে আমি চেষ্টার কোনও শেষ রাখি না।'

আমি ওঁকে প্রসঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চাইলাম। বললাম, 'আপনি তখন রিফ্লেক্সের কথা বলছিলেন।'

'ওহ্, হ্যাঁ—' সামান্য চমকে যেন চেতনা ফিরে পেলেন বৃদ্ধ ঃ 'রিফ্লেক্সের মতোই টেম্পারেচার সেন্স করার ব্যাপারেও ক্ষমতা কমে আসে। যেমন, খুব অল্প ঠান্ডা, বা খুব অল্প গরম কোনও জিনিসের উষ্ণতা ঠাহর করতে অসুবিধে হয়। তারপর ধরুন, যন্ত্রণা। বয়েস বেড়ে গেলে যন্ত্রণা টের পেতে গাছের দেরি হয়। মানুষেরও তাই। এরকম আরও অনেক ব্যাপার আছে। তা সেগুলো আমি গাছের ক্ষেত্রে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখেছি। তারপর নানারকমভাবে সেগুলোকে অ্যারেস্ট করার চেষ্টা করেছি—।'

'অ্যারেস্ট মানে?' আর-একটা বড়া মুখে দিয়ে আমি জানতে চাইলাম।

হাসলেন প্রলয়নাথ, বললেন, 'বয়েস বেড়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে অনুভূতিগুলোর এইসব পরিবর্তনকে আমি থামাতে চেষ্টা করেছি। বহু বছরের পরিশ্রমের পর আমি সাকসেসফুল হয়েছি, মোহনবাবু। তখন আমি গাছ থেকে চলে এসেছি প্রাণীতে—ইঁদুর আর গিনিপিগে।'

গ্রিনহাউসের কাছ থেকে ইঁদুর-গিনিপিগের খাঁচার দিকে আমাকে নিয়ে গেলেন প্রলয়নাথ। বললেন, 'সময়ের হিসেবে এই তিনটে ইঁদুর একই বয়েসের, কিন্তু ওদের মধ্যে বয়েস বেড়ে ওঠার লক্ষণগুলো তিনরকমের। কারণ, তিনটে ইঁদুরের বয়েস বেড়ে ওঠার গতি তিন রকমের। বুঝতেই পারছেন, মোহনবাবু, আমার এক্সপেরিমেন্ট কীরকম সাকসেসফুল হয়েছে। এর জন্যে অনেকরকমের সিরাম তৈরি করতে হয়েছে। রাতের-পর-রাত জাগতে হয়েছে। রাসায়নিক সমীকরণের হিসেব কষতে হয়েছে দিনরাত...।'

কথা বলতে-বলতে বৃদ্ধের ফরসা মুখ লালচে হয়ে উঠেছিল। উত্তেজিতভাবে তিনি হাত নাড়ছিলেন বারবার।

প্রলয়নাথ এরপর বললেন গিনিপিগের ওপরে তাঁর সিরামের সাফল্যের কথা। এবং সব শেষে বললেন তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার চরম ধাপের কথা—মানুষের ওপরে তাঁর এক্সপেরিমেন্টের কথা, পর্‌তাপ চওহানের কথা।

একটানা বহুক্ষণ কথা বলে এবং দাঁড়িয়ে থেকে বৃদ্ধ নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। টেবিলের কাছ থেকে দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে একটায় নিজে বসলেন, আর অন্যটায় আমাকে বসতে অনুরোধ করলেন।

আমি আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকালাম ঃ প্রায় সাড়ে আটটা। আজ কপালে ডিনার বলতে নির্ঘাত বিস্কুট কিংবা পাঁউরুটি আছে।

প্রলয়নাথ বোধহয় আমাকে লক্ষ করছিলেন, এবং ওঁর নজর যে যথেষ্ট ধারালো তার পরিচয় আগেই পেয়েছি। তার প্রমাণ হিসেবেই তিনি বললেন, 'আজ রাতে

আমাদের এখানে খাওয়া-দাওয়া করে যান, মোহনবাবু—।'

আমি সৌজন্য দেখিয়ে বললাম, 'না, না—তা কী করে হয়?'

'কেন তাতে অসুবিধের কী আছে!' কথাটা বলে কাশলেন প্রলয়নাথ। কাশির আওয়াজ শুনে বেশ বোঝা য়ায়, ওঁর বুকে সর্দি বসে গেছে।

বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর দিকে তাকিয়ে আমার ওঁকে কেমন আনমনা লাগছিল। ওঁর চশমার কাচে আলো পড়ে চকচক করছিল। মনে হচ্ছিল, উনি যেন গভীরভাবে কী ভাবছেন।

একটা দুঃসাহসিক মতলব আমার মনের কোণে উঁকি মারছিল। কিন্তু আমার ভেতরের সৎ মানুষটা তাকে প্রাণপণ রুখে দেওয়ার চেষ্টা করছিল।

প্রলয়নাথ আমাকে রোজ চায়ের নেমন্তন্ন করে খাওয়ান, সন্ধেটা আমার সঙ্গে গল্পগুজব করে কাটান। এতে আমার দিব্যি কেটে যাচ্ছে। কিন্তু এই নিত্যকার নিষ্কলঙ্ক রুটিনে বাদ সেধেছে সুপ্রিয়া। ওকে আমি দেখিনি, ওর সঙ্গে আলাপ করার সুযোগও হয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওকে দেখার জন্যে আমার মনটা কেমন আকুল হয়ে উঠেছে।

বাথরুমের ছোট্ট জানলাটাই কি এই আকর্ষণের কারণ? বোধহয় না। হয়তো কলকাতার মন-ভেঙে-যাওয়া ব্যাপারটার পর আমার মন যে-কোনওভাবে শূন্যতা পূরণ করতে চাইছে। তা ছাড়া সুপ্রিয়াকে সামনাসামনি দেখার জন্যে, আলাপ করার জন্যে, আমারও কেমন জেদ চেপে গিয়েছিল।

প্রলয়নাথ-অনুরাধা এত মিশুকে, অথচ তা সত্ত্বেও ওঁরা সুপ্রিয়াকে পরদানশিন করে রাখবেন, এ কেমন ব্যাপার! তা হলে কি প্রতাপের সঙ্গে সুপ্রিয়ার কোনও গোপন সম্পর্ক আছে?

যতই ভাবছিলাম, মতলবটা ততই বেশি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। তাই শেষ পর্যন্ত উন্মুখ বৃদ্ধকে বলেই ফেললাম, 'না, সেরকম অসুবিধের কিছু নেই, তবে খাওয়া-দাওয়া সারতে রাত হয়ে গেলে কোয়ার্টারে ফিরতে পারব কি না তাই ভাবছি—।'

আমি জানি, রাতের খাওয়া এখানে সারলে খাওয়ার টেবিলে নিশ্চয়ই সুপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা হবে। তা ছাড়া, কে জানে আজকের নিঝুম রাত হয়তো চৌকো জানলার চেয়েও বাড়তি কিছু দিতে পারে আমাকে।

প্রলয়নাথের জেরান্টোলজি আমার কাছে যতই একঘেয়ে আর অসহ্য হোক, সুপ্রিয়াকে দেখার জন্যে একটু-আধটু জরাবিজ্ঞান সইতে আমি রাজি আছি।

আমার ভাবনা-চিন্তা যতই ঘূর্ণি তুলতে লাগল সবকিছু ততই যেন জট পাকিয়ে যেতে লাগল।

ল্যাবরেটরি ছেড়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। প্রলয়নাথ ঘরের সব আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘরের দরজায় শেকল তুলে দিলেন।

'আমার ল্যাবরেটরি কেমন দেখলেন?' আচমকা জানতে চাইলেন প্রলয়নাথ।

'ভালোই...বেশ অ্যাট্রাকটিভ।' বৃদ্ধের মন-রাখা জবাব দিলাম আমি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'এটাই আমার সব। এটার জন্যেই আমি বেঁচে আছি।'

আমি নীরবে ঘাড় নাড়লাম।

প্রলয়নাথ এবার বললেন, 'চলুন, বসবার ঘরে বসবেন চলুন। আমি অনুরাধার সঙ্গে একটু কথা বলে যাচ্ছি—।'

অলিপথ বরাবর হাতের ইশারা করে আমাকে এগোতে বললেন তিনি। আমি আধো-আঁধারি পথ ধরে রওনা হলাম।

রাতের সঙ্গে-সঙ্গে ঠান্ডাও যে বাড়ছে সেটা এখন টের পেলাম। হাতে হাত ঘষে মুখ দিয়ে নিশ্বাস ছাড়লাম আমি। রান্নাঘরের দিক থেকে ঠিকরে আসা আলোয় দেখলাম, নিশ্বাসের বাষ্প জমাট বেঁধে ধোঁয়াটে দেখাচ্ছে।

নানান চিন্তা মাথায় নিয়ে এক-পা এক-পা করে এগোচ্ছিলাম আমি। আমাকে কি রাতে থেকে যেতে বলবেন প্রলয়নাথ? সে-কথা বলার আগে কি স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে গেলেন? কে জানে!

হঠাৎই মিহি ফিসফিসে স্বরে কেউ আমার নাম ধরে ডেকে উঠল : 'মোহনবাবু—।'

আমি চমকে ফিরে তাকালাম শব্দের উৎস লক্ষ করে।

অলিপথের বাঁদিকে সিমেন্টের জাফরি বসানো একটা দেওয়াল। তার ওপাশটা অন্ধকার। কিন্তু জাফরির ফাঁকফোকর দিয়ে একটা অবয়বের আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। অবয়বটা যে কোনও মহিলার সেটা মেয়েলি কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কে এই অবগুণ্ঠিতা?

আমার নীরব প্রশ্ন সে বোধহয় ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে টের পেল। তাই হয়তো মিষ্টি চাপা গলায় সসঙ্কোচে সে বলল, 'আমি...সুপ্রিয়া...।'

বুকের ভেতরে ঘোড়দৌড় শুরু হয়ে গেল পলকে। কেন জানি না, আমার হাত-পা কাঁপতে লাগল।

'আপনি...আপনি...সামনে আসুন...' কাঁপা গলায় অনুনয় করে উঠলাম আমি। চেনা পারফিউমের গন্ধ আমার নাকে এসে ঝাপটা মারল।

'আমি কারও সামনে যাই না।' বলল মায়ারমণী, 'একটা...একটা অ্যাকসিডেন্টে আমার...আমার মুখ...পুড়ে গেছে। রান্না করার সময়...স্টোভ বার্স্ট করেছিল...।'

আশ্চর্য! এই দুর্ঘটনার কথা তো প্রলয়নাথ কখনও বলেননি!

সুপ্রিয়ার কথা শুনে আমার মনটা খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম, ওর প্রতি অলৌকিক টানটা ক্রমেই ভয়ংকর চেহারা নিচ্ছে।

'আপনাকে আমি...আড়াল থেকে দেখেছি, মোহনবাবু—' বলল সুপ্রিয়া, 'আপনার সঙ্গে গল্প করতে ভীষণ ইচ্ছে করে।'

আমার হাত-পা তখনও কাঁপছিল। বুঝতে পারছিলাম না, কী বলব, কী বলা উচিত।

'সুপ্রিয়া—' কাঁপা স্বরে ওর নামটা বেরিয়ে এল আমার মুখ দিয়ে।

'আ—আঃ!' তৃপ্তির মিষ্টি শব্দ করল অন্ধকারের তরুণী, 'এই প্রথম কোনও যুবকের মুখে আমার নাম শুনলাম।'

আমার মনে হচ্ছিল, এখনই ছুটে যাই জাফরির ওপাশে। তারপর...।

'সুপ্রিয়া—' আবার ওর নাম ধরে ফিসফিসে স্বরে ডেকে উঠলাম আমি।

'আজ রাতে থেকে যান, মোহনবাবু। রাতে আপনার সঙ্গে এসে আলাপ করে যাব।' একটু থেমে তারপর ঃ 'ভয় নেই, আপনার কোনও ক্ষতি হবে না। বরং লাভ হতে পারে—।'

কিছুটা দূরে কাশির শব্দ শুনলাম। বোধহয় প্রলয়নাথ আসছেন।

জাফরির ওপাশে সুপ্রিয়ার অবয়ব চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু পারফিউমের হালকা গন্ধটা ভারী বাতাসে অলসভাবে ভেসে রইল।

আমি তৎপর হয়ে বসবার ঘরের দিকে হাঁটা দিলাম। পেছনে পায়ের শব্দ এবার শোনা যাচ্ছিল। এবং একটু পরেই প্রলয়নাথ ঘরে ঢুকে ঘোষণা করলেন, 'আপনি রাতে খাওয়া-দাওয়া করে এখানেই থেকে যান, মোহনবাবু। কাল সকালে চা খেয়ে একেবারে কোয়ার্টারে ফিরবেন। তাতে আপনার মর্নিং ওয়াকটাও হয়ে যাবে।'

কম্বল মুড়ি দিয়ে আরামের বিছানায় শুয়ে ছিলাম বটে কিন্তু আমার চোখে একফোঁটা ঘুম নেই। নানান চিন্তা, নানান কল্পনা বেপরোয়াভাবে ঘাই মারছিল মাথার ভেতরে। সুপ্রিয়া কখন আলাপ করতে আসবে? কতক্ষণ ধরে চলবে সেই আলাপ? আলাপের পর কী হবে?

যতই এসব কথা ভাবছিলাম, ততই মনে পড়ছিল সুপ্রিয়ার কথা। দুর্ঘটনা হয়তো ওর মুখের সৌন্দর্য কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু ওর অন্যান্য সৌন্দর্য কেড়ে নিতে পারেনি।

রাতে খাওয়ার টেবিলে ছিলাম আমরা দুজন—প্রলয়নাথ আর আমি। অনুরাধা আমাদের খেতে দিচ্ছিলেন। প্রতাপ ওঁকে থালা-বাটি-গ্লাস এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করছিল। যথারীতি সুপ্রিয়ার দেখা মেলেনি।

খেতে-খেতেই আমি জিগ্যেস করেছিলাম, 'সুপ্রিয়া খেতে আসবে না?'

অনুরাধা আমাকে ডাল দিচ্ছিলেন, হঠাৎই থেমে গেলেন, তাকালেন স্বামীর মুখের দিকে। হয়তো ভাবছিলেন, এই বোধহয় সুপ্রিয়ার অ্যাকসিডেন্টের ব্যাপারটা প্রলয়নাথ আমাকে বলে দেবেন। কিন্তু প্রলয়নাথ চশমার ভেতর থেকে স্থির শান্ত চোখে অনুরাধাকে একবার দেখলেন, তারপর আমাকে বললেন, 'আপনাকে তো আগেই বলেছি, সুপ্রিয়া একা-একা থাকতে ভালোবাসে। ওর চোখে একটু প্রবলেম আছে—আলো একেবারে সহ্য করতে পারে না।'

আমি বৃদ্ধের কথা এমনভাবে শুনছিলাম যেন টিভিতে খবর শুনছি। সত্যিই

অদ্ভুত! একটা মিথ্যে ঢাকতে গিয়ে প্রলয়নাথকে কত মিথ্যে কথাই না বলতে হচ্ছে! সত্যি-সত্যি কী হয়েছে সুপ্রিয়ার? স্টোভ ফেটে অ্যাকসিডেন্ট? নাকি ওর চোখে সত্যিই কোনও প্রবলেম আছে?

তখনই আমার হঠাৎ সন্দেহ হল, প্রলয়নাথ জেরান্টোলজির কোনও বিপজ্জনক এক্সপেরিমেন্ট চালাননি তো সুপ্রিয়ার ওপরে! তারই প্রকোপে হয়তো মেয়েটার মুখ পুড়ে গেছে! এখন বাবার লজ্জা ঢাকতে অপরিচিত অতিথিকে ও বলে ওর স্টোভ-অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে!

আমার সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল।

লক্ষ করছিলাম, অনুরাধা বারবার চোরাচাউনিতে আমাকে দেখছেন, জরিপ করার চেষ্টা করছেন যেন।

আর প্রতাপ? সেই তখন থেকে দেখছি 'মৃত্যুঞ্জয়' প্রতাপ কেমন অদ্ভুত অপছন্দের চোখে আমার দিকে তাকিয়ে। অথচ একইসঙ্গে মনে হয় ও যেন কিছু বলতে চায় আমাকে। অনেকক্ষণ ধরে ও আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। যেন কিছু বলার জন্যে সুযোগ খুঁজছে।

খাওয়ার টেবিলে বসে প্রলয়নাথের পরিবারকে আমার কেন জানি না ভীষণ রহস্যময় মনে হচ্ছিল। অনেক গোপন কথা ওঁরা লুকিয়ে রাখতে চান।

খাওয়া-দাওয়ার শেষে অনুরাধা আমাকে বৃদ্ধ প্রলয়নাথের একটি লুঙ্গি ধার দিয়েছেন, তারপর আমাকে শোওয়ার ঘর দেখিয়ে দিয়েছেন।

ঘরটা একতলায়। বাড়ির পেছনদিকে সরু মাপের একটা সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলে ছোট্টমতো উঠোন। উঠোনের একদিকে কলতলা, আর-একদিকে তিনটে ঘর ঃ একটা সামান্য বড়, অন্য দুটো ছোট-ছোট। বড় ঘরটায় আমার শোওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল।

পরে জেনেছি শেষের ছোট ঘরটায় প্রতাপ থাকে।

ঘরে সব ব্যবস্থাই ছিমছাম। বাঁ-দিকের দেওয়ালে নকশা ছাপা পরদা টাঙানো। ডানদিকে একপাশে ছোট খাটে বিছানা পাতা। বিছানার ওপরে লাল-খয়েরি আর সাদার ছিটে দেওয়া আকোলা প্রিন্টের বেডকভার। বিছানার পাশে মেঝেতে রাখা জলের জগ আর গ্লাস।

আমাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে অনুরাধা নিঃশব্দে চলে গেছেন।

আমি ঘড়ি দেখলাম ঃ প্রায় দশটা বাজে। এখানকার হিসেবে গভীর রাত। সুতরাং জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরে বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে পড়েছি। দিনের শেষ সিগারেট আরাম করে শেষ করে তারপর বেডসুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিয়েছি।

অন্ধকারে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম বটে, কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। নানান ছবি একের-পর-এক ভেসে উঠতে লাগল মনের পরদায়। একইসঙ্গে জরাবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে রাতের বয়েসও বাড়তে লাগল।

হঠাৎই দরজায় টোকার শব্দ শুনলাম।

আমার বুকের ভেতরে একটা বিশাল পাথর যেন আচমকা টাল খেয়ে গেল।

নিশ্চয়ই সুপ্রিয়া এসেছে! এতক্ষণ পর্যন্ত একমুহূর্তের জন্যেও এই মেয়েটার চিন্তা আমার মন ছেড়ে যায়নি।

কম্বল গায়ে জড়িয়ে নিয়ে চটপট নেমে পড়লাম বিছানা ছেড়ে।

কিন্তু সত্যিই সুপ্রিয়া এসেছে তো?

দরজায় আবার টোকা পড়ল।

আমি দরজার কাছে গিয়ে চাপা গলায় জিগ্যেস করলাম, 'কে?'

'আমি...সুপ্রিয়া...।'

দরজা খুলতেই শাল মুড়ি দেওয়া ছায়ারমণী ঢুকে পড়ল ঘরে। আমি চেনা পারফিউমের গন্ধ পেলাম। নেশাগ্রস্তের মতো ওকে ধরতে গেলাম, কিন্তু ও চকিতে সরে গেল অন্ধকারে।'

আমি দরজায় খিল তুলে দিলাম। তারপর অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে মেয়েটাকে খুঁজতে লাগলাম। সে এক রোমাঞ্চকর বিচিত্র লুকোচুরি খেলা!

অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। ফলে অন্ধের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎই যেন ওর শালের প্রান্ত আমার হাত ছুঁয়ে গেল। কিন্তু তারপরই সব শূন্য।

হঠাৎই ও ডেকে উঠল, 'মোহন, আমি এখানে...বিছানায়...।'

আমার বুকের ভেতরে অন্যরকম আগুন জ্বলে উঠল। একটা তীব্র আকাঙক্ষা আমাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল বিছানার দিকে।

যখন ওকে ছুঁলাম তখন আমার আঙুলের ডগা থেকে কাঁধ পর্যন্ত যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল।

'সুপ্রিয়া! সুপ্রিয়া!'

কম্বল মুড়ি দিয়ে আমরা দুজনে তখন কাছাকাছি চলে এসেছি। ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম সব মুছে গেছে আমার মন থেকে। সুপ্রিয়াই তখন একমাত্র সত্যি, আর সব মিথ্যে।

শীতের মধ্যে সব পোশাক খুলে ফেলতে বেশ সময় লাগল আমাদের। তারপর আমি পাগলের মতো আঁকড়ে ধরলাম ওর যৌবন। আমার মাথার ভেতরে শিরা দপদপ করছে। রক্তকণিকাদের পাগল-করা দৌড় শুরু হয়ে গেছে প্রতিটি ধমনিতে।

সুপ্রিয়ার শরীর যে-কোনও পুরুষকে স্তম্ভিত করে দেওয়ার মতো। মাখনের মতো মোলায়েম, মার্বেল পাথরের মতো মসৃণ, আর ভরা দিঘির মতো টইটম্বুর।

তবে ভালোবাসার সময় ও মুখটা সরিয়ে রাখছিল আমার দিক থেকে। হয়তো দুর্ঘটনার পর থেকেই ওর মুখ স্পর্শকাতর। সেইজন্যেই ওকে একটিও চুমু খেতে পারছিলাম না। কিন্তু তা ছাড়া আর সবকিছুই করতে পারছিলাম।

আমাদের ঠোঁট চিরে অর্থহীন শব্দের টুকরো বেরোচ্ছিল। শরীরের উদ্দাম ঝড়ে আমরা জগৎসংসার ভুলে গিয়েছিলাম। চরম মুহূর্তে সুপ্রিয়া চাপা চিৎকার করে আমাকে

আঁচড়ে কামড়ে একেবারে শেষ করে দিল। আমার মুখ দিয়েও চাপা গোঙানি বেরিয়ে এসেছিল। আর সেই সময়কার উত্তাল জোয়ারে আমাদের মধ্যে কোনও নিয়ম, কোনও প্রতিরোধ কাজ করছিল না।

হঠাৎই আমার ঠোঁট চলে গেছে সুপ্রিয়ার গালে। আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা বরফের স্রোত নেমে গেছে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। খাটটা দুলে উঠেছে অন্ধকারে। হাত-পা পাথর হয়ে গেছে চোখের পলকে।

আর তখনই, অন্ধকার ঘরে আমি কাশির শব্দ পেলাম।

এই শব্দ আমার খুব চেনা।

হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল বুকের ভেতরে। আর একইসঙ্গে আমার হাত চলে গেল বেডসুইচের দিকে।

দু-একবার দপদপ করে জ্বলে উঠল টিউবলাইট।

তখন আমি প্রলয়নাথকে দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম অনুরাধাকে। আর একইসঙ্গে সুপ্রিয়াকেও দেখতে পেলাম।

অনুরাধা শুয়ে আছেন আমার বিছানায়। চোখে-মুখে অপরাধবোধের ছাপ। কিন্তু এ কোন অনুরাধা! এ কি স্বপ্ন, নাকি সত্যি!

অন্ধকারে সুপ্রিয়াকে আদর করার সময় আমার ঠোঁট স্পর্শ করেছিল অনুরাধার আঁচিল—ওঁর এককালের বিউটি স্পট। আমি অবাক হয়েছিলাম, ভয়ও পেয়েছিলাম। কারণ, মা ও মেয়ের ঠোঁটের ওপরে একই স্থানাঙ্কে আঁচিল থাকাটা আমার কাছে অসম্ভব, অবাস্তব মনে হয়েছিল।

কিন্তু এখন দেখলাম, ব্যাপারটা মোটেই অসম্ভব নয়। কারণ, অনুরাধা ও সুপ্রিয়ার শরীর একটাই। যে-অনুরাধাকে আমি আগে দেখেছি, এখন ওঁকে নগ্ন অবস্থায় দেখে বুঝলাম, আমার এতদিনের দেখাটা অসম্পূর্ণ ছিল।

অনুরাধার জরাগ্রস্ত চেহারা শেষ হয়েছে গলার ঠিক নীচে এসে। তারপর থেকে শুরু হয়েছে জরাহীন দুরন্ত যৌবন। মুখ-গলা বাদ দিয়ে এই শরীরের দিকে তাকালে এই শরীরের বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ বলেই মনে হয়। এই শরীরকেই আমি বাথরুমের চৌকো জানলা দিয়ে দেখেছি? এই কি তা হলে সুপ্রিয়া? আমার অনুমান অন্তত তাই। বুঝলাম, এই হল প্রলয়নাথের সেই 'অলৌকিক' ব্যাপার।

আমি অবাক হয়ে একই শরীরে জরা আর যৌবনের সহাবস্থান দেখছিলাম। চমক ভাঙল প্রলয়নাথের কথায়।

খসখসে গলায় বৃদ্ধ বললেন, 'আমাদের মাপ করবেন, মোহনবাবু...।'

আমি প্রলয়নাথের দিকে ঘুরে তাকালাম।

বন্ধ ঘরে বৃদ্ধ ঢুকলেন কোথা দিয়ে? খেয়াল করে দেখি, ঘরের সামনের দেওয়ালের পরদা খানিকটা সরানো। আর সেই পরদার পেছনে চোখে পড়ছে একটা ছোট দরজা।

প্রলয়নাথের হাতে চশমাজাতীয় একটা বিদ্‌ঘুটে যন্ত্রও ছিল। সেটার দিকে তাকিয়ে আমি গোটা ব্যাপারটা আঁচ করার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু কিছুতেই কূল পাচ্ছিলাম না।

বুঝতে পারছিলাম না, এখন আমার কী করা উচিত। আমি কি প্রাণভরে ভর্ৎসনা করব এই দম্পতিকে? কাল সকালে ব্যাপারটা নিয়ে কি শোরগোল তুলব?

প্রলয়নাথ একটা মোড়া টেনে নিয়ে বিছানার কাছে এসে বসলেন। ওঁর বলিরেখাময় মুখে বিষণ্ণতার ছায়া। মাথা হেঁট করে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন তিনি।

আমি এর মধ্যে পোশাক পরে নিচ্ছিলাম। অনুরাধাও দেখলাম শাড়ি জামাকাপড় শাল গায়ে জড়িয়ে নিচ্ছেন। ধীরে-ধীরে সুপ্রিয়া ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল। অবশেষে পড়ে রইল এক পঁয়ষট্টি-সত্তর বছরের মহিলা, যার মাথায় কাঁচাপাকা চুল, গাল ভাঙা, মুখের চামড়ায় অগুনতি ভাঁজ, আর একটা চোখে ছানি পড়েছে।

কে বলবে, এই মহিলার শরীরে বাঁধা পড়েছে অবিশ্বাস্য দু-কূল ছাপানো যৌবন।

'মোহনবাবু—' তাকিয়ে দেখি প্রলয়নাথ মুখ তুলেছেন। চশমার কাচের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ওঁর চোখে জল—সূক্ষ্ম ধারায় সেই অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে নাকের পাশ দিয়ে।

'মোহনবাবু, আপনার কাছে আর লুকিয়ে লাভ নেই—সব খুলেই বলি।' প্রলয়নাথ খসখসে ধরা গলায় বলতে শুরু করলেন, 'সুপ্রিয়া নামে সত্যিই আমাদের একটা মেয়ে ছিল। মাত্র চার বছর বয়েসে স্কুটার অ্যাকসিডেন্টে ও মারা যায়। সে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর হল। তবে, তার সঙ্গে আমার জেরান্‌টোলজির এক্সপেরিমেন্টের কোনও সম্পর্ক নেই।

'জরাবিজ্ঞান নিয়ে আমার এক্সপেরিমেন্ট যখন শুরু হয়, তখন গাছপালা আর ইঁদুর-গিনিপিগের সঙ্গে-সঙ্গে অনুরাধার শরীরের ওপরেও আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে থাকি। তবে অবশ্যই অনুরাধার অনুমতি নিয়ে। অনুরাধা আমাকে এত ভালোবাসে যে, কখনও আমার কোনও সাধে বাদ সাধেনি। তা ছাড়া বুটুন—মানে, সুপ্রিয়া—মারা যাওয়ার পর আমরা দুজনেই বেঁচে থাকার কোনও মানে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তখন জরাবিজ্ঞানের গবেষণা আমাকে বাঁচিয়ে তুলল। আর অনুরাধাও তাতে সায় দিল।'

বিছানার এক কোণে বসে থাকা অনুরাধার দিকে কোমল চোখে দেখলেন প্রলয়নাথ। তারপর ধরা গলায় বললেন, 'ওর ওপর দিয়ে যে কত ঝড়ঝাপটা গেছে! তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ঝড় হচ্ছে আমার তৈরি করা "কাউন্টার-এজিং সিরাম"—এই সিরাম বয়েস বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকে বাধা দেয়। কিন্তু সিরামে মনের মতো কাজ হল না।

'অনুরাধার শরীরের সর্বত্র আমি এই সিরাম নিয়ম করে ইনজেক্ট করতাম।

আর সাত-দশ দিন পরপর অনুরাধার শরীর খুটিয়ে লক্ষ করতাম। কিন্তু গোলমালটা একটুও টের পাইনি। সেটা টের পেলাম বছরদশেক পর। দেখলাম, ওর মাথা আর গলা বাদে সিরামটা কাজ করেছে। কিন্তু তখন থামারও উপায় নেই, আর ফেরারও পথ নেই। অনুরাধার শরীরের ভেতরে কোনও-কোনও অংশে বয়েস ঠিকমতোই বাড়তে লাগল। কিন্তু শরীরের বাইরে—গলা থেকে পা পর্যন্ত ওর তিরিশের যৌবন অটুট রইল।

'এই ব্যাপারটা লক্ষ করার পরই আমরা দুজনে স্রেফ খেলাচ্ছলে সুপ্রিয়ার "জন্ম" দিলাম আবার। অনুরাধাকে বলতাম, তোমার শরীরে সুপ্রিয়া বেঁচে আছে। আমি ওকে কখনও অনুরাধা, কখনও সুপ্রিয়া বলে ডাকি। জানি না, এ আমার পাগলামো—না মেয়েকে হারানোর শোকে তাড়া খাওয়া বাপের সেন্টিমেন্ট!'

অনুরাধা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কান্না চাপা দিতে মুখে কাপড় গুঁজে দিলেন।

'দেখতে-দেখতে আমি বুড়িয়ে গেলাম। অনুরাধার মনের অনেকটাই বুড়িয়ে গেল, আর শরীরের মধ্যে শুধু মাথা, আর গলা। সুতরাং এই বৃদ্ধ স্বামীকে নিয়ে অনুরাধার অতৃপ্ত শরীর রাতের-পর-রাত কাটাতে লাগল। ওকে পর্যবেক্ষণ করে আমি প্রতি সপ্তাহে পাতার-পর-পাতা নোট নিতাম। আমার অবাক লাগত। যে-শরীরে মা হওয়ার কোনও ক্ষমতা নেই, সেই শরীরে তৃপ্তির চাহিদা কোথা থেকে আসে! কেমন হতে পারে সেই তৃপ্তির প্রতিক্রিয়া? আমার ভীষণ কৌতূহল হত। আমার গবেষণার সম্পূর্ণ বিবরণ আমি পরের বিজ্ঞানীদের জন্যে রেখে যেতে চাই। তাই আমাকে যে জানতেই হবে।' হাত মুঠো করে বিছানায় ঠুকলেন প্রলয়নাথ। ওঁর উত্তেজনায় লালচে মুখে সত্যসন্ধানী বিজ্ঞানীর জেদ।

মাথার সাদা চুলে হাত চালিয়ে প্রলয়নাথ আবার বললেন, 'অনুরাধার অদ্ভুত শরীরের প্রতিক্রিয়া—মানে, সেক্সুয়াল রিঅ্যাকশন্‌স—জানার জন্যে আমি পাগল হয়ে গেলাম। তখন নানানরকম ফন্দিফিকির করে কোনও যুবককে ডেকে নিয়ে আসতাম বাড়িতে। তাকে সুযোগ বুঝে লোভ দেখানো হত। ওই বাথরুমের জানলা দিয়ে। অথবা, অন্ধকারে জাফরির আড়াল থেকে অনুরাধা ওর মিষ্টি গলায় কথা বলত অচেনা মানুষটির সঙ্গে। তারপর রাতে থেকে যেত সেই অতিথি। এই ঘরটায় তাকে শুতে দেওয়া হত। গভীর রাতের অন্ধকারে অনুরাধা চলে আসত এই ঘরে। অতিথির সঙ্গে মিলিত হত এক অদ্ভুত রমণী।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন প্রলয়নাথ। মাথা নাড়লেন এপাশ-ওপাশ। তারপর চাপা খসখসে গলায় অনেকটা স্বগতোক্তির মতোই বলে চললেন, 'অন্ধকারে যখন সেই মিলনের খেলা শুরু হত তখন...তখন আমি...এই হতভাগা জেরান্টোলজিস্ট—' নিজের বুকে আঙুল ঠুকলেন তিনি : 'ওই লুকোনো দরজা দিয়ে পরদা সরিয়ে ঢুকে পড়তাম এই ঘরে। তারপর অন্ধকারে এই চশমাটা চোখে দিয়ে সব দেখতাম। দুটো শরীরের প্রতিটি খুঁটিনাটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতাম।

তারপর সেইসব তথ্য টুকে রাখতাম গবেষণার খাতায়।'

হাতের চশমাটা আমাকে দেখালেন প্রলয়নাথ। ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'এটার নাম স্নুপারস্কোপ—অন্ধকারে দেখার চশমা—এটা দিয়ে ইনফ্রারেড্ আলো দেখতে পাওয়া যায়। ফলে ছবিগুলো অন্যরকম দেখায়। স্বাভাবিক রঙিন ছবির মতো নয়। কিন্তু তাতে আমার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের কোনওরকম অসুবিধে হয় না।

'মোহনবাবু, এইসব যা-যা আমরা করতাম, আপনার সঙ্গেও ঠিক তাই করেছি। আপনি...আপনি দয়া করে এই বুড়ো-বুড়িকে মাপ করবেন। বিজ্ঞানের গবেষণার স্বার্থে আমরা আপনার কাছে অনেক কিছু গোপন করেছি, আপনাকে ঠকিয়েছি, লজ্জায় ফেলেছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ ছাড়া আমাদের আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।'

অনুরাধার কান্নার শব্দ আমি টের পাচ্ছিলাম। তার সঙ্গে অপরাধবোধ আর গ্লানি মিশে ছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আমি প্রতাপের কথা জিগ্যেস করলাম।

প্রলয়নাথ স্নুপারস্কোপটা চাদরের আড়ালে ঢুকিয়ে রেখে বললেন, 'পর্‌তাপের ওপরে আমি সিরাম ইন্‌জেক্ট করে গবেষণা করছি। আমার বিশ্বাস, এবারে আর কোনও ভুল হবে না। অনুরাধার বেলায় যে গন্ডগোল হয়েছে এবারে যাতে সেরকম না হয় সেদিকে আমি খেয়াল রেখেছি। তা ছাড়া পর্‌তাপ আমাদের ছেলের মতো...' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বৃদ্ধ ঃ 'একদিন...আমার আর অনুরাধার ব্যাপারটা ও জেনে ফ্যালে। আমাদের বিপজ্জনক এক্সপেরিমেন্টের খবর পেয়ে যায়। তারপর থেকেই বাড়িতে কোনও তরুণ অতিথি এলে ও সেটা পছন্দ করত না। অথচ আমার মুখের ওপর প্রতিবাদও করতে পারত না। আমি ওর কষ্ট বুঝি, মোহনবাবু। অনুরাধার দুঃখও বুঝি। আর আপনার মনের অবস্থাও বুঝতে আমার অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু কী করব বলুন! জরাবিজ্ঞানের স্বার্থে আমাকে যে সব জানতেই হবে।'

বৃদ্ধ আবার চোখের জল ফেলছিলেন। ওঁর শরীরটা কেঁপে-কেঁপে উঠছিল।

হঠাৎই তিনি উঠে এসে আমার হাত চেপে ধরলেন দু-হাতে। আবেগমথিত গলায় বললেন, 'মোহনবাবু, আপনার কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, আমাদের এই রিসার্চের কথা আপনি কাউকে বলবেন না। কথা দিন, প্লিজ, কথা দিন...।'

আমি কথা দিয়েছিলাম।

সেই বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা সেদিন আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন। এবং সেই বিচিত্র রজনীতে আমি ঈশ্বরের কাছে মনে-মনে প্রার্থনা করেছিলাম, প্রলয়নাথের অলৌকিক গবেষণা সফল হোক। সত্যিই প্রতাপ চওহানের চিরযৌবনের কথা শুনে হতবাক হয়ে যাক সারা পৃথিবী।

পরদিন সকালে চোখের জলে ওঁরা দুজন আমাকে বিদায় দিয়েছিলেন।

উপন্যাস



ঘাসের শিষ নেই

॥ এক ॥

আদিত্য দাঁড়িয়ে ছিল বড় রাস্তার ধারে।

রাস্তা পার হওয়ার জন্য যতবারই এগোতে যাচ্ছে, ততবারই পাঁচ-সাতটা অটো রিকশো ছুটে আসছে ফুলঝুরির মতো। সাঁ-সাঁ করে বিপজ্জনক বাঁক নিয়ে বিকট শব্দের সারেগামা শুনিয়ে অত্যন্ত জটিল পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। এই ছোট মাপের গাড়িগুলো ঠিক ইঁদুরের মতো। এদের গতিপথের জ্যামিতিক চেহারা এতই আঁকাবাঁকা যে, স্বয়ং ইউক্লিডও হয়তো 'এলিমেন্ট্স্' লেখা বন্ধ করে এই নতুন জ্যামিতির রহস্য সন্ধানে দিশেহারা হয়ে ছুটে বেড়াতেন।

বাজারের থলেটা শক্ত হাতে ধরে আবার পা বাড়িয়েছিল, কিন্তু ক্যাবারে নর্তকীর মতো সাবলীল বাঁক নিয়ে পথ জুড়ে এসে দাঁড়ানো মিনিবাসটাকে একরকম খেয়ালই করেনি আদিত্য। সুতরাং আবার দাঁড়িয়ে পড়ল বিরক্ত হয়ে। আচ্ছা, কলকাতা শহরে এখন গাড়ির সংখ্যা কত? এক লাখ, দু-লাখ, পাঁচ লাখ, না এক কোটি? অটো, স্কুটার, মিনি, ট্যাক্সি, বাস, প্রাইভেট কার, ট্রাক, লরি—ওঃ! ভাবা যায় না। মানুষের বেড়ে ওঠার হার দিব্যি রুখে দিতে পেরেছে সরকার, কিন্তু গাড়ির বেলায় অষ্টরম্ভা।

ঠিক তখনই মিনিবাসের একজস্ট পাইপ দিয়ে ঘন কালো ধোঁয়া বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ল আদিত্যর চোখেমুখে। হঠাৎ যেন দম আটকে এল ওর। শরীরটা কেমন গুলিয়ে উঠল। চট করে পিছিয়ে এল নর্দমার ধারে। শব্দ করে থুতু ফেলল দুবার। গলার ভেতরটা কেমন জ্বালা-জ্বালা করছে।

আদিত্য আর দেরি করল না। নানারকম গাড়ির যানজট ও হর্নের প্যাঁ-পোঁর মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। ঠিক যেন গোলকধাঁধায় পথ চলা। ছুটির দিনেও এই রাস্তাটার এরকম বেহাল অবস্থা। হরি শা'র হাটের দিন এ-অবস্থা হবেই। সপ্তাহে দুটো দিন ঃ বুধবার, আর রোববার। তখন অরবিন্দ সেতুর যে-অবস্থা হয়, ইচ্ছে করে শ্রীঅরবিন্দকে ডেকে এনে দেখাতে। যাঁর উপাসনা গৃহের মূল মন্ত্র নিস্তব্ধতা ও নীরব প্রার্থনা, তাঁর নাম যুক্ত করা হল কিনা সবচেয়ে উপদ্রুত রাস্তায়!

বড় রাস্তা পেরিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা চালাল আদিত্য। এখনই প্রায় সওয়া আটটা। বউদি বোধহয় বাজারের জন্য হাঁ করে বসে আছে। ঠিক দশটায় দাদার এয়ারপোর্টে যাওয়ার কথা। ওঁর অফিসের কোন এক বড়সাহেব আসবেন। তাঁকে আপ্যায়ন করে নিয়ে গিয়ে তুলতে হবে কোম্পানির গড়িয়াহাটের গেস্টহাউসে। তারপর বাকি দিনটা চলতে হবে তাঁর মরজিমাফিক।

চলতে-চলতে একবার আকাশের দিকে তাকিয়েছিল আদিত্য। মেঘে-মেঘে প্রায় ছেয়ে গেছে। অথচ বৃষ্টির কোনও নামগন্ধ নেই। ক'দিন ধরেই কেমন এক অসহ্য

গুমোট।

মুখ নামাতেই চমকে গেল আদিত্য। চোখাচোখি হয়ে গেল বৃদ্ধ মানুষটার সঙ্গে।

নাম শঙ্করানন্দ চক্রবর্তী। ওদের বাড়ি থেকে তিনটে বাড়ি পরেই ভদ্রলোকের ছাপোষা একতলা বাড়ি। বয়েস প্রায় সত্তর। শুধু স্বামী-স্ত্রী দুটিতে জুটি বেঁধে ব্যাট করছেন। একটি মাত্র ছেলে। বছরদশেক আগে সেই যে বাড়ি ছেড়ে আমেরিকা পাড়ি দিয়েছে আর ফেরার নাম নেই। সেখানেই নাকি বিয়ে-থা করে সংসারী হয়েছে। বাড়ি-টাড়িও কিনেছে বোধহয়। বছরে দু-বছরে এক-আধটা চিঠি বাপ-মাকে দেয়। সেই চিঠিটা ভদ্রলোক পাড়ার পাঁচজনকে দেখিয়ে বেড়ান। আদিত্যকেও অনেকবার দেখিয়েছেন। প্রথম-প্রথম আদিত্য বিরক্ত হয়েছিল। মনে হয়েছিল, ছেলে যে আমেরিকায় বিরাট বড়লোক সেটাই পাড়ার লোককে জানানোর একটা ছুতো বোধহয়। কিন্তু পরে আর তা মনে হয়নি।

শঙ্করবাবুর হাতে দুটো ঠোঙা। পাটের সুতলি বাঁধা। সামনেই পাড়ার জমাটি মুদি-দোকান মনোহর ভাণ্ডার। হয়তো সেখানেই কিছু কিনতে এসেছিলেন। আদিত্যর খুব কাছে এসে একটু জোরালো গলাতেই বললেন, 'দিতু, কোনও খবর আছে?'

আদিত্যর বুকের মধ্যে পলকে অপরাধবোধ তৈরি হয়ে গেল। ইস, একেবারে ভুলে মেরে দিয়েছে। কী বিচ্ছিরি লাগছে এখন!

বৃদ্ধের পরনে সাদা শার্ট আর ধুতি। গায়ের রং টকটকে ফরসা। গাল ভাঙা। চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। মাথার চুল সাদা। ছোট্ট টুথব্রাশ গোঁফও তাই। নাকটা সামান্য মোটা। তার ওপরে একটা ছোট আঁচিল। চোখ দুটো ঠিক কটা নয়, তবে ঘোলাটে। কানে কম শোনেন বলে চেঁচিয়ে কথা বলেন অকারণে।

আদিত্য কিছুক্ষণ দেখল ঘোলাটে চোখ দুটোর দিকে। একটু আগে দেখা আকাশের কথা মনে পড়ল ওর।

শঙ্করবাবু বোধহয় ভাবলেন আদিত্য তাঁর অনুরোধটা একেবারে ভুলে মেরে দিয়েছে। তাই প্রত্যাশা-ভরা ঘোলাটে চোখে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে ঘষা গলায় বললেন, 'তোমায় দুটো টিউশনি জোগাড় করে দিতে বলেছিলাম—মানে, আগের দুটো টিউশানি তো ফাইনাল পরীক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে শেষ হয়ে গেল। বোঝোই তো, বাড়ির ট্যাক্স, ইলেকট্রিক বিল, আর আমরা দুটি প্রাণী! যে করে হোক চালাতে তো হবে। তা ছাড়া মাঝে-মাঝে ঘর-দোর মেরামতের ঝামেলা রয়েছে।' বৃদ্ধ একটু কাশলেন। শব্দে বোঝা গেল গলায় কফ উঠল। কিন্তু তিনি ওই অবস্থাতেই বললেন, 'তুমি তো এ-লাইনে রয়েছ, তাই তোমাকে বলে রেখেছিলুম—।'

আদিত্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা মিথ্যে অজুহাত ভেতরে-ভেতরে তৈরি করছিল। ও যে দুটো টিউশানি করে তা ঠিক। যাদবপুরে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে ঢোকার সময় থেকেই দু-একটা টিউশানি করত ও। পাড়ার মধ্যে, নয়তো তার

আশেপাশে। হাতখরচের টাকাটা উঠে যেত তাতে। তারপর পাশটাশ করে চাকরি করছে প্রায় বছরদশেক, কিন্তু টিউশানির অভ্যেসটা আর ছেড়ে দেওয়া হয়নি।

আদিত্যর গলায় ভেতরটা খুশখুশ করে উঠল। দেরি হয়ে যাচ্ছে বাড়ি ফিরতে। কী বলা যায় ভদ্রলোককে?

'মেসোমশাই, আমি ভুলিনি। দু-চারজনকে বলেছি। কোনও খবর থাকলে সামনের সপ্তাহে আপনাকে জানিয়ে দেব। শুধু ইংরেজি তো?' গলার স্বর বেশ খানিকটা চড়িয়ে শেষ প্রশ্নটা ছুড়ে দিল আদিত্য। জানা কথাই, শুধু ইংরেজি। তবুও কেন যে ন্যাকার মতো এই প্রশ্নটা করে বসল কে জানে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুধু ইংরেজি,' বৃদ্ধের ঘোলাটে চোখের তারা একটু উজ্জ্বল হল। তারপরই গলা নামিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কেন, সঙ্গে আর কিছু পড়াতে বলছে নাকি? বাংলা, ভূগোল আর ইতিহাস হলে ম্যানেজ করে নেব। তবে টাকাটা একটু বাড়িয়ে দিলে...।'

'ঠিক আছে, কথাবার্তা ফাইনাল হলে আপনাকে খবর দেব'খন।'

'তুমি একটু খেয়াল রেখো, বাবা,' বলে ছোট-ছোট পা ফেলে শঙ্করবাবু চলে গেলেন।

এই এক আশ্চর্য লোক। বাড়িতে ভাড়াটে বসাবেন না কিছুতেই। খালি বলবেন, 'মহাদেব এসে তা হলে থাকবে কোথায়?'

মহাদেব—মহাদেবদা, ওঁর সেই আমেরিকাবাসী ছেলে। তার ফিরে আসার কথা ভেবে শঙ্করবাবু যক হয়ে গেছেন। যে-ভাবেই হোক বসতবাড়িটা ওঁকে ঠিকঠাক রাখতে হবে। নইলে এই বয়েসে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরে কে আর হেঁটে-হেঁটে ছাত্র পড়াতে যায়! ছাত্ররা ওঁর কাছে যজমান। আর উনি যেন পুরুতমশাই। একটু আগেই কাঁধের পাশ দিয়ে পইতেটা উঁকি মারছিল। ভদ্রলোক খুব সাত্ত্বিক। রোজ গায়ত্রী জপ করেন। গীতা পড়েন।

আদিত্যর কষ্ট হল। কতরকম কারণেই না মানুষকে বেঁচে থাকার কসরত করতে হয়। নাঃ, অন্তত একটা টিউশানি ওকে জোগাড় করতেই হবে। সুনয়নাকে একবার বলে দেখা যেতে পারে। কিন্তু মেয়েটা যা ইয়ারবাজ! আদিত্যকে তো মাস্টারমশাই বলে পাত্তাই দেয় না। চোখ মটকে বলে, 'ভূতের ওঝার মতো চেহারা, তাকে আবার মাস্টারমশাই বলতে হবে। অ্যাই দিতুদা, সত্যি করে বলুন না, ছোটবেলায় আপনি ভূত তাড়াতেন?'

আদিত্যর হাসি পেল। আর প্রায় একইসঙ্গে মনোহর ভাণ্ডারের দেওয়াল ঘড়িটায় চোখ গেল ঃ আটটা চল্লিশ! সর্বনাশ! বাড়ির দিকে একরকম প্রায় ছুটই লাগাল আদিত্য। আজ কপালে দুঃখ আছে।

দশ-বারো পা যেতে না যেতেই পিছন থেকে কে ডাকল ঃ 'দিতু!'

ভুরু কুঁচকে মাথা ঘোরাল আদিত্য। শুভেন। পাড়ার বন্ধু। কবিতা-টবিতা লেখে।

লম্বা-লম্বা চুল। চোখ টানা-টানা। গায়ের রং কালো। পরনে ডোরাকাটা শার্ট আর পাজামা। খুব সামান্য দাড়ি আছে। আর অসম্ভব রোগা।

'কী বলছিস?' আদিত্য বিরক্ত হয়ে জিগ্যেস করল।

'কাল তোর অফিস থেকে একটা প্যাড এনে দিবি? আগেরটা ফুরিয়ে গেছে।'

আদিত্য বরাবরই ওর কবিতা লেখার কাগজ সাপ্লাই দেয়—সুতরাং ঘাড় নাড়ল। বলল, 'একটু পরে বটতলায় আয়, আমি থাকব।' তারপরই চোখে ঠুলি লাগানো ঘোড়ার মতো একরকম দৌড়ই লাগাল বাড়ির দিকে।

আজ ছুটির দিনটা একেবারে যাচ্ছেতাই কাটছে ওর। হনহন করে হাঁটতে হাঁটতেই বারদুয়েক কাশল। ওদের সরু গলির মুখে পৌঁছেই দেখল পাড়ার ছোট-ছোট ছেলেগুলো এরই মধ্যে রবারের বল নামিয়ে পেটাপেটি শুরু করে দিয়েছে। হঠাৎই ওর পায়ের কাছে বলটা গড়িয়ে আসতেই বাঁ-পায়ে বলটা চেপে ধরল ও। তারপর এক জায়গায় দাঁড়িয়েই শরীরটাকে ডানদিকে সামান্য হেলিয়ে বাঁ-পায়ে চোস্ত এক শট মারল। খোকন, দিপু আর তোতা একেবারে হইহই করে উঠল ঃ 'ওয়েল প্লেড, দিতুদা! ওয়েল প্লেড!'

আদিত্য একসময়ে চার-দশে খেলত। কখনও মাঠের কমপিটিশান, কখনও গলিতে, কখনও ফ্ল্যাটবাড়ির ছাদে, কখনও বা হরি শা' হাটের বাড়ির দোতলার প্রকাণ্ড বারান্দায়। ওরা সেটা জানে। আর আদিত্যও মাঝে-মাঝে খেলা নিয়ে ওদের টুকটাক পরামর্শ দেয়।

স্যাঁতসেঁতে গলিটায় কয়েক পা ঢুকেই বাড়ির দোতলার বারান্দায় চোখ গেল আদিত্যর। ঠিক যা ভেবেছে তাই। বারান্দায় গলা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনজন ঃ মা, বউদি আ মুন্নি। দূর থেকে মুন্নির লাল-হলুদ ছাপা স্কার্টটা বেশ চেনা যাচ্ছে। গতবার পুজোর সময় আদিত্য এনে দিয়েছিল—দিল্লি থেকে। মুন্নি আর সেই ছোট বোনটি নেই—অনেক বড় হয়ে গেছে। সামনের বছর হায়ার সেকেন্ডারি দেবে—আর্টস-এ।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই ওপর থেকে বউদির তিরস্কার শুরু হয়ে গেল ঃ 'সত্যি ছোড়দা, তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু নেই। জানো, তোমার দাদাকে ঠিক দশটায় এয়ারপোর্টে পৌঁছতে হবে, আর তুমি ওই ছেলেগুলোর সঙ্গে বাজার হাতে বল খেলতে লেগে গেলে—।'

আদিত্য ওপরে তাকায়নি। বউদি আরও কী বলছিল, কিন্তু ওর কানে তার কিছুই ঢুকল না। ও ততক্ষণে বাড়িতে ঢুকে পড়েছে।

বাড়িতে ঢুকেই নানকুর চিৎকার কানে এল। চিৎকার করে নার্সারি রাইম আওড়াচ্ছে বাচ্চাটা ঃ 'জ্যাক অ্যান্ড জিল, ওয়েন্ট আপ দ্য হিল। জ্যাক অ্যান্ড জিল...।' শুধু প্রথম দুটো লাইন বারবার পড়ে যাচ্ছে। ওর মায়ের কাছে থেকে মার খেল বলে। একে বাজারের দেরি হয়েছে বলে বউদি রেগে টং, তার ওপরে ছেলের এই মন্ত্র

আওড়ানো।

দোতলার সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে রান্নাঘরের কাছে বাজার বয়ে নিয়ে যেতে-যেতেই শুনতে পেল নানকুর পিঠে কিল পড়ার গুমগুম শব্দ। আর তারপরই ভ্যাঁ।

সঙ্গে-সঙ্গে বারান্দার কাছ থেকে মায়ের চিৎকার শুরু হয়ে গেল ঃ 'কী হচ্ছে, লতা! বাচ্চাটা কী করেছে! ওকে অকারণে মারছ কেন?'

আদিত্য বাজারের থলে দুটো রেখে দাদার ঘরে উঁকি মারল। মারপিটের ব্যাপারটা ওখানেই হচ্ছে। দাদা ঘরে নেই। বোধহয় চান করতে গেছে। তবে ঘরে থাকলেও হয়তো ছেলেকে বাঁচাতে পারত না।

আদিত্য ডেকে বলল, 'বউদি, পরজীবে করো দয়া আমি অতি মন্দ। আজকের মতো নানকুকে তুমি ফরগিভ করে দাও। আর কোনওদিন ওর কাকুমণি দেরি করে বাজার আনবে না।'

নানকু কান্না থামিয়ে আদিত্যকে দেখল। তারপর কান্না জড়ানো গলায় 'কাকুমণি! কাকুমণি!' বলে ছুটে এল ওর কাছে।

লতা দাদার একপ্রস্ত জামা-প্যান্ট আলনা থেকে নিয়ে বিছানায় গুছিয়ে রাখল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল আদিত্যকে। বলল, 'সত্যি, ছোড়দা, তুমি একেবারে হোপলেস। ভালো ট্রেনিং দিচ্ছ ভাইপোকে—।'

আদিত্য নানকুর মাথার বড়-বড় চুলে হাত বুলিয়ে বলল, 'যাই বলো, বউদি, তোমার কিল মারার স্টাইলে ব্রুস লি-র মতো একটা আভিজাত্য আছে। অ্যাই নে, শিগগির একটা মাদ্রাজি নমস্কার কর তোর মাকে—' শেষের কথাটা নানকুকে লক্ষ করে।

নানকু একবার আদিত্যর মুখের দিকে তাকাল, তারপর মায়ের দিকে দু-তিন পা এগিয়ে হুমড়ি খেয়ে সটান উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মেঝেতে। বারবার মাথা ঠুকতে লাগল মায়ের দু-পায়ে। আর বিড়বিড় করে 'জ্যাক অ্যান্ড জিল'-এর প্রথম দুটো লাইন আওড়াতে থাকল।

লতা রাগের মধ্যেও হেসে ফেলল। ছেলেটাকে টেনে তুলল মেঝে থেকে। নানকু মায়ের হাত ছাড়িয়ে চলে এল আদিত্যর কাছে। আদিত্য বলল, 'কেমন ট্রেনিং দিয়েছি বলো! যাকগে বউদি, তুম জলদি রান্না করো। আমি নানকুকে ও-ঘরে নিয়ে যাচ্ছি। সকাল থেকে এখনও চা খাইনি। গলাটা শুকিয়ে গেল—।'

আদিত্য ছেলেটার হাত ধরে নিয়ে চলল বারান্দার দিকে। মা তখনও আপনমনে কীসব বকে চলেছে। আর মুন্নি দূর থেকে গলা বাড়িয়ে দাদার ঘরের দিকে উঁকি মেরে দেখছে।

পাশের বাড়ি থেকে উনুনের ধোঁয়া ভেসে আসছে। তার বেশ খানিকটা ঢুকে পড়ছে আদিত্যদের বাড়িতে। চোখ জ্বালা করছে। গলার কাছটাও খুশখুশ করছে আবার। কাশি পেয়ে গেল আদিত্যর। একইসঙ্গে টের পেল, পরনের পাঞ্জাবিটা ঘামে

ভিজে লেপটে আছে ওর গায়ে।

বারান্দার লাগোয়া ঘরটাই দোতলা বাড়িটার সবচেয়ে বড় ঘর। বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ড গ্র্যাচুইটির টাকা দিয়ে তৈরি বাড়ি। জমিটা ছিল ঠাকুরদার কেনা। তখন, খুব বাচ্চা বয়েসে, আদিত্যরা উলটোডাঙ্গার মুরারিপুকুরে ভাড়া থাকত। বাবা রিটায়ার করার ঠিক পরেই বাড়ি করেছিল। আর বাড়ির কাজে শেষ-ছোঁওয়া দেওয়ার আগেই বাবাকে চলে যেতে হয়। যাওয়ার আগে অবশ্য একমাস ধরে লড়াই করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেনি। হয়তো পারত, কিন্তু ডাক্তাররা অসুখটা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেনি।

বাবা চলে গেছে প্রায় তেরো বছর। কিন্তু মনে হয়, এই তো সেদিন।

বাড়ির কোনও-কোনও পিলারে পলেস্তারা পড়েনি। কোথাও হয়তো দু-চারখানা ঢালাইয়ের রড বেরিয়ে রয়েছে। এইরকম টুকিটাকি শেষ-না-হওয়া কাজ। এগুলোর দিকে চোখ পড়লেই আদিত্যর মনে পড়ে যায় বাবার কথা। মনে হয়, বাবা যেন বলছে, 'দিতু, তুই আর পলাশ এসব কাজ নিয়ে মাথা ঘামাসনি। তোদের পড়ার ক্ষতি হবে। দাঁড়া, একটু ফুরসত পাই, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এসব বাকি কাজ করিয়ে নেব।'

বাবা বাড়ির নাম রেখেছে 'সুরেন্দ্র নিলয়'—ঠাকুরদার নামে। বাড়ির বাইরের দেওয়ালে একটা ফলকে সেটা খোদাই করা আছে। কিন্তু দেওয়ালটায় নোনা ধরে গেছে। এই এলাকার প্রায় সব বাড়িতেই ড্যাম্প, নোনা।

নানকু হাত ধরে টান মারতেই আদিত্যর খেয়াল হল মা ওকে কী যেন বলছে। আবার বলতেই কথাটা কানে ঢুকল আদিত্যর ঃ 'লতার হাত বড্ড বেড়েছে! কারণে-অকারণে ছেলেটাকে মারবে!'

আদিত্য নানকুকে দেখল। চোখের কোলে জল শুকিয়ে আছে, কিন্তু মুখে হাসি। মা জড়সড়ো হয়ে দেওয়ালের লাগোয়া বিছানায় বসেছিল। পাশেই ছোট ট্রানজিস্টর রেডিও বাজছে। ওটা সব সময়েই বেজে চলে। গান-বাজনা-খবর-খেয়াল—ও থেকে যা হোক কিছু একটা আওয়াজ বেরোলেই হল।

আদিত্য বলল, 'নানকুর সামনে বোলো না, আশকারা পেয়ে যাবে—।'

নানকু সঙ্গে সঙ্গে আদিত্যর হাত ধরে একরকম ঝুলেই পড়ল, বায়নার সুরে বলল, 'কাকুমণি, আশকারা খাব, আশকারা কিনে দাও আমাকে—।'

মুন্নি বারান্দায় পোষা টিয়াপাখিটাকে ছোলা খেতে দিচ্ছিল, নানকুর আবদার শুনতে পেয়ে ডাকল ঃ 'এদিকে আয়, আশকারা নিয়ে যা, চা দিয়ে খাবি।'

বাচ্চাটা আদিত্যর হাত ছেড়ে বারান্দায় দৌড় লাগাল।

মা নীচু গলায় বলল, 'চা খাবি তো?'

আদিত্য বিছানার পাশে দাঁড় করানো স্টিলের আলমারির আয়নায় নিজের চেহারা দেখছিল, বলল, 'হ্যাঁ, দাও—।'

আলমারির পাশেই একটা ছোট টেবিলে বাবার ফটো। তাতে চন্দনের টিপ দেওয়া। সামনে রাখা ছোট্ট পিতলের থালায় তিন-চারটে সাদা ফুল। নয়নতারা। ওদের বাড়িতে ঠিক ছাদ নেই, তবে খাটো পাঁচিল ঘেরা ছাদের মতোই একটা ছোট জায়গা আছে। তার চার কোণের পিলার থেকে চারটে করে মরচে ধরা লোহার রড বেরিয়ে আছে। সেই ছাদের চাতালে গোটাপাঁচেক টবে কয়েকটা ফুলগাছ। মা আর মুন্নিই গাছগুলোর আদর-যত্ন করে। মা প্রতিদিনই খুব ভোরে ওঠে। ছাদে যায়। ফুল তুলে নিয়ে আসে বাবার ফটোতে দেওয়ার জন্য। চন্দন বেটে টিপ পরায়। এ যেন এক দেবপূজা। সেই পুজোর সময় ছবির মধ্যে থেকে সুপুরুষ অকালপ্রয়াত মানুষটা তার বিধবা বউকে দেখে। বয়েসকালে মা কম সুন্দরী ছিল না। কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর তেরো বছরে মায়ের বয়েস ছাব্বিশ বছর বেড়ে গেছে। তার ওপর সাদা শাড়ি। সাদা জমিওয়ালা শাড়ি বরাবরই মায়ের দু-চক্ষের বিষ ছিল। এখনই সেই বিষ চব্বিশ ঘণ্টা গিলতে হচ্ছে।

মা ধীরে-ধীরে হেঁটে গেল চায়ের টেবিলের দিকে। ফ্লাস্কে চা ছিল। মা ভোরবেলা তৈরি করে ফ্লাস্কে ঢেলে রাখে। বাবার ছবির সামনে এক কাপ দেয়। বাবা চা ভালোবাসত। তারপর নিজে এক কাপ নেয়। রেডিয়ো শোনে, চায়ে চুমুক দেয়। এ-ঘরে টিভি আছে একটা। কিন্তু সেটা মা চালায় সন্ধেবেলা।

মায়ের ডাকে পিছন ফিরল আদিত্য। চা নিয়ে এসেছে মা। ধোঁয়া উঠছে এখনও। খুব কাছে মায়ের মুখ। চোখের চারপাশের ভাঁজগুলো চোখে পড়ল। শোকের কাটাকুটি খেলা। আদিত্য চা নিতেই নীচু গলায় মা জিগ্যেস করল, 'তোর এত দেরি হল?'

চায়ে চুমুক দিল আদিত্য। বলল, 'কী করব! হাটের দিনে রাস্তাটার কী অবস্থা হয় জানো তো? তার ওপর মহাদেবদার বাবার সঙ্গে রাস্তায় দেখা। টিউশানি খুঁজছিল—।'

মা আবার চলে গেল বিছানার কাছে। বসল বিছানায়। বিড়বিড় করে বলল, 'ভদ্রলোকের কী আর উপায়! দেখার কেউ নেই। একটা ঘর ভাড়া দিলেও কিছু টাকার জোগাড় হত। কিন্তু দেবে না। তা হলে নাকি বাড়ি হাতছাড়া হয়ে যাবে। মহাদেব আর এসে থাকতে পারবে না।'

আদিত্য কোনও জবাব দিল না। বিছানার প্রান্তে খবরের কাগজটা পড়েছিল। সেটা তুলে নিয়ে চায়ের কাপ হাতে বারান্দায় গেল।

বারান্দার ডানদিকের রেলিঙে পাখির খাঁচাটা রাখা ছিল। খাঁচার সামনে নানকুকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুন্নি। মাঝে-মাঝেই 'ভক্তদাস, ভক্তদাস' করে ডাকছে, আর পাখিটাও একই কথা শুনিয়ে দিচ্ছে উত্তরে। নানকু বারবার পাখিটার লাল ঠোঁটের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিচ্ছে। মুন্নি কোনওরকমে ওর হাতটা আটকাতে চেষ্টা করছে। বলছে, 'কী হচ্ছে, নানকু, মার খাবি এবার!'

নানকু মুখ ঘুরিয়ে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, মার খাব না, আশকারা

খাব।'

আদিত্য বলল, 'ওকে নামিয়ে দে, মুন্নি। ওর বোধহয় সত্যি-সত্যি খিদে পেয়েছে।'

মুন্নি কোল থেকে নামিয়ে দিয়েই বাচ্চাটা 'জ্যাক অ্যান্ড জিল' বলতে-বলতে ছুট লাগাল। মা বিছানা থেকে দুবার ওকে নাম ধরে ডাকল, কিন্তু ছেলেটা ভ্রূক্ষেপই করল না।

মুন্নি বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল। আর পাখিটা তখনও নিজের নাম বলে যাচ্ছে বারবার।

পাখিটা বাবা-ই কিনেছিল প্রায় চোদ্দো বছর আগে। এক পাখিওয়ালা এ-গলিতে পাখি ফিরি করতে এসেছিল। সে-ই মোটামুটি ঠকিয়ে ভালো দাম নিয়ে গছিয়ে দিয়ে যায় এই সাদামাটা টিয়াপাখিটা।

বাবা পাখিটাকে ভীষণ ভালোবাসত। নিয়ম করে খাওয়াত, যত রাজ্যের গল্প করত ওর সঙ্গে। আর পাখিটাও 'কর-কর-কঁ-কঁ' ইত্যাদি নানা আওয়াজ করে এদিক-ওদিক ঘাড় কাত করে সে-গল্প বোঝার চেষ্টা করত। বাবা পাখিটাকে বাইরে ছেড়ে রাখত। পাখিটা তখন ঘুরে বেড়াত বাবার পায়ে-পায়ে। বোধহয় ওর ডানা ভারী হয়ে গিয়েছিল, তাই উড়তে পারত না। বেড়ালের গন্ধ পেলেই চিল-চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করত। ঝাঁপিয়ে উঠে পড়ত বাবার কোলে।

বাবা-ই পাখিটার নাম রেখেছিল 'ভক্তদাস'। কার ভক্ত, কারই বা দাস, কে জানে! আদিত্যর নামটাও বাবার রাখা। আর ছোটবেলায় নিজের নামটা বলতে গিয়ে ও নাকি 'দিতু' বলত। সেই থেকেই এই অদ্ভুত ডাক নাম : 'দিতু'। তবে প্রথম-প্রথম অদ্ভুত লাগলেও এখন গা সওয়া হয়ে গেছে।

আদিত্য চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে খবরের কাগজের পাতায় চোখ বোলাচ্ছিল। সাধারণত এই সময়ে গ্রীষ্মের রোদ বারান্দায় পৌঁছে যায়, কিন্তু বারান্দার বাঁ-দিক ঘেঁষে একটা মাধবীলতা গাছ থাকায় খানিকটা আড়াল পাওয়া যায়। এখন অবশ্য আড়ালের কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ সূর্য মেঘে ঢাকা।

আদিত্য আড়চোখে মুন্নিকে দেখছিল। সকালবেলাতেই পরিপাটি করে সেজেছে। দিনরাত্তির বইয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। শুধু রোববার সকালটা ছাড়া। কারণ সপ্তাহে ওই একটা দিন মোহিতবাবুর ছেলে রজত ওদের বাড়ির বারান্দায় আর জানলার কাছে ঘোরাঘুরি করে। যেমন এখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ছে, অথবা পড়ার ভান করছে। আর মাঝে-মাঝেই নজর দিচ্ছে আদিত্যদের বাড়ির বারান্দার দিকে। মুন্নির দিকে।

রজত দুর্গাপুরে হোস্টেলে থেকে রিজিওনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াশুনো করে। আদিত্যর মতোই ইলেকট্রিক্যাল।

শনিবার বিকেলে বা রাতে বাড়িতে আসে রজত, আর সোমবার খুব ভোরে

চলে যায়। ওদের বাড়িটা আদিত্যদের উলটোদিকে দ্বিতীয় সারিতে, একটু ডানদিক ঘেঁষে। চারতলা বাড়ি, সদ্য রং করা হয়েছে। রজত থাকে তেতলায়।

রজত ছেলে হিসেবে খারাপ নয়। ফরসা, চোখ-মুখ বেশ ধারালো, মাথার চুলগুলো কখনওই বশে থাকে না। কথা বলার সময় মাঝে-মাঝে নাকটানার অভ্যেস আছে।

আদিত্যর সঙ্গে আলাপ আছে রজতের। ওকে 'দিতুদা' বলে। বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে। মুন্নির কাছাকাছি আসার ছুতোয় দু-একবার পড়া বুঝতেও এসেছে আদিত্যর কাছে।

কী করে ওদের দুজনের পরিচয় হল আদিত্য জানে না। পরিচয় কি সত্যিই হয়েছে? নাকি চোখের দেখা, এ-ওর দিকে তাকানো, ওইটুকু পর্যন্তই? মুন্নিকে ডেকে জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু সেটা...।

মুন্নি যদিও ভক্তদাসকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার ভান করছিল, ওর চোখ বারবার ছুটে যাচ্ছিল রজতের দিকেই। মুন্নিটার বিয়ে হয়ে গেলে বেশ হত। পলাশ আর আদিত্য দুজনেই হালকা হতে পারত। আবার এ-ও ঠিক, এই সুন্দর ছোটবোনটা চলে গেলে বাড়িটা কেমন ফাঁকা হয়ে যাবে। আদিত্য কল্পনায় সেই ফাঁকা বাড়িটা দেখতে পেল। ডাকল, 'অ্যাই মুন্নি, শোন—।'

মুন্নি মুখ ফেরাল। ছোড়দাকে দেখল, বলল, 'কী?'

আদিত্য চায়ের কাপে পরপর তিনটে চুমুক দিয়ে বলল, 'একটা টিউশানি জোগাড় করে দিবি?'

মুন্নি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'কেন, দুটো টিউশানিতে তোর হচ্ছে না?'

'না, তা না—।'

'কী পড়াবি? ছাত্র, না ছাত্রী?'

মুন্নির সঙ্গে আদিত্যর বয়েসের তফাত প্রায় পনেরো-ষোলো বছর। কিন্তু কী করে যেন ওদের সম্পর্কটা পিঠোপিঠি ভাইবোনের মতো হয়ে গেছে।

আদিত্য ছোটবোনকে দেখছিল। কী সুন্দর দেখতে! মায়ের ছোটবেলার ফটো দেখেছে। সেই মুখটা যেন কেটে বসানো। ডান গালে একটা তিল। ঘন ভুরুর ওপরে নেমে আসা চুলের ঝালর, চঞ্চল চোখের পালক, কপালের টিপ, সব মিলিয়ে স্বপ্নের মতো। এই ছোটবোনটা কখনও যেন দুঃখ না পায়। যেন কোনও কষ্ট না আসে ওর জীবনে।

আদিত্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। মুন্নি আঙুল চালিয়ে কপাল থেকে চুলের ঝালর সরাতে চাইল। বলল, 'কী দেখছিস হাঁ করে? বল, ছাত্র না ছাত্রী?'

আদিত্য হেসে বলল, 'যে-কোনও একটা হলেই চলবে। আসলে আমার জন্যে নয়, মহাদেবদার বাবার জন্যে—।'

'ও—' ঠোঁট কামড়াল মুন্নি। বলল, তাহলে তো ইংরেজি—ঠিক আছে, জিগ্যেস

করে দেখব। যদি খোঁজ পাই তোকে বলব।'

আদিত্য কয়েক চুমুকে বাকি চা-টুকু শেষ করে ফেলল। কাগজের হেডলাইনগুলোয় চোখ বুলিয়ে চলে গেল খেলার পাতায়। ফুটবল খেলোয়াড়দের দলবদলের বৃত্তান্ত পড়তে লাগল। হঠাৎই কোথা থেকে একঝলক ফুরফুরে বাতাস এল। আদিত্যর দু-হাতে মেলে ধরা খবরের কাগজ বেসামাল হয়ে গেল। সুনয়নার কথা মনে পড়ে গেল ওর। ওই মেয়েটাও যেন ওই রকম—দমকা হাওয়ার মতো। আজ সন্ধেবেলায় ওকে পড়াতে যাওয়ার কথা আছে।

সুনয়নাদের বাড়িটা খুব দূরে নয়। আদিত্যদের সরু গলি থেকে বেরিয়ে বাঁদিকে কিছুটা গেলে ফুটপাথের ওপরে একটা করপোরেশনের কল আছে। তার ঠিক সামনেই।

রোববার আর বুধবার সন্ধেবেলা ওকে পড়াতে যায় আদিত্য। ফিজিক্স অনার্স নিয়ে পড়ে। সামনের বছরে পার্ট টু দেবে। কিন্তু কী করে পাশ করবে ঈশ্বর জানেন। পার্ট ওয়ানে অতি জঘন্য রেজাল্ট করেছে। পড়াশুনো ছাড়া আর সব বিষয়ে সুনয়নার আগ্রহের অন্ত নেই। যেমন, ওদের বাড়ির কাছে পায়রা বেশি কেন। প্রজাপতি দেখলে পরে দিন ভালো যায় কি না। আবহাওয়ার পূর্বাভাষ কেমন করে জানানো হয়। টিভির অ্যানটেনায় সবসময় বিজোড় সংখ্যক এলিমেন্ট থাকে কেন। সত্যি, সুনয়নার জিজ্ঞাসার শেষ নেই।

মুন্নি হঠাৎই চলে গেল বারান্দা থেকে। আদিত্য দেখল, রজতকেও আর দেখা যাচ্ছে না।

সামনেই নরেনবাবুর বাড়ি। দোতলা, তবে অনেকটা জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে। বাড়িটা বেশ পুরোনো। তারই ভাঙা কারনিসে কয়েকটা কাক বসে আছে। ডাকছে এলোমেলো। একে গুমোট আবহাওয়া, তার ওপর কাকের ডাক। বৃষ্টি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা আছে নাকি?

মা বারান্দায় এল। বলল, 'তুই খেতে যা। লতা ডাকছে।'

আদিত্য জিগ্যেস করল, 'দাদা বেরিয়ে গেছে?'

এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দেখল ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরে পলাশ বাড়ি থেকে বেরোল। হাতে ফোলিও ব্যাগ, হাঁটছে হনহন করে। এয়ারপোর্টে পৌঁছতে ওর নির্ঘাত দেরি হয়ে যাবে।

মা বোধহয় আদিত্যর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল, কিন্তু আদিত্য সেটা খেয়াল করেনি। যখন খেয়াল করল তখন মা বলছে, 'দিতু, আমার কাশিটা আবার বেড়েছে মনে হচ্ছে। বুকে খুব কষ্ট হচ্ছে। লতা বলছিল গরম জলে নুন ফেলে কুলকুচো করলেই ঠিক হয়ে যাবে—।'

আদিত্য খবরের কাগজটা ভাঁজ করে ফেলল। বলল, 'টোটকা যা করতে চাও করো, তবে কাল তোমাকে ডাক্তারবাবুর কাছে দেখাতে নিয়ে যাব। তখন যেন না বোলো না।'

মায়ের কাশি বারো মাসের। তার ওপরে হাঁপানির টান। রোগা শরীর। খুব ধীরে-ধীরে হাঁটাচলা করে।

আদিত্য মাকে দেখছিল। মানুষটার জীবনের আর কতটুকুই বা অবশিষ্ট আছে! অঙ্কের হিসেবে একষট্টি বছর বয়েসটা হয়তো তেমন বেশি নয়, কিন্তু গত তেরো বছরে নানারকম অসুখ মাকে অসহায় করে দিয়েছে।

মাথার সামনেটা রুপোলি চুলে ঢাকা। গাল সামান্য ভাঙা। কয়েক বছর আগেও মা হাসলে এই গালে টোল পড়ত। এখনও হয়তো পড়ে, কিন্তু বোঝা যায় না। জরা কাউকে ক্ষমা করে না।

মায়ের চোখের চশমায় আলো চকচক করছিল। কীসব বিড়বিড় করল নিজের মনে।

আদিত্য বলল, 'রান্না করবে না?'

মা অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, 'করব। একা মানুষের নিরামিষ রান্না আর কতক্ষণ লাগে!'

রান্না করা মায়ের নেশা ছিল। নিত্যনতুন রান্না খাইয়ে চমকে দিত বাবাকে। এখন চমকে দেওয়ার কেউ নেই।

আদিত্য মায়ের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল। অজান্তেই ওর চোখ চলে গেল মায়ের হাতের দিকে। শাঁখাহীন কঙ্কালসার হাতে দু-গাছা সরু চুড়ি। তাতে দুটো সেফটিপিন ঝুলছে। মা সবসময় বলে, 'এই চুড়ি দুটো তোর বউকে দিয়ে যাব। আর গলার হারটা মুন্নিকে। আমার তো নিজের বলতে আর কিছু নেই—।'

আদিত্যর হাসি পেল। চুড়ির সঙ্গে সবসময় সেফটিপিন থাকে। যেখানে-সেখানে বিঁধে যেতে চায়। মা জানে না।

সকালবেলার ঘোলাটে আলোয় মা নিথর মূর্তির মতো বারান্দার দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। সেই মুহূর্তে চুপিচুপি কে যেন একটা কারুকাজ করা চন্দন কাঠের ফ্রেম মায়ের মুখের সামনে ধরল। আদিত্যর নাকে ধূপের গন্ধ ভেসে এল। ওর গলার কাছটা খুশখুশ করে উঠল আবার। গলায়, বুকে, একটা কষ্ট হল।

॥ দুই ॥

বিকেলবেলা ঘুম ভাঙতেই অবাক হয়ে গেল আদিত্য।

এরকম বিকেল আগে কখনও ও দেখেনি।

বটতলা থেকে আড্ডা মেরে ফিরে স্নান করে খেয়েদেয়ে একটু গড়িয়ে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু কখন ঘুম এসে গেছে টের পায়নি। ঘুম ভাঙতেই গলির দিকের জানলায় নজর গেছে ওর। একইসঙ্গে ঘড়িও দেখেছে। সাড়ে চারটে। কিন্তু এই সময়

তো জানলায় একফালি বিকেলের রোদ এসে পড়ার কথা!

খানিকটা অবাক হয়েই বিছানা ছেড়ে শ্লথ পায়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ও। তারপর রীতিমতো ঘাবড়ে গেছে।

এক অদ্ভুত ধোঁয়াশায় চারদিক ছেয়ে গেছে। হালকা বাদামি রঙের ধোঁয়া। কোথাও গাঢ়, কোথাও বা সামান্য পাতলা। তারই মধ্যে খুব ধীরে খেলা করছে ধোঁয়াশার স্রোত। চোখ যেন খুব সামান্য জ্বালা-জ্বালা করছে মনে হল। কিন্তু উনুনের ধোঁয়ার মতো অত সাংঘাতিক নয়।

দোতলা থেকে ভক্তদাসের চিৎকার শুনতে পেল আদিত্য। বেড়াল দেখতে পেলে বা তার গায়ের গন্ধ পেলে যেরকম চেঁচায়, অনেকটা সেইরকম।

তাড়াতাড়ি জামা-প্যান্ট পরে নিল আদিত্য। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে কলতলায় হাতমুখ ধুয়ে নিল। হাতে হাত ঘষতে-ঘষতে উঠে এল দোতলায়। ডানদিকে দাদার ঘরের দরজা। সেদিকে একপলক তাকিয়ে ও মায়ের ঘরে গেল। এ-ঘরে মা আর মুন্নি শোয়। আর কখনও-কখনও নানকু।

মুন্নি ঘরের আলো জ্বেলে খাটের ওপরে বসে দুলে-দুলে কী পড়ছিল। মা টিভিটা অন করে নব ঘোরাচ্ছিল। সেট থেকে শুধুই হিজিবিজি শব্দ হচ্ছিল, আর পরদায় একইরকম ছবি।

আদিত্য বিরক্তভাবে বলল, 'কী করছ? এখন কোনও প্রোগ্রাম আছে নাকি?'

মা টিভির সুইচটা অফ করে দিয়ে বলল, 'না, হঠাৎই শীতের মতো কুয়াশা হল, তাই দেখছি খবরে কিছু বলে কি না—।'

আদিত্য বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে মুন্নিকে জিগ্যেস করল, 'মুন্নি, তোর চোখ জ্বালা করছে?'

মুন্নি পড়া থামিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, অল্প-অল্প। তোর?'

আদিত্য বলল, 'হ্যাঁ, আমারও।'

ভক্তদাসের খাঁচাটা সকাল-বিকেল বারান্দার রেলিঙে এনে রাখা হয়। আদিত্য দেখল, পাখিটা অস্বাভাবিক ছটফট করছে। আর ডেকে উঠছে থেকে-থেকেই।

মা চা তৈরি করে রেখেছিল। আদিত্যকে জিগ্যেস করল, 'চা খাবি?'

আদিত্য বলল, 'না, একটু বেরোব। নয়নাদের বাড়ি পড়াতে যাব। তা ছাড়া ব্যাপারটা কী সেটা একটু খোঁজখবর করে দেখি।'

মা পরপর কয়েকবার কাশল। ফরসা মুখ লালচে হয়ে গেল। মুন্নি তখন আবার পড়ায় মন দিয়েছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে আদিত্য জিগ্যেস করল, 'দাদা ফিরেছে?'

মুন্নি বলল, 'না—।'

আদিত্য আর দাঁড়াল না। চটির ফটাফট শব্দ তুলে সিঁড়ি নামতে শুরু করল। গলিতে বেরিয়ে মনে হল ধোঁয়াশাটা যেন একটু ফিকে হয়েছে। সাধারণত

এই সময়ে খোকন, তোতা ওদের বল পেটাপিটি শুরু হয়ে যায়, কিন্তু এখন ওদের দেখতে পেল না আদিত্য। আর বলের শব্দও শুনতে পেল না।

ধোঁয়াশার ভেতর দিয়ে ছ-সাত ফুট পর্যন্ত আবছা দেখা যাচ্ছিল। তাতেই আদিত্য অস্পষ্টভাবে দেখল, আশপাশের বাড়িগুলোর দরজায়, ছাদে, বারান্দায় বেশ ভিড়ই বলতে হবে। কথাবার্তার শব্দও কানে আসছে। মেঘে ঢাকা সূর্যের কুয়াশা-ভেদ-করা ঘষা আলো চারপাশের বাস্তব জগতটাকে কেমন যেন অবাস্তব করে দিয়েছে।

আদিত্য গলির মোড়ের দিকে পা চালাল। মাথা উঁচু করে থাকা ইট বা পাথরে বারদুয়েক হোঁচট খেল।

গলির মোড়ে বাঁ-দিকে ঘুরলেই একটা ছোট চায়ের দোকান। সেখানে বিকেলবেলা এমনিতেই একটা জটলা থাকে—আজ সেটা আরও বেশি।

ক'দিন আগেই খবরের কাগজে কম্পিউটারে ভোট দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে বেশ লেখালেখি হয়েছিল। ব্যালট বাক্স বলে কোনও বস্তু আর থাকছে না। পাঁচবছর আগেই দেশের প্রত্যেক নাগরিককে একটি করে গোপন নম্বর দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাকে বলা হয় সিটিজেন কোড নম্বর বা সংক্ষেপে সি সি এন। এই নম্বর আর ফটোগ্রাফ নিয়ে তৈরি হয়েছে আইডেন্টিফিকেশান কার্ড। এখন ভোটকেন্দ্র বলতে স্রেফ কম্পিউটার টার্মিনাল। যে-কোনও ভোটার সেখানে গিয়ে কিবোর্ডে নিজের গোপন কোড নম্বরটা পাঞ্চ করবে। নম্বরটা পাসওয়ার্ডের মতো। টাইপ করলেও কম্পিউটারের টিভি পরদায় দেখা যাবে না, তবে কাজ হবে। তখন কম্পিউটার ভোটারের নাম জানতে চাইবে। নাম ও কোডনম্বর যদি ঠিক-ঠিক খাপ খায় তা হলেই কিবোর্ডের নির্দিষ্ট বোতাম টিপে ভোটার ভোট দিতে পারবে। তা না হলে হাজার বোতাম টিপলেও কম্পিউটার তাকে ভোট দিতে দেবে না। আর ভোট চলবে তিনদিন ধরে। সুতরাং তাড়াহুড়োর কোনও ব্যাপার নেই। তা ছাড়া রিগিং ইত্যাদিও অকেজো হয়ে যাবে।

আর মাত্র দশদিন পরেই ভোট। সুতরাং হঠাৎই এই কম্পিউটার-নির্ভর ভোটের ঘোষণা অনেককেই চমকে দিয়েছিল। আর তাই নিয়ে এই চায়ের দোকানে কম জল্পনা-কল্পনা হয়নি। যাতায়াতের পথে টুকরো-টুকরো কথাবার্তা আদিত্যর কানে গেছে। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল, আজকের এই মুহূর্তের বিষয় ধোঁয়াশা।

জটলার মধ্যে শঙ্করবাবুকেও দেখতে পেল আদিত্য। গায়ে সাদা শার্ট আর হাঁটু পর্যন্ত ধুতি। দু-হাত পিছনে রেখে গম্ভীরভাবে সকলের মতামত শুনছেন। আদিত্যকে দেখতে পেলেন। এগিয়ে এসে কী বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামলে নিলেন নিজেকে। শুধু ঘোলাটে দু-চোখে কাতর অনুনয় ফুটে উঠল।

আদিত্য দূর থেকেই সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, মনে আছে ওর। ভোলেনি।

বয়স্ক মানুষের দল এই কুয়াশা বা ধোঁয়াশা নিয়ে যতই মাথা ঘামাক আদিত্যর মনে হল, ব্যাপারটা মোটেই তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। ধোঁয়া ধুলোয় এরকম তো

হতেই পারে! গলা খুসখুস করে উঠল, কিন্তু ও সেটাকে আমল না দিয়ে সুনয়নাদের বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

ওদের বাড়ির কাছে যে-করপোরেশনের কলটা আছে সেখানে দুজন লোককে দেখল আদিত্য। চোখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। সত্যি, মানুষের আতঙ্ক যে কতরকমের হতে পারে! এই তো, বছর-পঁচিশ আগে, ১৯৮০ সালে, পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ নিয়ে কী কাণ্ডটাই না হল! প্রচারের ফলে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, সেদিন রাস্তাঘাট ফাঁকা ধুধু করছে। আদিত্য তখন স্কুলে পড়ে, ক্লাস থ্রিতে। কিন্তু ওর মনে আছে। বাবা সূর্যগ্রহণ দেখার জন্য একজোড়া কালো কাচ জোগাড় করেছিল। রাস্তায় বেরিয়ে দেখেছিল পূর্ণগ্রাস। আদিত্য আর পলাশকেও দেখিয়েছিল। অথচ প্রচারের দাপটে বেশিরভাগ মানুষেরই ধারণা হয়েছিল, পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা মানেই পরলোকের পাসপোর্ট হাতে নেওয়া।

হাসি পেয়ে গেল আদিত্যর। আপনমনে হাসতে-হাসতেই সুনয়নাদের বাড়ির কলিংবেলের বোতাম টিপল ও।

রাস্তা দিয়ে কয়েকটা গাড়ি চলে গেল। হেডলাইট জ্বলছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও গতি অত্যন্ত ধীর। ফুটপাথের ধারে ডক্টর মণ্ডলের চেম্বারের সামনে একদল ছেলে আড্ডা মারছে। অবয়বগুলো বোঝা গেলেও এখান থেকে চেনা যাচ্ছে না।

চোখ ফেরাতেই চমকে উঠল। সুনয়না। সবুজ-সাদা-কালোয় ছাপা ম্যাক্সির মতন কী একটা পোশাক পরে আছে। কোমরে একজোড়া বেল্ট। চকচকে আংটা লাগানো।

'দেখছিলাম, কতক্ষণ অন্যমনস্ক থাকতে পারেন।' নয়না হাসল, বলল, 'ভেতরে আসুন—' একটু থেমে আবার, 'নাকি কুয়াশার জন্যে পড়া থেকে ছুটি?'

আদিত্য ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতে বলল, 'এখন পড়াতে আসিনি। সবে তো সওয়া পাঁচটা বাজে।'

নয়না দরজা বন্ধ করছিল আবার। হেসে মন্তব্য করল, 'আজ না হয় এক-দেড়ঘণ্টা বেশিই পড়ালেন। বাবাকে বললেই মাইনে বাড়িয়ে দেবে—।'

আদিত্য সুনয়নাকে দেখল। কী একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল। তারপর ঘরের কোণে চটিজোড়া ছাড়তে-ছাড়তে নীচু গলায় বলল, 'তোমার ইকনমিক্স নিয়ে পড়া উচিত ছিল।'

সুনয়না ভুরু কপালে তুলে বলে উঠল, 'ও মা! কী সর্বনেশে কথা, দিতুদা! তখন তা হলে আমাকে পড়াত কে?' তারপর একটু যেন চিন্তা করে বলল, 'অবশ্য আপনার কোনও অসুবিধে হত না। কমলি তো ফিজিক্স নিয়ে পড়ে—ওকে পড়াতেন। বেচারা সবসময় আপনার কথা বলে—।'

আদিত্য গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বলল, 'কী হচ্ছে, নয়না!'

নয়না হাসল। সুন্দর ছোট-ছোট দাঁত দেখা গেল ওর। বলল, 'এখনও বোঝেননি কী হচ্ছে। বাংলায় এর নাম ফাজলামি। বানান করে দেব?'

আদিত্য দম ছেড়ে মাথা নাড়ল হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে।

ঠিক তখনই নয়নার মা ঘরে এলেন। গোলগাল গিন্নিবান্নি চেহারা। বড় মাপের সিঁদুরের টিপ কপালে। ফরসা গালে সবে দু-একটা ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে। রগের কাছে কয়েকটা রুপোলি চুল।

ভদ্রমহিলা মিষ্টি গলায় আদিত্যকে বসতে বললেন।

ঘরের এক কোণে একটা টেবিল। তার দুপাশে দুটো চেয়ার। নয়না এখানে বসেই আদিত্যর কাছে পড়ে।

টেবিলের কাছ থেকে খানিকটা দূরে একটা লম্বা সোফা। বাদামি ভেলভেটের ঢাকনা দেওয়া। তার ওপরে দুটো-তিনটে ম্যাগাজিন আর একটা টিনটিনের বই।

আদিত্য মোজেইক করা মেঝেতে পা ফেলে দেওয়াল ঘেঁষা চেয়ারটায় গিয়ে বসল। তারপর মা ও মেয়েকে দেখল। কত আলাদা!

সুনয়নার বয়কাট চুল। গলা লম্বা। থুতনি সামান্য উঁচিয়ে দাঁড়ানো অভ্যেস। ফলে একটা উদ্ধত ভাব ফুটে উঠেছে। চোখ ছোট হলেও গভীর। কপালে বাঁদিকে একটা তিল রয়েছে। চোয়াল চওড়া, শক্ত। ঠোঁট পাতলা অথচ সবসময়েই যেন অভিমানে ফুলে আছে।

সুনয়না আদিত্যর উলটোদিকের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ডিসটেম্পার করা গোলাপি দেওয়ালের পটভূমিতে ওকে পোস্টারের মতন দেখাচ্ছে। আর ওর শ্যাম্পু করা চুলের ওপরে ঝুঁকে রয়েছে গাঢ় বাদামি রঙের দুটো ল্যাম্পশেড।

নয়নার মা সুইচ টিপে ঘরের টিউব লাইটটা জ্বেলে দিলেন। এবার স্পষ্ট বোঝা গেল, কুয়াশার খানিকটা ঘরের মধ্যেও ঢুকে পড়েছে।

সুনয়না হঠাৎই ভেতরে চলে গেল। আদিত্য ওর চলে যাওয়া দেখল। তারপর আলতো গলায় বলল, 'মাসিমা, আপনার চোখ জ্বালা করছে? কাশি পাচ্ছে?'

ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়েই ছিলেন। বললেন, 'না তো, তেমন কিছু না।' তারপর টেনে ঘ্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করলেন যেন।

টেবিলে নয়নার কয়েকটা বইখাতা অগোছালোভাবে পড়ে ছিল। উনি সেগুলো ঠিক করে সাজিয়ে দিতে লাগলেন।

ঘরের জানলাগুলো সব বন্ধ। জানলায় সুন্দর-সুন্দর পরদা। দেওয়ালে তিনটে বাঁধানো ছবি ঝুলছে। একটি বালক শ্রীকৃষ্ণ, আর দুটো প্রকৃতির ছবি—সবুজ আর নীলে মাখামাখি। শেষ ছবি দুটোর মধ্যে ইংরেজিতে ক্যাপশন লেখা রয়েছে। প্রথমটায় লেখা, 'টুডে ইজ দ্য ডে'; আজই সেই দিন। আর দ্বিতীয়টায় লেখা, 'অ্যান্ড গড ক্রিয়েটেড নেচার'। ঈশ্বর প্রকৃতি সৃষ্টি করিলেন।

ঘরের মধ্যে মানানসই বুক কেস রয়েছে একটা। দেওয়ালে বসানো। তার নীচের তাকে ছোট রঙিন টিভি। লেসের কাজ করা সুন্দর কাপড়ে ঢাকা। আদিত্যের মনে হল, ঘরের সাজসজ্জায় আর্থিক সচ্ছলতা লুকিয়ে রাখার কোনও চেষ্টা নেই।

সুনয়নার বাবা সুখেন্দু দত্ত এ-পাড়ার বহু বছরের বাসিন্দা। ইলেকট্রনিক জিনিসপত্তরের ব্যাবসা করেন। চাঁদনি চকে বেশ বড় দোকান। প্রায়ই সিঙ্গাপুর, হংকং, জাপান যাতায়াত করেন ব্যাবসার কাজে। সুনয়না ওঁদের একমাত্র মেয়ে। ওর জন্য আপাতত যা করেছেন তাই অনেক। এই প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি। দুটো গাড়ি ঃ একটা মারুতি ২০০০, আর অন্যটা মারুতি জিপসি। নিজের বাড়িতেই বড় গ্যারেজ, এ ছাড়া সল্টলেকেও চারকাঠা জমি কেনা আছে। আর আদি সপ্তগ্রামে প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি।

সুনয়নাই এসব খবর দিয়েছে আদিত্যকে। ওকে আদিত্য পড়াচ্ছে আজ প্রায় দেড় বছর। কিন্তু কখনও ওর মধ্যে বাড়তি অহংকার লক্ষ করেনি। ওর বাবার সঙ্গে কদাচিৎ দেখা হয় আদিত্যর। আর দেখা যদিও বা হয়, কথা তেমন হয় না। বেশিরভাগ সময়ে সুখেন্দুবাবু শুধু একটা কথাই বলেন, 'কী, নয়না ঠিকমতো পড়ছে তো?' আর আদিত্যও ঘাড় নেড়ে বলে, 'হুঁ—'। এখানেই যাবতীয় আলাপের শেষ।

সুখেন্দুবাবুর বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। চুল বেশ কাঁচাপাকা। চোখে শৌখিন ফ্রেমের চশমা। দেখলে রাশভারী বলে মনে হয়। তবে আদিত্যর সঙ্গে যখনই হিসেবের বাইরে কথা বলেছেন তখনই 'আপনি' বলে সম্বোধন করেছেন। এটা আদিত্যর অদ্ভুত লেগেছে। তবে দূরত্ব বজায় রাখার জন্য এই পদ্ধতিটা বেশ কাজের। যদিও সুনয়নার মা এই দূরত্ব বজায় রাখেননি।

নয়নাকে পড়িয়ে আদিত্য যা মাইনে পায় সেটা ও কাউকে সহজে বলে না। কারণ, বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। সপ্তাহে দু-দিন পড়িয়ে একহাজার টাকা, এটা বিশ্বাস না করারই মতো।

সুনয়নার মা বইপত্র গোছগাছ করে সবে সুস্থির হয়েছেন, এমনসময় মেয়ে যেন হাওয়ায় ভেসে ঘরে ঢুকল।

পোশাক পালটে ফেলেছে এরই মধ্যে। দিনের মধ্যে কতবার যে ও পোশাক বদলায় তার কোনও হিসেব নেই। সেইসঙ্গে মুখেও বোধহয় পাউডার-ক্রিম কিছু একটা ঘষে থাকবে—অন্তত আদিত্যর তাই মনে হল।

ওর এখনকার পোশাকটা কাটছাঁটে আগেরটার মতোই। তবে রং অনেক ফিকে। হালকা নীল। তার ওপরে ছোট-ছোট হলদে ফুলের নকশা।

'মা-মণি, টিভিতে নাকি স্পেশাল নিউজ হচ্ছে।' বলেই টিভির সুইচটা অন করে দিল সুনয়না। ভলিয়ুম কন্ট্রোলের নবটা ডানদিকে ঘুরিয়ে বলল, 'আমি দোতলায় ড্রেস চেঞ্জ করছিলাম, সোনালি ও-বাড়ির বারান্দা থেকে ডেকে বলল।'

সোনালি হয়তো পাশের বাড়ির বন্ধু-টন্ধু কেউ হবে। নয়নার বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা নেহাত কম নয়।

নয়নার মায়ের ভুরু কুঁচকে উঠেছিল। তিনি সোফার দিকে সরে গেলেন। কিছুটা দূরত্ব থেকে টিভির ছবি দেখবেন। আর নয়না এসে আদিত্যর সামনের চেয়ারটায়

বসল, বসে বলল, 'দিতুদা, আপনার গার্ড হচ্ছে না তো?'

আদিত্য মাথা নেড়ে জানাল, না। ততক্ষণে টিভি সরব হয়ে গেছে।

'...তবে আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা জানিয়েছেন, এই ধোঁয়াশায় ভয়ের কিছু নেই। তাঁরা ল্যাবরেটরিতে বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শুরু করে দিয়েছেন, আগামীকালই সেসব পরীক্ষার ফলাফল জানিয়ে দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র বলেছেন, বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে যে-কালো বৃষ্টি হচ্ছে, তার সঙ্গে এই ধোঁয়াশার কোনও সম্পর্ক নেই। হয়তো কোথাও মাটি খোঁড়ার কাজ চলেছিল। তারপর ঝোড়ো বাতাসে ধুলোর ঝড় উঠে এই অবস্থা হয়েছে। বিষয়টা তদন্ত করে দেখার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি তদন্ত কমিশন গঠনের আবেদন জানানো হয়েছে।

'মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের জনগণকে শান্ত থাকতে অনুরোধ করেছেন। কোনওরকম গুজবে তাঁরা যেন কান না দেন। তিনি আরও বলেছেন, গুজব রটনাকারীদের সন্ধান পেলে তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।

'এ-পর্যন্ত পাওয়া খবরে জানা গেছে এই ধোঁয়াশা কলকাতার সীমাবদ্ধ এলাকাতেই শুধু লক্ষ করা গেছে। দক্ষিণে যাদবপুর, উত্তরে বরানগর, পশ্চিমে গঙ্গা, আর পুবে সি. আই. টি. রোড ও ইস্টার্ন বাইপাস—এই হল মোটামুটি এর সীমানা। তবে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের পর নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এই ধোঁয়াশা মানুষের পক্ষে মোটেই ক্ষতিকর নয়। এই প্রসঙ্গে তাঁরা লন্ডন ও লস এঞ্জেলেসের ধোঁয়াশার কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে ৫ থেকে ১১ তারিখ পর্যন্ত লন্ডনে এক ধোঁয়াশা দেখা দেয়। তারও আটবছর আগে আমেরিকার লস এঞ্জেলেসের প্রায় একইরকম ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু কলকাতার এই হালকা ধোঁয়াশা তার তুলনায় নিতান্তই নিরীহ। বিজ্ঞানীরা এ-কথায় জোর দিয়ে বলেছেন, আবহমণ্ডলের ট্রোপোস্ফিয়ার অঞ্চলের কয়েকটি স্তরে বায়ুচাপের সামান্য তারতম্য ঘটায় এই ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের বিশ্বাস, কাল সকাল ছ'টার মধ্যেই আবহাওয়া আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

'কলকাতা দূরদর্শন থেকে প্রচারিত বিশেষ সংবাদ বুলেটিন এখানেই শেষ হল। প্রয়োজন হলে পরবর্তী বিশেষ সংবাদ বুলেটিন প্রচার করা হবে...নমস্কার...।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে টিভির সুইচটা অফ করে দিল সুনয়না। হেসে বলে উঠল, 'কী থ্রিলিং, না দিতুদা?' তারপর আবার চেয়ারে এসে বসে পড়ল।

আদিত্য কোনও জবাব দিল না।

সুনয়নার মা খবর শুনতে-শুনতে কখন যেন সোফায় বসে পড়েছিলেন। একটু কেশে বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই, কী বলো আদিত্য?'

আদিত্যর মনে হল, ভদ্রমহিলা ওর কাছে যেন ভরসা চাইছেন। ও নীচু গলায় বলল, 'না-না, দেখবেন কাল সকালেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ভদ্রমহিলা আপনমনেই কীসব বিড়বিড় করলেন। তারপর থেমে-থেমে বললেন, 'নয়নার বাবা গতকাল টোকিও রওনা হয়েছে। প্রায় সাত-আট দিন বাদে ফিরবে। এ সময় যদি হুট করে কিছু হয়...তার ওপর সামনে ভোট...।'

আদিত্য বুঝল, ভদ্রমহিলা কোনও একটা উত্তর আশা করছেন, কিন্তু ও কোনও জবাব দিল না। লক্ষ করল, সুনয়না ওর মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে। সেই মুখে অস্পষ্টভাবে কয়েকটা ঘামের ফোঁটা দেখা গেল যেন। উনি শ্রীকৃষ্ণের ফটোর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কপালে হাত বুলিয়ে ঘাম মুছে নেওয়ার ভান করলেন। সুনয়না হেসে বলল, 'মা-মণি, ''শোলে'' ছবিতে গব্বর সিং কী বলেছে মনে আছে? জো ডর গয়া, সমঝো কে মর গয়া।' শেষের কথাটা ও হিন্দি ছবির সংলাপ বলার মতো নাটকীয় ঢঙে উচ্চারণ করল।

আদিত্য বলে উঠল, 'কী হচ্ছে, নয়না!' তারপর ওর মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বুঝলেন, এসব হচ্ছে গাদাগুচ্ছের ভিডিও ক্যাসেট দেখার ফল—।'

ভদ্রমহিলা হেসে ফেলেছিলেন। ছোট্ট করে 'ফাজিল' বলে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন।

আর তখনই ট্রে-তে দু-কাপ চা ও কয়েকটা নোনতা বিস্কুট নিয়ে একজন পরিচারক ঘরে এল। ট্রে-টা নামিয়ে রাখল টেবিলে। তারপর, চলে যাওয়ার আগে, বলে গেল, 'দিদিমণি, আপনার ফোন এসেছে—'

'দিতুদা, আপনি চা খান, আমি এক্ষুনি আসছি। নিশ্চয়ই মোনালিসার ফোন, **অপটিক্স**-এর ক্লাসনোটগুলো চাইবে—।'

নয়না চলে যেতেই চায়ের কাপ তুলে নিল আদিত্য। চায়ের কাপ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। তখনই ওর খেয়াল হল, ধোঁয়াশা প্রায় কেটে গেছে। ওর ইচ্ছে হল, জানলা খুলে বাইরের অবস্থাটা একবার দ্যাখে, কিন্তু কেমন যেন ক্লান্তি টের পেল শরীরে। চেয়ার ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। ঘুম পাচ্ছে নাকি?

আদিত্য সাততাড়াতাড়ি চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই বুঝল জিভের ডগা পুড়ে গেছে।

সুনয়না এসে ঢুকল দমকা বাতাসের মতো। বলল, 'যা বলেছি তাই, মোনালিসার ফোন। ও ভীষণ সিরিয়াস।' তারপর প্লেট থেকে দুটো বিস্কুট তুলে নিয়ে কামড় দিল। চায়ের কাপ নিয়ে চুমুক দিল তাতে।

আদিত্য আড়চোখে তাকাল হাতঘড়ির দিকে। প্রায় পৌনে ছ'টা। ওর ইচ্ছে হল, একবার ছাদে যায়। আকাশটা কেমন লাগছে এখন?

প্রস্তাবটা নয়নাকে দিতেই ও এককথায় রাজি। সুতরাং চায়ের কাপ হাতে সোজা ছাদের দিকে।

ছাদে গিয়ে আকাশ-বাতাসের অবস্থা দেখে বিচলিত হল আদিত্য। অথচ খবরে বলা হয়েছে ব্যাপার তেমন গুরুতর নয়। অবশ্য আদিত্য নিজেও তা মনে করেনি।

কিন্তু এখন, এই তিনতলার ছাদে দাঁড়িয়ে এবং পশ্চিমের আকাশ-রেখার দিকে তাকিয়ে, ও যেন একটা আলতো ধাক্কা খেল।

বাদামি ধূসর ধোঁয়াশার এক বিশাল ওড়না যেন কোনও অদৃশ্য হাত বিছিয়ে দিয়েছে গোটা শহরের শরীরে। অকালসন্ধ্যায় ঝাপসা পাখিরা ডানায় ভেসে উড়ে যাচ্ছে আস্তানার দিকে। এক ম্লান কনে-দেখা আলো ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। আর পশ্চিমের লাল সূর্যের ছবি যেন ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে দেখা, রহস্যময়।

সুনয়না বলল, 'আকাশটা কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে।'

আদিত্য চায়ের কাপে চুমুক দিল। দেখল নয়নাকে। ও অনেকটা দূরে। ঝাপসা দেখাচ্ছে ওকে। নয়নাদের ছাদ মাপে বেশ বড়। ছাদের পুবদিকের পাঁচিলে লম্বালম্বিভাবে মাটি ফেলে গাছ লাগানোর আয়োজন করা হয়েছে। তাতে নানারকম ফুলগাছ। আদিত্য গাছগুলোর কাছে গেল। সবুজ পাতাগুলো কেমন বিবর্ণ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে জল পায়নি।

নয়না কখন যেন আদিত্যর খুব কাছে এগিয়ে এসেছিল। আদিত্যর থমথমে মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধীরে-ধীরে বলল, 'দিতুদা, কী হল?'

আদিত্য মাথা তুলে আকাশের দিকে দেখল। আকাশের একটা দিক কালচে দেখাচ্ছে। বৃষ্টি হবে নাকি? টিভির খবরের কথাগুলো মনে পড়ছিল আদিত্যর : '...এই ধোঁয়াশায় ভয়ের কিছু নেই...এই ধোঁয়াশা মানুষের পক্ষে মোটেই ক্ষতিকর নয়...।'

সুনয়না আবার বলল, 'কী হল, দিতুদা?'

আদিত্য আকাশ থেকে ছাদে নেমে এল। অন্যমনস্কভাবে বলল, 'ভয়ের কিছু নেই...।'

ঠিক সেই মুহূর্তে বড়-বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল আদিত্যর গায়ে। আদিত্য অবাক হয়ে দেখল, ওর সাদা পাঞ্জাবিতে ফোঁটাগুলো চিতাবাঘের গায়ের মতো কালো চাকা-চাকা দাগ তৈরি করেছে।

সুনয়না অবাক হয়ে এই অদ্ভুত কালো বৃষ্টির ফোঁটাগুলো দেখছিল, কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ওর হাত ধরে আদিত্য এক হ্যাঁচকা টান মারল। বলল, 'নয়না, জলদি—!'

তারপর ওরা দুজনে ছুটতে শুরু করলে ছাদের সিঁড়ির দিকে।

তখনই চায়ের কাপ দুটো ছিটকে পড়ল ছাদে। ভেঙে গেল ঝনঝন শব্দে।

নিরাপদ আশ্রয়ে এসে আদিত্য টের পেল, ওর গালেও বৃষ্টির দু-একটা ফোঁটা পড়েছে।

ভালো করে হাত-মুখ ধুয়ে আদিত্য পড়াতে বসল নয়নাকে। কিন্তু দুজনের কেউই মন বসাতে পারছিল না। ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ থাকলেও বাইরের বৃষ্টির শব্দ ওরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল।

কলকাতায় বৃষ্টি হচ্ছে। কালো বৃষ্টি। এই প্রথম।

॥ তিন ॥

আদিত্যর সারা মাথা, গা, ধীরে-ধীরে ঢেকে যাচ্ছিল কালো রঙে। কালো চটচটে এক আঠালো তরল, সাপের শরীরের মতো পিছল। ওর মুখ-হাত-পা জ্বালা করছিল। দম বন্ধ হয়ে আসছিল একটু-একটু করে।

ও আকাশের দিকে তাকাল। ধোঁয়াটে আকাশে কালো রঙের সূর্য। কী অদ্ভুত। সূর্যটা ধীরে-ধীরে গলে গিয়ে তরল ফোঁটা টপটপ করে ঝরে পড়ছে আদিত্যর গায়ে।

আদিত্য চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই দূরে মুন্নিকে দেখতে পেল ও। মেয়েটা অবাক চোখে আদিত্যর বিচিত্র চেহারা দেখছে। দেখতে-দেখতে কিশোরীর দু-চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল। আদিত্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। শুয়ে পড়েছিল মেঝেতে। দৌড়ে ওর কাছটিতে এসে মুন্নি ওর ওপরে প্রায় ঝুঁকে পড়ে বিস্ফারিত চোখে ওকে দেখতে লাগল। ডুকরে উঠে- কয়েকবার ডাকল, 'ছোড়দা! ছোড়দা!' তারপর মুখে হাত গুঁজে রক্ত হিম করা চিৎকার করে উঠল। একবার। দুবার। বারবার।

মুন্নির ভয়ঙ্কর চিৎকারে আদিত্যর কানের পরদা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যেতে লাগল।

আর তখনই ঘুমটা ভেঙে গেল আদিত্যর।

এবং সঙ্গে-সঙ্গেই শুনতে পেল কোনও মেয়ের গলায় তীব্র চিৎকার। সে চিৎকারে শোক দুঃখ, আশঙ্কা এবং উলঙ্গ আতঙ্ক মিশে রয়েছে। চিৎকারটা একটানা বেশ কয়েক সেকেন্ড ধরে হওয়ার পর থামল। তারপর আবার শুরু হল। থামল। আবার...।

আদিত্য স্পষ্ট বুঝতে পারল চিৎকারটা আসছে দোতলা থেকে। কিন্তু গলার স্বর কেমন বিকৃত হয়ে পড়ায় চিৎকারের মালিককে ও শনাক্ত করে উঠতে পারছিল না।

গতকালের কথা মনে পড়ল ওর। আর সেইসঙ্গে এইমাত্র দেখা ভোরবেলার স্বপ্নটার কথা।

কাল বৃষ্টি চলেছিল প্রায় একঘণ্টা ধরে। বৃষ্টির শেষে জানলা খুলে রাস্তায় উঁকি মেরেছিল আদিত্য। ধোঁয়াশা কেটে গিয়ে পরিবেশ তখন পরিষ্কার। কিন্তু রাস্তাটা কালো চকচকে হয়ে গেছে, ময়াল সাপের মতো। রাস্তায় লোকজনের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। আদিত্য তার একবর্ণও বুঝতে পারছিল না। কিন্তু ওর মনে হল, এ-আলোচনা সামনে হাজির হওয়া ভোট নিয়ে নয়।

নয়না টিভি চালিয়েছিল। তাতে অনেকক্ষণ ধরে প্রচারিত হল বিশেষ সংবাদ বুলেটিন। বক্তব্যের রকমফের কিছু হয়নি। তবে জনগণকে সাবধান ও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। একজন আবহবিজ্ঞানী ও একজন পরিবেশবিজ্ঞানীর সাক্ষাৎকার

প্রচারিত হল। সেই সাক্ষাৎকারের শেষে আদিত্যর মনে হল, প্রথম সংবাদ বুলেটিন প্রচারিত হওয়ার সময় যতটা জোর দিয়ে সবাইকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলা হয়েছিল, এখন তার অনেকটাই ক্ষয়ে গেছে।

সাক্ষাৎকারে প্রথমে আলোচনা করা হল ধোঁয়াশা নিয়ে। তাঁরা বললেন, পরীক্ষা করে আপাতত যা জানা গেছে তাতে কলকাতার এই ধোঁয়াশা 'ফটোকেমিক্যাল স্মগ' বা আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশা। যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়ায় যে-নাইট্রিক অক্সাইড আর হাইড্রোকার্বন থাকে, সূর্যের আলোর ক্রিয়ায় তা থেকে তৈরি হয় এক জটিল মিশ্রণ। এর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর হল 'প্যান' বা পারঅক্সি-অ্যাসিটাইল নাইট্রেট। এ ছাড়া রয়েছে ওজোন। ওজোন গ্যাস গাছের পাতায় ঢুকে পড়ে প্যালিসেড কোষকে আক্রমণ করে। ফলে ক্লোরোফিল নষ্ট হয়ে যায়, সালোকসংশ্লেষের হার কমে আসে। অবশেষে গাছের পাতায় গাঢ় রঙের ছোপ পড়ে, অথবা পাতার নানা জায়গা বিবর্ণ হয়ে যায়।

আলোচনার শেষ অংশে এল কালো বৃষ্টির কথা। এই বৃষ্টির জল যে ধর্মে আম্লিক, তা প্রাথমিক পরীক্ষাতেই ধরা পড়েছে। ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে এই 'খুনি' বৃষ্টি ঠিক কতটা ক্ষতি করেছে তা এখনও জানা যায়নি। তবে ইওরোপ ও উত্তর আমেরিকায় বহু হ্রদ ও বনাঞ্চলের ক্ষতি করেছে এই বৃষ্টি। সুইডেনের পনেরো হাজার হ্রদের জল এই বৃষ্টিতে আম্লিক হয়ে গেছে। নরওয়েরও প্রায় একই দশা। আমেরিকা আর কানাডাতেও একই ঘটনা লক্ষ করা গেছে।

আদিত্য ও সুনয়না গভীর মনোযোগে শুনছিল ভয়ঙ্কর অম্লবৃষ্টির কথা।

কোনও তরল কী পরিমাণ আম্লিক সেটা নির্ভর করে তার পি-এইচ মানের ওপরে। যেমন বিশুদ্ধ জলের পি-এইচ মান ৭, আর বৃষ্টির জলের পি-এইচ মান ৫.৬ এর নীচে হলেই তাকে অম্লবৃষ্টি বলা হয়। আমেরিকার পূর্ব অঞ্চলে ৪.৬ পি-এইচ মানের অম্লবৃষ্টি হয়েছে। ১৯৭৪-এ বম্বের ট্রম্বে ও চেম্বুরে ৪.৫ ও ৪.৮ পি-এইচ মানের বৃষ্টি হয়েছে। এমনকী দিল্লি, নাগপুর ও পুনেতেও একই ধরনের বৃষ্টির খবর পাওয়া গেছে।

এখন ভারতে কয়লার উৎপাদন প্রায় তিরিশ কোটি টন। এই কয়লার দহনের ফলেই তৈরি হচ্ছে ক্ষতিকর সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রিক অক্সাইড আর নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড। জলীয় বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এ থেকেই তৈরি হয়ে গেছে নানা অ্যাসিড। এই অ্যাসিড-বৃষ্টি মাটি শুষে নিলে রসায়ন ও জীববিদ্যাগত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বহু পরিবর্তন দেখা দিতে পারে।

শুনতে-শুনতে আদিত্যর মাথা টিপটিপ করছিল। আর নয়নার ফরসা মুখ বেশ খানিকটা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। আদিত্য চলে আসার সময় ও বলেছিল, 'দিতুদা, কী হবে বলুন তো শেষ পর্যন্ত?'

আদিত্য একটু আগেই ছাদে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'ভয়ের কিছু নেই—' এখানে

সেই কথাটাই আবার বলতে গিয়ে জিভ জড়িয়ে গেল। কেমন একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে।

ভেজা রাস্তায় পা ফেলে বাড়ি ফেরার সময় সুনয়নার প্রশ্নের উত্তরটাই খুঁজছিল আদিত্য। রাতে শোওয়ার সময়েও প্রশ্নটা ওর মাথা থেকে যায়নি। হয়তো সেইজন্যেই ভোরবেলার দুঃস্বপ্নটা দেখতে হয়েছে ওকে। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, যে-চিৎকারটা ও দোতলা থেকে শুনতে পাচ্ছে সেটা তো আর দুঃস্বপ্ন নয়। বাস্তব।

একটা চরিত্রহীন ভয় ঘিরে ধরল আদিত্যকে। ওর বড়-বড় শ্বাস পড়ছিল। এক ঝটকায় বিছানা ছেড়ে উঠে ও হুড়মুড় করে দৌড়ল সিঁড়ির দিকে। দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে যখন ও দোতলায় পৌঁছল ততক্ষণে চিৎকারটা বুক ভাঙা কান্নার চেহারা নিয়েছে।

দোতলার সিঁড়ির মুখেই পলাশের সঙ্গে দেখা হল আদিত্যর। সবে স্নান সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়েছে। পলাশ রোজই সকাল-সকাল স্নান সেরে নেয়।

আদিত্য জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার, দাদা?'

পলাশের হাতে গামছা। মাথা ঘষছিল সেটা দিয়ে। আদিত্যর প্রশ্নে ঠোঁট ওলটাল।

পলাশকে ডিঙিয়ে আদিত্য ছুটে গেল বড় ঘরের দিকে। সেখানে পৌঁছেই শোকের ঘটনাটা ও দেখতে পেল।

ভক্তদাসের তারের খাঁচাটা দু-হাতে জাপটে ধরে হাউহাউ করে কাঁদছে মা। এই কান্নার সঙ্গে তেরো বছর আগের ভয়ংকর কান্নার কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে। আদিত্যর মনে হল, মায়ের মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে একটা অশরীরী অবয়ব। সে বলছে, 'নিভা, কাঁদছ কেন? এই তো আমি—।' কিন্তু মায়ের কান্না থামছে না। মায়ের বিছানায় রাখা রেডিওতে তখন গানের সুর বাজছে।

মুন্নি, বউদি আর নানকু মা-কে ঘিরে জটলা করে দাঁড়িয়ে ছিল। আদিত্য কাছে যেতেই লতা চাপা গলায় বলল, 'ভক্তদাস হঠাৎ মরে গেছে—।'

এমনসময় পলাশ পিছনে এসে দাঁড়াতেই নানকুর হাত ধরে লতা ওর কাছে চলে গেল। নীচু গলায় কীসব বলতে লাগল।

মুন্নি মা-কে জড়িয়ে ধরে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল। আদিত্য হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ল খাঁচার কাছে। ভালো করে দেখল ভেতরটা। সবুজ পাখিটা নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে তারজালির মেঝেতে। চোখ আধবোজা। যেন ঘুমিয়ে আছে। আর মুখের সামনে খানিকটা রক্ত পড়ে আছে।

কাঁদতে-কাঁদতে মায়ের শীর্ণ শরীরটা হাঁপাচ্ছিল। মুন্নি কিছুতেই মা-কে খাঁচার কাছ থেকে সরাতে পারছিল না। মা ভাঙা গলায় ইনিয়েবিনিয়ে কত কথাই না বলছিল।

আদিত্য এই শোকের কিছুটা বুঝতে পারছিল হয়তো। পাখিটার গায়ে বাবার আদরের ছোঁওয়া লেগে ছিল। ওর অস্তিত্বের মধ্যে পৃথিবী-ছেড়ে-চলে-যাওয়া একটা মানুষের অস্তিত্বের তীব্র স্মৃতি রয়ে গিয়েছিল। মায়ের মন কিছুতেই সেটা হারাতে চাইছিল না। কিন্তু স্নেহ-ভালোবাসার টান সুতোর মতো। নিষ্ঠুর হাতে সুতোটা ছিঁড়ে দিলেই হল।

অনেক চেষ্টার পর মা-কে বিছানায় নিয়ে যেতে পারল মুন্নি। লতা এক গেলাস জল এনে ধরল মায়ের মুখের কাছে। মায়ের শরীরটা হেঁচকি তুলে কেঁপে উঠছিল বারবার। কোনওরকমে দু-চার চুমুক জল খেল।

পলাশ নীচু গলায় আদিত্যকে ডাকল। আদিত্য তাকাল দাদার দিকে। ইশারায় বোঝাল, 'তুমি যেতে পারো, আমি দেখছি—।'

পলাশ নানকুকে নিয়ে চলে গেল। বাচ্চাটা হঠাৎই কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে।

মা-কে স্বাভাবিক হওয়ার সময় দিচ্ছিল আদিত্য। সেই ফাঁকে ও তাকাল টেবিলঘড়ির দিকে। সওয়া সাতটা বাজে। অথচ রোদের দেখা নেই।

বারান্দার খোলা দরজার দিকে দেখল ও। গতকাল বৃষ্টির পর আবহাওয়া পরিষ্কার হয়েছিল। কিন্তু এখন আবার ধোঁয়াশার মেঘ ঘষা কাচের কাজ করছে। তারই মাঝে ভেসে যাচ্ছে গাঢ়তর কুয়াশার রেখা।

খাঁচা ছেড়ে উঠে মায়ের কাছে গেল আদিত্য। মা আর মুন্নির কাছ থেকে টুকরো-টুকরোভাবে যেটুকু জানতে পারল তা হল, সকালবেলা চায়ের পাট সেরে ভক্তদাসকে বারান্দার রেলিঙে রাখতে গেছে মা। আর তখন সতেজ পাখিটা হঠাৎই বারকয়েক ঝাঁকুনি দিয়ে কাত হয়ে পড়ে যায় দাঁড়ের ওপর থেকে। ওর মুখ থেকে খানিকটা কাঁচা রক্ত বেরিয়ে আসে। মা বারবার ডাকলেও সাড়া দেয়নি আর। চোদ্দো বছরের জীবনে দাঁড়ি পড়ে গেছে।

বিছানার পাশেই একটা ছোট তাকে মায়ের নানা ওষুধ। সেখান থেকে মাকে একটা ট্যাবলেট এনে দিল মুন্নি। মা কোনওরকমে সেটা গিলে ফেলল।

গলি থেকে রামুদার গলার আওয়াজ ভেসে এল : '—কালো, জগতের আলো। কলকাতায় কালো বৃষ্টি। কী সৌভাগ্য আমাদের! আকাশ থেকে বিনি পয়সায় আলকাতরা—।'

রামুদা এ-গলির বেশিরভাগ বাড়িতেই খবরের কাগজ দেয়। আর বরাবরই সাইকেল ছুটিয়ে যেতে-যেতে কাগজের হেডলাইনগুলো নিজের মতো করে শুনিয়ে দেয় সবাইকে।

লতা জিগ্যেস করল, 'চা দেব, ছোড়দা?'

আদিত্য বলল, 'না, মুখ ধুইনি—।'

বারান্দায় ধপ করে একটা শব্দ হল। খবরের কাগজটা বারান্দায় ছুড়ে দিয়েছে রামুদা। আদিত্য ভক্তদাসের খাঁচার দিকে একবার দেখল, তারপর দ্রুতপায়ে বারান্দায়

গিয়ে কাগজটা তুলে নিল।

কাগজের প্রথম পাতায় প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে শুধু ধোঁয়াশা আর কালো বৃষ্টির কথা। আর বাকি অংশে ভোট ও রাজনৈতিক আলোচনা। আদিত্য মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগল।

এই ধোঁয়াশা শুধু কলকাতাকে ঘিরেই। তার বাইরে নাকি খুব দ্রুত ফিকে হয়ে গেছে। আর কালো বৃষ্টির ধরনটাও ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের থেকে আলাদা। বিজ্ঞানীরা এখনও এই অদ্ভুত ঘটনার সঠিক কার্যকারণ খুঁজে পাননি। তবে তাঁরা এটুকু জানিয়েছেন, এই পরিবেশ দূষণ মানুষের পক্ষে মারাত্মক নয়। অন্তত এখনও। তবে এই পরিবেশ যদি বজায় থাকে, তা হলে রাজ্যে ভোটগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এ-বিষয়ে উদ্বিগ্ন। নাগরিক নিরাপত্তা পরিষদ এরই মধ্যে মহাকরণ অভিযানের হুমকি দিয়েছে।

এরপরই কয়েকটা দুর্ঘটনার খবরের দিকে নজর গেল আদিত্যর। কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণের সময় একটি যাত্রীবাহী বিমান সামান্য জখম হয়েছে। আবহাওয়ার উন্নতি না হলে আজ থেকে বিমান চলাচল বন্ধ থাকবে। এ ছাড়া কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় বাস, মিনিবাস, স্কুটার ইত্যাদি জড়িয়ে চারটি দুর্ঘটনা হয়েছে।

আদিত্য আকাশের দিকে দেখল। অবস্থা ধীরে-ধীরে কাল বিকেলের মতোই হয়ে উঠেছে। এই ধোঁয়াশা যদি আরও গাঢ় হয়ে ওঠে তা হলে রাস্তাঘাটে গাড়িঘোড়া আর চলতে পারবে না। সে-অবস্থায় মাকে নিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে বেরোনোটা বোধহয় ঠিক হবে না।

এরকম এলোমেলো নজর চালাতে-চালাতেই ওর চোখ গেল মাধবীলতা গাছটার দিকে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই যেন একটা ধাক্কা খেল আদিত্য।

গতকাল সকালেও যে গাছটা সজীব সতেজ ছিল, আজ কেমন যেন শুকিয়ে গেছে। গাছটার সারা শরীরে বিবর্ণ ছোপ। এই গ্রীষ্মেই যেন হেমন্ত এসে গেছে।

আদিত্য ভয় পেল। খবরের কাগজ হাতে ঘরের মধ্যে ঢুকে এল ও।

লতা নেই। মুন্নি তখনও মায়ের কাছে বসে। মা চুপচাপ বসে রয়েছে জানলার দিকে তাকিয়ে। চশমায় আলো পড়েছে। চোখ দেখা যাচ্ছে না। তবে শোকের হিজিবিজি যেন এরই মধ্যে আরও নিষ্ঠুর আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

মুন্নির দিকে খবরের কাগজটা বাড়িয়ে ধরতেই ও উঠে এল কাছে। আদিত্য নীচু গলায় বলল, 'মাধবীলতা গাছটার অবস্থা দেখেছিস?'

মুন্নি অবাক হল না। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ভক্তদাসকে ওই গাছটার গোড়ায় কবর দিয়ে দিস...মা বলছিল...।'

আদিত্য কাগজটা ওর হাতে দিয়ে ঘাড় নাড়ল। ওই গাছটা তেরো বছরের পুরোনো। বাবার অস্থিভস্ম ও নাভি ওই মাটিতে পুঁতে দিয়ে গাছের চারাটা বসানো

হয়েছিল। আদিত্যর মনে হল, কী আশ্চর্যভাবেই না তেরো বছরের ব্যবধানে একটা সবুজ টিয়াপাখির সঙ্গে বাবার একটা স্থায়ী নিকট সম্পর্ক গড়ে উঠল।

আদিত্য গলায় টক স্বাদ টের পেল। সকালে উঠে মুখ ধোওয়া হয়নি, হয়তো সেইজন্যেই। এখনও অনেক কাজ বাকি ঃ মুখ ধোওয়া, চা খাওয়া, বাজার, তারপর অফিস। একদিনের বাজার আগাম করা থাকে বলেই রক্ষে। বউদি হয়তো এতক্ষণে রান্না অনেকটা এগিয়ে নিয়েছে। দাদাকেও তো অফিসে বেরোতে হবে।

ঘর ছেড়ে কলতলায় যাওয়ার আগে বাবার ফটোর কাছে এক মুহূর্ত দাঁড়াল আদিত্য। পেতলের থালায় রাখা আজকের নয়নতারা ফুলগুলো শুকনো শীর্ণ। অথচ ভোরবেলা আহরণের পর এরই মধ্যে ফুলগুলো এরকম শুকিয়ে যাওয়ার কথা নয়।

আদিত্য ভাবল, অফিসে বেরোনোর আগে ছাদে গিয়ে টবের গাছগুলোর অবস্থা একবার দেখবে। ওর মাধবীলতা গাছটার কথা মনে পড়ছিল।

॥ চার ॥

আর দুটো দিন পেরোতে-না-পেরোতেই ছবিটা আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল।

চটচটে কালো বৃষ্টি হল চারবার। ধোঁয়াশা তার খেয়াল-খুশি মতো কলকাতাকে জড়িয়ে ধরতে লাগল।

আদিত্য ছাদে দাঁড়িয়ে ছিল। হাতঘড়ি দেখে বলা যায় এখন সূর্যাস্তের সময়। ধোঁয়াশার জন্য সূর্যকে দেখার কোনও উপায় নেই। শুধু পশ্চিমের আকাশের সামান্য লালচে আভাটুকু আশ্বাস। এই সময় পাখিরা শান্ত আকাশে ছায়াছবি হয়ে ঘরে ফেরে। দু-দিন আগেও এ-দৃশ্য দেখেছে আদিত্য। কিন্তু জানে, আজ আর দেখা যাবে না। কলকাতার পাখিরা বোধহয় আর কখনও ঘরে ফিরবে না। এখানে আর কোনও পাখপাখালি নেই, পোকামাকড়ও বোধহয় আর নেই।

আদিত্য টবের ফুলগাছগুলোর দিকে তাকাল। সব শুকিয়ে মরে গেছে। এখন শুধু অস্থিসার শুকনো কাণ্ডগুলো প্রেতের মতো হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আজও অফিসে বেরিয়েছিল আদিত্য। বেরোনোর আগে ছাদে এসেছিল একবার। ক'দিন ধরে রোজই আসছে। তখনই মরা দুটো চড়ুই পাখি দেখতে পেয়েছিল নয়নতারার টবের পাশে। ঠিক ভক্তদাসের মতোই মৃত। এবং অসহায়।

আদিত্য দুঃখ পায়নি। অবাকও হয়নি। কারণ, গতকাল সন্ধেবেলা নয়নাকে পড়ানোর সময় পরপর দুবার কালো বৃষ্টি হয়েছিল। রাতে বাড়ি ফেরার সময় পথের নানা জায়গায় কয়েকটা বেড়াল কুকুর মরে পড়ে থাকতে দেখেছিল। তখন ধোঁয়াশাটা আবার ঘন হতে শুরু করেছিল।

তারপর আজ সকাল থেকেই পথে বহু কাক, চড়ুই, শালিখ, মুরগি আর পায়রা নজরে পড়েছে ওর। সেই সঙ্গে কয়েকটা বাতাসি পাখি আর চামচিকেও। এ ছাড়া কদাচিৎ দু-একটা বাদুড়, প্যাঁচা, বুলবুলি। নিশ্চল। নিথর। কয়েকটা পাখি রাস্তার মাঝখানেও পড়ে রয়েছে। সেইসঙ্গে কুকুর, বেড়াল, ইঁদুর, ছুঁচো। চারপাশে কেমন একটা চাপা দুর্গন্ধ।

তিনতলার এই খাটো ছাদে দাঁড়ালেও বেশ কয়েকটা ঝুপসি গাছের মাথা দেখা যায়। এখনও দেখা যাচ্ছে, তবে তার প্রায় সব পাতাই ঝলসে শুকিয়ে খসে গেছে।

গত দু-দিনের বাজারের চেহারাটা মনে পড়ল আদিত্যর। তরিতরকারির নামে যা বিক্রি হচ্ছে সেসব যেন তরিতরকারির কঙ্কাল। আর সেগুলোই বিক্রি হচ্ছে আগুন দামে। শুধুই মাছ-মাংস খেয়ে ক'দিন বেঁচে থাকা যায়! এ ছাড়া চাল, ডাল, চিনির জোগান এই দু-দিনেই অবিশ্বাস্যরকম কমে গেছে।

মনোহর ভাণ্ডারে এই নিয়েই সকাল-বিকেল ঝগড়াঝাঁটি হইচই। এই বেসামাল পরিস্থিতিতে সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য ভোট মুলতুবি রাখতে বাধ্য হয়েছে। আর রোজই রেডিও-টিভি আর খবরের কাগজে পরিবেশের অদ্ভুত বিপন্ন অবস্থা নিয়ে নানা তত্ত্ব এবং তথ্য প্রচারিত হচ্ছে।

আদিত্য মনে-মনে খানিকটা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। কাকের ডাকে ঘুম ভাঙে না এমন সকাল কলকাতায় ভাবা যায় না। অথচ তাই হচ্ছে। যে-কর্কশ ডাক নিত্য শুনে-শুনে বিরক্ত লাগত, এখন সেই ডাক শোনার জন্যই আদিত্যর মন কান পেতে আছে। মনে হচ্ছে, একসঙ্গে এক দঙ্গল কাক 'কা-কা' করে ডেকে উঠলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এমনকী কাকের বদলে চড়ুই পাখির কিচিরমিচির হলেও মোটামুটি চলত।

আদিত্য আশপাশে তাকাল। অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে। সবুজ নেই। পাখিরাও আর নেই। ও ধীরে-ধীরে নেমে এল ছাদ থেকে।

দোতলায় নামতেই নানকুর গলা পেল। পড়ছে। বউদি পড়াচ্ছে। দাদা এখনও অফিস থেকে ফেরেনি। চাকরি ছাড়াও পলাশ টুকটাক অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করে। বিভিন্ন কোম্পানিতে অফিস স্টেশনারি—প্যাড, পেন, পেনসিল এইসব—সাপ্লাই করে। হয়তো সেইজন্যই দেরি হচ্ছে ফিরতে। আজ রাস্তাঘাটের যা অবস্থা তাতে দেরি হওয়াটা তেমন অস্বাভাবিক নয়।

মায়ের ঘরে গেল আদিত্য। ঘরে টিউব লাইট জ্বলছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা ঘোলাটে ভাব রয়ে গেছে। মা বিছানায় বসে চোখ বুজে রয়েছে। ঠাকুরের নাম করছে, অথবা বাবার স্মৃতি রোমন্থন করছে। আদিত্য মা-কে ভালো করে দেখল। বাদামি-কালো-হলুদ ছাপের বেডকভারের ওপরে শাড়ি পরা মায়ের শরীর বেশ স্পষ্ট। থুতনিটা সামান্য তুলে শিরদাঁড়া টানটান করে বসে আছে। অনেকটা ক্ষুদিরামের মূর্তির মতো।

গলার শিরা ফুলে রয়েছে।

বাবার ফটোর সামনে ধূপ জ্বলছে। সামনের পেতলের থালা খালি। সকালেও খালি ছিল। টবে ফুল ফোটেনি। পুষ্পহীন এই আরাধনা কতদিন চলবে কে জানে!

মা হঠাৎই কাশল। বেশ কয়েকবার। চোখ খুলে তাকাল। আদিত্য সামনের একটা চেয়ারে বসে পড়ল। ছোট টেবিলে রাখা ভাঁজ করা খবরের কাগজটা তুলে নিল হাতে। এমনসময় মা বলল, 'দিতু, আমার খুব ভালো ঠেকছে না—।'

আদিত্য তাকাল মায়ের দিকে ঃ 'কী?'

'এইসব—বৃষ্টি—ধোঁয়া—' মা বারান্দার খোলা দরজার দিকে ইশারা করল।

আদিত্য ঘাড় নাড়ল। বলল, 'দেখি কী হয়। সবাই তো বলছে ঠিক হয়ে যাবে—।'

খবরের কাগজে নানা জন এই ঘটনার নানা কারণ খুঁজে বেড়িয়েছে। কেউ বলেছে, পনেরো বছর আগের উপসাগরীয় যুদ্ধ এর জন্য দায়ী। কেউ বা রাশিয়া-আমেরিকার সাম্প্রতিক পারমাণবিক যুদ্ধকে এর জন্য দায়ী করেছে। মরিয়া হয়ে এ ওর ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছে। শুরু হয়ে গেছে কাদা ছোড়াছুড়ি।

মুন্নিকে ঘরে দেখতে পায়নি আদিত্য। হয়তো কোথাও গেছে। অন্য সময় হলে এই না-থাকাটা তেমন অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু আদিত্য জিগ্যেস না করে পারল না, 'মুন্নি কোথায় গেছে?'

মা জোরে শ্বাস নিচ্ছিল। বলল, 'অতসীদের বাড়ি গেছে।'

অতসীরা কাছাকাছি থাকে। মুন্নির সঙ্গে পড়ে। মুন্নি খুব একটা বেরোয় না রাস্তায়। কখনও গেলে অতসীদের বাড়ি যায়। ওখান থেকে রজতদের বাড়িটা অনেক কাছে দেখা যায়।

মা বিছানা ছেড়ে উঠে বারান্দার দরজা দুটো ভেজিয়ে দিল। আদিত্য কিছু বলল না। ওর তেতো হাসি পেল। দরজা বন্ধ করে বাতাসের বিষকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। মানুষের ফুসফুসে পৌঁছেই বিষের বিশ্রাম—তার আগে নয়।

টিভির সুইচটা অন করে দিল মা।

সরকারি চ্যানেলে সেই একই ব্যাপার। ধোঁয়াশা ও বৃষ্টি মারফত দূষণের মাত্রা কতখানি হতে পারে তার হিসেবনিকেশের চেষ্টা এখনও চলেছে। আর সেইসঙ্গে আগমার্কা অভয়বাণী ঃ মানুষের ভয়ের কিছু নেই।

সেটা শুনতে-শুনতে মৃতদেহের দুর্গন্ধ নাকে এল আদিত্যর। ওদের বাড়ির ভেতরের দিকের কার্নিশে দুটো পায়রা জোড় বেঁধেছিল। ডিমও পেড়েছিল দুটো। কিন্তু গতকাল আদিত্য দেখেছে মা-পায়রাটা কাত হয়ে পড়ে আছে। আর অন্য পায়রাটা নেই। হয়তো খাবারের সন্ধানে গিয়ে আর ফিরে আসতে পারেনি। অজাত পায়রা-শিশু দুটো থেকে গেল ডিমের আবরণের মধ্যেই।

আদিত্য খবরের কাগজটা রেখে দিল টেবিলে। উঠে গিয়ে টিভির পরদার চ্যানেল সিলেক্টর জেনে আঙুল ছোঁয়াল। সঙ্গে-সঙ্গে চ্যানেল নম্বর ফুটে উঠল পরদার মাথায় ডানদিকের কোণে। পাঁচ নম্বর ফুটে উঠতেই আঙুল সরিয়ে নিল আদিত্য। এটা প্রাইভেট চ্যানেল। সবসময় সরকারি খবরের ওপরে আস্থা রাখা যায় না। তিন-তিনটে প্রাইভেট চ্যানেল চালু হওয়ার পর সরকারি খবরগুলো বাধ্য হয়ে অনেক বেশি বাস্তবসম্মত হয়েছে। তবে প্রাইভেট চ্যানেলের খবরের ঢং এখনও অনেক আকর্ষণীয়।

চেয়ারে ফিরে এসে বসল আদিত্য। দেখতে লাগল।

পরদায় গড়িয়াহাট অঞ্চল দেখানো হচ্ছিল। আকাশছোঁয়া বাড়িগুলো ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় ঢাকা। সেখান থেকে ক্যামেরা নেমে এল রাস্তায়। দেখা গেল তুমুল হইচই হট্টগোল। তারই মধ্যে ইনসেট হয়ে ফুটে উঠল সংবাদ-পাঠিকার মুখ। তাঁর কথায় ও ছবিতে জানা গেল, দক্ষিণ কলকাতায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পেট্রলের দাম ছাব্বিশ টাকা লিটার থেকে চল্লিশ টাকায় পৌঁছে গেছে। আর ডিজেলের দাম সাড়ে আট থেকে পনেরোয়। অনেক মানুষই শহর ছেড়ে চলে যেতে চাইছে। এই টালমাটাল অবস্থায় একটু আগেই এক ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। একটা পেট্রল ট্যাঙ্কারের সঙ্গে একটা প্রাইভেট বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ট্যাঙ্কারটিতে আগুন ধরে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটে। বাইশজন এই দুর্ঘটনায় নিহত হয়। এছাড়া আরও—।

হঠাৎই বউদির চিৎকার শুনতে পেল আদিত্য ঃ 'ছোড়দা। ছোড়দা। শিগগিরই এসো।'

আদিত্য চেয়ার ছেড়ে ছুটল। তখনই টের পেল ওর চোখ জ্বালা করছে।

মা পিছন থেকে ডেকে উঠল, 'কী হল, লতা? কী হল?'

সিঁড়ির কাছে এসেই পলাশকে দেখতে পেল আদিত্য। ফিকে গোলাপি আর লালে ছাপা বুশ-শার্ট। একটু খেয়াল করতেই বুঝল, লালটা রং নয়—রক্ত।

পলাশের বাঁ-গালটা ফুলে রয়েছে। ডানভুরুর ওপরটা ফেটে গেছে। নাকের কাছটায় রক্তে মাখামাখি। সেখান থেকেই হয়তো রক্ত গড়িয়ে পড়েছে জামার বুকে।

আধবোজা চোখে পলাশ টলছিল। আদিত্য ওকে ধরে ফেলল। পলাশ যন্ত্রণায় ডুকরে উঠল।

বউদি এবার কাঁদতে শুরু করে দিল। নানকু কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছিল ওর মায়ের পিছনে। মাকে কাঁদতে দেখে বাচ্চাটাও কান্না জুড়ে দিল।

'পলাশ। এ কী অবস্থা হয়েছে তোর!'

মায়ের গলা চিনতে পারল আদিত্য।

পলাশকে জাপটে ধরে ঘরে নিয়ে গেল ও। লতাকে বলল, 'বউদি, একটা গামছা জলে ভিজিয়ে নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি—।'

আদিত্য পলাশকে শুইয়ে দিল বিছানায়।

'আঃ—' বলে চোখ বুজল পলাশ।

আদিত্য দাদাকে দেখছিল। ছোটবেলা থেকেই খুব নিরীহ। কখনও মারপিট করেনি। কারও সঙ্গে ঝগড়াও যখন করেছে তাও তেমন উগ্র হয়নি কখনও। একটু অন্যমনস্ক, আত্মভোলা। বউদি আর মা-কে খুব মানে। এই ভালোছেলেটাকে কে মারল? কারা মারল?

কখন যেন নানকু এসে আদিত্যর পাজামা খামচে ধরেছে।

'কাকুমণি, বাপির কী হয়েছে?' জিগ্যেস করল ছেলেটা। বাবাকে খুব ভালোবাসে। বাবার কোলেপিঠে চড়ে সবসময় বেড়াতে যায়।

আদিত্য পলাশের নাকের কাছে হাত রাখল। নিশ্বাস পড়ছে ধীরে।

লতা আর মা একইসঙ্গে ঘরে এল। দ্রুতহাতে শুরু করল পলাশের যত্ন। আদিত্য ওদের দেখছিল, তবে মনোযোগ ছিল না। ওর ছোটবেলার কথা মনে পড়ছিল। ফুটবল নিয়ে হাত ধরাধরি করে দেশবন্ধু পার্কে খেলতে যাওয়ার কথা। শীতের দুপুরে সল্টলেকের মাঠে টেনিস বলে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। বৃষ্টির মধ্যে পেটে বইখাতা গুঁজে ভিজতে-ভিজতে বাড়ি ফেরা। বাবাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময়ে খাটিয়ায় আগে-পিছে কাঁধ দেওয়া। তারপর 'বলো হরি, হরিবোল...।'

আদিত্যর যখন খেয়াল হল, তখন পলাশ বিড়বিড় করে কথা বলছে। কথা বলছে একটানা। কিন্তু আদিত্যর কানে কিছুই ঢুকছিল না। ও বলল, 'বউদি, আমি ডক্টর মণ্ডলকে ডেকে নিয়ে আসছি।'

একটা অ্যান্টিসেপটিক স্প্রে নিয়ে পলাশের কাটা জায়গাগুলোয় স্প্রে করছিল লতা। আদিত্যর দিকে ফিরে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল। নানকু তখন খাটের ওপর মাথা তুলে পলাশকে দেখতে চেষ্টা করছে, আর একনাগাড়ে 'বাপি, বাপি—' করে চলেছে।

আদিত্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। ওর চোখে সবকিছু কেমন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল।

বাড়ি থেকে বেরোতে-না-বেরোতেই লোডশেডিং। ভীষণ অবাক হয়ে গেল আদিত্য। কারণ, গত পাঁচবছরে বিদ্যুতের জোগান সবসময়েই চাহিদার প্রায় দ্বিগুণ থেকেছে। অবশ্য বৈদ্যুতিক ফল্ট থেকে যে বিদ্যুৎ সরবরাহ কচ্চিৎ কখনও বন্ধ হয়নি তা নয়। এটাও হয়তো সেইরকমই কিছু। কিন্তু আদিত্যর মন যেন সায় দিচ্ছিল না কিছুতেই। গত ক'দিনের আবহাওয়া ওকে খারাপটাই ক্রমশ ভাবতে শেখাচ্ছিল।

রাস্তার চেহারাটা ভারী অদ্ভুত। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে গেছে পাড়াটা। কিন্তু

এক অলৌকিক ঘষা আলো ছড়িয়ে রয়েছে। বোঝা যায়, আকাশে কোথাও একটা চাঁদ রয়েছে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকে চাপা দিল আদিত্য। বীভৎস দুর্গন্ধ। রাস্তায় পড়ে থেকে-থেকে পশুপাখির মৃতদেহগুলো পচতে শুরু করেছে। পথ চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। হোঁচট খাচ্ছিল বারবার। ধাক্কাও লাগল কয়েকটা কালো ছায়ার সঙ্গে। কিন্তু কষ্ট করে মোড়ের মাথায় পৌঁছতেই চায়ের দোকানের মোমবাতির আলো আদিত্যকে খানিকটা স্বস্তি দিল। শ্যামাপোকার মতো সেই আলোর দিকে এগিয়ে গেল ও। ভেসে বেড়ানো ধোঁয়াশার মধ্যে অনেকগুলো অস্পষ্ট অবয়ব দেখতে পেল। সেইসঙ্গে শুনতে পেল কলরব আর রেডিয়োর সংবাদ বুলেটিনের টুকরো।

জটলার মধ্যে মহাদেবদার বাবাকে দেখতে পেল আদিত্য। একটা বেঞ্চে বসে টেবিলে মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়েছেন।

আদিত্য অস্বস্তি পাচ্ছিল। সুনয়নাকে টিউশানির কথা বলতে ভুলে গেছে। কিন্তু বৃদ্ধই হাসিমুখে ডাকলেন ওকে, 'দিতু, তোমাকে যে ওই টিউশানির কথাটা বলেছিলাম—এখন আর কিছু ঠিক কোরো না। দেখছ তো এই গোলমাল। সব মিটে যাক, তারপর দেখা যাবে।' একটু থেমে আবার বললেন, 'ভাগ্যিস মহাদেবরা আমেরিকায় রয়েছে। নইলে এ অবস্থায় কলকাতায় কী করে থাকত ওরা। আর বাচ্চাটারই বা কী অবস্থা হত!'

বৃদ্ধের মুখমণ্ডলে এক ধরনের স্বস্তির আভা। ছেলের দেশে দূষণ নেই। সেখানে কালো বৃষ্টি নেই। অথচ আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশার শুরু আমেরিকাতেই।

খবরে নানা দুর্ঘটনার কথা বলছিল। শঙ্করবাবু জিগ্যেস করলেন, 'তুমি কোথায় চললে এই অন্ধকারে?'

'ডক্টর মণ্ডলের চেম্বারে—।'

পিছন থেকে বয়স্ক কেউ বলে উঠলেন, 'ডাক্তার কাল তল্পিতল্পা নিয়ে তার দেশ মেমারিতে পালিয়েছে। বলেছে, এখানে থাকলে কেউ বাঁচবে না।'

আর একজন কে যেন বলল, 'এখন তো সবে কুকুর-বেড়াল-গরু-ছাগল মরছে। এর পরে কী হবে কে জানে!'

'এদিকে সরকার স্রেফ অভয়বাণী দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে আছে।'

আদিত্যর কেমন মাথা ঝিমঝিম করছিল। কে কোন কথা বলছে সেটা ওর মগজে ঢুকছিল না। শুধু টুকরো-টুকরো কথাগুলো কানে আসছে।

'কেন, সরকার কী করবে? তালপাতার পাখা দিয়ে ধোঁয়া তাড়িয়ে দেবে? দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের কোনও দায়িত্ব নেই? একে তো ইলেকশান গেল ভেস্তে।'

'ইলেকশান কেন, সবই ভেস্তে যাবে। আর দু-দিন যেতে দাও, দ্যাখো না কী হাল দাঁড়ায়।'

'আমি আর একটা দিন দেখব—।'

আদিত্য 'আসি' বলে মোমের আলোর বৃত্ত ছেড়ে বেরিয়ে এল। শেষ শোনা কথাটা ক্রমাগতই ওর মাথার ভেতরে বাজছিল। ও একরকম ধোঁয়াশা হাতড়েই ফিরে এল বাড়িতে।

চেনা সিঁড়ি বেয়ে অনুমানে ভর করে দোতলায় উঠতে খুব একটা অসুবিধে হল না ওর। দাদার ঘর থেকে রিচার্জেবল ইমারজেন্সি ল্যাম্পের মলিন আলো বারান্দায় এসে পড়েছে।

মুন্নির গলা শুনতে পেল। অতসীদের বাড়ি থেকে এর মধ্যেই ফিরে এসেছে।

আদিত্য দাদার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

পলাশ খাটে হেলান দিয়ে বসে আছে। চোখ বোজা, হাতে হরলিক্সের গেলাস। ধীরে-ধীরে চুমুক দিচ্ছে। ডানভুরু আর নাকের কাছে সাদা প্লাস্টিকের মতো কী লাগানো। বউদি বোধহয় ইনস্ট্যাহিলার স্প্রে করে দিয়েছে। ইমারজেন্সি ল্যাম্পের সাদা আলোয় পলাশের ফরসা মুখ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

আদিত্য ঘরে ঢুকতেই তিনজোড়া চোখ তাকাল ওর দিকে। মা, লতা আর মুন্নি। আদিত্য মাথা নাড়ল। বলল, 'ডাক্তারবাবু নেই—কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে।'

আদিত্যর কথায় পলাশ চোখ খুলে তাকাল। বলল, 'বুকের ভেতরটায় খুব কষ্ট হচ্ছে—।'

পলাশের দুর্বল মিনমিনে স্বর ওদের আলোছায়াময় মুখে ভয়ের রেখা ফুটিয়ে তুলল।

আদিত্য চাপা গলায় লতাকে জিগ্যেস করল, 'কী করে এমন হল, বউদি?'

'ও যে-বাসে করে ফিরছিল সেটা ধোঁয়ায় দিশেহারা হয়ে একটা মিনিবাসকে প্রায় মুখোমুখি ধাক্কা মেরেছে। দুজন স্পটেই মারা গেছে। ও বোধহয় কিছুক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিল। তারপর জ্ঞান ফিরতে হাতড়ে-হাতড়ে কিছুটা এগিয়ে একটা গাড়ি থামাতে পেরেছে। ওর অবস্থা দেখে সেই গাড়ির মালিক দয়া করে এ-গলির মোড়ে পৌঁছে দিয়েছে—।'

লতার চেহারা ভারীর দিকে। মুখও গোলগাল। ফলে অভিব্যক্তি ভালো ফোটে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বউদির মুখে নগ্ন আতঙ্কের অরাজকতা লক্ষ করল আদিত্য। কথা শেষ হতে-না-হতেই সবার মনের প্রশ্নটা উচ্চারণ করল মা, 'দিতু, এখন তা হলে ডাক্তারের কী হবে?'

আদিত্য হালকা গলায় কথা বলে আশ্বস্ত করতে চাইল সবাইকে : 'মা, তুমি শুধু-শুধু চিন্তা করছ। আমি এক্ষুনি বেরোচ্ছি। খালের ওপার থেকে শ্যামল ডাক্তারকে নিয়ে আসতে পারি কি না দেখছি। তোমরা যদি দেরি দেখে চিন্তা করো, তাই খবরটা দিয়ে গেলাম।'

পলাশ হরলিক্স খাওয়া শেষ করেছিল। নানকু ওর পাশে গা ঘেঁষে বসে আছে। হাঁ করে কৌতূহলী চোখে বাবার মুখের ক্ষতচিহ্নগুলো দেখছে। পলাশ বিড়বিড় করে বলল, 'আসলে বুকের কাছটায় কীসের যেন ধাক্কা লেগেছিল...খুব জোরে...।'

আদিত্য পলাশের কাছে এগিয়ে গেল। ওর বুকে হাত বোলাল।

পলাশ যন্ত্রণায় চাপা চিৎকার করে উঠল, 'উঃ! লাগছে।'

আদিত্য হাত সরিয়ে নিল। কতদিন...কত বছর পরে দাদার বুকে হাত রাখল ও!

নানকু ওর জামা ধরে টান মেরে বলল, 'ও কাকুমণি, বাপিকে জলদি সারিয়ে দাও না।'

আদিত্য বাচ্চাটার গোলগাল মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করল। তারপর মজা করে বলল, 'অ্যাই, তোর চোখগুলো অমন গোলগোল কেন রে?'

নানকু সহজ গলায় জবাব দিল, 'আমি তো প্যাঁচা। মা বলেছে আমাকে প্যাঁচার মতো দেখতে।'

আদিত্য ওর মাথায় আলতো করে একটা চাঁটি মেরে বিছানা থেকে টর্চটা তুলে নিল, দরজার দিকে পা বাড়াল। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে-আসতে বলল, 'তোমরা ভেব না, আমি ঝট করে ডাক্তার নিয়ে আসছি।'

মা একটা মোমবাতি জ্বেলে নিজের ঘরের দিকে এগোচ্ছিল। মোমের আলোয় আদিত্য দেখতে পেল মায়ের ঠোঁট নড়ছে। হয়তো ঈশ্বরের কাছে ছেলের আরোগ্য কামনা করছে।

হঠাৎই বাবার কথা মনে পড়ে গেল আদিত্যর।

॥ পাঁচ ॥

রাস্তায় পা দিয়েই আদিত্য কেমন ভয় পেয়ে গেল।

লোডশেডিং-এর অন্ধকার আর চোখ-জ্বালা-করা গাঢ় ধোঁয়াশা মিলেমিশে এক বিচিত্র শত্রু হয়ে উঠেছে।

আদিত্যর চোখ খুব একটা কাজ করছিল না। ও হাতের টর্চটা জ্বেলে এপাশ-ওপাশ ঘোরালো। যেসব বস্তু চোখে পড়ল তাতে পরিস্থিতির ছবিটা আরও কুৎসিত মনে হল।

গলির একপাশে জঞ্জালের স্তূপ। সেখানে দুটো বেড়াল আর একটা কুকুর চোখে পড়ল আদিত্যর। এর মধ্যেই ফুলে উঠেছে, তার ওপর এখানে সেখানে ঠোকরানো।

আদিত্যর গা গুলিয়ে উঠল। পাক দেওয়া দুর্গন্ধের সঙ্গে একটা তীব্র ঝাঁঝ মেশানো বলে মনে হল। চোখ ভীষণ জ্বালা করছিল : জ্বালা কমাতে বারবার চোখের পাতা ফেলছিল।

অন্ধকারে ভূতের মতো খানিকক্ষণ পথ চলার পর আদিত্য আর পারল না। এতক্ষণ ধরে বুকে জমাট বেঁধে থাকা ভয়টা ওর পা দুটো অসাড় করে দিতে চাইল। এই অবস্থায় ও মুচিবাজারে গিয়ে শ্যামল ডাক্তারকে ঠিকমতো ডেকে নিয়ে আসতে পারবে তো!

এইরকম একটা দ্বিধা আর সংশয়ের টানাপোড়েনের মধ্যে হঠাৎ করেই যেন নয়নার কথা মনে পড়ে গেল। ওই মেয়েটার যা সাহস আছে আদিত্যর বোধহয় তা নেই। এখন আদিত্য ওকে ডাকতে গেলে ও হয়তো ঠাট্টা করবে। গব্বর সি-এর ডায়ালগটা আবার শুনিয়ে দেবে : জো ডর গয়া, সমঝো কে মর গয়া।

কিন্তু কোনও উপায় নেই। নয়না ঠাট্টা করে করুক। নয়নার ঠাট্টা আদিত্য সহ্য করতে পারবে। এই ভয়ঙ্কর পরিবেশে ওই ছটফটে ফাজিল মেয়েটা পাশে থাকলে আদিত্য সত্যি অনেকটা ভরসা পাবে।

সুতরাং কিছুটা মন্ত্রমুগ্ধের মতো সুনয়নাদের বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল আদিত্য। কলিংবেলের বোতামে হাত রাখার পর খেয়াল হল লোডশেডিং। কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে কলিংবেল টুংটাং শব্দে বেজে উঠল। তখনই আদিত্যর মনে পড়ল, সুনয়নাদের বাড়িতে মিনি জেনারেটার আছে।

দরজা খুলল নয়না নিজেই। বসবার ঘরে টিমটিম করে একটা বাল্‌ব জ্বলছে। আলোটা পিছনদিকে থাকায় ওকে ছায়াছবির মতো দেখাল। আদিত্য পরপর কয়েকবার চোখের পাতা ফেলল। চোখ জ্বালা করছিল। কিন্তু সবকিছু উপেক্ষা করে ও নয়নাকে দেখতে চাইল। খেয়াল ছিল না, হাতের টর্চটা তখনও জ্বলছে।

'এ কী! দিতুদা!'

মেয়েটার বিস্ময় মেশানো স্বরে কোথায় যেন সামান্য ভালো লাগা জড়িয়ে ছিল।

আদিত্য একটু ইতস্তত করে বলল, 'নয়না, আমার সঙ্গে একটু মুচিবাজার যাবে? খুব ঝামেলায় পড়ে গেছি। ডাক্তার ডাকতে হবে। দাদা...দাদার একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।'

মেয়েটা সত্যিই আশ্চর্য। একটি কথাও জিগ্যেস করল না। শুধু ছোট্ট করে বলল, 'একসেকেন্ড দাঁড়াও—মা-কে বলে আসি।'

এক সেকেন্ড নয়, ফিরে আসতে দশসেকেন্ড মতো সময় নিল সুনয়না। সদর দরজাটা টেনে লক করে দিয়ে আদিত্যর পাশাপাশি রাস্তায় নেমে এল। ওর চলার সঙ্গে দিব্যি তাল মিলিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে, দিতুদা? বড়দার কোথায় অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে?'

আদিত্য টর্চের আলোর দিকে চোখ রেখে বলল, 'দাদা বাড়িতে শুয়ে আছে। ডক্টর মণ্ডল শুনলাম কলকাতার বাড়ি ছেড়ে দেশের বাড়িতে পালিয়েছে। তাই মুচিবাজারের কাছ থেকে শ্যামল ডাক্তার—মানে ডক্টর দাসকে ডেকে আনতে যাচ্ছি।'

পথ চলতে-চলতে পলাশের ব্যাপারটা খুলে বলল আদিত্য। তারপর খানিকটা অনিশ্চিত গলায় বলল, 'এই ধোঁয়াশার জন্যে খালের ওপারে যেতে আমার কেমন ভয়-ভয় করছিল। তাই ভাবলাম, তোমাকে...মানে...মাসিমা তোমাকে কিছু বললেন?'

নয়না এইবার হেসে ফেলল : 'আপনাকে এখন থেকে দিতুদা নয়, ভিতুদ' বলে ডাকব।'

আদিত্য বিব্রত হল।

ওরা হাঁটতে-হাঁটতে অরবিন্দ সেতুর ওপরে উঠে পড়েছে। এখানে লোডশেডিং হয়নি। ব্রিজের দুপাশের ফুটপাথে লাইটপোস্টে সোডিয়াম ল্যাম্প জ্বলছে। তবে ধোঁয়াশা তাদের যাবতীয় ছটা শুষে নিয়েছে। রাস্তা থেকে যেটুকু চোখে পড়ে তা বাতির কঙ্কাল। গাঢ় মেঘলা আকাশের আড়ালে সূর্যকে যেমন দেখায়।

আদিত্য নয়নার হাত ধরে আলতো করে টেনে বলল, 'রাস্তা দিয়ে এসো। ফুটপাথে অনেক গর্ত আছে—কখন হোঁচট খাবে।'

ওরা ফুটপাতের পাশ ঘেঁষে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। কয়েকটা গাড়ি ধীরে ধীরে ওদের পার হয়ে গেল। গাড়ির হর্নের শব্দে কানে প্রায় তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়। কিন্তু গাড়ির ড্রাইভারদের আর দোষ কী! চোখে ঠিকমতো দেখতে না পেলে হর্নই ভরসা।

'আমি ভীষণ ভিতু হয়ে গেছি, নয়না।'

আদিত্যর স্বর কেমন মিনমিনে শোনাল। ওর কপাল ঘামছিল।

'কেন? চারপাশে এইরকম অবস্থা বলে?' নয়না চিবুক তুলে আদিত্যর ঝাপসা মুখের দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ। দেখছ না, একে-একে সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছ না কুকুর, বেড়াল, শালিখ, চড়ুইয়ের পর কাদের পালা?'

চারপাশের ঘোলাটে আঁধারের দিকে তাকিয়ে আচমকা নানকুর কথাটা মনে পড়ে গেল আদিত্যর : আমি তো প্যাঁচা। এই আঁধারে স্পষ্ট দেখতে হলে এখন শুধু নানকু কেন, সবাইকেই প্যাঁচা হয়ে যেতে হবে।

নয়না আদিত্যকে কয়েকপলক দেখল। তারপর আদিত্যর আঙুলের ওপরে ওর মুঠো আরও শক্ত হল।

আদিত্য বলল, 'কখন আমাদের পালা আসবে কে জানে!...মৃত্যু ভারী অদ্ভুত, নয়না। মৃত্যুর দরজা হাট করে খোলা থাকলেও সেই দরজা দিয়ে যেতে আমাদের

কষ্ট হয়...আমারও হবে।'

'দিতুদা!'

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা সংঘর্ষের শব্দ কানে এল।

দুর্ঘটনাটা ঠিক কোথায় ঘটল কে জানে। তবে শব্দ শুনে মনে হল, ওদের সামনে বেশ খানিকটা দূরে ধোঁয়াশার আড়ালে একটা ছোটমাপের দুর্ঘটনা ঘটেছে।

দু-চারজন লোকের চিৎকার শোনা গেল। আদিত্যরা যতই এগোচ্ছিল শব্দগুলো ততই জোরালো হচ্ছিল। গালিগালাজ কানে আসছিল। দু-একটা গাড়ি অধৈর্যভাবে হর্ন দিচ্ছিল।

আরও কাছে যেতে ব্যাপারটা স্পষ্ট হল। একটা অটোরিকশা একটা স্কুটারকে ধাক্কা মেরেছে। কালো-কালো ছায়ার মতো মানুষজন জড়ো হয়েছে সেখানে। তুমুল চেঁচামেচি চলছে।

ওরা দুজনে তাড়াতাড়ি হেঁটে জায়গাটা পেরিয়ে গেল। নয়না একবার হোঁচট খেয়ে 'উঃ!' করে উঠল। আদিত্য ওকে সামলে নিল।

অরবিন্দ সেতুর ঢাল বেয়ে নামতে-নামতে ওরা কয়েকটা ফ্লুওরেসেন্ট আলো দেখতে পেল। আদিত্য জানে, ব্রিজের মুখেই একটা বড়সড় মিষ্টির দোকান আছে ঃ পরেশ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। ওগুলো সেই দোকানেরই আলো। দোকানটার পাশ ঘেঁষে পাঁচমিনিট এগোলেই শ্যামল দাসের চেম্বার।

মিষ্টির দোকানের কাছে পৌঁছনোমাত্রই মাইকের বক্তৃতা ওদের কানে এসে ধাক্কা মারল। এতক্ষণ অন্যমনস্ক থাকায় বক্তৃতার রেশ ওরা খেয়াল করেনি।

'...আজ আমাদের সকলের সামনে একটাই প্রশ্ন—বাঁচার প্রশ্ন। বন্ধুগণ, আপনারা কি জানেন গত দশবছরে কলকাতা শহর আর তার আশেপাশে গাড়ির সংখ্যা কী হারে বেড়েছে? দশবছরে, সবরকমের গাড়ি মিলিয়ে, মোট বৃদ্ধির হার প্রায় চোদ্দো গুণ। তার ওপরে রয়েছে বেপরোয়া শিল্পায়ন। সরকার এসব ঘটনার সমর্থনে বলেছেন, বেকার সমস্যার চটজলদি সমাধানে এই শিল্পায়ন জরুরি ছিল। এ ছাড়া গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি মানেও তো আরও মানুষের আরও চাকরির সুযোগ। সুতরাং, বেকার সমস্যার দ্রুত সমাধান হচ্ছেই। মাননীয় নেতাগণ, শুধু আমরা—মানে, ছাপোষা সাধারণ মানুষরা—যারা আপনাদের মতো নেতাদের ভোট দিয়ে মসনদে পাঠিয়েছি, আমরা বুঝতে পারিনি যে, আপনারা বেকার সমস্যার সঙ্গে-সঙ্গে জনসংখ্যার সমস্যাটাও চটজলদি সমাধান করার চেষ্টা করছেন। আজ পথেঘাটে কুকুর-বেড়াল মরছে, কাল আমরাও কুকুর-বেড়ালের মতো মরব। দেশে আর একটিও বেকার থাকবে না—সব খতম হয়ে যাবে, আর একইসঙ্গে মহামান্য সরকার বেকার সমস্যার সমাধান করে দেবেন।

'বন্ধুগণ, এইরকম পরিস্থিতিতে কীসের নির্বাচন। আগে ভোটাররা বাঁচুক, তারপর তো ভোট...।'

মিটিং ঘিরে বেশ ভালোরকমই ভিড় জমেছে। জ্বালাময়ী ভাষণ শুনতে-শুনতে আদিত্য জটলা পেরিয়ে গেল।

সুনয়না বলল, 'দেখবেন, ইলেকশান হবে না।'

আদিত্য একটু আনমনা ছিল। নয়নার কথার কোনও জবাব দিল না। ও কল্পনায় একটা থার্মোমিটার দেখতে পাচ্ছিল। তার পারদ ক্রমাগত চড়ছে। শেষ পর্যন্ত কী হবে কে জানে!

মুচিবাজারের পাশ দিয়ে একটা সরু গলি ঢুকে গেছে ভিতরে। গলিটা অন্ধকার। এদিকটায় বোধহয় লোডশেডিং হয়েছে। আদিত্য টর্চ জ্বালল। নয়নার হাতটা ধরল মুঠো করে।

'ডক্টর দাসের চেম্বারটা কত দূরে?' নয়না জিগ্যেস করল।

আদিত্য অন্ধকারে সতর্কভাবে পা ফেলতে-ফেলতে বলল, 'এই তো, এসে গেছি।'

আর মিনিটখানেক হাঁটতেই ওরা ডক্টর দাসের চেম্বারে পৌঁছে গেল।

অন্ধকারে বাড়িটার আদল ঠিক বোঝা যায় না। তার ডান দিকে একটা ফাঁকা জায়গা—অনেকটা মাঠ মতন। তার একপাশে একটা পুকুর। গোটা জায়গাটার ওপরে কেমন এক ভূতুড়ে ঘোলাটে আলো ছড়িয়ে রয়েছে।

ডক্টর দাসের চেম্বারে ইমারজেন্সি ল্যাম্প জ্বলছে। সেখানে চেয়ারে-বেঞ্চিতে বসে আবছায়ার মতো অনেক মানুষ। বাইরের ফাটল ধরা উঁচু রোয়াকে ইমার্জেন্সি ল্যাম্পের সাদা আলো ছিটকে এসেছে।

নয়নাকে রোয়াকের কাছটায় দাঁড়াতে বলল আদিত্য। তারপর দু-ধাপ সিঁড়ি উঠে ঢুকে গেল চেম্বারের ভেতরে।

সুনয়না এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে অন্ধকার দেখল। ওর চোখ জ্বালা করছিল, আর মাথার ভেতরে একটু আগে শোনা বক্তৃতার লাইনগুলো ঘুরছিল।

আদিত্য বেরিয়ে এল মিনিটপাঁচেক পরেই। টর্চ জ্বেলে নয়নার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'চলো।'

'ডাক্তারবাবু কী বললেন?'

'বললেন, যত রাতই হোক যাবেন। আমাদের পাড়ার দিকে উনি কলে যান। আমাদের বাড়ির গলিটা চেনেন। আমি বাড়ির নম্বর দিয়ে দিয়েছি। আর সুদীপ্তদাকে চেনো তো? আমাদের পাড়ায় ব্রিজের বাঁ-দিকটায় থাকেন, ক্রিকেটের কোচ। ডক্টর দাসের ছেলে ওঁর কাছে ক্রিকেট খেলা শেখে। সুদীপ্তদার নাম বলার পরই উনি বললেন, আমার থাকার দরকার নেই, উনি ঠিক চলে যাবেন—।'

কথা বলতে-বলতে ওরা গলি ধরে অনেকটা পথ এগিয়ে গেল।

বাজারের কাছে মিটিং এখনও চলছে। কোনও একজন বিশেষজ্ঞ পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত দিচ্ছেন।

'...এখন আমাদের স্ট্যাক স্যাম্পলিং করে দেখতে হবে, অ্যামবিয়েন্ট এয়ার কোয়ালিটি টেস্ট করে দেখতে হবে, মাপতে হবে নানা মিটিওরোলজিক্যাল প্যারামিটার। সোজা কথায়, যে-দূষিত বাতাস আমরা ফুসফুসে টেনে নিচ্ছি দেখতে হবে তার ক্ষতি করার ক্ষমতা কতটা মারাত্মক। এ ছাড়া, বাতাসের দূষণ জলে পৌঁছতে খুব একটা সময় লাগে না। যে-জল এখন আমরা রোজ খাচ্ছি তা কতটা বিশুদ্ধ কে জানে! বেপরোয়া শিল্পায়নের জন্যে এখন হয়তো জলের মধ্যে আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, সায়ানাইড, লেড, ফ্লুওরাইড এসবের মাত্রা সাংঘাতিকরকম বেড়ে গেছে। খবরের কাগজে এত লেখালিখি হচ্ছে, কিন্তু তবুও সুরাহা কিছু হচ্ছে না। আমরা কলকাতার কয়েকটি এলাকার জল আর বাতাস অ্যানালিসিস করে দেখেছি। তার একটা রিপোর্ট আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি...।'

মিটিং-এর এলাকাটা পার হয়ে যেতেই সুনয়না বলল, 'দিতুদা, চলুন, আমরা কলকাতা ছেড়ে চলে যাই—।'

আদিত্য মুখ ফিরিয়ে সাহসী মেয়েটার মুখের দিকে তাকাল। ওর দু-কানের লতিতে দুটো মুক্তোর দুল। পাথর দুটো চকচক করছে। আর ওর চোখ দুটোও।

আদিত্য ছোট্ট করে 'হুঁ' বলল। আনমনাভাবে পা ফেলতে লাগল সামনের দিকে। ক'দিনের মধ্যেই চারপাশটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। জীবনটাকে যে যার মতন করে সাজাবে বলে ভাবছিল, কিন্তু...।

এমন সময় কালো ছায়ার মতো চারটে লোক ওদের কাছে এগিয়ে এল। ওদের একরকম ঘিরে দাঁড়াল।

ওরা দুজনে সবে অরবিন্দ সেতু ধরে দশ-বারো পা উঠেছে, তখনই ধোঁয়াশার আড়াল থেকে লোকগুলো বেরিয়ে এসেছে। ঘোলাটে আলোয় ওদের মুখ ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।

'আবে, মালকড়ি যা আছে বের কর—।'

সামনের লোকটা কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে মদের উগ্র বাষ্প নয়না আর আদিত্যর চোখেমুখে এসে ঝাপটা মেরেছে।

ডানপাশের ছায়াটা একটা লম্বা ছুরি বের করে আদিত্যর পাঁজরের কাছে ধরল।

নয়না একটা চিৎকার করতে গিয়েও সামলে নিল। শুধু অদ্ভুত একটা শব্দের টুকরো ছিটকে বেরোল ওর মুখ থেকে। আর আদিত্যর মুখের ভেতরে জিভটা যেন শিরীষ কাগজ।

'অ্যাই সালি! চেঁচালে গলা ফাঁক করে দেব। চটপট গিনিগুলো খোল।' পিছন থেকে একজন বলল।

নয়না সঙ্গে-সঙ্গে কাঁপা হাতে কানের দুল, গলার সরু চেন, খুলে দিয়ে দিল সামনের লোকটার হাতে। লোকটার খসখসে হাতের চামড়া নয়না ছুঁয়ে ফেলল

পলকের জন্য।

আদিত্য ততক্ষণে পকেটের সামান্য ক'টা টাকা আর হাতঘড়ি আর-একজনের হাতে তুলে দিয়েছে।

'আর কী আছে বের কর, নইলে সার্চ করব।'

'বস, ফুলটুসিকে আমি সার্চ করব মাইরি।' কথাটা বলার সঙ্গে-সঙ্গে পিছনের লোকটা নয়নার ঘাড়ের কাছে আলতো করে হাত দিল। নয়না শিউরে উঠে মাথা ঝাঁকুনি দিল।

আদিত্যর বুকের ভেতরে টিপটিপ শব্দ হচ্ছিল। ও শুকনো গলায় কোনওরকমে বলল, 'আমাদের আর কিছু নেই। সব দিয়ে দিয়েছি।'

সামনের লোকটা জড়ানো গলায় বলল, 'চারপাশে এই লাফড়া, তার মধ্যে গান্ডু ফুর্তি করতে বেরিয়েছে। শিগগির ফোট, নয়তো মাল এঁটো হয়ে যাবে—।'

পিছনের লোকটা ওদের ধাক্কা মারল। এবং পরক্ষণেই চারটে কালো ছায়া ধোঁয়াশার মধ্যে ক্রমে আবছা হতে-হতে মিলিয়ে গেল।

নয়না ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। আদিত্য কাঁপা হাতে ওর মাথায় হাত বোলাল।

ওরা যন্ত্রের মতো হাঁটছিল। কেউ কোনও কথা বলতে পারছিল না।

অনেকক্ষণ পর আদিত্য নীচু গলায় বলল, 'শুধু-শুধু তোমাকে ডেকে নিয়ে এসে এই ঝামেলায় ফেললাম। গয়নাগুলো...অনেক ক্ষতি হয়ে গেল...মাসিমা খুব বকাবকি করবেন...।'

নয়না হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছল। ঘাড় ঘুরিয়ে চেনা উদ্ধত ভঙ্গিতে তাকাল আদিত্যর দিকে ঃ 'আমি গয়নার জন্যে কাঁদছি না, দিতুদা। আপনার ঘড়ি আর টাকার জন্যেও না।'

'তবে কেন?'

'জানি না।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, তারপর ঃ 'আমার কান্না পাচ্ছে।'

'মাসিমাকে কী জবাব দেবে?'

'আজ নয় কাল ওগুলো যেতই। আমরাই বা আর ক'দিন আছি কে জানে!'

আদিত্যর শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিম স্রোত নেমে গেল। নয়নার শেষ কথাটায় ওর মনে হল, এই দূষিত পরিবেশে আমরা সত্যি-সত্যি এখনও বেঁচে আছি তো!

॥ ছয় ॥

এক ভয়ংকর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

যদি এভারেস্টের চুড়ো থেকে কয়েকহাজার প্রকাণ্ড লোহার বল গড়িয়ে-গড়িয়ে নীচে নামে, তা হলে বোধহয় অনেকটা এইরকমই শব্দ হবে। যদিও এই শব্দটা খুব

বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি।

শুধু শব্দ নয়, সেইসঙ্গে কেঁপে উঠেছে মাটি। যেন কয়েক সেকেন্ডের প্রবল ভূমিকম্প। কেঁপে উঠল খাট-বিছানা। ঝনঝন করে ভেঙে গেল জানলার কাচ। দেওয়াল থেকে খসে পড়ে গেল হলোগ্রামে ধরা ত্রিমাত্রিক নিসর্গ চিত্র।

নিশ্চয়ই ভূমিকম্প! বিছানায় উঠে বসে ঘড়ি দেখল আদিত্য ঃ ছ'টা দশ। আর ঠিক তখনই শুনতে পেল সমবেত গলায় উলুধ্বনি আর শাঁখের আওয়াজ। কিছু-কিছু সংস্কারে সময়ের মরচে ধরে না। এটাও বোধহয় তাই।

মাথাটা সামান্য টলছিল। খুব সাবধানে বিছানা ছেড়ে মেঝেতে নামল। দেখল, ঘরের পুবদিকের দেওয়ালে লম্বালম্বি এক চিড় ধরেছে। সুরেন্দ্র-নিলয়ে থাবা বসিয়েছে অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা।

দোতলা থেকে সকলের চেঁচামেচি কলরোল শুনতে পেল আদিত্য।

প্রথমে গলির দিকের জানলা দিয়ে উঁকি মারল। কিছু বোঝা গেল না। তখন কোনওরকমে হাত-মুখ ধুয়ে জামাটা গায়ে গলিয়ে চলে গেল দোতলায়।

গিয়ে দেখল যা ভেবেছে তাই ঃ প্রায় সকলেই বারান্দায়। মুন্নি আর লতা শরীরটাকে বিপজ্জনকভাবে রেলিঙের ওপর দিয়ে ঝুঁকিয়ে দেখার চেষ্টা করছে। মা ওদের পাশে দাঁড়িয়ে। হতভম্ব মুখ-চোখ। বারবার শুধু বলছে, 'কীসের শব্দ? কোথা থেকে এল শব্দটা?'

আদিত্য মুখ বাড়িয়ে পুবদিকটায় জমাট কালো ধোঁয়া দেখতে পেল। লক্ষ করল, গতকালের ধোঁয়াশা অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে।

গলি থেকে বেশ কয়েকজন পুরুষমানুষ রওনা দিয়েছে মারাত্মক শব্দের খোঁজে। বাড়ির বারান্দায় কিশোরী-মহিলাদের জটলা। আদিত্যর মনে হল, সবগুলো মুখের মধ্যেই কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে। গত কয়েকদিনের অপুষ্টি ছাপ ফেলেছে। মুখগুলো শুকিয়ে গেছে। সঙ্কটের রেখা এলোমেলো জ্যামিতির সৃষ্টি করেছে সেখানে।

আদিত্য বলল, 'মনে হয় কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। আমি দেখে আসছি—।'

মা ভয়ের চোখে দিতুকে দেখল।

পলাশ শয্যাশায়ী। যদিও ডাক্তারবাবু গতকাল দেখে গেছে, ওষুধ দিয়ে গেছে, আশ্বাসও দিয়েছে। তবুও কোথায় যেন একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা কাজ করে চলেছে।

মা শুধু শুকনো ঠোঁট নেড়ে বলল, 'সাবধানে যাস—।'

মুন্নি হঠাৎ বলে উঠল, 'আমিও যাব তোর সঙ্গে—।'

আদিত্য মা-কে দেখল, লতাকে দেখল। তারপর ছোট্ট করে বলল, 'চল—।'

রাস্তায় নেমে এক অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করল ঃ এই সাতসকালেই অনেকে বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে রওনা হয়েছে। সঙ্গে বউ-বাচ্চাকাচ্চা।

মুন্নি জিগ্যেস করল, 'এরা সব কোথায় যাচ্ছে রে?'

আদিত্য ঠোঁট ওলটাল ঃ 'কী জানি!'

ওর মনে পড়ল ডাক্তার মণ্ডলের কথা। কিন্তু মুন্নিকে কিছু বলল না।

সরু গলির ফাঁকফোকর দিয়ে আদিত্য খালের দিকেই এগোচ্ছিল। তখনই ওর চোখে পড়ল ভোরবেলা যে সামান্য গাড়িঘোড়া চলে তারা সব সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে। এখন কুয়াশা তেমন নেই। বরং প্রায় স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে। তাই ব্যাপারটা ওর কাছে কেমন বেখাপ্পা লাগল।

উলটোডাঙার খালের দিকটায় যেতে হলে একটা ছোট পার্কের মধ্যে দিয়ে গেলে খানিকটা পথ কমানো যায়। সেইজন্যই পার্কের ভেতরে ঢুকে পড়েছিল মুন্নি আর ও। ভোরবেলা এই পার্কে ছেলেরা ফুটবল খেলে, ব্যায়াম করে। আজ কেউ নেই। কেউ যে থাকবে না সেটা আরও স্পষ্ট মাঠের চেহারায়। মাঠের একটা অংশ গাঢ় সবুজ ঘাসের কার্পেটে ঢাকা ছিল—ক'দিন আগেও। এখন নেই। ঘাসের নীরস কঙ্কালগুলো কালচে হয়ে লেপটে রয়েছে মাটির সঙ্গে।

টিভির সাক্ষাৎকারের কথা মনে পড়ল আদিত্যর ঃ মাটির রসায়ন পালটে গেছে। সেই মাটির নানা জায়গায় পড়ে আছে কয়েকটা মরা পাখি, মরা প্রাণী।

মুন্নির চোখে-মুখে অসহায়ভাব ফুটে উঠেছিল। তাই দেখে ছোট বোনটার জন্য মন খারাপ হচ্ছিল আদিত্যর। ও স্কুলে-কলেজে পড়া বিজ্ঞানের নানা বিষয় মনে করার চেষ্টা করছিল। কোনওভাবে কি এই অবস্থাটাকে সামাল দেওয়া যায়?

পার্কের ভেতর দিয়ে আরও অনেকে যাচ্ছিল। হঠাৎই শুভেনের গলা পেল আদিত্য।

'অ্যাই দিতু!'

আদিত্য তাকাল। শুভেন লম্বা-লম্বা পা ফেলে ওর দিকেই আসছে। ওকে আরও বেশি কালো লাগছে আজ। তবে চোখের উজ্জ্বলতা কমেনি। মাথার চুল উসকো-খুসকো। ওকে দুটো নতুন প্যাড এনে দিয়েছে আদিত্য। কবিতা লেখার ফাঁকে-ফাঁকে ও চাকরির চেষ্টা করে। তবে সে ব্যাপারে খুব যে ঝোঁক আছে তা নয়।

শুভেন আদিত্যদের পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। জিগ্যেস করল, 'কেসটা কী বল তো মাইরি?'

আদিত্য ঠোঁট ওলটাল। সূর্যের আলো বাড়ছে, তবে এখনও মাটিতে স্পষ্ট ছায়া ফুটছে না। কোথা থেকে ভেসে আসা ধোঁয়াশার মেঘ উড়ে যাচ্ছে মাঝে-মাঝে।

'সবাই সালা—' বলেই মুন্নির দিকে তাকিয়ে জিভ কাটল শুভেন, তারপর আবার বলল, 'সবাই শুনছি কেটে পড়েছে। আমার বাপটা তো দেড়বছর ধরে বিছানায় সাঁটা। জানিস তো, গলা, বুক, পেট-ফেট সব নানচাকু হয়ে গেছে। মা-টা সকাল

বিকেল কাঁদছে। বলে, আমাদের অন্য কোথাও নিয়ে চল। কী যে করি না—। দাদাকে পরশুদিন একটা চিঠি দিয়েছি...।'

আদিত্য সব শুনল। কথাগুলো ওর বুকের ভেতরে কেটে-কেটে বসছিল।

মুন্নি হঠাৎ বলে উঠল, 'শুভেনদা, এই পলিউশান কলকাতা ছাড়িয়ে কত দূর পর্যন্ত গেছে জানেন?'

আদিত্য বুঝল, দুর্গাপুরের অবস্থা জানতে চাইছে মুন্নি। রজত সোমবার ভোরে সেখানে রওনা হয়ে গেছে।

শুভেন বলল, 'সবাই তো বলছে, এখন নাকি কলকাতার বাইরে অনেকটাই ছড়িয়ে গেছে। কীরে, তোরা কী করবি কিছু ঠিক করেছিস?'

শেষের প্রশ্নটা আদিত্যকে লক্ষ করে। মুন্নি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে হাঁটছিল।

আদিত্য নীচু গলায় বলল, 'এখনও ঠিক করতে পারিনি—।'

ওরা পার্কের বাইরে বেরিয়ে এল। রাস্তাটা এখানে একটু চওড়া। দুপাশে বাড়ি-ঘর। এর মধ্যে একটা বাড়ি অন্তত নব্বই বছরের পুরোনো। পাড়ার বয়েজ হাইস্কুলের প্রাক্তন হেডমাস্টারমশাইয়ের বাড়ি। তাঁর বয়েসও বোধহয় বাড়ির বয়েসের কাছাকাছি। সেই বাড়ির একটা অংশ ধসে পড়েছে রাস্তায়। এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়েছে ইট, চুন, বালি, রাবিশ। সেখানে জনাকয়েক মানুষের জটলা। বাড়ির যে-অংশটা এখনও অর্ধেকটা ভাঙা বারান্দা নিয়ে খাড়া হয়ে আছে, সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন লোলচর্ম বৃদ্ধ। কুঁজো হয়ে গেছেন বয়েসের ভারে। একহাতে বারান্দার রেলিং ধরে অন্য হাতটায় চোখ আড়াল করে দেখতে চাইছেন অকুস্থল। শরীর ও হাত ভীষণ কাঁপছে। তাঁকে সামাল দিতে পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক প্রৌঢ়।

বাড়িটার নানা জায়গায় ফাঁকফোকরে বট-অশথের রাজত্ব ছিল। আদিত্য জানে, এইসব 'পরজীবী' গাছ বাড়ির প্রাণ শুষে নেয়, ফাটল ধরায়। কিছুতেই এদের খতম করা যায় না। কিন্তু এখন? সবক'টা গাছই নীরস কঙ্কাল। শেকড়-বাকড় বের করে হা-হা করছে।

এবার ভিড়টা বেড়েছে, আর সেইসঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচিও। আর কয়েক পা এগোলেই হয়তো চোখে পড়বে জায়গাটা। এখান থেকে কালো ধোঁয়া স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

খুব সাবধানে আবর্জনা এড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছিল ওরা। দু-দিন ধরে রাস্তা সাফাই বন্ধ। জল সরবরাহ অনিয়মিত। রেশন-দোকানে প্রায় অচল অবস্থা।

আদিত্য বলল শুভেনকে, 'প্যাড তো নিলি। কবিতা আসছে?'

শুভেন কাশল জোরে। শব্দ করে থুতু ফেলল রাস্তায়। বলল, 'আসছে—তবে ভয় পাইয়ে দেওয়ার মতো। কোনওদিন ভাবিনি এরকম লাইন লিখব—।'

মুন্নি শাড়ির কোঁচাটা সামান্য তুলে একটা মরা বেড়াল এড়িয়ে গেল। তারপর কিছুটা আগ্রহ ফুটিয়ে তাকাল শুভেনের মুখের দিকে।

শুভেন বলল, 'দিতু, ভাবলে কষ্ট হয়, জানিস। গত সপ্তাহে লিখেছিলাম :

"যদি ঈশ্বর হতাম,
প্রতিটি গাছের প্রতিটি পাতায় লিখে দিতাম—
তোমার নাম।"

আর এখন কী লিখছি শুনবি?

"আজ শুধু অলৌকিক খেলা।
চারিদিকে শবের পাহাড়
বলো দেখি, কোনটা আমার?
বাজি থাক এক লক্ষ টাকা।"

মুন্নি হঠাৎই ডুকরে কেঁদে উঠল। শুভেনের চোখ জ্বলজ্বল করছিল। ও অবাক চোখে এই স্পর্শকাতর কিশোরীকে দেখছিল। আর তখনই অরবিন্দ সেতুর মাঝের অংশটা আদিত্য দেখতে পেল। অথবা বলা যেতে পারে, দেখতে পেল না। কারণ ওটা আর নেই!

দুর্ঘটনার দৃশ্যটা ওদের স্তম্ভিত করে দিল।

একটা প্রকাণ্ড এরোপ্লেন মুখ থুবড়ে পড়েছে উলটোডাঙার খালের মধ্যে। আর সেই সঙ্গে উধাও করে দিয়েছে অরবিন্দ সেতুর মাঝের অংশটা। অথচ কাল রাতেই এর ওপরে পা ফেলে হেঁটে গিয়েছিল নয়না আর আদিত্য!

আদিত্য দূর থেকেই আগুনের তাপ টের পাচ্ছিল। ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে খালপাড়ের কাছটায় এগোতেই ধোঁয়ার কালো মেঘের আড়াল ভেদ করে আগুনের শিখা চোখে পড়ল। একইসঙ্গে প্লেনটার যেটুকু অংশ যে-অবস্থায় চোখে পড়ল তাতে স্পষ্টই অনুমান করা যায় চালক বা যাত্রীদের কেউই বোধহয় বেঁচে নেই।

আদিত্যর চোখ জ্বালা করছিল। সেই অবস্থাতেই ও চারপাশে দেখছিল।

খালের দু-ধার ঘেঁষে সারি-সারি খোলার ঘর আর ঝুপড়ি। বহু বছর ধরেই এই ঝুপড়িগুলো এখানে রয়েছে। এর বাসিন্দারা নানা জীবিকা আঁকড়ে ধরে কোনওরকমে টিকে থাকার লড়াই চালায়। কেউ কাগজ কুড়িয়ে সংসার চালায়, কেউ পুরোনো প্লাস্টিক আর পলিথিনের ব্যাবসা করে, কেউ লুকিয়ে চোলাই মদের ঠেক চালায়, আর বেশিরভাগই সাইকেলভ্যান চালানোর কাজ করে। এখানকার পুরুষদের মেয়ে-বউরা লোকের বাড়ি-বাড়ি ঠিকে কাজ করে আর বাড়তি সময়ে ফষ্টিনষ্টি করে দু-পয়সা আয় করে। এখানকার মেয়েগুলো বারো-তেরো বছর বয়সেই কপালে কাচপোকা টিপ পরে, মাথায় কুচি দিয়ে লাল ফিতে বাঁধে, ঠোঁটে লিপস্টিক লাগায়,

আর চোখের নজর রগরগে নেমন্তন্নর কার্ডের মতো করে ঘুরে বেড়ায়।

আদিত্য মুন্নিদের ঘিরে ঝুপড়ির মানুষজনও জটলা করেছিল। নজর সকলেরই খালের দিকে। ওদের বেশ কয়েকজনও যে এই দুর্ঘটনায় তলিয়ে গেছে সেটা বোঝা যাচ্ছিল। ওরা অনেকেই পাগলের মতো ছুটোছুটি করছিল। ভাঙাচোরা ঘর থেকে নিজেদের সামান্য যা-কিছু জিনিসপত্র বের করে নিয়ে আসার চেষ্টা করছিল।

আদিত্যর নাকে পোড়া গন্ধ আসছিল। কী-কী একসঙ্গে পুড়লে এরকম গন্ধ পাওয়া যায় আদিত্য সেটা ঠাহর করতে পারল না।

চারপাশে বেশ একটা হইচই হচ্ছিল। কিন্তু কোনও কথাই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। শব্দগুলো সব যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। যে-সেতারটা কিছুদিন ধরে বেসুরো বাজছিল আজ সাতসকালে সেটার তারগুলো যেন ছিঁড়ে গেছে।

খালের ধার ঘেঁষে চওড়া রাস্তা। রাস্তার একপাশে গোটাচারেক বহুতল বাড়ি। সেগুলোর ছাদ আর বারান্দায় লোকজনের ভিড়।

পুলিশ এখনও এসে পৌঁছয়নি। তবে কাছাকাছি দবকল-অফিস থাকায় কয়েকজন দমকল কর্মী পোশাক পরে এদিক-ওদিক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের দৃষ্টি বিভ্রান্ত। যেন কী করবে ভেবে উঠতে পারছে না।

জটলার মধ্যে নানা মন্তব্য কানে আসছিল। সাতসকালে প্লেনটা যাচ্ছিল কোথায়? ধোঁয়াশার জন্য বিমান চলাচল তো বন্ধ থাকার কথা! হয়তো সকালে আকাশ পরিষ্কার ছিল, তাই চলতে শুরু করেছিল।

আদিত্য একবার আকাশের দিকে দেখল। ঘোলাটে ভাবটা বাড়ছে ধীরে-ধীরে।

হঠাৎই শুভেন ওর কাছে এল। এতক্ষণ ও ভিড়ের মধ্যে কোথায় ঢুকে পড়েছিল। আদিত্যর কাঁধে টোকা দিয়ে ডেকে বলল, 'দিতু, রীতেনটা মারা গেছে!'

রীতেন। আদিত্যর সঙ্গে চার-দশে রবারের বলে খেপ খেলত। ওদের মধ্যে একমাত্র রীতেনই ডিভিশন পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিল। ও এখনও থার্ড ডিভিশনে কাশীপুর স্পোর্টিং-এ খেলত। আর বডি ফিট রাখার জন্য প্রতিদিন ভোরে অরবিন্দ সেতুর ওপরে দৌড়ত।

শুভেনের পাশে রোগামতন কালো একটা ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল। পরনে স্যান্ডো গেঞ্জি, আর লাল হাফপ্যান্ট। ছেলেটাকে দেখিয়ে শুভেন বলল, 'রীতেনের ভাই। ওর পেছন-পেছন দৌড়চ্ছিল। প্লেনটা একেবারে দৈত্যের মতো রীতেনের ঘাড়ে এসে পড়েছে। ব্যস, খেলা খতম!'

ছেলেটা শব্দ না করে কাঁদছিল। শুভেন ওকে পিঠ চাপড়ে টেনে নিয়ে গেল একদিকে।

মুন্নি কাঁপা গলায় বলল, 'ছোড়দা, বাড়ি চল—।'

আদিত্য এবার দূর থেকে অনেকগুলো গলায় কান্নার আওয়াজ পেল। এতক্ষণ খেয়াল করেনি। এই সর্বনাশা দুর্ঘটনা কতজনকে শেষ করে দিয়েছে কে জানে! কত বাড়ি ধসে পড়েছে, কত বাড়িতে ফাটল ধরেছে তারও কোনও হিসেব নেই।

দূরে, খালের ওপারে, ধোঁয়ার হালকা আস্তরণ ভেদ করে চোখে পড়ল বহুতল কয়েকটা বাড়ির অবয়ব। ওপারে রাস্তার ধার ঘেঁষে বড়-বড় তিনটে বাড়ি ছিল। এখন দুটো। বাঁ-দিকের বাড়িটা মাপে এখন বামন হয়ে গেছে। লোকজনের কথাবার্তায় জানা গেল, দিশেহারা এরোপ্লেনটা নাকি প্রথমে ওই বাড়িটাকেই ধাক্কা মেরেছে।

খালের জল এমনিতেই কালো। গত ক'দিনের আবহাওয়া তাকে আরও কালো করে দিয়েছে। এখন প্রচণ্ড তাপে সে-জলে টগবগ করে যেন খই ফুটছে। ফুটন্ত তেলে একটা ভাঙা এরোপ্লেন ভাজা হচ্ছে।

মুন্নি এবার আদিত্যের জামা ধরে টান মারল। মুখে হাত চাপা দিয়ে অস্পষ্ট গলায় বলল, 'ছোড়দা, বাড়ি চল। আমি আর দেখতে পারছি না।'

আদিত্যের শরীরও কেমন করছিল। ও ছোটবোনকে নিয়ে বেরিয়ে এল ফাঁকা জায়গায়।

তখনই সাইরেনের আওয়াজ ওদের কানে এল। ডপলার এফেক্টের জন্য সাইরেনের শব্দের কম্পাঙ্ক দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। দূর থেকে ছুটে আসছে কয়েকটা জিপ, ভ্যান, অ্যাম্বুলেন্স, আরও কত গাড়ি।

এমনসময় রামুদার চিৎকার শোনা গেল : 'আজ থেকে সব ছুটি। অফিস নেই। ইস্কুল-কলেজও আর খুলবে না! কী আনন্দ! সরকার থেকে খাবার বিলির কাজ শুরু হয়েছে। রোজ দু-বেলা সরকারি নেমন্তন্ন। কেন নেমন্তন্ন? বিয়ে...কুয়াশা আর কালো বৃষ্টির বিয়ে...।'

রামুদা সাইকেল চালিয়ে আসছিল। সাইরেনের কান-ফাটানো শব্দ আর লোকের ভিড় তাকে থামিয়ে দিল। কাঁচাপাকা চুল মাঝবয়েসি লোকটা হতভম্ব হয়ে খালধারের দিকে এগোল। কয়েকবার কাশল। রোজ খবরের কাগজের হেডিং মুখস্থ করা অভ্যেস। এই দুর্ঘটনার খবরটা এখনও কাগজের হেডিং হয়নি। আদিত্য লক্ষ করল, চশমার ফাঁক দিয়ে দেখা ভয়ংকর দৃশ্যটা যে রামুদা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না, সেটা তার মুখ দেখেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

ওরা ভাইবোনে যখন বাড়ির দিকে ফিরছে তখন প্রাইভেট টিভি চ্যানেলের কয়েকটা গাড়ি ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এই অদ্ভুত দুর্ঘটনার ছবিটা সকলের বাড়িতে ঢুকে পড়বে।

আদিত্যের মন বলছিল, আর সময় নেই। আর বেশি সময় নেই। তারপরেই খতমের খেলা শুরু হয়ে যাবে।

॥ সাত ॥

'একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন গড়ে সাড়ে সাত হাজার লিটার বাতাস দরকার। যদি সেই বাতাসের সঙ্গে দূষিত পদার্থ মিশে থাকে, তা হলে সেগুলো গিয়ে জমা হবে ফুসফুসে। যেসব দূষিত কণার ব্যাস দশ মাইক্রোমিটারের বেশি, তাদের বেশিরভাগই আটকা পড়ে যায় নাকের সূক্ষ্ম রোমের ছাঁকনিতে। কিন্তু আরও ছোট কণাগুলো ঢুকে যায় নাকে, গলায়, শ্বাসনালিতে ও ফুসফুসে। এবার ক্ষতির পরিমাণ কতটা হবে তা নির্ভর করবে দূষণের ''থ্রেশোল্ড লিমিট ভ্যালুজ''-এর ওপরে। আগে এই মানকেই বলা হত ''ম্যাক্সিমাম অ্যালাওয়েব্‌ল কনসেনট্রেশান'' বা ''ম্যাক''। এখন কলকাতার বাতাস যেরকম দূষিত হয়ে পড়েছে তাতে ''ম্যাক''-এর মান অনেক নেমে গিয়ে বিপজ্জনক অবস্থা দেখা দিয়েছে। এখন সকলের উচিত নাকে-মুখে ভেজা কাপড় চাপা দেওয়া। আর যাদের গ্যাস-মুখোশ ব্যবহারের সুযোগ...।'

আদিত্য বিরক্ত হয়ে বন্ধ করে দিল টিভির সুইচ। ক'দিন ধরে এই এক জিনিস চলছে ঃ বিশেষজ্ঞদের মতামত।

মৃতদেহ ঘিরে বসে থাকা শ্মশানযাত্রীর মতো ছ'টা প্রাণী চুপচাপ বসে রয়েছে ঘরের এখানে-ওখানে। কারও মুখে কোনও কথা নেই। ঘোলাটে আবহাওয়ায় ঘরের আলোর তেজ অনেক কম। কারও মুখই স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না। সকলেই বোধহয় চাইছে, অন্য কেউ কথা বলুক।

লতা মাথা নীচু করে নানকুর মাথায় হাত রেখে মেঝেতে বসে। নানকুর মুখে কোনও শব্দ নেই। ও অনেক বড় হয়ে গেছে এ-ক'দিনে, ভাবল আদিত্য। 'জ্যাক অ্যান্ড জিল' অথবা মাদ্রাজি নমস্কার কিংবা 'আশকারা খাওয়ার' ব্যাপারগুলো যেন কত বছরের পুরোনো স্মৃতি।

মুন্নি মায়ের বিছানার এক কোণে বসে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মা বিছানায় উবু হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে। অন্য হাতে একটা ছোট ভিজে গামছা। পলাশ ঘরের একমাত্র ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে চোখ বুজে আছে। গত দু-দিনে শরীর মোটামুটি সেরেছে বটে, তবে মন সেরে ওঠেনি।

আদিত্য অস্পষ্ট অবয়বগুলো আর-একবার দেখল। ওর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল ভেতরে-ভেতরে। দূষিত প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করা যেন 'ছায়ার সাথে কুস্তি' করা। ও কয়েকটা পা ফেলে এগিয়ে গেল বাবার ফটোর কাছে। এই মানুষটা বেঁচে থাকলে আদিত্য বেঁচে যেত। ওর ওপরে কোনও সিদ্ধান্তের দায়দায়িত্ব থাকত না। পছন্দ না হলেও সবাই চুপচাপ মেনে নিত এই লোকটার কথা।

অনেক চেষ্টা করে আদিত্য কথাগুলো বের করতে পারল মুখ দিয়ে ঃ 'আর কোনও পথ নেই। আমাদের কলকাতা ছেড়ে পালাতে হবে—।'

আদিত্যর খুব কষ্ট হচ্ছিল। ওরা চলে যাবে এই শহর ছেড়ে। এখানে পড়ে

থাকবে সুরেন্দ্র নিলয়, বাবার অস্থিভস্ম, ভক্তদাসের মৃতদেহ, বাবার ফটো, আর চোদ্দো বছরের হাজার স্মৃতিকণা। প্রবল বালিঝড়ে মরুভূমিতে যেমন বালিকণা বেপরোয়া উড়ে যায়, ছড়িয়ে যায়, এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয় নিষ্ঠুর হাতে ঠিক সেইরকম উড়িয়ে দেবে, ছড়িয়ে ছত্রখান করে দেবে অসংখ্য স্মৃতিকণা।

মা বিশ্রীভাবে কাশল কয়েকবার।

পলাশ চোখ খুলল, বলল, 'সবাই পালাচ্ছে—।'

মুন্নি কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'অতসীরা চলে গেছে, নরেন জেঠুরাও আজ সকালে রওনা হয়ে গেছে—।'

আদিত্য জানে।

অফিস-কাছারি, স্কুল-কলেজ, সিনেমা হল, সব বন্ধ। দোকানে বাজারে একটুকরো খাবারের জন্য মানুষগুলো জানোয়ারের মতো লড়াই করছে। এ-ক'দিন ধরে জমানো চাল-ডাল আর দুধ খেয়ে মা কোনওরকমে টিকে আছে। কিন্তু খাবারের ভাঁড়ারও এখন প্রায় শূন্য। শুধু ওদের নয়, লক্ষ-লক্ষ লোকের। ইতিহাসে পড়েছে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ছিল মানুষের তৈরি। এই নতুন মন্বন্তরও তাই।

গত কয়েকদিনে টিভিতে কাগজে শুধু লড়াই আর হানাহানির কথা। কেউ বলেছেন, গত বিশবছরে কলকাতাকে যে-বেপরোয়া শিল্পায়নের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাতে এই পরিস্থিতি অনিবার্য ছিল। তার ওপরে রয়েছে পেট্রল-ডিজেল নির্ভর যানবাহনের পরাবৃত্তীয় ক্রমবৃদ্ধি। আবার কেউ বলছেন, সভ্যতার ক্রমবিকাশের জন্য এই শিল্পায়ন ছিল অত্যন্ত জরুরি।

শুধু অভিযোগ, আর পালটা অভিযোগ। দেশের কর্তাব্যক্তিদের ভদ্রতার মুখোশ খসে পড়েছিল অনেক আগেই। এখন তাঁদের দাঁত-নখও দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

রাত বাড়ছিল। সেইসঙ্গে আদিত্যের ভয়ও। খাওয়ার সময় এগিয়ে এলেই ওর ভয় হয়।

ও মায়ের কাছে এগিয়ে গেল। মা ভিজে গামছাটা নাকে-মুখে ঘষছিল বারবার। মায়ের পিঠে আলতো হাত রেখে আদিত্য বলল, 'সামান্য যা কিছু গুছিয়ে নিয়ো, মা। কাল ভোরে আমরা রওনা হব।'

মা আর পারল না। হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। বলল, 'এসব ছেড়ে কোথায় যাবি, দিতু? কোথায় যাবি তুই?'

আদিত্য মাথা নাড়ল। বলল, 'এখনও জানি না। তবে কলকাতা থেকে দূরে—গ্রামের দিকে—যেখানে এখনও গাছপালা আছে, পাখি আছে।'

নানকু মায়ের কাছ থেকে হঠাৎই ছুটে এল আদিত্যর কাছে। বায়না করে বলল, 'কাকুমণি, পাখি নেব। পাখি নেব। ভক্তদাসের মতো—।'

দিতু ওর মাথায় হাত বোলাল। বলল, 'দেব রে, আমরা পাখির দেশে যাচ্ছি।'

একটু আগেই বাচ্চাটা কেমন গুম মেরে বসেছিল। 'পাখি' কথাটাই ওকে কেমন

চঞ্চল করে তুলেছে এক মুহূর্তে। আদিত্য আগে কখনও বোঝেনি এই ছোট্ট শব্দটার এরকম মনোহারী গুণ আছে। অথচ মা তখনও কাঁদছে। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে।

পলাশ দাঁত দিয়ে নখ কাটছিল। জড়ানো গলায় বলল, 'লতা বলছিল, ওদের বাড়ি চলে যাবে...।'

বউদিদের বাড়ি সোনারপুর। সেখানে অবস্থা কীরকম আদিত্য জানে না। টিভি আর খবরের কাগজের মাধ্যমে যেটুকু জেনেছে তাতে এই দূষণ কলকাতাকে কেন্দ্র করে রোজই ছড়িয়ে পড়ছে দূরে, দূরান্তরে। সরকারের খাবার বিলির কাজ শুরু হয়েছে। সরকারি ট্রাক আর লরি শহরের বাসিন্দাদের সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে শহর থেকে দূরে। কিন্তু মাঝে-মাঝেই গাঢ় ধোঁয়া সবকিছু ঢেকে দিয়ে যানবাহন অচল করে দিচ্ছে। দুর্ঘটনাও হচ্ছে মুড়িমুড়কির মতো। আদিত্যর মনে পড়ল দু-দিন আগের বিমান দুর্ঘটনার কথা, রীতেনের কথা। মনে পড়ল, কান্নার শব্দ, অসংখ্য ক্রেন আর মানুষের কর্মব্যস্ততা, ধোঁয়া, আগুন—সবমিলিয়ে এক আশ্চর্য সর্বনাশ।

আদিত্য তাকাল লতার দিকে : 'তুমি কী করে যাবে, বউদি? চারদিকে সাংঘাতিক অবস্থা চলছে—।'

লতা কাঁদো-কাঁদো মুখে পলাশের দিকে তাকাল। মানুষটার শরীরে এখনও তেমন জোর আসেনি। লতার একটামাত্র ভাই। পরেশ। বয়েস বাইশ-চব্বিশ হবে। সে হয়তো লতার দু-বোন আর মা-বাবাকে নিয়ে ব্যস্ত আছে। কিন্তু এই মারাত্মক অবস্থার কথা জেনেও পরেশ একবার খোঁজ নিতে আসেনি।

আদিত্য নানকুকে মুন্নির কাছে দিল। তারপর বলল, 'তুমি চিন্তা কোরো না, বউদি। আমি কাল সকালে তোমার বাড়ির খবর নেওয়ার চেষ্টা করব। তারপর আমরা রওনা হব। তবে যা বললাম, গোছগাছ করে নাও—এর পরে সে-সময়টুকুও আর থাকবে না।'

মুন্নি বলল, 'শুনছিলাম, সুবোধদার বাচ্চা মেয়েটা নাকি মারা গেছে—।'

সুবোধ পাল। বড় রাস্তার কোণে বইয়ের দোকান আছে ভদ্রলোকের। স্কুল-কলেজের বই পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে নানান বাংলা-ইংরেজি ম্যাগাজিন। সুবোধদার দোকানে ম্যাগাজিন দ্যাখে না, এ-পাড়ায় এমন লোক খুব কম। ওঁর মেয়েটাও মাঝে-মাঝে দোকানে বসত। বছরসাতেক বয়েস। বেশ হাসিখুশি ছিল।

মা চোখ মুছে জিগ্যেস করল, 'কী করে মারা গেল? কখন?'

মুন্নি কষ্ট করে কথা বলছিল, 'কাল সন্ধেবেলা মারা গেছে। কী হয়েছিল কেউ জানে না। ডাক্তারও বলতে পারেনি। শুধু হাঁপের টান উঠছিল বারবার।'

লতা আচমকা ছুটে এসে নানকুকে জাপটে ধরল। ভাঙা গলায় বলল, 'ছোড়দা, চলো আমরা এখুনি চলে যাই—।'

পলাশ বিরক্তভাবে বলল, 'আঃ, লতা—কী হচ্ছে? কী ছেলেমানুষি করছ!'

ঘরের মধ্যে ধোঁয়াশা গাঢ় হচ্ছিল। কে যেন কেশে উঠল দুবার।

আদিত্যর গলার ভেতরে একটা গিরগিটি নড়াচড়া করছিল। পেটের ভেতরটা নখর হাতে খামচে ধরেছে যেন কেউ। কারও মুখই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। মুখগুলো ধীরে-ধীরে আবছা হয়ে যাচ্ছে। হয়তো একসময় মিলিয়ে যাবে।

মায়ের ওষুধ রাখার তাকে একটা টেবিলঘড়ি আছে। আদিত্য সময় দেখতে চাইল। কিন্তু মাত্র সাত-আট ফুট দূর থেকেও তার উপায় নেই। আদিত্য ঘড়িটার খুব কাছে গিয়ে সময় দেখল ঃ ন'টা দশ। আবার মনে পড়ল, খাওয়ার সময় এগিয়ে আসছে। ওর গলার ভেতরে গিরগিটিটা নখের আঁচড় কাটল।

আঁচড়ের কষ্টটা ভোলার জন্য টিভির সুইচটা অন করে দিল আদিত্য। সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে গেল নানা চ্যানেলের প্রতিযোগিতা। বিপদকে কে কত বেশি বিপজ্জনক করে দেখাতে পারে তার অসুস্থ প্রতিযোগিতা। নানকু ছাড়া আর সবাই টিভি দেখার জন্য টিভি সেটের আরও কাছে এগিয়ে এল।

আদিত্য ঘর ছেড়ে বেরোতেই শুনতে পেল কলিংবেল বাজছে। কে ডাকতে এল এখন? পিছন ফিরে 'আমি দেখছি' বলে ও সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল নীচে।

নামতে-নামতে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল। সিঁড়ির প্রতিটি ধাপকে আজ অনেক আপন মনে হচ্ছে। ময়লা পড়া ঘোলাটে বাল্‌বটাও যেন কত চেনা। দেওয়ালের প্রত্যেকটি ত্রুটি, ড্যাম্পের দাগ, সবই কত নিজের—চোদ্দো বছরের বন্ধু। ওদের ছেড়ে চলে যেতে হবে। কে জানে, আর কখনও ফেরা হবে কি না। কে জানে, আরও কতদিন ধরে চলবে কুয়াশা আর কালো বৃষ্টির বিয়ে!

আদিত্য বুকে হাত বোলাল। রোজ সাড়ে সাত হাজার লিটার করে বাতাস নেয় এর ভেতরে। গত সাতদিনে বাহান্ন হাজার পাঁচশো লিটার বাতাস নিয়েছে। আদিত্য পরম আদরে পাগলের মতো হাত বোলাতে লাগল বুকে। ফুসফুসজোড়াকে উদ্দেশ্য করে অস্ফুট গলায় বলল, 'কী রে, তোরা এখনও ঠিকঠাক আছিস তো?'

আদিত্যর ফুসফুস কোনও উত্তর দিল না।

সদর দরজার কাছে এসে একটা গাঢ় ছায়া দেখতে পেল। কাছে যেতেই শুনল ছায়াটা বলছে, 'আদিত্য দাদাবাবু আছেন?'

গলার স্বরেই কিছুটা আন্দাজ করেছিল, আরও কাছে গিয়ে চিনতে পারল। দশরথ। মাঝবয়েসি মানুষ। সুনয়নাদের বাড়ি কাজ করে। খুব পান খায়, আর কারণে-অকারণে হাসে—এমনকী বকাঝকা করলেও। তবে এখন হাসছে না।

রাস্তার দুর্গন্ধ নাকে আসছিল। কিন্তু আদিত্য নাকে হাত চাপা দিল না। এভাবে কতক্ষণই বা আত্মরক্ষা করা সম্ভব? জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার, দশরথদা?'

'দিদিমণি আপনাকে একবার ডেকেছেন—।'

আদিত্যর মনে অনেকগুলো প্রশ্ন জাগছিল, কিন্তু মুখে কিছুই বলল না। কয়েক

মুহূর্ত চুপ করে থেকে অস্পষ্ট গলায় বলল, 'তুমি যাও—আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।'

এখন রাতে রাস্তায় বেরোতে হলে সবাই টর্চ নিয়ে বেরোয়। নইলে গায়ে-গায়ে ধাক্কা লাগার ব্যাপারটা বেশিরভাগ সময়েই এড়ানো যায় না।

আদিত্য একতলার ঘর থেকে টর্চ নিয়ে এল। নীচ থেকে চেঁচিয়ে বলল 'আমি একটু বেরোচ্ছি—।'

রাস্তায় নামতেই দুর্গন্ধটা তীব্র হল আরও। মাঝে-মাঝে দরকারমতো টর্চ জ্বেলে হাঁটতে লাগল আদিত্য। আকাশের দিকে না তাকিয়েও বুঝল চাঁদ দেখা যাবে না। ঢেকে আছে গাঢ় মেঘে। হয়তো সেই মেঘ থেকেই হবে কালো বৃষ্টি। সেই পাঞ্জাবিটার কথা মনে পড়ল, যেটার ওপরে কালো বৃষ্টির ফোঁটা পড়েছিল সুনয়নাদের ছাদে। কাচার পরে পাঞ্জাবিটার কয়েক জায়গায় বৃষ্টির ফোঁটার মাপে ফুটো হয়ে গিয়েছিল।

সরু গলি থেকে বেরিয়ে চায়ের দোকানের দিকে ঘুরল আদিত্য। রাস্তা যেন গতকালের চেয়েও ফাঁকা। চায়ের দোকানেও কোনও জটলা নেই। মাঝে-মাঝে কয়েকটা প্রাইভেট কার, লরি, টেম্পো, অটো পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। সবগুলোই মানুষ বোঝাই। অরবিন্দ সেতু বিকল হওয়ার পর এই ছোট রাস্তাটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। ব্রিজের দু-প্রান্তে আড়াআড়ি লোহার রড বেঁধে করোটি ও কাটাকুটি হাড়ের ছবিওয়ালা প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে ব্রিজ সারানোর কোনওরকম কাজ শুরু হয়নি। এই পরিস্থিতিতে কিছু হওয়ার সম্ভাবনাও বোধহয় নেই।

আদিত্য চলতে-চলতে এপাশ-ওপাশ টর্চ ঘোরাচ্ছিল। হঠাৎ দেখল একজন মানুষ রাস্তার ধারে একটা বাড়ির রোয়াকে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে টর্চের আলোয় কী যেন একটা পড়ার চেষ্টা করছে।

আদিত্য চিনতে পারল। শঙ্করানন্দ চক্রবর্তী। মহাদেবদার বাবা। ও কাছে এগিয়ে গেল। চেঁচিয়ে ডাকল, 'কী করছেন, মেসোমশাই?'

বৃদ্ধ চমকে মুখ তুলে তাকালেন। ঘোলাটে চোখের মণি দেখা যাচ্ছে না। ফরসা মুখে ভাঁজের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। হাতের কাগজটা লুকোতে যাচ্ছিলেন স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায়। মুখের ভাবও হয়ে গিয়েছিল অস্বাভাবিক। কিন্তু আদিত্যকে চিনতে পেরে যেন ভরসা পেলেন। চোখ-মুখ কিছুটা উজ্জ্বল হল। চোখের মণিও যেন স্পষ্ট হল। হাতের কাগজটা বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'দিতু, মহাদেবের চিঠি এসেছে। আজ বিকেলে।'

আদিত্য বোধহয় অবাক চোখে তাকিয়েছিল বৃদ্ধের দিকে। ছেলের চিঠি রাতের বেলা রাস্তায় এসে পড়ার দরকার কী?

শঙ্করবাবু সেটা লক্ষ করেই হয়তো অপ্রস্তুতভাবে বললেন, 'তোমার মাসিমা কদিন ধরে খুব খিটখিটে হয়ে গেছে। দিনরাত খালি বলছে, এই বিপদে মহাদেব তো আমাদের নিয়ে যেতে পারত ওর কাছে। যত বোঝাই, ওর সেখানে কত কাজ, কিছুতেই বুঝবে না। মহাদেবের নাম শুনলেই খেপে উঠছে। আমাকে বলছে, সবাই পালাচ্ছে—চলো, আমরাও চলে যাই—' শঙ্করবাবু হাসলেন। বড় নির্মল মজার হাসি। বললেন,

'কী যে বলে তোমার মাসিমা। মাথাটাই বোধহয় গোলমাল হয়ে গেছে। আরে, আমরা ভিটে ছেড়ে চলে গেলে তারপর কী হবে বুঝতে পারছ! কলকাতায় এলে আমার ছেলেটা, নাতিটা মাথায় একটা ছাদ খুঁজে পাবে না। সেটা ওকে বোঝায় কার সাধ্যি!' শঙ্করবাবু হঠাৎই কাশতে শুরু করলেন। কাশির দমকে বৃদ্ধের শরীরটা ঝাঁকুনি খেয়ে উঠছিল বারবার। কাশি আর থামতেই চায় না। মুখ লাল, চোখ বড়-বড় হয়ে গেছে। একটা হাত চলে গেছে গলা-বুকের কাছে।

আদিত্য ভয় পেয়ে বৃদ্ধের পিঠে হাত রাখল। শীর্ণ খাঁচাটা কাঁপছে থরথর করে। ও বলল, 'আপনি বাড়ি যান, মেসোমশাই—।'

একসময় থামল কাশি। হাঁ করে হাঁফাতে লাগলেন বৃদ্ধ। জিভ দেখা গেল। আদিত্যর মনে পড়ল, দেশবন্ধু পার্কে দৌড়োনো অ্যালসেশিয়ান কুকুরের কথা। কুকুরদের জিভ দিয়ে ঘাম ঝরে। এই মারাত্মক পরিবেশে সবকিছুই কেমন বদলে যাচ্ছে। অচেনা লাগছে সবকিছু। আদিত্য মনেপ্রাণে চাইল, গত সাতদিনের ঘটনাটা যেন একটা দুঃস্বপ্ন হয়। ও যেন জেগে ওঠে ঘুম থেকে এবং দেখে যে, ও বিছানায় শুয়ে আছে। চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যাক এই কঙ্কালসার বৃদ্ধের হাঁফানো চেহারার অপচ্ছায়া।

কিন্তু অপচ্ছায়াটা আদিত্যর প্রার্থনা শুনল না। কয়েকবার ঢোঁক গিলে বলে উঠল, 'দিতু, বাড়িতে আমি এক মুহূর্ত টিকতে পারছি না। তাই মহাদেবের চিঠিটা লুকিয়ে রেখেছিলাম পকেটে। তাও কি আমাকে বেরোতে দেয় বাড়ি থেকে! বলে, একা-একা থাকলে তোমার মাসিমার নাকি ভয় করবে। এখন খাবার জোটানোর নাম করে রাস্তায় বেরিয়েছি। শুনলাম, মানিকতলায় বস্তিতে নাকি সরকারি খাবার বিলি হচ্ছে। এদিকটায় তো খাবারের গাড়ি আসেনি, তাই ভাবছিলাম—' আবার কাশি এল। থামল একটু পরে।

আদিত্য গলা তুলে জিগ্যেস করল, 'আপনার বাড়িতে খাবার নেই?'

শঙ্করবাবু তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়লেন ঃ 'না, না—আছে, বার্লি আর সাবু আছে। দুপুরে বার্লি খেয়েছি। জ্বরজারি হলেই খাই। তা এমনি খারাপ লাগল না।'

আদিত্য হতভম্ব হয়ে বুড়ো মানুষটাকে দেখছিল। বুঝতে পারল, গিরগিটিটা গলা থেকে এখনও যায়নি। ও কোনওরকমে জিগ্যেস করল, 'মহাদেবদারা কেমন আছে, মেসোমশাই?'

'ভালো। খুব ভালো। ওদের ওখানে ধোঁয়া নেই, কালো বৃষ্টি নেই। বেশ নিশ্চিন্তে আছে।'

আদিত্য নীচু গলায় বলল, 'আপনি বাড়ি যান, মেসোমশাই—।'

বৃদ্ধ ওর কথা বোধহয় বুঝতে পারলেন না। উৎসুক চোখে তাকালেন।

আদিত্য মাথা নাড়ল, তারপর এগিয়ে গেল। একটু দূর থেকেও আবছা দেখা গেল, বৃদ্ধ আবার হাতের কাগজটার ওপরে ঝুঁকে পড়েছেন।

সুনয়নাদের বাড়িটা যতই কাছে এগিয়ে আসতে লাগল, ততই অক্সিজেন

আশঙ্কা অনিয়তাকার চেহারা নিতে লাগল। পরশুদিন ওদের বাড়িতে শেষবার গিয়েছিল। তখন সুনয়নার মাকে খুব সুস্থ দেখেনি। শরীরের অসুস্থতা যত না, তার চেয়ে বেশি ছিল মনের অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা। মেয়ের জন্য। মেয়ের বাবার জন্য। টোকিও থেকে ফোন এসেছিল সুখেন্দুবাবুর। ফিরতে ক'দিন দেরি হবে। টোকিও থেকে ওসাকায় যাবেন বিশেষ দরকারে। সেখান থেকে টোকিও ফিরে বাকি কাজ সেরে তারপর কলকাতা রওনা হবেন। নয়না বাবাকে জানিয়েছিল কলকাতার অবস্থা। তাতে সুখেন্দুবাবু বিচলিত হননি। শান্তভাবেই বলেছেন, বিপদ-আপদ দেখা দিলে নরোত্তম কওশিককে জানাতে। কওশিক ওদের চাঁদনি চকের দোকানের ম্যানেজার। প্রায় মাঝবয়েসি, তবে স্বাস্থ্যবান চেহারা। আদিত্য তাঁকে কয়েকবার দেখেছে নয়নাদের বাড়িতে। নয়নার মায়ের কাছেই শুনেছে, নরোত্তম খুব সৎ এবং পরিশ্রমী। আজকের দিনে এরকম মানুষ বিরল।

আদি সপ্তগ্রামে নয়নাদের এক প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি আছে। প্রায় পনেরো বিঘে জমি জুড়ে। আদিত্য একবার ওদের অফিস থেকে সেখানে পিকনিকে গিয়েছিল। নয়নাই বাবার কাছ থেকে অনুমতি ও চাবি জোগাড় করে দিয়েছিল। সুখেন্দুবাবু বলেছেন, অবস্থা খারাপের দিকে গেলে চিন্তার কোনও কারণ নেই। নরোত্তম মা-মেয়ে ও বাড়ির লোকজনকে নিরাপদে পৌঁছে দেবে সেখানে। সেখানেও যদি বিপদ দেখা দেয়, তা হলে টাকার ব্যবস্থা করা আছে, নরোত্তমই যা ভালো বোঝে করবে। ভয়ের কিছু নেই।

'...জো ডর গয়া, সঁমঝো কে মর গয়া...।'

নয়নার কথাটা বেজে উঠেছিল আদিত্যর কানে। আবার একইসঙ্গে মনে পড়ে গেল ওর আর-একটা প্রশ্ন : 'দিতুদা, কী হবে বলুন তো শেষ পর্যন্ত?'

আদিত্য মন খারাপ করে ফিরে এসেছিল সেদিন। নয়না বলেছিল, 'দিতুদা, এখন পড়া-টড়া হবে না। সব ঝামেলা মিটে যাক, তারপর...।'

তা হলে আজ কেন এই জরুরি তলব?

দরজায় পৌঁছে কলিংবেল বাজাল আদিত্য। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে সুনয়নাই দরজা খুলল।

ওদের সদরের আলোটা টিমটিম করছিল। ওর মুখটা ঠিক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না।

আদিত্য ইয়ারকি করেই টর্চটা জ্বেলে তাক করল সুনয়নার মুখে।

ও চোখ কুঁচকে মুখ ঘুরিয়ে নিল : 'কী হচ্ছে, দিতুদা!'

'ফাজলামি।' আদিত্য বলল, 'বানান করে দেব?' তারপর টর্চ সরিয়ে নিল।

সুনয়না কয়েকসেকেন্ড চুপ করে রইল। অবাক চোখে দেখতে চেষ্টা করল আদিত্যকে। দিতুদার কথায় কোনও কুয়াশা নেই, কালো বৃষ্টিও নেই। নয়না বলল, 'আসুন, ভেতরে আসুন—।'

বাড়িতে ঢুকতে-ঢুকতে আদিত্য বলল, 'কী ব্যাপার? এরকম বেটাইমে তলব!'

সদর দরজা বন্ধ করে দিয়ে দরজার পিঠে হেলান দিয়ে দাঁড়াল নয়না। বলল, 'আমরা কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি, দিতুদা। কাল সকালে।'

আদিত্য কোনও কথা বলল না। ওরা চুপচাপ ঘরে এসে ঢুকল।

ঘরের টিউব লাইটের আলোয় অনেক স্পষ্ট করে দেখা গেল মেয়েটাকে। পরনে জাম রঙের ম্যাক্সি। তার মধ্যে সাদা বুটি। মাথার ছোট-ছোট চুল অবাধ্য ঢঙে এলোমেলো। চোখের নীচে ময়লা ছোপ। ঠোঁটের অভিমান আরও তীব্র। সব মিলিয়ে এক অপ্রত্যাশিত রুক্ষতা। সবুজের ছিটেফোঁটাও নেই আর।

'আমরা কাল চলে যাচ্ছি, দিতুদা।' সুনয়না আবার বলল। ও দরজার কাছটায় দাঁড়িয়ে।

আদিত্য লম্বা সোফাটার ওপরে বসে পড়েছিল। ঘরটায় চোখ বুলিয়ে নিল একবার। দেখল, দেওয়াল ঘেঁষে কয়েকটা 'আলফা' সুটকেস আর সফ্ট লাগেজ সাজানো। এ ছাড়া বাকি সবকিছু আগের মতোই। বালক শ্রীকৃষ্ণ এখনও হাসছে। আর প্রকৃতির ছবি দুটোয় আকাশ এখনও নীল, গাছপালা এখনও সবুজ।

আদিত্য ঠিক বুঝে উঠতে পারল না ওর এখন কী করা উচিত। ও অন্য যে-ছাত্রটিকে পড়ায়—অভিজিৎ—তারা তিনদিন আগেই ঘরদোরে তালা দিয়ে চলে গেছে। যাওয়ার খবরটা ওরা পৌঁছে দিয়েছিল আদিত্যকে। তবে বলেছিল, 'কোথায় যাচ্ছি জানি না। কবে ফিরব তাও জানি না।'

এই ছাত্রীও যাচ্ছে। যাবে না কেন? সবাই তো চলে যাচ্ছে। পাড়া প্রায় শ্মশান হয়ে এল।

আদিত্য বলল, 'তোমাদের আরও আগে চলে যাওয়া উচিত ছিল।'

'জানি। কিন্তু মায়ের শরীরটা যে খারাপ হল হঠাৎ। মিস্টার কওশিক রোজ আসছেন। আজও এসেছিলেন। আমাদের দুটো গাড়িতেই তেল ভরতি করা হয়ে গেছে। আর ছ'টা জেরিক্যানে বাড়তি ডিজেল আর পেট্রল নেওয়া হয়েছে। আর এই মালপত্র। উনি কাল সকালে আর একটা ম্যাটাডর ভ্যান নিয়ে আসবেন...।'

আদিত্য মা, মুন্নি, পলাশ, লতা, নানকুর কথা ভাবল। ভাবল শুভেনের কথা। ওর শয্যাশায়ী বাবার কথা। শঙ্করবাবুর কথা। সুবোধদার বাচ্চা মেয়েটার কথা। নয়নার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হল, নয়না ওর কাছ থেকে কিছু শুনতে চাইছে।

আঙুলের ডগায় আঙুল ঘষল আদিত্য। বলল, 'যাও। তবে সাবধানে যেয়ো। সাবধানে থেকো। সময় পেলে চিঠি দিয়ো...।'

আদিত্য টের পেল, গলার গিরগিটিটা এখনও যায়নি।

সুনয়না কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল। তারপর দু-তিন পা এগিয়ে এল ঘরের ভেতরে—আদিত্যর দিকে। দু-হাত পিছনে রেখে থুতনি সামান্য উঁচু করে দাঁড়াল।

আদিত্য ওর দিকে তাকিয়ে ছিল। সুনয়নার বুকের দিকে নজর গেল ওর। অপরাধবোধ মনের মধ্যে কামড় বসাচ্ছিল, কিন্তু ও তক্ষুনি চোখ ফেরাতে পারল না। নয়নার ছিপছিপে শরীরের তুলনায় বুকজোড়া উদ্ধত, বেপরোয়া। আদিত্যর অস্বস্তি হল। ছাত্রীকে এমন চোখে দেখা কি ঠিক? কিন্তু নয়না ওর তাকানো ভ্রূক্ষেপই করল না। আচমকা বলল, 'দিতুদা, আপনারাও চলুন—আমাদের সঙ্গে—।'

আদিত্য কিছুক্ষণ কোনও জবাব দিতে পারল না। ওর মনে পড়ল, নয়না কখনও ওদের বাড়িতে যায়নি। আদিত্যও যেতে বলেনি কখনও। কারণ, সবসময়েই ওর মনে পড়ে যেত দুর্বল দিকগুলোর কথা। অন্তত যে-জিনিসগুলোকে ওর নিজের দুর্বল বলে মনে হয়। বাড়ির ড্যাম্প ধরা দেওয়াল, সর্বত্র এলোমেলো ব্যাপার, নিতান্তই ছাপোষা বাড়ির ছাপোষা বাসিন্দা...ওঃ। মনে হত, বাড়ির বাইরের জগৎটা কত সুন্দর। আর এখন? অসহ্য ধোঁয়াশার গতিপথ কেউই রুখতে পারেনি! অনায়াসে তা সিংদরজা কিংবা ফাটা ঘুণ ধরা কাঠের পাল্লা পেরিয়ে গেছে। কোনওরকম শ্রেণিবিচার করেনি।

'কী হল, দিতুদা, যাবেন না আমাদের সঙ্গে?'

গাড়ি দুটোর কথা মনে পড়ল আদিত্যর। ডিজেল আর পেট্রোলে টইটুম্বুর ট্যাঙ্ক নিয়ে যেন দু-দুটো তেজীয়ান বুড়ো ঘোড়া অপেক্ষা করছে। সামনে লম্বা দৌড়।

আদিত্য নয়নাকে বসতে বলল। আর তখনই নয়নার মা ঘরে এলেন। হাতে একটা খাম। সেটা আদিত্যর দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বললেন, 'এটা দেওয়ার জন্যেও তোমাকে ডেকেছিলাম। নয়না তো বলেছে বোধহয়—আমরা কাল সকালে চলে যাচ্ছি।'

মাসের মাত্র এগারো দিন পেরিয়েছে। ক'দিনই বা পড়াতে এসেছে আদিত্য। কিন্তু এখন টাকার দরকার। হাজার টাকা নেহাত কম নয়। বিপদের সময় টাকার দাম আরও বেড়ে যায়।

আদিত্য নির্লজ্জের মতো হাত বাড়িয়ে খামটা দিল। বলল, 'আপনার শরীর কেমন আছে?'

'এখন তো একরকম। পরে যদি আবার খারাপ হয়, তাই আর দেরি করছি না, কালই রওনা হচ্ছি।'

সুনয়নার ধৈর্যের সীমানা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছিল মাপে। হঠাৎই ও বলল, 'মা, দিতুদারাও চলুক না আমাদের সঙ্গে—।'

ওর মা অদ্ভুত হেসে দেখলেন আদিত্যকে। বললেন, 'গেলে তো ভালোই।'

সুনয়নার মায়ের হাসিটা দেখে কষ্ট হল আদিত্যর। পুরোপুরি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে মানুষ যখন এগোয় তখনই বোধহয় সে এরকম হাসি হাসতে পারে।

এ-হাসিতে কোনও পিছুটান নেই।

আদিত্যর যে আজ কী হয়েছে! ছাত্রীকে আজই প্রথম বোধহয় ও তরুণী হিসেবে ভাবছিল। বারবার খুঁটিয়ে দেখছিল মেয়েটাকে। ইস্, ওর কপালের তিলটাকে কতদিন ভালো করে দেখা হয়নি। ও ভাবত তিলটা বোধহয় ডানদিকে। কিন্তু না, ওটা তো বাঁ-দিকে রয়েছে। বাঁ-দিকেই বেশি মানিয়েছে। দু-ভুরুর মাঝখানে গাঢ় রঙের টিপটাও কী সুন্দর! ম্যাক্সিটা কি একটু আঁটোসাঁটো লাগছে ওর গায়ে? আরে, পায়ের নখে রং দিয়েছে! বেশ দেখাচ্ছে তো! কানের লতিতে লাল-সবুজ দুলটাও চমৎকার।

'দিতুদা—' সুনয়না অন্যরকম গলায় ডাকল। ওর চোয়ালের রেখায় এখন আর নমনীয়তা নেই।

'কাল সকালে আমাকে সোনারপুর যেতে হবে—বউদিদের বাড়ি খোঁজ নিতে।' আদিত্য বলল, 'সেখান থেকে ফিরে এসে তারপর রওনা দেব। এখানে আর ভরসা পাচ্ছি না—।'

মা ও মেয়ে একইসঙ্গে বলে উঠল ঃ 'ট্রেনে যাওয়া অসম্ভব!'

আদিত্য ভুরু কুঁচকে সপ্রশ্নে তাকাল।

সুনয়নার মা তখন বললেন, 'কওশিকজির কাছেই শুনছিলাম। কলকাতার বাইরে থেকে ট্রেন প্রায় আসছে না বললেই চলে। সব ট্রেনই রওনা হচ্ছে কলকাতা ছেড়ে। তবে—।'

আদিত্য ধৈর্য না হারিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

'—মানে, ট্রেনে চড়ার জন্যে নাকি সাংঘাতিক ভিড়। তুমি সোনারপুর খবর নিতে যেতে পারবে না।...আর গেলেও ফিরতে পারবে কি না সন্দেহ...।'

আজ, এখন, আর কেউ চা-বিস্কুট নিয়ে এল না। আসার কথাও নয়। সবকিছুরই ছন্দ নষ্ট হয়ে গেছে। আতিথেয়তারও।

সুনয়নার মা তখনও কথা বলছিলেন, '...শুরুর দিকে ভেবেছিলাম, এ-ব্যাপারটা বেশিদূর গড়াবে না। কিন্তু এখন...কওশিকজির কাছে শুনলাম, টিভি, রেডিও আর খবরের কাগজের অফিসের লোকদের নাকি গ্যাস-মুখোশ দেওয়া হয়েছে। কোনওরকমে কাজ চলছে সেখানে। এ ছাড়া দোকানপাট, ব্যাবসা সবই প্রায় বন্ধের মুখে। রাস্তাঘাটে সাফাইয়ের কাজ বন্ধ হওয়ার জন্যে নানা অসুখবিসুখ ছড়িয়ে পড়ছে সব জায়গায়। পথেঘাটে খুন-জখম-রাহাজানি বেড়ে গেছে...।'

অরবিন্দ সেতুর ওপরে সেই রাহাজানির রাতটার কথা মনে পড়ে গেল আদিত্যর। মাসিমা কি পুরো ব্যাপারটা জেনেছেন? কে জানে!

একটু সময় নিয়ে আদিত্য বলল, 'কাগজে তো এত সব লেখেনি—।'

'বোধহয় সবাই ভয় পেয়ে যাবে, তাই। তবে প্রাইভেট চ্যানেলে কিছু-কিছু দেখিয়েছে। নয়না বলছিল, ও দেখেছে।'

শেষ কথাটা বলার সময় মেয়ের দিকে তাকিয়েছিলেন সমর্থনের আশায়। কিন্তু সমর্থন মিলল না। সুনয়না পুরোনো কথাটাই বলল আবার, 'দিতুদা, আপনারা তা হলে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন তো? কাল সকালে আমরা স্টার্ট দিচ্ছি কিন্তু—।'

'যাব—' আদিত্য বলল। লক্ষ করল ঘরের ধোঁয়াশা ফিকে হয়ে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে।

সুনয়নার মা চেয়ারে বসেছিলেন। আদিত্যর কথায় যেন স্বস্তি পেলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ভালোই হল, তোমরা থাকলে আমরাও অনেকটা ভরসা পাব।' তারপর শিথিল পায়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। যাওয়ার আগে শ্রীকৃষ্ণের ফটোর দিকে তাকালেন একবার।

সুনয়নার চোয়ালের রেখা কিছুটা নরম হয়েছিল। ও হঠাৎই বসে পড়ল সোফার কোণে—আদিত্যর কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে। ঘাড় তেরছা করে জিগ্যেস করল, 'দিতুদা, আপনি আমাকে ভয় পান?'

আদিত্য মুখ তুলে বুক খালি করে শব্দ করে হেসে উঠল। হাসতেই থাকল। হাসির ছোঁয়াচ নয়নার মুখেও লাগছিল।

হাসির দমক কিছুটা কমলে পর আদিত্য বলল, 'তোমার কথাই ঠিক। আমি ছোটবেলায় ভূত তাড়িয়ে বেড়াতাম। মাস্টারি আমাকে মানায় না।'

সুনয়না বিমূঢ়ভাবে বলল, 'তাতে কী?'

আদিত্য হাসতে-হাসতেই বলল, 'আজ বুঝলাম, মাস্টারিটা মানায় তোমাকেই। মাস্টারদের আমি ভয় পাই। আমি আবার ভূত তাড়ানোর চাকরিতে ফিরে যাব।'

সুনয়না দু-হাত কোলের কাছে জড়ো করে মাথা নেড়ে জিগ্যেস করল, 'বলুন তো, ভূত আছে কি নেই?'

'কী করে বলব, হয়তো আছে—।'

'ভূতের আয়ু ক'বছর হতে পারে, দিতুদা? মানুষের সমান?'

আদিত্য ঠাট্টা করে হাত নাড়ল : 'ধ্যাৎ, ভূত আবার মরে গিয়ে ভূত হতে পারে নাকি! ভূত যদি থাকে তো সে অমর।'

'বাঃ, গ্র্যান্ড। তা হলে তো বিশ লক্ষ বছরের পুরোনো আফ্রিকার আদিম মানুষ অস্ট্রালোপিথিকাস-এর ভয়ংকর আত্মা আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর বুকে—।'

নয়না হাসছিল। আদিত্যও হেসে বলল, 'ও বেচারা ঘুরে বেড়ালে তোমার মাথাব্যথা কেন বুঝতে পারছি না।'

নয়না বলল, 'আমি আমার কথা ভাবছি, দিতুদা। আমি যদি মরে যাই তাহলে ওরকম লক্ষ কোটি বছর ধরে ঘুরঘুর করতে পারব না, বাবা!'

'আমি যদি মরে যাই...'। আদিত্যর মাথার ভেতরে ধোঁয়াশায় বিভ্রান্ত একটা এরোপ্লেন পাক খেতে শুরু করল। টালমাটালভাবে উড়তে উড়তে ওটা বিপজ্জনকভাবে গোঁৎ খেয়ে নামতে লাগল নীচের দিকে। বহু নীচের ভূমিখণ্ড বিদ্যুৎগতিতে ছুটে

আসতে লাগল আদিত্যর কাছে। ওর খাদ্যনালির পিছল দেওয়ালে নখ বসিয়ে গিরগিটিটা বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। উঁকি মারতে চাইছে আলজিভের পাশ দিয়ে। বাতাস নিতে চাইছে বুক ভরে।

সুনয়না খুব হাসছিল। হাসির কুচি ছড়িয়ে পড়ছিল ঘরের মধ্যে। আদিত্য গভীরভাবে দেখছিল ওকে। চেনা-অচেনা দুটো স্তরের মধ্যে দোলাচলে মগ্ন ওর ছবিটা।

বাড়ি ফেরার পথে মনে হল যেন শ্মশানের পথ ধরে হাঁটছে। শুধু আশেপাশে কোনও ছন্নছাড়া নেড়ি কুকুর নেই।

এমনসময় দূর থেকে ভেসে আসা কয়েকটা 'গুম-গুম' শব্দ শুনতে পেল আদিত্য। বোমার শব্দ? তারপরই তীব্র কানফাটানো শব্দ অনেকগুলো ঃ ক্র্যাক-ক্র্যাক-ক্র্যাক—। গুলির আওয়াজ?

অন্য সময় হলে আদিত্যর মনে এখন অনেকরকম প্রতিক্রিয়া হতে পারত। কিন্তু ও অলস পায়ে চুপচাপ হাঁটতে লাগল। ভাবতে লাগল, বোমা, গুলি, ধোঁয়া আর কালো বৃষ্টি—এর মধ্যে কোনটা সবচেয়ে মারাত্মক। অরবিন্দ সেতুর মুখে লাগানো করোটির ছবিটা ভেসে উঠল আদিত্যর চোখের সামনে। ভাবল, 'আমাদের প্রত্যেকের শরীরেই একটা করে করোটি রয়েছে।'

সুনয়নার শেষ কথাটা আবার মনে পড়ে গেল ওর।

॥ আট ॥

এরকম ভয়ংকর দৃশ্য আদিত্য কখনও দেখেনি।

একটা দুঃস্বপ্নের নগরীর রাস্তা ধরে ছুটে চলেছে ওদের গাড়ি। প্রথমে চকোলেট রঙের মারুতি গাড়ি। গাড়িতে নরোত্তম কওশিক, দশরথ, পলাশ, লতা আর নানকু। একজন ছোকরা ড্রাইভার চালাচ্ছে।

তার পিছনে সাদা জিপসিতে আদিত্য, মুন্নি, মা, সুনয়না আর সুনয়নার মা। গাড়ি চালাচ্ছে বিশু নামের একজন মোটাসোটা ড্রাইভার।

সবার পিছনে একটা সবুজ ম্যাটাডর ভ্যান। ভ্যানে মালপত্র বোঝাই। মালপত্র ছাড়া সেখানে রয়েছে ডিজেল আর পেট্রোলের জেরিক্যান। ভ্যানের ড্রাইভার ছাড়া গাড়িতে রয়েছে নয়নাদের বাড়ির দুজন কাজের লোক—একজন রোগা কিশোর, আর একজন প্রায় বৃদ্ধ, বহুদিন ধরে ওদের বাড়িতে রয়েছে।

মারুতি গাড়িতে বসা কওশিকের নির্দেশমতোই গাড়ি চালাচ্ছে ড্রাইভার। আদিত্যদের জিপসি ও ম্যাটাডর ভ্যান শুধু মারুতিকে অনুসরণ করছে।

খুব ভোরে মালপত্র নিয়ে সুনয়নাদের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিল আদিত্য। ঘুমন্ত নানকু ছিল লতার কোলে। পলাশের হাত ধরে ছিল আদিত্য। আর মা নির্ভর করেছিল

মুন্নির ওপরে।

জিনিসপত্র নিয়ে সবাই বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসার পর সদর দরজায় তালা দিচ্ছিল আদিত্য। তখনই মা কেঁদে উঠেছিল। মুন্নিও। সুরেন্দ্র নিলয়ে তালা পড়ছে। দেওয়ালে ফাটল ধরা, ঢালাইয়ের রড বেরিয়ে থাকা এই বাড়িতে আর কখনও কি ফিরে আসতে পারবে ওরা?

আদিত্য দেওয়ালগুলো দেখল। ড্যাম্পের ছাপে তৈরি কী সুন্দর সব বিমূর্ত ছবি! সদরের মাধবীলতা গাছটা দেখে কষ্ট হল আদিত্যর। শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া এক নিষ্ঠুর কঙ্কাল। তার নীচে কালচে মাটির আড়ালে বাবার অস্থিভস্ম, ভক্তদাসের দেহাবশেষ। ওগুলো ধীরে-ধীরে মিশে যাবে দূষিত মাটির অণুতে।

আশ্চর্য! ওরা চলে আসছে, তখন একটা নির্লজ্জ অপচ্ছায়া পিছন থেকে গলা ফাটিয়ে মাকে ডাকছিল ঃ 'নিভা! নিভা! কবে ফিরবে তোমরা? চিন্তা কীসের, বাড়ি দেখার জন্যে আমি তো রইলাম। নিভা—নিভা—।'

মা পিছন ফিরে তাকিয়েছিল। স্মৃতি বড় বেহায়া। যেখানে-সেখানে উদোম হয়ে পাগলের মতো নাচে। কারও মানা শোনে না।

ছিন্নমূল পরিবারের মতো পা ফেলে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল ওরা। চারপাশে কোনও শব্দ নেই। পাখি নেই, গাছের পাতা নেই। আকাশ ঘোলাটে। গতকাল মাঝরাতে আবার কালো বৃষ্টি হয়েছে। তবে এখন আর কেউ ভয় পাচ্ছে না। শুধু অপেক্ষা করছে।

নাকে ভিজে কাপড় চাপা দিয়ে দুর্গন্ধ ও দূষণ আড়াল করতে চাইছিল ওরা। ধোঁয়াশার হালকা আবরণ যেন শীতের ভোর তৈরি করেছে। নির্জন পথে পা ফেলতে-ফেলতে আদিত্যর মনে হল গাড়িতে রওনা হয়ে শেয়ালদা স্টেশনের কাছটা একবার ঘুরে গেলে হয়। গতকাল লতাকে ট্রেনের ব্যাপারটা বলেছিল আদিত্য, কিন্তু ওর মুখ দেখে মনে হয়নি খুব একটা বিশ্বাস করেছে। তবে এটা ঠিক ওর অফিসে যারা বাইরে থেকে আসত, তারা বলেছিল, অবস্থা খারাপ দেখলে আসা বন্ধ করে দেবে। তারপর তো অফিস-দোকানপাট সব বন্ধের মতোই হয়ে গেল। কে জানে, কলকাতা থেকে দূরে যারা আছে, তারা এখনও নিশ্চিন্ত আছে কি না!

না-নিলেই-নয় এমন সব জিনিসই ওরা সঙ্গে নিয়েছে। তা ছাড়া গয়নাগাটি টাকাপয়সা। পরিস্থিতি যখন ঘোরালো হচ্ছিল তখনই ব্যাঙ্কের শতকরা নব্বই ভাগ টাকা তুলে নিয়েছিল আদিত্য। সেসময় থেকেই সব ব্যাঙ্কে টাকা তোলার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। তবে কে জানে, এখনও যেসব বিপদের মুখোমুখি হতে হবে, টাকার বিনিময়ে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে কি না।

মুন্নি ভক্তদাসের খালি খাঁচাটা হাতে করে হাঁটছিল। মা কিছুতেই ওটা ছেড়ে যেতে রাজি হয়নি। খাঁচাটা অল্প-অল্প দুলছিল। পাখি নেই। একটা পুরোনো গানের কলি মনে পড়ল আদিত্যর ঃ 'পাখি উড়ে যাবে বলে খাঁচা কিনি না—।' ও তাকাল

চারপাশে। ওরা যে-খাঁচায় বন্দি তার দেওয়ালটা কত দূরে? তার দরজাটা খোলা আছে তো?

গাড়িতে সদলবলে গুছিয়ে ওঠা থেকে শুরু করে রওনা হওয়া পর্যন্ত সুনয়নার মেজাজ বেশ হালকা ছিল। যে-কোনও ব্যাপারের মধ্যেই একটা না একটা সুবিধের দিক খুঁজে বের করছিল মেয়েটা। কওশিকজিকে ও-ই বলেছিল কলকাতার কয়েকটা জায়গা দেখার কথা। তার সঙ্গে আদিত্য শুধু শেয়ালদার কথাটা যোগ করেছিল। কারণ, বউদির চোখের জলে ভেজা ফোলা চোখ দুটোর করুণ অবস্থা ওর নজর এড়ায়নি।

গাড়ি সরু রাস্তা ছেড়ে বড় রাস্তায় পড়ল। কাল রাতে বৃষ্টি হওয়ায় কুয়াশা অনেকটা ফিকে। তবে গাড়ি চালাতে হচ্ছিল সাবধানে। দোকানপাট সবই বন্ধ থাকায় পরিবেশ থমথমে। রাস্তায় যত রাজ্যের আবর্জনা, পশুপাখির মৃতদেহ—দুর্গন্ধের ঝাপটায় গা গুলিয়ে উঠছে। যে-ক'টা গাড়ি দেখা গেল সবই লোকজন আর মালপত্রে বোঝাই। মাঝে মাঝে সাইরেন বাজিয়ে ছুটে যাচ্ছে পুলিশের জিপ, মোটরবাইক। আরোহীদের মুখে অদ্ভুত ধরনের গ্যাস-মুখোশ। এ ছাড়া খবরের কাগজ, টেলিভিশন কোম্পানি আর হাসপাতালের গাড়িও চোখে পড়ল। এখানে-ওখানে লোকজন হেঁটে যাচ্ছিল। তাদের হাতে সুটকেস, ব্যাগ, পোঁটলা-পুঁটলি।

গাড়িতে সবাই চুপচাপ বসেছিল। মা চশমা খুলে চোখ মুছছিল বারবার। মুন্নি মায়ের হাঁটুর কাছটা খামচে ধরে বসে। ফ্যাকাসে আলোছায়া সকলের মুখে।

সুনয়না হঠাৎই বলল, 'দিতুদা, দেখেছেন কুয়াশা কেমন ফিকে হয়ে গেছে! আমি বেট রেখে বলতে পারি তিনদিনের মধ্যেই সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে।'

আদিত্য হাসল। নয়নাকে দেখল। সাদার ওপরে নানা রঙের ছাপ দেওয়া সুইস কটনের টিশার্ট পরেছে, আর 'হারা' জিন্স। মাথার খাটো চুলে শ্যাম্পু। মুখে কীসব মেখেছে—বেশ চকচক করছে। কানে স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি আধুনিক নকশার ইয়ারিং।

কিছুক্ষণ রাস্তা দেখার পর চোখ ফিরিয়ে নিল আদিত্য। অলস চোখে দেখতে লাগল ড্যাশবোর্ডের মিটারগুলো। যন্ত্রের কাঁটা এখন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

গাড়ি নির্জন সারকুলার রোড ধরে ছুটছিল। রাস্তার দুপাশের বহুতল বাড়ির ফাঁকে-ফাঁকে গাছগাছালির কঙ্কাল।

হঠাৎই অস্বাভাবিকভাবে ব্রেক চাপল বিশু। সবাই ছিটকে পড়ল এ-ওর ঘাড়ে। ধোঁয়ার আড়াল থেকে আচমকা কয়েকটা লোক হাজির হয়েছে গাড়ির সামনে। ওদের দুজনের হাতে লম্বা বাঁশের লাঠি। আর-একজনের হাতে একটা বড় হাতলওয়ালা কুড়ুল। সঙ্গে আরও দু-তিনজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখে ঘৃণা ও হিংসার ছাপ।

নয়না 'বিশুদা! জোরে চালাও, জোরে!' বলে চিৎকার করে উঠল।

মারুতি গাড়িটা একটু আগে বেরিয়ে গেছে লোকগুলোর নাগালের বাইরে।

সুতরাং আদিত্যদের জিপসিটাকে বাগে পেয়ে সামনের লোক দুটো ভয়ঙ্কর চিৎকার করে আক্রমণ করে বসল। কুড়ুলের প্রচণ্ড আঘাতে এসে পড়ল জিপসির সাদা বনেটে। তারপরই নিষ্ঠুর লাঠির সংঘাত।

মুন্নি ভয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ছোড়দা! সাবধান!'

বিশু প্রাণপণে স্টিয়ারিং ঘোরাল ডানদিকে। একটা লোক হেডলাইটের ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল রাস্তায়।

আদিত্য বিশুর পাশেই বসেছিল, চট করে মাথা নীচু করে আড়ালে লুকোতে চাইল। গাড়িটা টাল খেয়ে চাকায় বীভৎস ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে লোকগুলোকে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল সামনের দিকে। মারুতি গাড়িটাকে তখনও দেখা যাচ্ছে সামনে।

আদিত্য মাথা তুলে বলল, 'নয়না, দ্যাখো তো, পেছনের ম্যাটাডরটা ঠিকমতো আসছে কি না—।'

সুনয়নার মুখের রক্ত কেউ পলকের জন্য শুষে নিয়েছিল। গলা বাড়িয়ে দেখে ও ঘাড় নাড়ল, 'আসছে।'

সুনয়নার মা বললেন, 'ওই সাংঘাতিক লোকগুলো কি গুন্ডা না পাগল? আমার বুক ধড়াস-ধড়াস করছে।'

আদিত্য পিছন ফিরে মা-কে দেখল। শীর্ণ বৃদ্ধা মেয়ের আরও কাছে সরে বসেছে। চোখ বোজা। বিপদ ভুলে থাকার জন্য স্মৃতি রোমন্থন, না ঈশ্বরের কাছে নিরাপত্তার নীরব প্রার্থনা?

বিশু কেশে বলল, 'পালের গোদাটা ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছে। মাথায় চোট পেয়েছে মনে হয়—' এবং গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল।

আদিত্যর বড়-বড় শ্বাস পড়ছিল। খানিকটা সময় নিয়ে স্বাভাবিক হয়ে তারপর বলল, 'লোকগুলো খেপে গেছে। বোধহয় শহর ছেড়ে পালানোর জন্যে মরিয়া হয়ে গাড়ি খুঁজছে।'

মুন্নি জিগ্যেস করল, 'কেন রে—?'

আদিত্য উত্তর দিতে গিয়েও থেমে গেল। উত্তর দেওয়ার আর প্রয়োজন হল না। কারণ সামনে তাকিয়েই দুঃস্বপ্নের দৃশ্যটা ওর নজরে পড়ল। প্রায় একইসঙ্গে গাড়ির আর সকলে দেখতে পেল দৃশ্যটা।

বিশু দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'সবাই ঠিকমতো ধরে-টরে বসুন—' এবং পরক্ষণেই অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিয়ে এক ঝাঁকুনিতে গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে দিল।

পুলিশের অনেকগুলো জিপ ও ভ্যান রাস্তার মাঝামাঝি লাইন করে দাঁড়িয়ে। বাঁ-দিকের ফুটপাথে দাঁড়ানো ই এস আই হাসপাতালের বারোতলা বাড়ির কাছ থেকে লাইনের শুরু—সেখান থেকে এগিয়ে গেছে সোজা শেয়ালদার ফ্লাইওভারের

দিকে।

কোথাও সাইরেন বাজছে তীব্র স্বরে। মাইকে চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে কেউ। আর গাড়ির লাইনের বাঁ-দিকটা জনসমুদ্রে ঠাসা। অসংখ্য মানুষ মালপত্র নিয়ে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে। তাদের প্রচণ্ড চাপ সামলাতে পুলিশের দল হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। রাস্তার অর্ধেকটা দখল হয়ে গেলেও বাকি অর্ধেকটার কোনও যানজটের ব্যাপার নেই। কখনও-সখনও দু-একটা গাড়ি ছুটে যাচ্ছে।

আদিত্যর মনে হল, মরুভূমিতে যেন জলের জন্য লাইন পড়েছে।

জনসাগরের রেখা অজগর সাপের মতো এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে। একটু পরেই ধোঁয়াশায় অস্পষ্ট ঝাপসা হয়ে গেছে ছবিটা।

নয়না বলল, 'কওশিকজি ঠিকই বলেছিলেন। আপনি সোনারপুরে যেতে পারতেন না, দিতুদা। দেখেছেন, কী সাংঘাতিক অবস্থা!'

আদিত্য মাথা নাড়ল। এই অসহায় মানুষগুলো ক'দিন ধরে লাইন দিয়ে থাকবে ট্রেনের জন্য? বুঝতে পারল, একটা গাড়ি হাতে পাওয়ার জন্য মানুষ কেন মরিয়া হয়ে উঠেছে।

মায়ের কাশি শুনতে পেল ও। টের পেল, ওর নিজের গলাটাও কেমন খুসখুস করছে। শঙ্করবাবুর কথা মনে পড়ল। আমেরিকাবাসী ছেলের চিঠি হাতে বসে থাকা দিশেহারা মানুষটার শেষ ছবিটা ওর চোখে পড়ল। মনে পড়ল রীতেনের কথা। রীতেন নিশ্চয়ই কখনও ভাবেনি প্লেন দুর্ঘটনায় মারা যাবে। কারণ প্লেনে চড়া ওর কাছে নেহাতই স্বপ্ন ছিল। কিন্তু সেই অসম্ভবও সম্ভব হল। আচ্ছা, শুভেন কী করছে এখন? কেমন আছে ওর শয্যাশায়ী বাবা?

গাড়িটা আচমকা ঝাঁকুনি খেল। কোনও গর্তে পড়ল বোধহয়। আদিত্য জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল। রাস্তার মাঝখান পর্যন্ত চলে এসেছে আবর্জনা। ইট-কাঠ হাড়গোড় সবই বোধহয় মিশে গেছে। সবকিছুর ওপরেই কালো বৃষ্টির সিলমোহর।

শেয়ালদা ফ্লাইওভার পেরিয়ে মৌলালি, তারপর এস এন ব্যানার্জি রোডে ডানদিকে ঘুরবে ভেবেছিল, কিন্তু দেখল, সামনের গাড়িটা সোজা ছুটে চলল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কারণটা বুঝতে পারল। রাস্তা বন্ধ। করোটি আর কাটাকুটি হাড়ের ছবি। সব রাস্তাতেই ভয়ঙ্কর বিপদ। এরকম আরও কয়েকটা রাস্তা চোখে পড়েছে এর আগে।

একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে চুপচাপ বসেছিল গাড়ির যাত্রীরা। বিশু গাড়ি চালাচ্ছে একমনে। ওর চোখ একাগ্র, জ্বলজ্বল করছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িগুলো চলে এল কলকাতার সবচেয়ে খোলামেলা জায়গায়—ময়দানে। সঙ্গে-সঙ্গে অলৌকিক অবাস্তব কোনও শক্তি আদিত্যর ঝুঁটি খামচে ধরল অমানুষের মতো। তারপর নিষ্ঠুরভাবে হ্যাঁচকা টান মারতে লাগল—একের পর

এক।

গাড়িটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কারণ নরোত্তম কওশিক মারুতি গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। দাঁড়িয়ে পড়েছে জিপসির পিছনের ম্যাটাডর ভ্যানও।

কওশিকজি নেমে পড়েছেন গাড়ি থেকে। এগিয়ে আসছেন জিপসির দিকে।

আদিত্যও নামল গাড়ি থেকে। মা দুর্বল গলায় বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

মুন্নি ডাকল, 'ছোড়দা!'

আদিত্যর মাথা টলছিল। ওর ভয়াতুর চোখ অনিশ্চিত দিশেহারা ভঙ্গিতে দেখতে লাগল এপাশ-ওপাশ। এ কী সর্বনাশের ছবি দেখছে ও!

মাথার ওপরে আকাশ জুড়ে বাদামি ধোঁয়াশা। দূর দিগন্তেও তাই। স্পষ্ট আলোময় ঘোলাটে পটভূমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো রঙের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। তার সারা গায়ে কালচে ছোপ। আর সেই স্মৃতিসৌধ ঘিরে সবুজের ধূসর কঙ্কাল। মাঠের পর মাঠ কালচে-বাদামি ঘাসের মৃতদেহে ঢাকা। সমস্ত গাছপালা ডাইনির আলুথালু চুলের মতো খটখটে শুকনো শাখাপ্রশাখা মেলে ভয়ঙ্কর ছায়াহীন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই আশ্চর্য রুক্ষ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে যেন কয়েক কোটি বছরের জীর্ণ মলিন এক প্রাসাদ। তার মাথায় ডানাওয়ালা উপদেবী—লোহার পরি। পারদের ওপরে ভেসে নেচে বেড়াত ক'দিন আগেও। এখন তার পায়ের নীচে পারদের বিষ, মাথায় ধোঁয়াশার।

কওশিকজি আদিত্যর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, 'আপনাকে তো আগেই বলেছিলাম, দেখার কিছু নেই। সব শেষ। তা-ও আপনি দেখতে চাইছিলেন—' একটু থেমে আবার বললেন, 'আমরা সেকেন্ড হুগলি ব্রিজের ওপর দিয়ে বেরিয়ে জি টি রোড ধরব।

আদিত্য তখনও ওর ছোটবেলার স্বপ্নটাকে দেখছিল। বাচ্চা বয়েসে বাবার সঙ্গে এখানে বেড়াতে এসেছিল ওরা। মা, পলাশ আর ও। পলাশের সঙ্গে কত ছুটোছুটি করেছিল এই সবুজ মাঠে। অভিভূত হয়ে গিয়েছিল সাদা ধবধবে এই স্মৃতি-সৌধের সৌন্দর্যে। মনে হয়েছিল, স্বপ্নে দেখা কোনও রঙিন জলছবি। যেদিকে তাকানো যায় শুধু সবুজ আর সবুজ। আর পশ্চিমের আকাশরেখায় কয়েকটা দীর্ঘকায় অট্টালিকা।

আদিত্যর পা অবশ হয়ে যাচ্ছিল ধীরে-ধীরে। মনও। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, নয়না নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে। ওদিকে পলাশও।

আদিত্যর মাথা টলে গেল। ও হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল রাস্তায়। দু-হাতে মুখ ঢাকল। এই মাটি, এই বাতাস মানুষের কখনও কোনও ক্ষতি করেনি। অথচ প্রকৃতির এই দুই অপরূপ দানকে বছরের পর বছর ধরে বিষ খাইয়ে-খাইয়ে আমরা কী অবস্থায় নিয়ে এসেছি আজ!

আদিত্য আর পারল না। বুকের ভেতরের চাপা হাহাকারটা কান্না হয়ে এক ধাক্কায় বেরিয়ে এল বাইরে। হা ঈশ্বর! আদিত্য কেন রুখতে পারছে না এই আবেগকে? কেন ভেঙে পড়ছে সব প্রতিরোধ?

আদিত্য হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। প্রকৃতির মৃতদেহের পাশে বসে যেন কোনও পরম আত্মীয় কাঁদছে। কাঁদছে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে দু-হাতে রাস্তার কালো অ্যাসফাল্ট চাপড়াতে লাগল আদিত্য। জল ভরা চোখে পিছনে মাথা হেলিয়ে ঘুণ ধরা আকাশটাকে দেখল বারবার।

আদিত্যর রকমসকম দেখে কওশিকজি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ঘন ভুরু কুঁচকে উঠল, ফরসা মুখের বিবর্ণ চেহারায় ফুটে উঠল এলোমেলো জ্যামিতিক রেখা। ঝুঁকে পড়ে আদিত্যর হাত ধরলেন তিনি। বললেন, 'উঠুন আদিত্যবাবু, আমাদের লেট হয়ে যাচ্ছে—।'

ততক্ষণে নয়না এসে পড়েছে। পলাশও।

'দিতুদা,' আদিত্যর অন্য হাতটা ধরল নয়না। জোর করে হেসে হালকা গলায় বলল, 'গব্বর সিং কী বলে গেছে ভুলে গেছেন! ওঃ কাম অন, দিতুদা, ডোন্ট বি চিকেন—।'

পলাশও বোধহয় ডাকছিল আদিত্যকে। কিন্তু নয়নার শেষ কথাটা আদিত্যর মাথায় আগুন জ্বালিয়ে দিল। সেইজন্যই পলাশের কথা স্পষ্টভাবে ও শুনতে পায়নি। ভয়! একে কি ভয় বলে?

ষাট বছর আগে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফেলা হয়েছিল। অসংখ্য নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু মানুষকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। তখন আইনস্টাইন বলেছিলেন, পরমাণু বোমা যদি পৃথিবীর তিনভাগের দু-ভাগ মানুষকেও নিশ্চিহ্ন করে দেয়, তা হলেও পৃথিবীতে যথেষ্ট বুদ্ধিমান মানুষ বেঁচে থাকবে, থাকবে পর্যাপ্ত বই—তারাই মানবসভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সুতরাং আদিত্য ভয় পায়নি। কিন্তু ওর শরীরের ভেতরে কোথায় যেন একটা বেদনা তরঙ্গের উৎস তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তা থেকেই চিনচিনে বেদনার স্রোত ছড়িয়ে যাচ্ছিল হাতে পায়ে মাথায়।

আদিত্য সুনয়নার দিকে তাকাল। ঝাপসা দেখাচ্ছে তরুণীকে। কওশিকজি ওকে টেনে তুললেন। বললেন, 'আদিত্যবাবু, প্লিজ, ডোন্ট লুজ ইওর কুল। সামনে এখনও অনেক পথ বাকি।'

কওশিকজি পলাশকে গাড়িয়ে ফিরে যেতে বললেন। ইশারা করলেন মুন্নিকে, নয়নাকেও। তারপর নির্ভরযোগ্য হাতের বাঁধনে রেখে আদিত্যকে বসিয়ে দিলেন জিপসিতে।

বিশু আদিত্যকে খানিকক্ষণ দেখল। তারপর বলল, 'বেকার চোখের জল ফেলছেন। চোখের জলের আজকাল কোনও দাম নেই।' একটু থেমে বিশু স্বগতোক্তির

মতো বলল, 'সব শালা ফালতু—'

ওর মুখে কেমন যেন কষ্টের ছাপ পড়েছিল। সেটা দেখতে-দেখতে আদিত্য চোখ মুছছিল। পিছনে তাকিয়ে দেখল, মা মুখে আঁচল গুঁজে কাঁদছে। সুনয়নার মা হাত রেখেছে মায়ের হাতে। এই বিধবা মহিলাটি অবুঝ রয়ে গেল, চিরকাল। একটা তুচ্ছ সবুজ পাখি, একটা সাধারণ ড্যাম্প ধরা ফাটল ধরা দোতালা বাড়ি, কয়েকটা নয়নতারা ফুল কিছুতেই ভুলতে পারছে না। এর কপালে অনেক দুঃখ আছে।

তিনটে গাড়ি চলতে শুরু করেছিল আবার। তখনই অনেকগুলো কঙ্কালসার মানুষকে ওরা দেখতে পেল।

দূরের শুকনো মরা গাছগুলোর গোড়ায় উবু হয়ে বসেছে দু-তিনজন করে। দু-হাতে খামচাচ্ছে রুক্ষ মাটি। এইভাবে উপড়ে নেওয়া গাছের শিকড় মুখে পুরে দিয়ে চিবোচ্ছে। খুঁজে বেড়াচ্ছে এক বিন্দু রস। ওদের চোখেমুখে তৃপ্তির ছাপ। কেউ-কেউ চোখ বুজে মুখ নাড়ছে। কিন্তু এই রসের সঙ্গেই হয়তো ঢুকে পড়ছে মারাত্মক বিষ। বাতাসের বিষ, কালো বৃষ্টির বিষ।

ধুলোর ঝড় উড়িয়ে গাড়ি ছুটল দ্বিতীয় হুগলি সেতুর দিকে। কয়েকটা মোটরবাইক বিকট গর্জন তুলে ওদের পেরিয়ে গেল। আরোহীদের প্রত্যেকের মুখেই গ্যাস-মুখোশ। কোমরে বেঢপ আকারের আগ্নেয়াস্ত্র।

ব্রিজের ওপরে উঠতেই দেখল তিরিশ মিটার উঁচু হাইমাস্ট লাইটিং স্তম্ভের মাথায় কালো রঙের সোডিয়াম বাতিগুলো জ্বলছে। কমলা আরও খানিকটা যেতেই চোখে পড়ল একপাশের ব্রিজের রেলিং উধাও। কোনও গাড়ি হয়তো ধাক্কা মেরেছে। আর একটা মারুতি-৪০০০ পিকঅ্যাপ ভ্যান উলটে পড়ে আছে কিছুটা দূরে। অসংখ্য কাচের টুকরো আর পোড়া তেল ছড়িয়ে আছে রাস্তার ওপরে। ওলটানো গাড়িটার সামনের দিকটা একেবারে দুমড়েমুচড়ে গেছে।

তখনই গঙ্গার জলের দিকে নজর গেল আদিত্যর। কালচে জলে ছলাৎ-ছলাৎ ঢেউ উঠছে। আর এখানে-সেখানে ভেসে রয়েছে মরা মাছ, জলচর প্রাণী। ভেসে থাকা দুটো স্টিমারও চোখে পড়ল। চেহারা দেখে মনে হল না ওগুলোয় কোনও প্রাণ আছে।

সামনের মারুতি গতি বাড়ানোর ফলে বিশুও গতি বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর পিছনের ম্যাটাডর ভ্যানটাও চেষ্টা করছিল তাল রাখতে।

সুনয়না নীচু গলায় কথা বলছিল মায়ের সঙ্গে। মুন্নিও মাঝে-মাঝে কথা বলছিল। কিন্তু কথাগুলো স্পষ্ট করে বুঝতে পারছিল না আদিত্য। ও নানকুর কথা ভাবছিল। বাচ্চাটা কি পারবে ওদের মতো বড় হয়ে উঠতে? ও কি যেতে পারবে গাছপালা-পাখির দেশে—যেখানে আকাশের ছায়া জলে মিশে জল আর আকাশ একাকার?

আদিত্যর মনে পড়ল, সুবোধদার বাচ্চা মেয়েটা পারেনি।

॥ নয় ॥

যে-রাস্তা ধরে গাড়ি ছুটে চলেছে তাকে শ্মশান কিংবা মরুভূমি—অথবা দুটোই বলা যায়। ধোঁয়াশা আগের চেয়ে একটু গাঢ় হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা স্কুটার, মোটরবাইক বা গাড়ি চোখে পড়ছে। দুটো অসাড় দেহও দেখা গেল। তবে আদিত্যদের গাড়ি একটুও গতি কমাল না। দুর্ঘটনায় আহতদের পক্ষে মরে যাওয়াই এখন ভালো। এখন শুধু স্বার্থপরের মতো নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার লড়াই।

চাপা গলায় কথাবার্তা ও খুকখুক কাশির শব্দ ছাপিয়ে সুনয়নার মা হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, 'বিশু, আমরা কোন রাস্তা দিয়ে যাব?'

বিশু দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল শক্ত করে গাড়ি চালাচ্ছিল। মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'একটু পরেই দিল্লি রোড ধরব।'

আদিত্য সিটে মাথা এলিয়ে শুয়েছিল। বিশুর কথা শুনে তাকাল হাতঘড়ির দিকে। সওয়া বারোটা। এখন গনগনে রোদ্দুর থাকার কথা, অথচ মনে হচ্ছে সন্ধে ছ'টা। শুনতে পেল, মা মুন্নিকে বলছে, 'খিদে পেলে বলবি, চিঁড়ে আর বাতাসা আছে।'

'আমাদের ব্যাগে বিস্কিট আছে,' সুনয়না বলল।

মুন্নি বোধহয় মাথা নেড়ে থাকবে—খিদে পায়নি ওর। কারণ, তারপর আর কোনও শব্দ বা কথা শোনা গেল না।

আদিত্যর ঝিমুনি আসছিল। ও চোখ বুজল। মনে-মনে চাইল, ও ঘুম ভেঙে উঠেই যেন দ্যাখে সবকিছু পালটে গিয়ে আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

কিন্তু আচমকা ঘুম ভাঙতেই আদিত্য দেখল কিছুই পালটায়নি—শুধু রাস্তার দুপাশের দৃশ্য ছাড়া।

ওরা বোধহয় দিল্লি রোডে এসে পড়েছে। কারণ রাস্তাটা চলে গেছে সোজা, নাক বরাবর। অন্তত যতটুকু দেখা যাচ্ছে।

ধোঁয়াশার স্তর এখানে অনেকটা ঘন। সাপের মতো এঁকেবেঁকে দুপাশের ঢালু মাঠে নেমে গেছে। অসংখ্য সাদা সাপ যেন পরস্পর জড়াজড়ি করে এগিয়ে চলেছে।

কতকগুলো মোটরবাইকের গর্জন কানে আসছিল আদিত্যর। গোঁ—গোঁ—গর্‌র্—গর্‌র্—। যেন একপাল হিংস্র পশু একটি মৃত হরিণকে নিয়ে ভাগাভাগির লড়াইয়ে মেতে উঠেছে।

সামনের মারুতির গতি কমে এসেছিল। সুতরাং বিশু গতি কমাল। একইসঙ্গে শ্লথ হল ম্যাটাডর ভ্যান।

গাড়ির ভেতরে কেউ কথা বলছিল না। কিন্তু প্রত্যেকেই উইন্ডশিল্ডের ভেতর দিয়ে একাগ্র চোখে সামনে তাকিয়ে রয়েছে। সুতরাং মারুতির গতি কমানোর কারণ ও মোটরবাইকের শব্দের উৎস একইসঙ্গে দেখতে পেল সকলে।

খানিকটা দূরে একটা ছোট লরি কাত হয়ে পড়ে রয়েছে রাস্তার ওপরে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কয়েকজন মানুষের দেহ। কয়েকটা মোটরবাইক জায়গাটা ঘিরে রয়েছে। মোটরবাইকের আরোহীদের মুখে গ্যাস-মুখোশ অথবা কাপড়ের টুকরো। তাদের হাতে নানা অস্ত্র।

ধোঁয়াশার জন্য কোনও কিছুই খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তবে চিৎকার ও আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে নানারকম। দু-তিনটে বাইক বেপরোয়া গতিতে চক্কর মারছে। কয়েকজন মানুষ প্রাণপণ ধস্তাধস্তি করছে কালো পোশাক পরা দুটো লোকের সঙ্গে। তারই মধ্যে ফায়ারিং-এর শব্দ হল ঃ ক্র্যাক-ক্র্যাক—।

গাড়ির সবাই তটস্থ হয়ে উঠেছে। চাপা অর্থহীন শব্দও বেরিয়ে এল কারও ঠোঁট চিরে। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে প্রাণভয়ে ছুটে নেমে গেল ডানদিকের মাঠে। মিলিয়ে গেল ধোঁয়াশার মধ্যে। সঙ্গে-সঙ্গে একটি লোক দৌড়ে এসে উঠে পড়ল একটা খালি মোটরবাইকে। তার হাতে এক বিশাল লম্বা ছুরি—নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে ধরা। জোরালো পায়ে এক লাথি মেরে বাইকে স্টার্ট দিল সে। তারপর বাঘের গর্জন তুলে দক্ষ ক্ষিপ্রতায় ছুটল পালিয়ে যাওয়া দুজনের পিছনে। লোকটার মুখের মুখোশ খসে পড়েছে। পুরুষ্টু গোঁফের নীচে দাঁতের সারি দেখা যাচ্ছে। চোখে আগুন।

কালো পোশাক পরা লোকগুলোকে প্রথমটায় পুলিশের লোক বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু দু-এক সেকেন্ডের মধ্যেই যেসব দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে বোঝা গেল, ধারণাটা ভুল।

আদিত্য চেঁচিয়ে উঠল, 'বিশু, গাড়ি ঘোরাও!' কারণ, উলটে থাকা লরিটাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

বিশুর মুখে ভয়ের ছাপ পড়েছিল। ও গাড়ি ঘোরানোর কাজ শুরু করতেই দেখতে পেল, তিনটে লোক এগিয়ে আসছে। দুজন বাইকে চড়ে, আর একজন দৌড়ে। তার মধ্যে দুজনের হাতে অস্ত্র চোখে পড়ল।

সামনের গাড়িটা বাঁ-দিকে বাঁক নিয়ে ঢালু মাঠে নেমে গেল। নামার সময় গাড়িটা এমন বিপজ্জনকভাবে টাল খেয়ে গেল যে, মনে হল এই বুঝি উলটে যাবে।

আদিত্য জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে 'দাদা! দাদা!' বলে চিৎকার করে উঠল। নানকু, বউদি ওদের কিছু হবে না তো? শুনতে পেল, মা শব্দ করে জোরে কেঁদে উঠল। সুনয়না আদিত্যর পিঠের কাছে জামাটা খামচে ধরল। মুন্নি জড়িয়ে ধরেছে মা-কে। আর সুনয়নার মা কাঠ হয়ে চোখ বুজে বসে আছেন।

মারুতিটা ধোঁয়ার আড়ালে চলে যাচ্ছিল। আর ঠিক তখনই কীসের ধাক্কায় যেন জিপসির সামনের কাচটা মাকড়সার জালের মতো হয়ে গেল।

নীচের জমিতে নেমে যাওয়া মারুতিকে লক্ষ করে একটা লোক রিভলভার উঁচিয়ে ফায়ার করল। লক্ষ্যভেদ হল কি না বোঝা গেল না।

জিপসিটা ডানদিকে ঘুরে নীচের দিকে নামতে শুরু করল। আর তখনই ক্ষিপ্র বেগে ছুটে আসা একটা বাইকের সঙ্গে ধাক্কা লাগল সজোরে। জিপসি টাল খেয়ে ঘুরে গেল খানিকটা। কিন্তু বিশু চোয়াল শক্ত করে স্টিয়ারিং আঁকড়ে ধরে বসে আছে। চাপা গলায় খিস্তি করে গাড়িটা ও নামিয়ে দিল নীচের মাঠে।

হইচই, আর্তনাদ ও ইঞ্জিনের গর্জনে আদিত্যর মাথা ঝিমঝিম করছিল। ধোঁয়াশার স্তর ভেদ করে বিপজ্জনক ঝাঁকুনি দিয়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে চলছিল জিপসি। আদিত্য ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে দেখল। কয়েকটা কালো ছায়ামূর্তি ঘিরে ধরেছে ম্যাটাডর ভ্যানটাকে। শুরু হয়ে গেছে লুঠপাটের খেলা। একটু পরেই তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার শোনা গেল। তার মিনিট-তিন-চার পরেই এক বিস্ফোরণ।

জিপসি ছুটছে মাতালের মতো। লাফাচ্ছে, ঝাঁকুনি দিচ্ছে অনবরত। গাড়ির মধ্যে কান্না আর চাপা চিৎকার জট পাকিয়ে যাচ্ছে বারবার। পিছনে তাকিয়ে ধোঁয়াশার ভেতর দিয়ে আগুন আর কালো ধোঁয়া দেখতে পেল আদিত্য। ভ্যানটা জ্বলছে। পুড়ছে।

বিশু পাগলের মতো এপাশ-ওপাশ স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছিল, প্রাণপণ চেষ্টা করছিল গাড়িটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে।

আদিত্য মুন্নি আর নয়নাকে বলল লক্ষ রাখতে, কোনও মোটরবাইক ওদের পিছনে আসছে কি না দেখতে।

ওরা তাকিয়ে ছিল পিছনদিকে। আদিত্য দেখল, সুনয়নার মুখে এই প্রথম ভয়ের স্পষ্ট ছাপ পড়েছে। সাদা টি-শার্টের নীচে ওর বুক দ্রুত ওঠানামা করছে। আদিত্যর ইচ্ছে করল মেয়েটাকে কাছে টেনে নেয়। নিয়ে বলে, 'কোনও ভয় নেই, নয়না, আমি তো আছি—।'

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা অস্বাভাবিক শব্দ করে থেমে গেল জিপসির চাকা। গাড়িটা টাল খেয়ে গেল খানিকটা। বিশু মরিয়া হয়ে অ্যাকসিলারেটারে চাপ দিয়েই চলল। ইঞ্জিন গোঁ-গোঁ করতে লাগল, কিন্তু গাড়ির চাকা দু-ইঞ্চিও নড়ল না।

আদিত্য চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'সবাই নেমে পড়ো। এক্ষুনি!'

ওরা সবাই নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। আদিত্য আর বিশু জিপসির সামনের চাকা পরীক্ষা করল। একটা বড় গর্তে ঢুকে গেছে বাঁ-দিকের চাকাটা।

ওরা প্রাণপণে চাকাটা দু-চারবার ঠেলে দেখল। গাড়ি নড়ল, কিন্তু গর্ত ছেড়ে চাকা উঠল না। দূর থেকে চিৎকার চেঁচামেচি তখন অস্পষ্টভাবে কানে আসছে। আর দেরি করা উচিত হবে না।

আদিত্যর কথায় ছোটখাটো মালপত্র যে-যার হাতে তুলে নিল। তারপর যতটা জোরে হাঁটা যায় হাঁটতে শুরু করল।

মা খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছিল না। মুন্নি আর নয়না সাহায্য করছিল। আদিত্যর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে মা বলল, 'দিতু, পলাশ—নানকু—ওরা—' মা

কথা শেষ করতে পারল না। কেঁদে উঠল অসহায়ভাবে।

আদিত্য বলল, 'দেখছি—।'

সুনয়নার চোখ ফোলা-ফোলা লাগছিল। ও নীচু গলায় ওর মায়ের সঙ্গে কথা বলছিল। একটু আগের বিস্ফোরণটা যে ম্যাটাডর ভ্যানের হতে পারে, সেই সম্ভাবনাটা বোধহয় ওকে দুর্বল করে দিচ্ছিল।

আদিত্য চারপাশটা যতদূর দেখা যায় দেখল। সেই একই দৃশ্য। বিবর্ণ গাছপালা, ঘাস, পাতা, ফল, বিষাক্ত মাটি। জনহীন শুনশান। ধোঁয়াশা কখনও ফিকে, কখনও গাঢ়।

হাঁটতে-হাঁটতে আদিত্যর মনে হল জায়গাটা বোধহয় চাষের জমি ছিল। আর বাঁ-দিকটায় ছিল বড়-বড় গাছের বিশাল বাগান। এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে আম-জাম-কাঁঠাল গাছের কঙ্কাল। আর জমিটা ঝরাপাতায় ছাওয়া।

আদিত্যর চঞ্চল চোখ একটা আশ্রয় খুঁজছিল, কিন্তু তক্ষুনি কোনও বাড়িঘর বা কুটির নজরে পড়ল না।

এদিক-ওদিক করে দিশেহারার মতো হাঁটছিল সকলে। বিশু বলল, 'ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা মিটে গেলে পরে গিয়ে গাড়িটা ঠেলেঠুলে তুলে নিয়ে আসব। গাড়ি না থাকলে এখানেই বেঘোরে মরতে হবে—।'

আদিত্য বিশুর দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

আর ঠিক তখনই একটা মেয়ের চিৎকার শুনতে পেল ওরা। একবার, দুবার, তিনবার।

আদিত্য যেন একটা ঝাঁকুনি খেল। এই চিৎকারটার মধ্যে যেন একটা নিরুপায় বেদনা ও হতাশা মিশে আছে। অথচ এই চিৎকারের মধ্যে আক্রান্তের মরিয়া সুর থাকা উচিত। যে সুর বলে, আমি বেঁচে উঠতে চাই।

কয়েকসেকেন্ড মাত্র। তারপরই আদিত্য ছুটতে চাইল চিৎকার লক্ষ করে। বিশুকে বলল ওদের নিয়ে এগিয়ে যেতে।

তখন বিশু কী একটা যেন এগিয়ে দিল আদিত্যর দিকে। বলল, 'এটা কাছে রাখুন—।'

আদিত্য হাতে নিল জিনিসটা। একটা মাংকি-রেঞ্চ। প্রায় এক ফুট লম্বা। একটা প্যাঁচ ঘুরিয়ে এই ধরনের রেঞ্চের মুখের হাঁ বাড়ানো-কমানো যায়। এটাকে কি অস্ত্র হিসেবে ভাবা যায়? সাধারণ একটা যন্ত্র। অথচ এই মুহূর্তে এটা ছোঁওয়ামাত্রই আদিত্যর গায়ে কাঁটা দিয়েছে। বুঝতে পেরেছে, আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসেবে এই ভারী যন্ত্রটা মোটেই অযোগ্য নয়।

চিৎকারটা শোনা গেল আরও দুবার।

সুতরাং আর অপেক্ষা না করে আদিত্য ছুটল।

বাঁ-দিকে একটু কোনাচে জায়গা থেকে আসছিল চিৎকারটা। পিছন থেকে মা

আর মুন্নির ডাক কানে এল। কিন্তু আদিত্য থামল না। মায়ের গলা শুনতে পেল আবার, 'দিতু, তুই যাস না। আমাদের ফেলে এভাবে যাস না—।'

'ছোড়দা, চলে আয়! ওসব ঝামেলায় জড়াস না।' মুন্নি।

'দিতুদা, প্লিজ। দিতুদা—' সুনয়না।

ওদের স্বার্থপর পিছুডাক ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছিল। আর আদিত্য রুক্ষ শুকনো এবড়োখেবড়ো জমির ওপর দিয়ে ছুটছিল। চার-দশে খেলার কথা মনে পড়ছে। পায়ে রবারের বল, একটু দূরেই গোলপোস্ট। পাড়ার ছেলেগুলো ওর নাম ধরে হইহই করে চেঁচাচ্ছে।

এদিকটাতেও অনেকগুলো বড়-বড় গাছ। মাটি ঝরাপাতায় ঢাকা। আদিত্য ছুটতে-ছুটতে একটা গাছে ধাক্কা খেল। কারণ, ধোঁয়াশা ওকে নিয়ে ইঁদুর-বেড়াল খেলছিল।

ছিটকে পড়েও হাল ছাড়েনি আদিত্য। খড়খড়ে আগাছা ও পাতায় মুখ ঘষে গেল ওর। চামড়া ছড়ে গিয়ে জ্বালা করতে লাগল। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উঠে দাঁড়াল। রেঞ্চটা বাগিয়ে ধরে আবার চলতে শুরু করল দ্রুত পায়ে।

কয়েক পা এগিয়েই মোটরবাইকটা দেখতে পেল। কাত হয়ে পড়ে আছে। প্রায় একইসঙ্গে আসল দৃশ্যটাও নজরে পড়ল।

একটা মেয়ে একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে পড়ে আছে। পরনে কালো আর সবুজ ছাপা শাড়ি। বয়েস বাইশ-তেইশ বছর হবে হয়তো। শ্যামলা মুখে অস্বাভাবিক আতঙ্ক। চোখ বড় করে তাকিয়ে রয়েছে।

মেয়েটার কাছ থেকে একটু দূরেই দুটি মানুষে ভয়ংকর লড়াই চলেছে। মরণপণ লড়াই। ধস্তাধস্তি, ঘুসি—একেবারে দাঁত-নখের যুদ্ধ।

গাছের কঙ্কালে ঘেরা রাজত্বে পাতাঝরা মরুভূমি জমিতে এ-লড়াই কেমন অদ্ভুত লাগল আদিত্যর। বাঁচার লড়াই, না মরার লড়াই?

আরও কাছে এগিয়ে গেল ও। তখনই গোঁফওয়ালা কালো পোশাক পরা লোকটাকে চিনতে পারল। একটু আগেই এই লোকটা খোলা ছুরি বাগিয়ে মোটরবাইক নিয়ে তাড়া করেছিল দুটি অসহায় মানুষকে। এরা দুজনই কি সেই দুজন?

কালো পোশাক পরা লোকটা হঠাৎই চিৎকার করে উঠল। তার রোগা প্রতিদ্বন্দ্বী নখের গভীর আঁচড় টেনে দিয়েছে চোখে, গালে, গলায়। লোকটা এক ভয়ংকর গর্জন করে হাতের কায়দায় কাত করে শুইয়ে দিল রোগা মানুষটাকে। ভারী পা দিয়ে চেপে ধরল তার গলা। তারপর নিজের দেহটাকে যতটা সম্ভব লম্বা করে কোনও জিনিসের খোঁজে হাত বাড়িয়ে দিল।

আদিত্য দেখল জিনিসটা। সেই লম্বা ছুরি, কিন্তু খাটো তরোয়ালও বলা যায়। ওটা হাতের নাগাল পেলে যে কী অবস্থা হবে সেটা বুঝতে অসুবিধে হল না। সুতরাং বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল আদিত্যর শরীরে। তিনটে লম্বা পা ফেলে ও এগিয়ে গেল ওদের

কাছে। এবং হাতের মাংকি-রেঞ্চটা কালো পোশাক পরা লোকটার মাথায় সজোরে বসিয়ে দিল। একবার—দুবার।

ভারী দেহটা কাত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। তখনই টলতে-টলতে উঠে দাঁড়াল রোগা মানুষটা। সারা মুখে ধুলোমাটি। জামা রক্তে ভেজা। লম্বা-লম্বা চুল উসকোখুসকো, নেমে এসেছে শ্যামলা মুখের ওপরে। মনে হল, বয়েস বেশি নয়।

শ্যামলা ছেলেটা এলিয়ে পড়ে থাকা লোকটাকে উদভ্রান্ত চোখে একবার দেখল। তারপর চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতায় এক লাফে তুলে নিয়ে এল ছুরিটা। এবং পাগলের মতো কোপাতে লাগল অসাড় মানুষটাকে। একইসঙ্গে অর্থহীন চিৎকারও করে চলল।

আদিত্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। কারণ, এতক্ষণে ও রোগা শ্যামলা মানুষটাকে চিনতে পেরেছে। শুভেন! শুভেন এখানে কেমন করে এল? এ কী অবস্থা হয়েছে ওর!

শুভেন তখনও ছুরি চালাচ্ছিল কসাইয়ের মতো। পড়ে থাকা লোকটা বারকয়েক নড়েচড়ে উঠেছিল। আর্তনাদও করেছিল দু-একবার। কিন্তু এখন একেবারে নিথর, চুপচাপ। তবুও শুভেন এক মারাত্মক কোপ বসিয়ে দিল লোকটার মুখের ওপরে। নাক আর চোখের মাঝে ইঞ্চিখানেক ফাঁক হয়ে গেল। রক্তে ভেসে গেল জায়গাটা। কিন্তু শুকনো মাটি পলকেই সব শুষে নিচ্ছিল। যে-শরীর থেকে আর কোনওভাবে সাড়া পাওয়া যাবে না ভাবা গিয়েছিল সেই ভারী শরীরটা ঝটকা দিয়ে উঠল বীভৎসভাবে। বেঁকে গেল অদ্ভুত কোণে। তারপর স্থির।

হাতের ছুরি ফেলে দিয়ে মুখ মুছল শুভেন। আদিত্যর দিকে দেখল। বোধহয় চিনতে পারল ওকে। সম্মোহিতের মতো শিথিল পায়ে কয়েক পা এগিয়ে এল। তারপর 'দিতু, তুই!' বলে হঠাৎই হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল।

হাতের রেঞ্চটা ফেলে দিয়ে চকিতে ওকে ধরে ফেলল আদিত্য। একেবারে জাপটে ধরল। ভাঙা গলায় বলল, 'শুভেন, তুই এখানে কী করে এলি? মাসিমা মেসোমশাই—ওরা কোথায়?'

শুভেন জড়িয়ে-জড়িয়ে বলল, 'সব শেষ!' তারপর আরও কীসব বলছিল ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছিল না। ছুরির আঘাত ওকেও রেহাই দেয়নি।

আদিত্যর কথার উত্তর দিল কালো মেয়েটি। গাছের গুঁড়ির কাছ থেকে ও কখন যেন এগিয়ে এসেছে।

'একটা লরি জোগাড় করে আমরা সবাই কলকাতা থেকে রওনা হয়েছিলাম। যে যেখান থেকে পেরেছে লরিতে উঠেছে—তবে লরিওয়ালাকে টাকা দিতে হয়েছে। এই রাস্তার প্রায় শুরু থেকেই এই লোকগুলো—' পড়ে থাকা লাশটা আঙুল দিয়ে দেখাল মেয়েটি : 'এই লোকগুলো আমাদের পিছু নিয়েছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম পুলিশের লোক, কিন্তু পরে বুঝেছি না, তা নয়...।'

আদিত্য লক্ষ করল, মেয়েটির শাড়ি নানা জায়গায় ছেঁড়া। ব্লাউজও তাই। ওর যৌবন জানান দিচ্ছে অপকটে। অল্পের জন্য শরীর-দূষণের হাত থেকে বেঁচে গেছে ও।

'জল...একটু জল দে, দিতু—' শুভেন হাঁ করে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল। ওর জিভটা কেমন ফ্যাকাসে।

আদিত্য এপাশ-ওপাশ দেখল। এখানে জল পাবে কোথায়! পেলেও কি তা মুখে দেওয়া যাবে? নয়নাদের সঙ্গে জলের বোতল রয়েছে। তা ছাড়া আশেপাশে যদি কোনও টিউবওয়েল থাকে?

'কল্পনা!' আর্ত গলায় ডাকল শুভেন।

মেয়েটি পাগলের মতো ছুটে এসে ঝুঁকে পড়ল শুভেনের ওপরে। ব্যাকুল স্বরে বলল, 'কী শুভেনদা, বলো...।'

শুভেনের ঠোঁট নড়ছিল, কিন্তু কোনও শব্দ হচ্ছিল না।

কল্পনা অনুনয়ের চোখে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'একটু জল পাওয়া যাবে কোথাও?'

আদিত্য পাতা ছাওয়া জমির ওপরে ধীরে-ধীরে শুভেনকে শুইয়ে দিল। শুভেনের জামা থেকে রক্ত লেগে গেছে ওর জামায়। ও উঠে দাঁড়াল। কল্পনাকে বলল, 'তুমি ওর কাছে থাকো, আমি দেখছি জল পাওয়া যায় কি না।'

কল্পনা শুভেনের কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। জ্বলজ্বলে কালো চোখে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে হঠাৎই জিগ্যেস করল, 'আপনি শুভেনদার কে হন?'

'বন্ধু,' আদিত্য বলল। তারপর জিগ্যেস করল, 'তুমি?'

কল্পনা শুভেনের আধখোলা চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেউ না। লরিতেই আলাপ।'

আদিত্য অবাক চোখে কয়েক মুহূর্ত ধরে মেয়েটাকে দেখল। তারপর ক্লান্ত পায়ে হাঁটা দিল জলের সন্ধানে। বিশুরা যেদিকে এগিয়েছে, সেদিকেই হাঁটতে শুরু করল। পিছন থেকে শুভেনের অর্থহীন প্রলাপ কানে আসছিল ওর।

খানিকটা এগোতেই বিশুর দেখা পাওয়া গেল। এলোমেলো চক্করে আদিত্যকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ওকে চিৎকার করে ডাকল আদিত্য।

ওকে দেখে বিশুর যেন ধড়ে প্রাণ এল। ছুটে এসে আদিত্যর হাত চেপে ধরল। বলল, 'আপনার জন্যে কেঁদে-কেঁদে আপনার মা হয়রান হয়ে যাচ্ছে। শিগগির চলুন—।'

আদিত্য অল্প কথায় সবকিছু খুলে বলল বিশুকে।

'একটু জলের ব্যবস্থা করো—যে করে হোক। নইলে শুভেনটাকে...।'

পিছন থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে এল। বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়েছে

কল্পনা। হাউহাউ করে কাঁদছে। আগের আর্ত-চিৎকারের তুলনায় এই সর্বহারা কান্না অনেক বেশি গভীর।

বিশু চলে যাচ্ছিল, আদিত্য ওকে ডেকে দাঁড় করাল। জলের বোধহয় আর দরকার নেই। ও অবশ হয়ে হেঁটে আবার ফিরে চলল শুভেনের কাছে। বিশুও চলল ওর পিছনে-পিছনে।

কালো মেয়েটা নির্লজ্জের মতো আছাড় খাচ্ছিল শুভেনের বুকের ওপরে। আর বিকৃত গলায় চিৎকার করে 'শুভেনদা! শুভেনদা!' বলে ডাকছিল। কিন্তু শুভেন কোনও সাড়া দিচ্ছিল না। ওর কবিতার সেই 'অলৌকিক খেলা'-য় মেতে উঠেছে যেন।

আদিত্য কল্পনাকে দেখছিল। মাত্র একঘণ্টার সহযাত্রীর জন্য এত চোখের জল ফেলা যায়! এইরকম তীব্রতায় প্রকাশ করা যায় শোক-দুঃখ-তাপ!

নিরুপায় আদিত্য বিশুকে ইশারা করল। তারপর এগিয়ে গিয়ে কল্পনাকে একরকম জোর করে টেনে তুলল দুজনে। শুভেনের মৃতদেহ নিয়ে কী করবে ভাবছে, এমনসময় বহু দূরে শোনা গেল বাইকের গর্জন। এদিকেই আসছে।

আদিত্য আর দেরি করল না। কল্পনার হাত ধরে টান মারল। বিশুকে তাড়া দিল একইসঙ্গে ঃ 'জলদি, এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেই বিপদ!'

বিশু রেঞ্চটা চট করে তুলে নিল। একটা হাতিয়ার থাকা দরকার। তারপর ওরা তিনজনে একরকম ছুটতে শুরু করল।

বিশুই পথ দেখানোর কাজ করছিল।

ছুটতে-ছুটতেই আদিত্য ভাবল ঃ শুভেনের দেহ অন্তত শেয়াল-কুকুর বা কাক-শকুনে ছিঁড়ে খাবে না। কারণ, এরা কেউ আর নেই। শুভেনের দেহ কেউ যদি কুরে-কুরে খায় তো সে প্রকৃতি। প্রকৃতিই ওকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

অন্ধকার গাঢ় এবং গভীর হলে বোঝা যায় পৃথিবীর একপিঠ চলে গেছে সূর্যের আড়ালে। রাত হয়েছে। যদি এই তফাতটুকুও মুছে যায়, তা হলে?

ওঃ, কতদিন যে স্পষ্ট করে সূর্য দেখা যায়নি! দেখা হয়নি চাঁদ-তারাও। ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। ভীষণ। ভাবছিল আদিত্য।

নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ওদের পথ চলা শেষ হয়নি এখনও। ক্লান্ত-শ্রান্ত মুখগুলো ওর মনে ব্যথা তৈরি করছিল। রুক্ষ প্রান্তর, শুকিয়ে যাওয়া গাছপালা, কালোজল দিঘি পেরিয়ে অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছে ওরা।

মা আর পারছিল না। মায়ের জন্যই পথে বিশ্রাম নিতে হয়েছে বারবার।

বিশু মাঝে-মাঝেই পিছনে দেখছিল। পথের নানা চিহ্ন খুঁটিয়ে নজর করছিল। ওর মুখের অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, পথ চিনে জিপসির কাছে ফিরে যাওয়াটা খুব সহজ কাজ হবে না।

এলোমেলো মেঠো পথে কয়েকটা পরিত্যক্ত কুটির যে চোখে পড়েনি তা নয়। কিন্তু সেগুলো নিরাপদ বলে মনে হয়নি আদিত্যর। যে-কোনও মুহূর্তে ও বিপদের আশঙ্কা করছিল। এই বুঝি ধোঁয়াশার পরদা চিরে বেরিয়ে আসবে বাঘের দল। কারণ রাস্তার ঘটনাটা ও ভুলতে পারছিল না কিছুতেই। ভুলতে পারছিল না শুভেনের কথা। 'চারিদিকে শবের পাহাড়'। সব শেষ।

কল্পনা কাঁদছিল। ছেঁড়া শাড়ি-ব্লাউজের জন্য কোনও সঙ্কোচ ছিল না ওর। কারও সঙ্গে একটাও কথা বলছিল না। পায়ে জুতো-চটি কিছু নেই। শরীরের অনেক জায়গায় কেটে-ছড়ে গেছে।

আদিত্য উৎসাহ দিচ্ছিল সবাইকে। আর একটু! আর একটু।

কখনও ও মায়ের সঙ্গে হাঁটছিল। কখনও মুন্নির পাশে। কখনও মাসিমার পাশে। আর বেশিরভাগটাই সুনয়নার পাশে—ওর কাছাকাছি থাকতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল।

আদিত্য শুধু ওকেই বলেছে শুভেনের কথা। আর কাউকে বলেনি। বিশু আর কল্পনাকেও বারণ করেছে বলতে। শুভেনের কথা শুনলে ওদের মনের জোর চুরমার হয়ে যেতে পারে।

সন্ধের অন্ধকার নামতেই নয়না জিগ্যেস করল, 'আর কতদূর, দিতুদা?'

আদিত্য চারপাশ দেখে নিয়ে নীচু গলায় বলল, 'থাকার মতো একটা সেফ জায়গা পেলেই থাকব।'

'মা, মাসিমা—ওরা আর পারছে না।'

'জানি,' ঠোঁট কামড়াল আদিত্য। একটু থেমে বলল, 'নানকু কেমন আছে কে জানে।' আদিত্যর চোখে জল এসে গেল হঠাৎ। বাচ্চাটাকে ও পাখির দেশে নিয়ে যাবে বলেছিল। যে করে হোক একটা পাখির ডাক শোনাবে।

আদিত্য চোখের জল মোছার চেষ্টা করেনি। কিন্তু আবছা আঁধারে কোন অলৌকিক দৃষ্টিতে মেয়েটা সেটা টের পেল? খাটো গলায় ডাকল, 'দিতুদা—।'

আদিত্য চোয়াল শক্ত করার চেষ্টা করে বলল, 'জানি। গব্বর সিং কী বলে গেছে, মনে আছে।'

নয়নার মুখের কমনীয়তা এরই মধ্যে অনেকটাই বনবাসী। মাথার চুলে ধুলোর ছোঁয়া। ঠোঁটে খরা লেগেছে। কিন্তু ওর হাতের স্পর্শ উত্তাপহীন নয়।

মেয়েটা আচমকা আদিত্যর হাত চেপে ধরতেই আদিত্য সেটা বুঝতে পারল। ওর ইচ্ছে হল, ডান হাতে ঝোলানো ব্যাগটা ফেলে দিয়ে কিছু একটা করে বসে।

সুনয়না বলল, 'নানকুদের জন্যে আপনি চিন্তা করবেন না। কওশিকজি আছেন। উনি আমাদের বাগানবাড়ি চেনেন।'

আদিত্য দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। ওর হাসি পেল। এখনকার এই অবস্থায় বাগানবাড়ি কাকে বলে? বাগানই বা কাকে বলে? সুন্দর করে সাজানো মরা গাছের সারিকেই কি বাগান বলে?

অন্ধকার অনেকটাই গাঢ় হয়েছিল। টর্চ জ্বেলেছে বিশু। ও সবার আগে-আগে হাঁটছে। আদিত্যরা একেবারে পিছনে।

ও সুনয়নার কাঁধে হাত রাখল। সামান্য কাছে টানল ওকে। সুনয়না অবাক হল না। অন্তত অনুভবে আদিত্যর তাই মনে হল। গালিলেও, নিউটন, আইনস্টাইনের চেয়ে ফ্রয়েড অনেক বেশি শক্তিশালী।

নয়নার কানের কাছে মুখ নিয়ে আদিত্য বলল, 'নয়না, এবার জেগে ওঠো। তুমি এখনও বুঝতে পারছ না, বাগানবাড়ি বলে আর কোথাও কিছু নেই।' শেষ দিকে আদিত্যর গলা বসে গেল, কথা জড়িয়ে গেল।

নয়না বলল, 'আমি তো বলেছি, আর তিনটে দিন। দেখবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে—।'

আদিত্য বুঝতে পারছিল, মেয়েটার গলায় আগের সেই আস্থা আর নেই। এত কষ্টের ভ্রমণ আর পথের হানাদার দস্যুর দল সবরকম আস্থা শুষে নিয়েছে।

ও কিছু বলল না। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও 'মাদ্রাজি' নমস্কার করা হাসিখুশি বাচ্চাটাকে ভুলতে পারছিল না। নানকু! নানকু!

তখনই দূরের একটা বাড়ি ওদের চোখে পড়ল। তার দোতলার জানলা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। ঘোলাটে আলো।

ঠিক একইরকম ঘোলাটে আলো ফুটে উঠল সকলের চোখে। আদিত্যরও মনে হল, এইবার হয়তো একটা নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যাবে। হাতের ছোট-বড়-মাঝারি লাগেজগুলো অনেকক্ষণ ধরে পাথর হয়ে ঝুলছে। হাতের ও কাঁধের প্রতিটি পেশি, শিরা, বেদনায় টনটন করছে।

নয়না বলে উঠল, 'দিতুদা! দেখেছেন?'

আদিত্য সুনয়নাকেই দেখছিল অন্ধকারে। বলল, 'দেখেছি—।'

সামনে আর-সকলে নানা কথা বলছিল। নতুন এই আলোর ইশারায় হঠাৎই যেন সবার মধ্যে উদ্দীপনা জেগে উঠেছে।

টর্চের আলোয় কোনওরকমে পথ দেখে হোঁচট খেতে-খেতে সবাই এগোচ্ছিল।

কল্পনার কাছাকাছি পৌঁছে আদিত্যর কানে এল ফোঁপানির শব্দ। অবুঝ মেয়েটা এখনও থামতে পারেনি।

এখন ধোঁয়াশা কিছুটা কমে এসেছে। চোখও জ্বালা করছে কম। আশ্রয়ের দেখাও মিলেছে এই রুক্ষ প্রান্তরে। তবুও কল্পনা থামতে পারেনি।

অন্ধকারে আরও অন্ধকার সাতটা প্রাণী ধীরে-ধীরে পৌঁছে গেল বাড়িটার সদর দরজায়।

তখনই বুঝতে পারল, আশেপাশে আরও কয়েকটা বাড়ি রয়েছে। কিন্তু সেগুলো সবই ঘুটঘুটে অন্ধকার।

অন্য সবাইকে থামতে বলে আদিত্য ডেকে নিল বিশুকে। ব্যাগটা নামিয়ে রে

টর্চটা ডানহাতে বাগিয়ে ধরল।

একটা আশ্রয়ের আকাঙক্ষা এখন ভয়ানক তীব্র হয়ে উঠেছে। সঙ্গে বয়ে আনা জলের সঞ্চয়ও বিপদসীমায় পৌঁছে গেছে। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যেতে চাইছে।

ঠোঁটের ওপরে জিভ বুলিয়ে নিল আদিত্য। শুকনো জিভটা গিরগিটির লেজের মতো লাগল। ও আর বিশু সদরের কাঠের পাল্লার হুড়কো খুলে ভেতরে ঢুকল।

চারিদিকে খাটো পাঁচিল ঘেরা জায়গা। তার সামনের অংশে বাগান ছিল। টর্চের আলো বুলিয়ে দেখা গেল এখন যা হওয়ার কথা তাই হয়েছে। নীরস শাখাপ্রশাখা আর ঝরাপাতা।

ওরা সাবধানে এগোচ্ছিল, পিছন থেকে মুন্নি ডেকে উঠল, 'ছোড়দা, খুব জল তেষ্টা পেয়েছে রে...।'

আদিত্য টর্চ ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল। সুনয়না ততক্ষণে প্লাস্টিকের ওয়াটার বটল এগিয়ে দিয়েছে ছোট বোনটার দিকে।

আদিত্য চাপা গলায় বলল, 'দেখো তো আশেপাশে টিউবওয়েল আছে কি না। থাকলে জলের অভাবটা অন্তত মিটবে।'

সামনে টর্চ ঘোরাতেই বাড়ির দরজাটা দেখা গেল। ভেজানো। একতলায় কোনও আলো চোখে পড়ছে না। মনে হয়, সব জানলাই বন্ধ।

বিশু আর আদিত্য সামনে এগিয়ে গেল। টর্চ নিভিয়ে দরজার পাল্লায় সতর্কভাবে চাপ দিল।

আড়চোখে আদিত্য দেখল, বিশু রেঞ্চ বাগিয়ে ধরেছে।

আর তখনই ওদের অবাক করে দিয়ে দরজাটা খুলে গেল। বাড়িটার ভেতরের হা-হা অন্ধকার ওদের স্বাগত জানাল।

কারও কথার শব্দ কানে এল ওদের। তবে কথাগুলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

অন্ধকারেই বিশুর চকচকে চোখ আদিত্যকে দেখল। আদিত্য বিশুর হাতে টর্চ দিল, কিন্তু ওকে টর্চ জ্বালতে বারণ করল।

দোতলার খানিকটা আলো ঠিকরে এসে পড়েছে নীচের একটা ছোট উঠোনে। প্রতিফলিত আলোয় যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে ভয়ের কিছু নজরে পড়ল না।

বিশুর হাত ধরে টান মারল আদিত্য। দোতলায় যাওয়ার সিঁড়িটা আবছা দেখতে পেয়েছে ও।

একতলায় উঠোন ঘিরে দুটো ঘর। দুটোই অন্ধকার। প্রাণের সাড়া নেই।

সিঁড়িতে একবার টর্চের আলো ফেলল বিশু। ধুলো, নোংরা, অপরিষ্কার।

টর্চ নিভিয়ে ওরা দুজনে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

দোতলা থেকে ভেসে আসছিল কথাগুলো। ক্রমেই জোরালো হচ্ছিল। আরও কয়েক ধাপ ওঠার পর কথাগুলো বোঝা গেল। পুরুষের গলা : '...যে করে হোক এ অবস্থাকে সামলাতে হবে। এত সহজে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের

সাহায্য আসতে শুরু করেছে। দরকার হলে বিদেশি সাহায্যও আসবে।'

পুরুষটি থামতেই শোনা গেল নারীকণ্ঠ : 'শুধু সাহায্য দিয়ে কী হবে। সবুজের ছিটেফোঁটা নেই, একটা পাখি নেই, পোকামাকড় নেই, আর আইন-শৃঙ্খলা বলেও তো কিছু নেই...চারদিকে শুধু লুঠপাট খুন-জখম...।'

ওরা দুজনে দোতলায় উঠে এসেছে। দোতলার তিনটে ঘরের দুটোয় আলো জ্বলছে। শব্দ অনুসরণ করে ওরা চলে এসেছে একটা আলো-জ্বলা ঘরের সামনে।

আদিত্য আর দেরি করল না। বিশুকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এবং একইসঙ্গে বলতে শুরু করল, 'আমরা খুব বিপদে পড়ে—।'

থেমে গেল আদিত্য। ঘরে কোনও লোক নেই।

সাদামাঠাভাবে সাজানো একটা বসবার ঘর। চেয়ার, টেবিল, দেওয়াল-আলমারি, আর সাধারণ ক'টা আসবাব। টেবিলে কয়েকটা বই আর খবরের কাগজ। ঘরের এক দেওয়ালে একটা টিউব লাইট জ্বলছে। কিন্তু তার আলো ঘোলাটে—মরা মাছের চোখের মতো।

ঘরের সর্বত্র ধুলোর মিহি স্তর। আসবাবপত্র দেখে মনে হতে পারে এই ঘরটা একটু আগেই কেউ ব্যবহার করেছে, কিন্তু ধুলোর আস্তরণ অন্য গল্প বলছে।

পুরুষ আর নারীকণ্ঠ তখনও কথা বলছিল—টিভির ভেতর থেকে।

আদিত্য এগিয়ে গিয়ে টিভির সুইচটা অফ করে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে এক অদ্ভুত ছমছমে নিস্তব্ধতা গোটা বাড়িটায় চেপে বসল।

বিশু ঘরের ভেতরে ঢুকে অবাক চোখে চারপাশ দেখছিল। ও আদিত্যকে জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার, দাদা! কী বুঝছেন?'

আদিত্য বোধহয় বুঝতে পেরেছিল। মাথা নাড়ল সামান্য। চুলে হাত চালাল। গলার কাছে একটা জ্বালা টের পেল।

ও বিশুকে নিয়ে গোটা বাড়ির প্রত্যেকটি ঘরে একবার করে উঁকি মারল। না, কেউ নেই এ-বাড়িতে। ধুলোর বহর দেখে মনে হল দু-চারদিন আগেই সবাই এ-বাড়ি ছেড়ে গেছে। সুরেন্দ্র-নিলয়ের মতো। নিরুদ্দেশের পথে চলে যাওয়া মানুষগুলো আর কখনও কি ফিরে আসতে পারবে এই ঠিকানায়?

বিশু সব দেখেশুনে বলল, 'যাকগে, রাতটা নিশ্চিন্তে এখানে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।'

আদিত্য ঘাড় নাড়ল। ছোট্ট করে বলল, 'হুঁ—।'

ও শিকড় ছিঁড়ে চলে যাওয়া মানুষগুলোর কথা ভাবছিল। কী ভীষণ তাড়াহুড়ো ছিল তাদের। ঘরদোর খোলা, টিভি চলছে, বাতি জ্বলছে। নাকি সেসময় অপ্রত্যাশিত বিদ্যুৎ-বিভ্রাট হয়েছিল?

পরিত্যক্ত একটা স্মৃতির কোঠা এখন আদিত্যদের আশ্রয়। ও বিশুকে বলল, সবাইকে ডেকে নিয়ে আসতে। সবাই চিনে নিক তাদের রাত্রিনিবাস।

আদিত্য দোতলার টিভির ঘরে দাঁড়িয়ে নানকুদের কথা ভাবছিল, এমনসময় ক্লান্ত শ্রান্ত মানুষগুলো একে-একে এল।

আদিত্য বিশুকে বলল, 'সদর আর বাড়ির দরজায় ভালো করে খিল ছিটকিনি এঁটে দাও শিগগির।'

বিশু চলে গেল। তখন আদিত্য তাকাল মায়ের দিকে।

হাতে-পায়ে শুকনো আঁচড়ের দাগ, কিন্তু মুখে প্রশান্তি। মা ভীষণ সইতে পারে—শরীরের ব্যথা। মায়ের উদাস মুখ দেখে ওর মনে হল মা এখনও বুঝি একটা ছন্নছাড়া মানুষের 'নিভা! নিভা!' ডাক শুনতে পাচ্ছে। সেইসঙ্গে নানকুর চিৎকার : 'ঠামা, তুমি কোথায়?'

দোতলা ও একতলায় একটা করে শোওয়ার ঘরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। আদিত্য আর বিশু মিলে মোটামুটিভাবে ঝেড়েঝুড়ে দিয়েছিল বিছানাগুলো।

আদিত্য এগিয়ে গেল মায়ের কাছে। বলল, 'এসো—।'

সুনয়নার মায়ের মুখের বহু চেনা গিন্নি-বান্নিভাব অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে। তাঁর চেহারায় এখন হতাশা ছাড়া আর কিছু নেই।

আদিত্য তাঁকেও ডেকে নিল : 'আসুন, মাসিমা—' তারপর এগোল দোতলার শোওয়ার ঘরের দিকে। ওঁদের দুজনের সবচেয়ে বেশি বিশ্রাম দরকার।

বিশু ফিরে এসেছিল। আদিত্য ওকে বলল, খাওয়ার ব্যবস্থা করতে। এ-বাড়ির ভাঁড়ার আগেই খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছে ওরা। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে সামান্য কিছু হয়তো পাওয়া যাবে। মুন্নি এসে জানাল যে, বাড়ির পিছনদিকে একটা টিউবওয়েলের সন্ধান পাওয়া গেছে। তার জলটা বেশ মিষ্টি।

নয়না টিভির সুইচ অন করে দিয়ে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল। তারপর বিশুর সঙ্গে খাবারের জোগাড়ে সাহায্য করতে গেল।

মুন্নি একটা চেয়ারে জড়োসড়ো হয়ে মুখ গুঁজে পড়েছিল। চোখের কোলে কালি। সুন্দর মুখ অবহেলায় মলিন।

পাশের ঘরে মা শুয়ে পড়েছে বিছানায়। সুনয়নার মা-ও।

ওঁদের দিকে তাকাতে কষ্ট হচ্ছিল আদিত্যর। শ্বাস নিতেও বেশ কষ্ট হচ্ছে। লক্ষ করেছে, মা ভীষণ হাঁপাচ্ছে, আর কাশছে ক্রমাগত। শরীরটা জীর্ণ-শীর্ণ।

সুনয়না বোধহয় হাঁটাচলা করছে মনের জোরে। কিন্তু এভাবে কতক্ষণ? আর কতদিন? আর কতমাস পরে শেষ হবে নয়নার 'তিন দিন'!

কাল সকালে ওরা সবাই যাবে জিপসিটা খুঁজতে। যে করে হোক গাড়িটাকে ঠেলে তুলতে হবে গর্ত থেকে। তারপর ওই ভাঙা উইন্ডশিল্ড নিয়েই রওনা হতে হবে।

কিন্তু কোথায়? কতদূরের গন্তব্যের দিকে? আর পলাশ-বউদি-নানকুরা?

আদিত্য এইসব উলটোপালটা ভাবছিল। তখন টিভিতে গতানুগতিক নানা কথাবার্তা হচ্ছে। পুরোনো কিছু রেকর্ডিং চালিয়ে দেখানো হচ্ছে। কিন্তু সেগুলো দেখেশুনে আদিত্যর মনে নতুন কোনও প্রতিক্রিয়া জাগছিল না। সব মানুষই ভয় ও হতাশার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। এখন শুধু আক্রোশ, বিরক্তি, ক্ষোভ পড়ে আছে।

পরিত্যক্ত এই বাড়ির নানা ঘরে ঘুরে আদিত্য এতটুকু অবাক হয়নি। দেওয়ালে দু-তিনটে বাঁধানো ফটো। বাচ্চাদের স্কুলের বইপত্র। আলনায় এলোমেলো জামাকাপড়। রান্নাঘরে হাঁড়িকুড়ি। কলতলায় এঁটো বাসনপত্র। খাওয়ার ঘরে শুকনো বাসি খাবার। উঠোনের দড়িতে দুটো ছড়ানো কাপড়।

না, কোনও তফাতই খুঁজে পায়নি আদিত্য। যদি কোনও বাস্তুহারার দল তালা ভেঙে ঢুকে পড়ে সুরেন্দ্র-নিলয়ে, তারাও বোধহয় একই দৃশ্য দেখবে, একই অনুভবের শিকার হবে।

কল্পনা এসে ঘরে ঢুকতেই আদিত্যর মনে পড়ল, অনেকক্ষণ ওকে দেখেনি। কিন্তু তা বলে এরকমভাবে দেখবে ভাবেনি। স্নান সেরে ফেলেছে মেয়েটা। অন্য শাড়ি-ব্লাউজও পরে নিয়েছে। গুনগুন করে গান গাইছিল। এসে একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ল ধুপ করে। বলল, 'দাদা, আপনাকে ক্লান্ত লাগছে। যান, একটু বিশ্রাম করে নিন—।'

আদিত্য মুন্নিকে দেখল। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর স্বপ্নের মধ্যে দুর্গাপুর কিংবা রজত ঢুকে পড়তে পেরেছে কি না কে জানে! কারণ, এখন তো স্বপ্ন বলতে দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নেই।

আদিত্য ঘড়ি দেখে বলল, 'সবে পৌনে ন'টা। আগে দেখি খাওয়াদাওয়ার কী ব্যবস্থা হল, তারপর শোওয়ার কথা ভাবা যাবে।'

কল্পনা টিভি দেখছিল। অন্তত টিভির দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। মাথা হেলিয়ে ভিজে চুল আরও ভালো করে ছড়িয়ে দিল পিঠের ওপর। হালকা নীল সুতির শাড়ি আর হলুদ-কালো ছিটের ব্লাউজ বেশ দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। কিছুক্ষণ গুনগুন করে মেয়েটা হঠাৎই জিগ্যেস করল, 'এখানে ক'দিন থাকবেন?'

ওর প্রশ্নটা চমকে দিল আদিত্যকে। ওর কথার ঢঙে মনে হল ও যেন প্যাকেজ ট্যুরে বেরিয়েছে। আদিত্য ওদের টিম ম্যানেজার। কিন্তু এই ট্যুরের কি সত্যিই কোনও শেষ আছে?

টিভিতে কলকাতার নানা রাস্তাঘাট দেখানো হচ্ছিল। চোখে পড়ছিল ছোট-বড় ঘর-বাড়ি। কল্পনা সেগুলো দেখতে-দেখতে বলল, 'সব জায়গায় একই অবস্থা জানলে বাড়ি ছেড়ে বেরোতাম না। শুধু-শুধু এত ঝামেলা।'

আদিত্যর মাথার ভেতরে টনটন করে উঠল। গলার কাছটায় পুরোনো অস্বস্তিটা

ফিরে এল। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল। চোখ জ্বালা করছে। থুতু উঠছে মুখে বারবার।

সত্যিই তো, কোথায় পালাচ্ছে ওরা?

কল্পনা হঠাৎই উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে। অকারণে বাড়তি হাত-মুখ নেড়ে বলল, 'দেখি গিয়ে রান্নাবান্না কী হচ্ছে...।' তারপর গুনগুন করতে-করতে ঘর ছেড়ে চলে গেল। ওর সহজ হওয়ার চেষ্টাটা এতক্ষণ পরে খেয়াল করল আদিত্য।

কল্পনা চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর উঠে গিয়ে অফ করে দিল টিভির সুইচ। খবর শুনে বা পরিস্থিতি জেনে কোনও লাভ নেই। অতীত এ-অবস্থায় কোনওরকম সাহায্য করবে না।

যদি কাল সকালে জিপসিটা খুঁজে না পাওয়া যায়? তখন বড় রাস্তায় গিয়ে ওত পেতে থাকতে হবে একটা গাড়ির জন্য। তারপর কৌশলে সেই গাড়ি আটকাতে হবে। হানাদার খুনি হয়ে খতম করে দিতে হবে গাড়ির লোকগুলোকে। এবং নিজেদের লোকজনকে গাড়িতে তুলে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে যেতে হবে। বাঁচাতে হবে কয়েকটা জীবন।

যদি বেঁচে থাকে, তা হলে এই ভয়ংকর অপরাধবোধ নিয়েই বাঁচতে হবে : কয়েকটা জীবনের বিনিময়ে নিজেদের জীবন বাঁচিয়েছে আদিত্য। আর যদি জিপসিটা খুঁজে পাওয়া যায়, তা হলে গাড়ি চালিয়ে নিরাপদ গন্তব্যে ছুটে যাওয়ার আগে নানকুদের খোঁজ করতে হবে না? সম্পর্কের সুতোগুলো কি কয়েকদিনের মধ্যেই এত সরু আর পলকা হয়ে গেছে?

আদিত্যর মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। গলা আর বুকেও কষ্ট। ও পায়ে-পায়ে চলে এল ঘরের বাইরে। বারান্দার রেলিঙে সামান্য ঝুঁকলেই মাথার ওপরে আকাশ দেখা যায়। ধোঁয়াটে নক্ষত্রহীন আকাশ। আদিত্যর দম বন্ধ হয়ে আসছিল যেন। ও জলে ডোবা মানুষের মতো খড়কুটো আঁকড়ে ধরতে চাইছিল। ছাদে যাওয়ার সিঁড়িটা কোন দিকে? আদিত্য পা চালিয়ে এগোল সেদিকে।

ছাদ মাপে খুব ছোট। এটাও যেন সেই সুরেন্দ্র-নিলয়ের অভিন্ন প্রজাতি। অন্ধকারে তার কোনাকানাচ দেখা না গেলেও আদিত্য এই এক টুকরো ছাদটার সঙ্গে এক অদ্ভুত আত্মীয়তা অনুভব করল। এর যেন এক নিজস্ব স্পর্শ আছে, ঘ্রাণ আছে।

এই সময়ে আকাশে কত তারা থাকে, কত! মাঝে-মাঝে জল নামে আকাশ থেকে। ভরা যৌবনে ছেয়ে যায় ভূমির গাছপালা। ফুলের গন্ধ আসতে থাকে ঢেউয়ের মতো। ফুলের গন্ধ কেমন হয় আদিত্য কি ভুলে গেছে? ও চোখ বুঝে বহু লক্ষ বছর আগেকার ফুলের ঘ্রাণের স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে চাইল। হিলহিলে সাপের মতো পিচ্ছিল হয়ে সেই স্মৃতি লুকোচুরি খেলছিল ওর সঙ্গে। এই বুঝি ধরা দেয়, আবার অধরা থেকে যায়।

চোখ বুজে থাকায় দেখতে পায়নি আদিত্য, কিন্তু ঘ্রাণে টের পেল। ফুল? কী ফুল? টের পাওয়া সত্ত্বেও ও আরও কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে আন্দাজ করতে চাইল। পারল না। তাই চোখ খুলল।

সুনয়না। খুব কাছে দাঁড়িয়ে। ওর মুখমণ্ডল লিপস্টিকের বিজ্ঞাপনের মতো ক্লোজ-আপ ছবি। কিন্তু মুখটা কেমন ঝাপসা লাগছে।

আদিত্য চোখ খুলতেই নয়না নীচু গলায় বলল, 'এখানে কী করছেন, দিতুদা?'

আদিত্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল : 'মনে হচ্ছে বাড়িতেই আমরা বেশ ছিলাম—।'

'এখানে আমার একটুও ভালো লাগছে না। বাড়ির কথা মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে, জাপান থেকে ফিরে এসে বাবা একটানা কলিং বেল বাজিয়ে যাচ্ছে—।'

'আমারও ভালো লাগছে না।' আদিত্য সুনয়নার চোখ দেখল : 'নয়না, বলতে পারো, এভাবে তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মতো পালিয়ে-পালিয়ে শেষ পর্যন্ত কোথায় যাব আমরা? আমাদের কোনও ঘর নেই, বাড়ি নেই, ঠিকানা নেই। মা, মাসিমা ওদের কষ্ট তুমি তো দেখতে পাচ্ছ—বলো, সহ্য করা যায়? তার ওপর দাদা, বউদি, নানকু, দশরথ, কওশিকজি—কোথায় হারিয়ে গেল ওরা। ম্যাটাডর ভ্যানে আগুন লেগে তিন-তিনটে লোক শেষ হয়ে গেছে। শুভেন! শুভেনটাও। যে-ছেলেটা চাকরিবাকরির তোয়াক্কা না করে ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়াত, কবিতা লিখত, ওকে আমি কয়েক মিনিটের জন্যে কসাই হয়ে যেতে দেখেছি। ভয় হয়, নয়না, বাঁচার চেষ্টা করতে করতে আমিও কি ধীরে-ধীরে ওরকম বদলে যাব? আমার হাতে একটা রেঞ্চ অথবা ছুরি থাকবে, আমি অমানুষ হয়ে যাব—।'

'দিতুদা!'

মেয়েটার মুখ থেকে তীব্র বেদনার ভাষা হয়ে ছিটকে বেরোল শব্দটা। সুনয়না একটা হাত আদিত্যর কাঁধে রাখল, অন্যটা আলতো করে ওর ঠোঁটের ওপর। বলল ফিসফিসে গলায়, 'এরকম বলতে নেই, দিতুদা—তুমি কখনও পালটাবে না, কখনও না।'

আদিত্য সবকিছু ভুলে গেল। দুনিয়াজোড়া দূষণের কথা মুছে গেল ওর মন থেকে। ও সত্যিকারের ডুবে যাওয়া মানুষের মতো আঁকড়ে ধরল সুনয়নাকে। ওর পবিত্র বিশ্বাসকে। তারপর পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল ওর ঠোঁটে, নাকে, ভুরুতে, কপালে, চিবুকে, গলায়। ঠোঁটে, নাকে, ভুরুতে, কপালে, চিবুকে...।

সুনয়না মন-প্রাণ দিয়ে চুমুগুলো গ্রহণ করছিল। ভাবছিল, এভাবেই অনন্তকাল কেটে যাক। তারপর যখন সকাল হবে, তখন যেন স্পষ্টভাবে সূর্য দেখা যায়, দেখা যায় গাছপালা। তা না হলে এই ভয়ংকর দূষণ মানুষগুলোকে ধীরে-ধীরে পালটে দেবে। নিরীহ মানুষগুলো স্বার্থপরের মতো প্রাণ বাঁচাতে কাপুরুষ হানাদার হয়ে উঠবে।

আদিত্য যখন থামল তখন ওর গাল বেয়ে জল পড়ছে। সুনয়নার নিটোল মুখ ও দু-হাতে আঁজলা করে ধরল। এক অঞ্জলি ফুল। ওর মনে পড়ল শুভেনের লেখা কবিতার লাইন ঃ 'তুমি চলে গেলে দিনগুলো সব রাত হয়ে যায়।' এখন অনুভব করতে পারছে, ভালোবাসা কীরকম তীব্র হলে তবে এরকম লাইন লেখা যায়। সুনয়না কাছে থাকলে তবেই দিন আসবে, দিনগুলো দিনই থাকবে—রাত হয়ে যাবে না।

ও নয়নাকে কাছে টেনে রেখেই ভাঙাচোরা গলায় বলল, 'নয়না, সামনে এখনও অনেক কাজ বাকি। দাদাদের আগে খুঁজে বের করতে হবে। তারপর আমরা সবাই মিলে বাড়ি ফিরে যাব।'

আদিত্য মনে-মনে ভাবল, নিজেদের জমিতে দাঁড়িয়ে আমরা বাঁচার জন্য লড়ব। লড়াইয়ের জায়গা থেকে পালিয়ে গিয়ে কখনও লড়াই করা যায় না। কক্ষনো না।

এরপর অনেকক্ষণ ধরে ওরা দুজনে ছাদের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল। এলোমেলো বাজে কথা বলল অনেক। তারপর একসময়ে হাত ধরে নীচে নেমে এল।

মা-দের ঘরে গিয়ে দেখল মা বিছানায় বসে আছে। একপাশে একটা থালায় রুটি আর ডাল সেদ্ধ। আর কোলের কাছে বাবার ফটোটা। কাঁদছে নিঃশব্দে। আর সুনয়নার মা বিষণ্ণ হতাশ মুখে চুপচাপ পাশে বসে।

আদিত্য নয়নার হাত ছেড়ে দিয়ে নিজের চোখ মুছল।

ওকে দেখেই মা বলল, 'দিতু, এখানে আমার মন টিকছে না...' কান্না চাপতে মুখে আঁচল গুঁজে দিল মা।

আদিত্য দেখল, দেওয়ালে চার-পাঁচ বছরের একটা হাসিখুশি ছেলের ফটো। ছেলেটার মুখটা বারবারই নানকুর মতো হয়ে যাচ্ছিল।

আদিত্য এগিয়ে গিয়ে মায়ের পিঠে হাত রাখল, বলল, 'আর কোনও চিন্তা নেই, মা। কাল সকালেই আমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছি—সে যেভাবেই হোক। বিশু তোমাদের আগে নিয়ে যাবে, আর আমি দাদাদের খুঁজে বের করে ওদের সঙ্গে নিয়ে ফিরব। তুমি একটুও ভেব না।'

এরকম পরিস্থিতিতে কথাগুলো অন্তসারশূন্য মনে হওয়ার কথা। কিন্তু আদিত্যর গলার স্বর আর ওর চোয়ালের রেখা স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছিল এর মধ্যে কোনও মিথ্যে আশ্বাস নেই, বরং পরিপূর্ণ প্রতিজ্ঞা রয়েছে।

মায়ের মুখ যেন কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠল দিতুর কথায়। সুনয়নার মা মলিন হাসলেন একটু।

আদিত্য তখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল, কলকাতায় কাকের ডাকে ওর ঘুম ভাঙছে। রামুদা ভোরবেলায় খবরের কাগজ বিলি করতে এসে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, 'কলিকাল শেষ হল, কলকাতায় কাক এল। কলিকাল শেষ হল, কলকাতায়...।'

আর শুকিয়ে নীরস ও প্রাচীন হয়ে যাওয়া গাছপালাগুলোর শাখাপ্রশাখার সন্ধিস্থলে এই এতটুকু জোড়া-জোড়া সবুজ পাতা বেরিয়েছে। আবার আসছে সবুজের দিন। গাছপালার দিন, পাখপাখালির দিন, পোকামাকড়ের দিন। নানকুকে আর অন্য কোনও দেশে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। নিজের জন্মভূমিতে দাঁড়িয়েই ওকে লড়াই শেখাতে হবে। শেখাতেই হবে।

ক্রমেই আদিত্যর চোয়াল আরও শক্ত হচ্ছিল। নয়না এসে ওর জামা ধরে এক টান মারল। বলল, 'দিতুদা, এখন আর ভয় পেলে চলবে না। গব্বর সিং কী বলে গেছে মনে আছে তো?'

আদিত্য চোখে হাসল, বলল, 'মনে আছে—।'

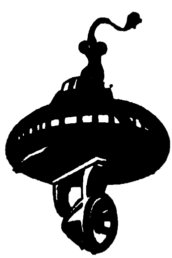
ও তরতর করে বয়ে যাওয়া গঙ্গার ছবি দেখতে পেল। নৌকো ভাসছে এখানে-ওখানে। হু-হু করে বাতাস দিচ্ছে। ধোঁয়াশার ছিটেফোঁটাও আর নেই। অনেকগুলো কালো-কালো ছেলেমেয়ে হাত-পা ছুড়ে দাপিয়ে স্নান করছে বহতা নদীর জলে।

এমনসময় বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির ফোঁটার টুপটাপ শব্দ ঘরে দাঁড়িয়েই টের পাওয়া যাচ্ছে।

আদিত্য সুনয়নার দিকে তাকাল। বলল, 'চলো, ছাদে যাই—বৃষ্টিতে ভিজি—।'

সুনয়না চঞ্চল পা ফেলে এগিয়ে গেল আদিত্যর দিকে। প্রায় ছুটেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ওরা দুজনে।

কালো বৃষ্টি হলেও বৃষ্টিতে ভিজতে ওরা এখন আর ভয় পায় না।



তিন দশকের লেখালেখি
থেকে লেখকের বাছাই করা
অনন্য সংকলন



২৬ গল্প

১ উপন্যাস

INR 250.00

9788183740791

www.bookspatrabharati.com